"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

পরিচয়

বর্ষ ৩৫ । সংখ্যা ৭
মাঘ, ১৩৭২

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : খালেদ চৌধুরী

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

বিষ্ণু দে

দুটি কবিতা

মানুষ যে

নিষ্ঠীবনে ডুবে যাক, নাকি শাস্তি : ঘৃণার কুলকুচা ?
ভারতীর ভিতে ঘর, দুঃস্থ বটে, ভাঙা আজ বাসা ;
তবুও মানবগর্বে মৃত্যুহীন। ভক্ত নই প্রয়োগতত্ত্বের,
সুবিধাবাদের গর্তে উপযোগ স্বভাববিরোধী।
সুতরাং যদিও বা শত্রু হয় দুরন্ত, প্রত্যাশা
সর্বদাই শুভবুদ্ধি, সম্প্রতি সত্যের অসত্যের
সীমা প্রায় লুপ্ত, অধিকন্তু শক্তি দেখি নিরবধি
নির্মম নির্লজ্জ। এবং আমরা সে শক্তিতে উদাস,
আমরা যে মানবজীবনের সহিষ্ণু প্রেমিক। মানি,
দীর্ঘকাল নিজবাসভূমে আমাদের পরবাস
হয়তো বিচ্ছিন্ন ক'রে গেছে দেশে কর্ম আর বাণী।
তবুও লজ্জায় মরি, মানুষ যে,—কি ক'রে যে হানি
শঠে শাঠ্য যদিই বা সিঁধ কাটে ইঁদুর বা ছুঁচা !

অন্য রঙ্গমঞ্চে

সারাটা জীবন বুঝি একলব্য মননের মল্লমঞ্চে
পেশীর চর্যায় যাবে ?   ঝুলন বা রাসের হর্ষ
কিংবা যৌথ নৃত্যোৎসবে বা গানের দোলায়
বিচ্ছিন্নের উঞ্ছবৃত্তি চৈতন্যের তীব্র বিপ্রকর্ষ
কোনোওদিন মেলাবে না একতায় এই চিরমর্ষ
ব্যক্তিকে কি তার ব্যস্ত হাটখোলার ইটখোলার গন্ধে ?

অবজ্ঞা ও আত্মদান, ক্রুদ্ধ ঘৃণা আর ভালোবাসা,
বঞ্চক ক্ষমতা আর যত ধূর্ত তীরন্দাজ প্রাত্যহিক আশা
মিলবে না কোনোও কুরুক্ষেত্রে কোনোও বিশ্বরূপ সত্যে
কোনোও সমীকরণের নবন্যাসে স্বয়ম্বশ মৌল একতার তত্ত্বে ?
পূর্ণ হয়ে এল প্রায় চৈতন্যের জাগরণে পঞ্চাশৎ বর্ষ,
দ্বিজোত্তম সত্যকাম সে শিশুকে হেনে যাবে অন্ধে মৌনে গন্ধে ;

প্রৌঢ় হৃদয়েরা চায় সুস্থ শান্তি মননের অন্য রঙ্গমঞ্চে ॥

রোমাঁ রলাঁ

ইটালিয়ান শিল্পে মিকেলআঞ্জেলোর প্রভাব

"আমার কোনো ধরনের বন্ধু নেই" মিকেলআঞ্জেলো বলেছিল ১৫০৯ সালে, "আমার দরকারও নেই কাউকে।"

চল্লিশ বছর বাদে, ১৫৪৮ সালে, মিকেলআঞ্জেলো আবার লিখল, "কারুর সঙ্গে কথা বলি না আমি, আমি সর্বদাই একা।"

কনডিভি লিখে গেছে, "সে অল্পবয়স থেকেই সর্বগ্রাসী উদ্যম নিয়ে, শুধু ভাস্কর্য বা চিত্রকলা নয়, সমগ্র শিল্পক্ষেত্রে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিল; ফলে বাধ্য হয়েছিল নিজেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে মানুষের সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে। এই কারণেই তাকে অনেকে খ্যাপাটে ভাবত, পাগল ভাবত। আসলে তার ভালবাসা ছিল নিজের কাজে, সেই বিরামহীন পরিশ্রমই তাকে নিঃসঙ্গ করে তুলেছিল। সৃষ্টির মধ্যেই এমন আনন্দ আর রোমাঞ্চ তাকে ভরপুর করত যে, সামাজিক আলাপনে স্ফূর্তি লাগত না; বরঞ্চ নিজের চিন্তার সূত্র কাটত বলে বিরক্তি বোধ করত।

মহান পুরুষ 'সিপিও'র মতোই তার সবচেয়ে কম নিঃসঙ্গ লাগত নির্জনতায়।"

মিকেলআঞ্জেলোর সৃষ্টি এবং প্রতিভার মর্মকেন্দ্র এই তীব্র নিঃসঙ্গতা। নিজের মধ্যে অর্গলবদ্ধ হয়ে সে বেঁচেছে; সমসময়ের শিল্পক্ষেত্রের সঙ্গে সত্যকারের যোগ তার ছিল না। সে র‍্যাফায়েলকে অবজ্ঞা করে বলেছে, 'ওর ক্ষমতা অন্তর থেকে আসে নি, এসেছে অনুশীলন থেকে।' তার নিজের অনুপ্রেরণা সবসময় ভিতর থেকে আসে সে কথা জানিয়েছে। এ দম্ভের ফলে হয়তো তার ক্রমাগত অস্থির প্রচেষ্টার কথা অংশত ঢাকা পড়তে পারে, তবু এ কথা সত্য যে অন্যের শিল্পকীর্তির মধ্যে সে কখনও নিজেকে বদলাবার বা নতুন করবার চেষ্টা করে নি। বরং তার ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্টতর হয়েছে। বলা চলে, অন্যের কাছে উদাহরণ বা শিক্ষা সে খোঁজে নি, কারণ, খুঁজেছে আরও আত্মস্থ হবার। চিরকাল তার ক্ষুধাকে শান্ত করেছে

তার অন্তরাত্মা—প্রারম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত। মানুষটাকে যে চিনেছে, তার সৃষ্টিকেও সে চিনতে পারবে।

এই অসাধারণ একনিষ্ঠ চরিত্রের সবচেয়ে বড় বিস্ময় যে তা দুই বিরোধী জগতের সমন্বয়ে তৈরি। বস্তুবাদের কঠোরতায় মিলেছে আদর্শবাদের প্রশান্তি, উদ্দাম শক্তি আর সৌন্দর্যবোধের মধ্যে খ্রীষ্টানের অতীন্দ্রিয়তা, শরীরী উগ্রতায় বুদ্ধিমানের বিমূর্তি, শক্তিমানের চর্চিত শরীরে প্লেটোর নিষ্কাম আত্মা। যুধ্যমান এই দুই শক্তির অবিচ্ছেদ্য সংযোগ তার যন্ত্রণার যেমন আংশিক কারণ, তেমনি তার মহত্ত্বেরও জন্মদাতা। বুঝতে পারা যায় যে তার শিল্পের পরম স্থৈর্য প্রচণ্ড সংঘাতের উপর তৈরি; তার কর্মকে বিরাটত্বের ব্যঞ্জনা দিয়েছে সেই আলোড়ন। আদর্শবাদ অন্য শিল্পীর কাছে শীতলতা আর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে, কিন্তু মিকেলআঞ্জেলোর অস্থির আবেগ এমনকি বিমূর্ত ভাবনাগুলোও হিংসা আর প্রেমের হোমাগ্নিতে জ্বলন্ত।

ভয়ের কারণও আছে। অতীন্দ্রিয় শিল্পী অন্দরমহলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠতে পারে। বাস্তব পৃথিবী তখন বিরাগ আর তাচ্ছিল্যের কারণ হয়ে ওঠে।

> "জগতে সুন্দর কিছু এ চোখে দেখি নি
> কারণ নিঃসীম শান্তি তোমারই দুচোখে।
> গভীরে কোথাও তবু, যেখানে সবটা তীর্থভূমি
> অন্তর পেয়েছে প্রেম, যে তার স্বর্গের সহচরী;
> ঈশ্বরের সহজাতা, জন্ম তার দেবতার দেশে।
> অন্যথায় বেঁধে রাখে যেসব ভঙ্গুর ভালবাসা
> তারা মিথ্যা জানি, তাই আরো দূরে চলি
> যেখানে প্রেমের প্রেম মৃত্যুহীন একা।"

ভারচি'র ধারণাই ঠিক। মিকেলআঞ্জেলোর বিশ্বাস সক্রেটিসের ধারণায়। হয়তো সান মার্কোর উদ্যানে প্লেটোবাদী পণ্ডিতদের কাছে এ তার যৌবনের পাঠ, হয়তো তাদের সাহচর্য কেবল তার চরিত্রের সত্যবোধকেই জাগিয়েছে, যাই হোক না কেন বিনা বিচারের বোধে এরা দুজন প্রায় সমধর্মী।

পারাসিয়াসের প্রচেষ্টা ছিল কেবল "আলো ও ছায়ার, কাঠিন্যের ও কোমলতার, বস্তুর বাইরের চেহারার" প্রতিফলন। সক্রেটিস তাকে ছবি আঁকার আদর্শ শিখিয়েছিলেন। তা হল বস্তুর গভীরতম প্রদেশের অনুসন্ধান,

তার আত্মার রূপায়ণ। তাঁকে বলতে শুনি ফিদোতে "প্রান্তর আর গাছের মধ্যে শেখার কিছু তো পাই নি। পেয়েছি নাগরিক মানুষের কাছে।"

এই মানুষগুলোর সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহের কারণ এই জন্যেই যে তাদের মধ্যে এমন কিছু দেখেছিলেন যা অবিনাশী। তাদের শরীরে, ভাবে যা কিছু পলাতক, পরিবর্তনশীল যা জীবনের নরম মাধুর্যের স্পর্শ লাগা বলে আমাদের ভালো লাগে, ছবির বিষয়বস্তু করতে ইচ্ছা যায়—তাঁর কাছে সেগুলো অবান্তর, ক্লান্তিকর, মোহ। শিল্প মোহের সৃষ্টি করে। এর কারবার যা নিয়ে তা "দৃষ্টিমান মানুষের কল্পনায় স্বপ্ন আনে। এ ছেলে-ভুলানো ছায়া, দূর থেকে দেখলে তাদের বিভ্রম ঘটে। ইন্দ্রিয়ের এই বিভ্রম আত্মাকে একমাত্র সত্য—চিরন্তন ভাবনাগুলো—থেকে বিচ্যুত করে।"

প্রকৃতিকে যথাযথ রূপ দিতে মিকেলআঞ্জেলোর ঔদাসীন্য এই যুক্তির উপর দাঁড় করানো। তীব্র আন্তরাবেগ দিয়ে সে তাকে বুঝতে চেয়েছে শুধু তার নিয়মগুলো জানবার জন্যে। তাকে স্বীকার করেছে বৈরী হিসেবে; কারণ, মানুষের আত্মাকে সে বন্দী রাখতে চায়। মিকেলআঞ্জেলো চেয়েছিল মুক্তি। সে তাকে ব্যবহার করতে চেয়েছে নিজের চিন্তার উপকরণ হিসেবে। প্রকৃতির যান্ত্রিক উপাদানগুলো সে খুঁজেছে, তার সন্ধান বার করেছে; তারপর যখন নিজের ইচ্ছামত তাদের ব্যবহার করতে পেরেছে তখন তার উপর অত্যাচার চালিয়েছে। তাকে বাধ্য করেছে অদ্ভুত পরিণাম মেনে নিতে। শরীরবিদ্যার গভীর জ্ঞানকে ব্যবহার করে সে মনোমত একটা ভাবগত মানুষ তৈরি করেছে; কোনোও বিশেষ মানুষের দিকে না তাকিয়ে সে এক নতুন প্রকৃতিকে সৃষ্টি করেছে তার নিজের ভাবনার ছায়ায়। সে অনুসরণ করেছে ঈশ্বরকে; কারণ, তিনি একমাত্র সমস্ত ভাবনার উৎপত্তি এবং মূল।

"যেমন উত্তাপ কখনও আগুন ছাড়া থাকে না, তেমনই সুন্দরও অনন্তের আশ্রিত। আমার চিন্তা সেখান থেকেই আসে, তারই চেহারা নিয়ে আসে, তারই স্তব করে।"

তার সৃষ্টিতে কেবল যা মৃত্যুহীন তারই সাধনা। বহিঃপ্রকৃতির ব্যবহারে তা সম্ভব, সে বিশ্বাস করে নি। তাই তার চেষ্টা সমস্ত কাজে—একটা প্রচণ্ড শক্তি সে মূর্ত করতে চেয়েছে। তার নিজের প্লেটোবাদী খ্রীষ্টান হতাশায় মেশা। ভিত্তোরিয়া কোলোন্নার মতো সমস্ত মানবিক প্রকৃতি তার কাছে অনুপম সৌন্দর্যে ভরা, অথচ সে নিজে মৃত্যুচিন্তায় বিমূঢ়।

এক অস্তমিত যুগে তার জীবন কেটেছে যখন বাস্তব প্রকৃতির আনন্দময়তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। একমাত্র ঈশ্বরই আশ্রয়,—অনন্ত, অমোঘ পূর্ণতা যাতে। মিকেলআঞ্জেলো বাস্তবতায় সম্পূর্ণ অনাগ্রহী। প্লেটোর মতো তার কাছেও ভাস্কর্যের কাছে অঙ্কনবিদ্যা অনাদৃত।

"আমার কাছে ছবি আঁকা তত ভালো যত তা ভাস্কর্যের মতো। ভাস্কর্যের কাজ তত খারাপ যত তা অঙ্কনধর্মী। ভাস্কর্য চিত্রকলার পথ দেখিয়ে চলে এবং এ দুটোর মধ্যে তফাৎ সূর্য আর চন্দ্রের মতো।" যদি সব কিছু ছাপিয়ে তাকে ভাস্কর বলে মানতে হয় তবে তার কারণ তার তীব্র অমূর্ত প্রতিভা, এই মাধ্যমেই সে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছে।

"পরম যে শিল্পী,
তারও বাসনা থাকে না দেখাবার,
অমসৃণ পাথরের অকেজো আড়ালে
যা ঢাকা নেই।
মনের দোসর হাত
শুধু পারে
পাথরের ঘুম ভাঙাতেই।"

তার ভাস্কর্যও পর্যবসিত হয়েছে সবচেয়ে সরল চেহারায়—নিঃসঙ্গ মূর্তি-সৃষ্টিতে। দলবদ্ধ মূর্তি বা পটপ্রোথিত ভাস্কর্যে মিকেলআঞ্জেলোর অনুরাগ ছিল না। তা সে প্রায় করে নি বল্লেই চলে, এবং সে ক্ষেত্রে তার অস্বাচ্ছন্দ্য প্রকট। চেলিনি এবং ভাসারি মারফৎ যতটুকু আমরা জানি তাতে মনে হয় যে তার শিল্পচেষ্টা এবং ভাস্কর্যের বনিয়াদ ছিল রেখাঙ্কন; সবচেয়ে বস্তুনিরপেক্ষ বলেই তা হয়তো তার চিন্তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

মিকেলআঞ্জেলো যেমন এঁকেছে তেমন আর কেউ পারে নি। শার্ল ব্লঁম বলেছেন ঠিকই, "তার ভাস্কর্য এবং দেয়ালচিত্রের মধ্যে কাজের তারতম্য হয়তো আছে; কিন্তু রেখাঙ্কনে, এমনকি যখন সে অমনোযোগী বা অতি সংক্ষিপ্ত, তখনও হাতের কোনো দুর্বলতা, মনের কোনো অস্থিরতা প্রকাশ পায় নি।" তার মধ্যে তার সঙ্গীহীন স্বপ্ন আর স্বগতোক্তি ধরা পড়ে, তার সবচেয়ে পূর্ণ প্রকাশভঙ্গী ফুটে ওঠে।

এই তাচ্ছিল্যের সঙ্গে মেশানো যে বিশ্বাসের অভিব্যক্তি সেটা আমরা বুঝি। কোন শিল্পী আছে যার জ্বালা লাগে না অবুঝ জনতার আবেগ-

প্রবণতায় কোনো অতি সাধারণ শিল্পকর্মের সাফল্য দেখে? এই অকিঞ্চিৎকর সফলতায় মিকেলআঞ্জেলোর উদ্ধত প্রত্যাখ্যান কোন শিল্পী বুঝবে না? এই দম্ভ শিল্পিচরিত্রের মর্যাদা বাড়ায়, তবু আর্টের পক্ষে এ সর্বনাশা। সমস্ত সরল মানুষের কাছে তার দরজা বন্ধ হয়ে যায় এর ফলে। শিল্পকে সরিয়ে নিয়ে যায় সংগোপন আদর্শ সন্ধানে, একান্ত পরিপূর্ণতার দিকে যা কেবল কিছু মানুষই বুঝবে বা জানবে। মিকেলআঞ্জেলোই বলেছে, "ভাল ছবি, তার নিজের জন্যেই মহান এবং পবিত্র। কারণ প্রাজ্ঞদের কাছে সেই দুরূহ সাধনাই আত্মাকে সবচেয়ে উদ্বুদ্ধ করে, ভক্তিমান করে তোলে যা ঈশ্বরের পূর্ণতার কাছ বরাবর পৌছায়, তাঁর মধ্যে এক হয়। ভাল ছবি এই পূর্ণতার প্রতিচ্ছায়া মাত্র, পেন্সিলের স্বল্প রেখা, একটা গান, একটা সুর; অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির মানুষই তার দুঃসাধ্য আয়াস উপলব্ধি করতে পারে। সেইজন্যই তা এত বিরল। খুব কম মানুষই তা আয়ত্ত করতে পারে বা তা ব্যবহার করতে জানে। ছবি আঁকা ঐশ্বরিক সংগীত তাঁর ভাস্বর সত্তার অন্তর্ছবি।"

মিকেলআঞ্জেলোর নিবিড় বিশ্বাস এবং প্রাণবন্ত উদ্দীপনা তার আদর্শবাদকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ঈশ্বরচিন্তা। এক প্রাণময় পুরুষকে কল্পনা করেছে যার সঙ্গে সে কায়মনে একাত্ম হতে চেয়েছে। তার বদলে যদি কোনো অবিশ্বাসী বা সন্দিগ্ধ মানুষ বাদ দিয়েও 'কাউন্সিল অব ট্রেন্টে'র মতো কোনো আন্তরিক ঈশ্বরবিশ্বাসীর কাছে কোনো ভাসারী বা জুচ্চেরোর কাছে যাওয়া যায়, তবে সেখানে দেখা যাবে ঈশ্বর যুক্তির উৎস। প্রেম বা উন্মাদনার আশ্রয় নন। হায় রে জ্ঞানবৃদ্ধের যুক্তি—পুরো শিল্পকলার আদি অন্ত তাতে দেখা যায়। মিকেলআঞ্জেলোর একশ বছর পরে পুসঁ্যা এই নিগড়ে সমস্ত শিল্পকে বাঁধল। এর সমস্ত স্বাভাবিক সম্ভাবনাকে একটিমাত্র চিন্তায় পর্যবসিত করা হল। সৃষ্টিকর্মের ভাবনাই হল প্রধান কথা, তারই ধ্যান হল কর্তব্য। অমূর্ত চিন্তা রূপের থেকে দামী কারণ চিন্তাই একমাত্র স্বতঃস্ফূর্ত। বাদবাকি সব—প্রাণোচ্ছ্বাস, অভিব্যক্তি, রঙ—বিচার এবং যুক্তি দিয়ে বাঁধা। বিষয়বস্তুই সংরচনা নির্ধারণ করবে, মুখ্য কেন্দ্র ঠিক করবে, ছবির অন্যান্য অংশকে স্থানবিশেষে উপস্থাপন করবে। মানুষের চরিত্র এরই ফলে বোঝা যাবে—তার অন্তরের এবং সঙ্গে সঙ্গে বাইরের চেহারা এতে পরিষ্কার হবে কারণ এ দুটো তো পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা। দৃশ্যপটের চেহারা ঠিক করবে, কারণ দৃশ্যের সঙ্গে ছবির যুক্তিগত সম্বন্ধ ঠিক হওয়া চাই। এমনকি অঙ্কনকৌশলও

এর উপর নির্ভর করে থাকবে। ছবি আঁকার কায়দা বিষয়ানুগ হতে হবে। শান্ত হলে হবে ফ্রীজিয়ান, গম্ভীর হলে গেরিয়ান বা বিষণ্ণ হলে লিডিয়ান। এইভাবে সমস্ত কিছু বুদ্ধিগত, হিসাবমাফিক হয়ে গেল। ঈশ্বরের পূর্ণতাবোধের অতীন্দ্রিয় আকৃতি মিকেলআঞ্জেলোকে বেহিসাবী অনুভূতির স্বাধিকার দিয়েছিল। পুসঁ্যা আর কিছুকেই হিসাবের বাইরে রাখলো না। তার যুক্তির আদেশে বাধ্য হাত কাজ করে চলল।

পুসঁ্যার নাম করতে হয় এইজন্যই যে সে বুদ্ধিবাদী শিল্পীদের শেষ এবং চূড়ান্ত প্রতিনিধি। অন্তত তার কাজে তার প্রখর বুদ্ধির ছাপ সে রেখে গেছে। তার ব্যবহার একটা বিশেষ চিন্তাপ্রণোদিত, তার কাজে সে চিন্তা প্রবল এবং প্রাঞ্জল। কিন্তু অক্ষম শিল্পীদেব হাতে তার পরিণতি কি হবে? যে-শিল্পীরা নিজের মতো করে ভেবে নেয় বা অন্যের ভাবনাকে নতুন দক্ষতায় প্রকাশ করে, তাদের সংখ্যা নগণ্য। তাছাড়া অপরিণতদের কাছে আদর্শ একটা অস্পষ্ট পূর্ণাঙ্গতার ধারণা যেটা নিয়ে সজোরে প্রকাশ করতে পারলেই তারা খুশি। বুদ্ধিগত আদর্শের আড়ালে তারা প্রকৃতিকে বিকৃত করতে আরম্ভ করে; তারপর ধীরে ধীরে, নিজেদের পিঠ ফিরিয়ে, চোখদুটো আত্মম্ভরিতায় বুজে, নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করে। টোমাজ্জো বলেছে, "সুন্দর বস্তু থেকে বহুদূরে।" তার উত্তরকালের প্রতীক লোমাজ্জো, নন্দনতাত্ত্বিক, চিত্রকর—অন্ধ।

অল্পবিস্তর সবাই অন্ধ—মিকেলআঞ্জেলোর চারপাশের সবাই। তাদের দুর্বল চোখ শিল্পের গোধূলি গগনের এই একক সূর্যের জ্যোতিতে দৃষ্টি হারিয়েছিল। আর রেণেসাঁর ইতালিতে রাত্রি নেমে আসছিল ধীরে। দিক চক্রবালের ওপার থেকে এই সূর্যের অস্তমিত আভা বহুদিন তার দীপ্তিমান আলো ছড়িয়ে রাখল। ইতালির আর্টকে মিকেলআঞ্জেলো বিহ্বল করল।

মিকেলআঞ্জেলোর সঙ্গে ষোড়শ শতাব্দীর অন্য প্রধানদের—যেমন র‍্যাফায়েল বা কোরেজ্জিওর প্রভাব তুলনা করা যায় না। তাদের নিজের শতাব্দীতে যতই তাদের প্রতিষ্ঠা থাকুক না কেন, কোরেজিও বা র‍্যাফায়েল তাদের নিজেদের যুগের চিন্তাই ফুটিয়েছে—অনেক মাধুর্য এবং মহিমা দিয়ে। মিকেলআঞ্জেলো যুগভ্রষ্ট একক, স্বতন্ত্র, অতিকায়। সে এক বিশাল পর্বতের মতো। তার পাদদেশের, বাসিন্দাদের মনে স্বভাবতই ইচ্ছা জাগবে এর চূড়ায় উঠতে। কিন্তু অন্য কোনো যুগে এত অক্ষম মানুষ আর জন্মায় নি,

যারা এই নির্মম এবং মহিমান্বিত শিখরে উঠতে উৎসুক অথচ অপারগ। ডেকাডেন্সের সুকুমার শিল্পীরা তার অনুপ্রেরণায় মাতাল হয়ে উঠেছে, তাদের নীরক্ত শিল্পে তার অমিতবীর্য ধারণাকে আহ্বান করতে চেয়েছে। কিন্তু তারা নিজেদের সীমা অতিক্রম করেই মরেছে—একমাত্র তাতেই বাঁচতে পারত তারা। নিজেদের ক্ষুদ্র স্বপ্নজগতের শীতলতা হয়তো অনুরাগের উত্তাপে কাটত, কিন্তু তাদের আকাঙ্খা চাইল বিরাট সৃষ্টিকর্ম। একরাশ প্রমূর্ত বিরাট দেহের প্রচণ্ড অঙ্গভঙ্গী যা তারা দেখেছে, তাই তাদের মনের মধ্যে আবর্ত সৃষ্টি করতে লাগল অথচ বুদ্ধি বা হৃদয়ের কোনো সংহতি দিয়ে তাকে মর্যাদা দিতে পারল না।

আমাদের মনে রাখতে হবে মিকেলআঞ্জেলোর জীবনের পঞ্চাশ বছর কেটেছে ইতালীয় আর্টের স্বর্ণযুগে এবং আমাদের সময় যেমন ভিক্তর উগোর ভাগ্যে হয়েছে, তেমনি তারও প্রশস্তি বেড়েছে ততই যত তার দাবি কমেছে। এমনকি যে গোষ্ঠীগুলো সবচেয়ে বেশিদিন তার বিরোধিতা করেছে, যেমন র‍্যাফায়েলের শিষ্যরা, তারাও তার জয়গান করেছে শেষে। পেরিনো দেল ভাগা মেনে নিয়েছিল যে চিত্রকররা তাকে গুরু বলে মানত, তাদের শ্রেষ্ঠ এবং অঙ্কনবিদ্যায় দেবতা বলে পূজা করত—যারা স্বাতন্ত্র্যের গর্ব করত, চেলিনির মতো তারা সনেট লিখেছে :

‘মিকেলআঞ্জেলো, হে দেবতা। তোমার মুকুটের একটা পাতা দাও। তোমারই বৈভব আছে, একমাত্র তুমিই অমর। আমি তাতেই খুশি থাকব ; আমার আর অন্য বাসনা নেই, কারণ আমার কাছে একমাত্র তাই শুভ, তাই সুন্দর।”

তার নিজের দেশ ফ্লোরেন্স, ইতালীর অন্য সব জায়গার থেকে বেশি করে তাকে শ্রদ্ধা করেছে অন্ধভাবে। অঙ্কনবিদ্যার যে-কেন্দ্র ভাসারী প্রতিষ্ঠা করল, তা শিষ্য এবং অনুচরদের বিদ্যালয় হয়ে উঠল। মিকেলআঞ্জেলোর ছবি বেশির ভাগ রোমে থাকার জন্য ফ্লোরেন্সবাসীদের আঁকা রইল ভাস্কর্যের নকল করতে ব্যস্ত। লান্‌জি যেমন বলেছে, তার প্রধান কর্তব্য হল ‘বিরাট পাষাণস্তূপের পেশীরাশি’ দেখানো।

গুরুর বাণী অনুসরণ করেই তা ঘটল। তার কথা ছিল ভাস্কর্যই হবে চিত্রকরের পাঠগৃহ, আদর্শ। মিকেলআঞ্জেলোর ইচ্ছাকে সূত্র হিসাবে ব্যবহার করে চেলিনি হাস্যকরভাবে প্রমাণ করতে চাইল, ভাস্কর্য চিত্রাঙ্কণের থেকে সাতগুণ বেশি দামী।

এই সময় থেকে চিত্রকর নিজেকে তৈরি করতে সুরু করল মূর্তি এঁকে, বিশেষ করে মিকেলআঞ্জেলোর। ফলে রঙের প্রাধান্য রইল না। একমাত্র লক্ষ্য হয়ে উঠল অতিস্পষ্ট রেখাঙ্কণ, অযৌক্তিক চাঞ্চল্য, অত্যধিক নিপুণতা। চেলিনির কাছে সে সবচেয়ে বড় চিত্রকর, ছবি আঁকা ভাস্কর্যের নকলিয়ানা বলেই এবং সেই হিসাবে ব্রনজিনো সবচেয়ে আদর্শের অনুকূল আঁকিয়ে। কোনো আদর্শকে বুঝে অনুসরণ করার বিপদ কম, কিন্তু মিকেলআঞ্জেলোর ভক্তদের কাছে তার ভাবনা একদম ধরা পড়ে নি। তাছাড়া কী হবে, তার সমস্ত শিল্প তার শতাব্দীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। আমরা দুঃখের হাসি ছাড়া কি হাসব, যখন দেখি তার সময়কার লোকেরা উজ্জ্বল হয়ে ভয়ংকর 'রাত্রি'কে সাজানো দামি কথার মালা গেঁথে বন্দনা করছে।

কী চূড়ান্ত বিড়ম্বনা। ঘৃণা আর ক্লান্তির বিরাট প্রমূর্ততার বাইরের চেহারাটা দেখে দুনিয়া তারিফ করল—যা 'মোজেস' বা 'দিন', বা 'বিজয়ীর কাছে বন্দীর পরাভব' 'উষা' কিংবা 'দাসের দল' বলে পরিচিত। দুনিয়ার বিরুদ্ধে যে অভিশাপ সৃষ্টি করা হল তার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিশ্ববাসী ধন্যবাদ দিল। তাকে নিজেরা উচ্চারণ করতে লাগল অর্থ না বুঝে।

ফ্রেডরিগো জুচ্চেরোর দুটো রেখাঙ্কন আছে লুভ্‌রে। তাতে দেখা যায় সান লোরেনজোর ধর্মালয়ে কিছু শিল্পী গভীর মনোযোগে মিকেল-আঞ্জেলোর মূর্তি আঁকছে। যোড়শ শতাব্দীর কত শিল্পীই না এই আদলে তাদের সমস্ত শিল্পকে গড়ে তুলতে চেয়েছে। অথচ তারা একবারও ভাবে নি যে এ মূর্তি একমাত্র সম্ভব কারণ এক গভীর আলোড়ন তাদের প্রাণ দিয়েছে। নিষ্প্রাণ চর্চা ও চেষ্টা তাকে রূপ দিতে গেলে তা হাস্যকর হতে বাধ্য।

ভিনিসের বাতিস্তা ফ্রাঙ্কো সবচেয়ে বেশি উদ্যমী ছিল মিকেলআঞ্জেলোকে কপি করার ব্যাপারে। ভাসারি বলে গেছে এমন কোনো স্কেচ ছিল না, কোনো টুকরো, কোনো অসমাপ্ত রেখাঙ্কন ছিল না যা সে গভীর শ্রদ্ধায় আঁকে নি। পুরো সিস্তিন চ্যাপেল তার মুখস্থ ছিল। ১৫৩৬ সালে ফ্লোরেন্সে এসে সে আবার সান লোরেনজোর সমস্ত মূর্তিকে আঁকল। ১৫৪১ সালে তাড়াতাড়ি ছুটল রোমে "শেষ বিচারের" উদ্বোধন অনুষ্ঠানে, সেখানে বসে পুরো ছবিটাকে আঁকল। বুঝতে পারা যায়, নিজের চিন্তার অবসর তার ছিল না। বহুদিন পর্যন্ত কোনো নিজস্ব ছবি সে আঁকে নি। যখন নিজের ছবি আঁকতে বসল তখন তার 'মন্তেমুর্লোর যুদ্ধ' হয়ে দাঁড়াল 'পিসার বিরুদ্ধে

যুদ্ধ' বা 'গোনিমীডের ধর্ষণ'-এর অংশবিশেষের জোড়াতালি। স্বাতন্ত্রী চেলিনি আত্মজীবনীতে লিখেছে "আমি বরাবর মিকেলআঞ্জেলোর মনোরম ভঙ্গীকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করার চেষ্টা করেছি, আর তারপর তা থেকে বিচ্যুত হই নি।"

একশ বছর বাদেও বের্নিনি পরপর দু বছর ধরে 'শেষ বিচার'-কে কপি করে গিয়েছে, তারপর প্রকৃতিকে আঁকতে সুরু করেছে। স্কিভোলি তাকে তা করতে দেখে বলেছে, "তুমি মূর্খ। তুমি যা দেখেছ, তা আঁকছ না; এ তো মিকেলআঞ্জেলো ছাড়া আর কিছু নয়।"

বের্নিনিই একথা বলে গেছে; এতে সে বিরূপ সমালোচনা দেখে নি, কারণ নতুন শিল্পশিক্ষার্থীদের জন্যে সে এই নীতিরই সুপারিশ করেছে।

"অল্পবয়সীদের সুন্দরের ধারণা করা সব প্রথমে দরকার, কারণ সারা জীবন এটা প্রয়োজনে লাগবে। প্রকৃতি নিয়ে আঁকতে সুরু করলে তাদের সর্বনাশ হবে। প্রকৃতি দুবল এবং নীচস্বভাবা তার দ্বারা যদি কল্পনা প্রভাবিত হয় তবে সুন্দর এবং মহতের সৃষ্টি অসম্ভব; প্রাকৃতিক জগতে তা নেই। যারা প্রকৃতিকে ব্যবহার করতে চায় তাদের ক্ষমতা থাকা চাই প্রাকৃতিক জগতের ত্রুটিকে বোঝার এবং সংশোধন করার। কোনো যুবকের তা করার ক্ষমতা হবে না যদি না সে সুন্দরের সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা লাভ করে।"

শিক্ষাদানের মূল কথাটা হল প্রকৃতি অশুভ; মিকেলআঞ্জেলোর চিন্তাও ছিল তাই। তার বিষণ্ণ আদর্শময়তা কোন অভাবনীয় পরিণতিতে পৌঁছল —তা এখন আমাদের কাছে স্পষ্ট। এতে কেবল প্রকৃতি-বিমুখীনতা এলো না, এ আসল ব্যক্তিগত অনুভবের জায়গায় বিধিবদ্ধ কায়দা, "যেহেতু কোনো এক ব্যক্তির পক্ষে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান অসম্ভব, এবং শিল্পের মতো গভীর এবং দুবোধ্য ব্যাপারে সাহায্য ছাড়া চলা যায় না।"

এই আজ্ঞানুচারী ভক্তবৃন্দদের দেখলে মিকেলআঞ্জেলো কি বলত? সে সোচ্চারে ঘোষণা করেছে, "যে কেউ অন্যের অনুসরণ করবে সে এগোতে পারবে না। নিজের ক্ষমতা সৃষ্টি করতে যে জানে না, তার অন্যের সৃষ্টি দেখে লাভ নেই।"

কিন্তু হীনমন্যতার ধারণাও তারা হারিয়েছিল। মিকেলআঞ্জেলোর ভুক্তাবশিষ্ট নিয়ে তারা এত গৌরব করতে লাগল, যা দু শতাব্দীর ক্ষুধা মিটিয়েও তাদের গুরু পায় নি। কেউ নিশ্চিন্তে স্মৃতিচারণ করে চলল, কেউ টীকা পাঠে মন দিল, কেউ বা গুরুর বিরাট সৃষ্টির অক্ষম অনুকরণে

যেতে রইল। সবাই আত্মসন্তুষ্ট। কেউ অনুভব করল না কী নিবিড় মন্ত্রণা দিয়ে তাদের পথিকৃৎ এবং গুরু এই সৃষ্টিকাণ্ড সম্ভব করেছে, যা এত সহজে তারা অনুকরণ করছে।

মিকেলআঞ্জেলোর আদর্শের পেছনে একটা প্রবল সংশোধনী শক্তি কাজ করেছে, "সুন্দরের সাধনার সংগ্রাম; যন্ত্রণার পবিত্রতা।" সে লিখে গেছে, "ত্রুটিহীন সৃষ্টির প্রচেষ্টা ঈশ্বরসাধনা; কারণ ভগবানই পূর্ণতা।"

তার মতো প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব নিয়ে আর কেউ মূর্তি গড়ে নি। সিস্তিন চ্যাপেলের ছাদে ছবি আঁকতে আঁকতে সে যন্ত্রণায় কেঁদেছে, 'সময়ের অপব্যয়' হচ্ছে বলে। তার ভাস্কর্য নিজের রক্ত দিয়ে গড়া অথচ শেষ করে সে শান্তি পায় নি, অসম্পূর্ণ করে রেখেছে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেদনায় চোখের জল ফেলে গেছে। "ভালবেসেছে, কেঁদেছে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে জ্বলেছে—এমন কোনো মানুষী আবেগ নেই যা তাকে গ্রাস না করেছে।"

এক স্বপ্নময় আদর্শকে সে খুঁজে বেড়িয়েছে, ব্যর্থকাম হয়েছে। মৃত্যুর সময় জীবনের আনন্দ ঘুচল বলে পরিতাপ করে নি, দুঃখ পেয়েছে কাজ করায় বিঘ্ন ঘটল বলে।

এই সরল বিনয়ী মানুষের পাশাপাশি ক্ষুদে গুরুদের অদ্ভুত আত্মাভিমান দেখে কি ভাবব আমরা? যারা মহান গুরুর বংশধর বলে দাবি করেছে, নিজেদের মিকেলআঞ্জেলো বলে ভেবে গেছে! ভাসারীর সাহস হয়েছে লিখতে:

"আমাদের কালে চিত্রশিল্পের এত উন্নতি হয়েছে যে আগে যেখানে ছ বছরে একটা ছবি আঁকা হত, এখন আমরা বছরে ছটা ছবি আঁকছি। আমি সাক্ষ্য দিতে পারি, কারণ এ আমার চোখে দেখা এবং নিজেও তা করেছি। তা সত্ত্বেও আমাদের ছবি অনেক সম্পূর্ণাঙ্গ, অনেক উৎকৃষ্ট, যা আমাদের আগেকার শিল্পীরা পারে নি।"

সব থেকে অক্ষমও এ কথা ভাবত। পেরিনো দেল ভাগা নিজেকে মেসাচ্চিওর থেকে বড় শিল্পী ভাবত; আর চেলিনির অহংকার উন্মাদের পর্যায়ে পৌচেছিল। সে ভাবত অতীতের শিল্পকীর্তি কেবল তার কাজের পশ্চাদ্‌পট। প্রিমাতাচ্চিও যে ব্রোঞ্জের ঢালাই রোম থেকে এনেছিল তাই দিয়ে তার 'জুপিটার' সে তৈরি করল।

যে-শিল্পী সাফল্য সম্বন্ধে এত বিশ্বাসী, সে পরিশ্রম করতে যাবে কেন?

গিয়রলমো ডা ত্রেভিসো চিৎকার করে উঠেছে, "আমি শিখতে যাব ? আমি ? যার তুলির ডগায় শিল্পের বাস ?"

যে সাবধানতা মিকেলআঞ্জেলো অনুভব করত তা আর শিল্পীদের বাধা দিল না। তারা সুরু করলে শেষ করতে দ্বিধা বোধ করত না। পোমারাঞ্চি, সেমিনো, কালভি প্রতিদিন চারবর্গ গজ করে আঁকতে সুরু করল। ষোল বছর বয়সে ক্যাম্বিসিও 'নাওবি'র ছবি আঁকল না জেনে, না চর্চা করে। এক ডজন শিল্পীর সমান যে-ছবি এঁকে ফেলল, তার স্ত্রী আগুন ধরাত পরিত্যক্ত ছবির বাণ্ডিল দিয়ে, যা প্রতিনিয়ত সে ছুঁড়ে ফেলত। তার সময়কার লোকেরা তাকে মিকেলআঞ্জেলোর সঙ্গে তুলনা করে মিকেলআঞ্জেলোর স্থান নীচে ঠিক করেছে।

সান্তি দি তিতোর প্রতিকৃতি আঁকতে সময় লাগত আধ ঘণ্টারও কম। বাড়িতে কারখানা খুলে সে রাশিরাশি প্রতিকৃতি তৈরি করতে লাগল। তার ছাত্র তেম্পেস্তির প্রতিভা রোমের বিরাট দেয়ালচিত্রণে খুশি হতে পারল না, অবসরবিনোদনে সে পনের শ' খোদাইয়ের কাজ করা ছবি তৈরি করল। এক মাসে ভাসারি, ত্রিবোলা আর আন্দ্রিয়া দেল কোসিমো একটা পুরো প্রাসাদ বানিয়ে অলংকৃত করে দিল। একদিনে পেরিনো দেল ভাগা 'রক্ত সাগরের পথ' এঁকে ফেলল।

ভিনিস বাঁচল অনেকদিন, রোম এবং ফ্লোরেন্স থেকে দূর বলেই। তারা প্রকৃতির সঙ্গে অন্তর মিলিয়ে রইল, তাকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করল যা দেখে ভাসারি আঁৎকে উঠত। কিন্তু শিল্পের এই শেষ আশ্রয়ও শেষ পর্যন্ত হার স্বীকার করল ফ্লোরেন্সের কাছে। ভিনিসের বাস্তববোধে তিন তোরেন্তো আমদানী করল মিকেলআঞ্জেলোর ধারণা।

বুদ্ধিতে জরাতুর হওয়ার আশঙ্কা ইতালির চিরকেলে সমস্যা। বুদ্ধিবাদে বিশুষ্ক, আমোদপ্রিয় তার হীনবল একটা যুগের মানসিক স্থৈর্য মিকেলআঞ্জেলো নষ্ট করে দিল। তার চোখ ধাঁধানো আলোয় দুর্বল চোখগুলো অন্ধ হয়ে গেল। তাদের কল্পনায় সুরু হল প্রলাপ, যাতে কাব্য নেই, চিন্তা নেই, প্রাণ নেই।

শতাব্দীর শেষে প্রয়োজন ছিল কারাচ্চীদের। ইতালিয় শিল্পকে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে না বাঁচালেও, অন্তত এর দুর্বুদ্ধি এবং দুঃস্বপ্ন থেকে উঠিয়ে একে একটা নিরুত্তাপ মর্যাদা দিল যাতে গা ঢাকা দিয়ে সে মরতে পারে।

মিকেলআঞ্জেলোর প্রবলতা এমনি করেই ইতালিয় শিল্পর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। এই হয়, নিজের কালের বহু উর্ধ্বে উঠলে এই পরিণতি। 'ডেকাডেন্স'কে বন্ধ করতে পারে বা অন্তত ঠেকিয়ে রাখে কারাচ্চিদের মতো শিল্পীরা, বুদ্ধি দিয়ে, সামান্য ক্ষমতা দিয়ে যা সে যুগের সাধারণ লোকের মতো, তাদের সহজবোধ্য। তারা সাধারণ বুদ্ধির প্রতিভা; তাই সাধারণ লোকের ভোগে লাগে। শিল্পের বীরেরা অত্যাচারী, তাদের মহিমা হত্যা করে। তারা যত বড়, তত ভয়াল; কারণ তারা সব মানুষের কাছে এমন ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা দেয় যা একবারই মাত্র সম্ভব। তারা ধ্বংসকারী, তারা আলো জ্বালায়, কিন্তু পুড়িয়েও দেয়। তাদের সত্তায় এবং কাজে তারা অদ্বিতীয় হবার দাবি রাখে। তারা যেন সমস্ত প্রকৃতির আবেদনকে নিজের মধ্যে সার্থক করে তোলে; তাদের পেছনে চলে যারা, তাদের নিঃশেষে আত্মবিলুপ্ত হতে হয়।

তরুণ শিল্পীদের কাছে মিকেলআঞ্জেলোকে আদর্শ করে দাঁড় করান অসম্ভব কথা। কখনও কোনো বড় শিল্পীকে শিল্পের আদল হিসেবে ব্যবহার করা চলে? এটাই কি 'সনাতনী' শিক্ষার সবচেয়ে বড় দোষ নয়? তারা শক্তির, ক্ষমতার, সৌন্দর্যের নিদর্শন। তাদের উজ্জ্বল আলোর দিকে একবার তাকিয়ে দেখা ভাল, তারপর নিজেকে সরিয়ে নিতে হবে, মন দিতে হবে নিজের কাজে।

অনুবাদঃ কৌস্তুভকান্তি মুখোপাধ্যায়

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

যদি-না

আমরা যে-যার নিজ বাসভূমে পরবাসী আমরা সকলে
স্মৃতিকুঠুরিতে কেউ স্বপ্ন-প্যাসিফিকদ্বীপে তৎক্ষণমণ্ডূক
কেউ, (স্বেচ্ছাবন্দী), মধ্যে দ্বিধাব্যবধান আবাদে দপ্তরে কলে
মানুষে মানুষে, মধ্যে নৈঃসঙ্গ নিরাশ ভয় লয় শূন্যভুক।
ইতস্তত ঘুরছি ফিরছি বহু বহুতর বহুরূপী। মনমুখ
চিন্তাচেষ্টা বিভিন্ন বিরুদ্ধ ক্রুদ্ধ, আত্মদ্বন্দ্বে ক্ষত ক্ষিপ্র খোলে
লালমেটেসবুজহলুদ রক্তরঙ্ ঢালে—তবুও চিবুক
সুমসৃণ, মুহূর্তও মন্ত্রমুগ্ধ রঙ্গনটী হাসিটির কোলে।
আর অতীত তামাদি উপদ্রুত রক্তস্বেদস্রাবী বর্তমান
ভবিষ্যতও হস্তচ্যুত, আজ শুধু বাদ-বিসংবাদ স্বত্ববান।
এ-আত্মখোলসে চিরনির্বাসন, সময়কে কড়ি গুণে দেয়া
উৎকেন্দ্র যোগেশ যেন আমরা শুকনো সাজানো বাগানে :
যদি-না আত্মায় জাগে বিস্ফোরণ, চূর্ণ পরিণাম মেনে-নেয়া
যদি আত্মা হোহো হেসে একদা-না বাঁধে সেতু ব্যবধানে গানে।

অরুণ ভট্টাচার্য

কোথায় পালাবো আমি

চারিদিকে শব্দ শুনছি : পালিয়ে যা বাঁচতে চাস্ যদি
দু কানে হাত রাখছি ত্রস্তে, ভাবছি বসে একলা অন্ধকারে,
কোথায় পালাবো আমি, ঘর জুড়ে বীভৎস প্রেতেরা
কাছে টানছে অগোচরে ; এরি মধ্যে উজ্জ্বল নিশীথে
একমাত্র সন্ধ্যাতারা দপ্‌দপ্‌ করে ডাকছে আমার ছায়াকে।

সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৬৫ ও শিক্ষাপরিচালনব্যবস্থা

(১)

'কেরল শিক্ষাবিল, ১৯৫৭' এবং 'কেরল বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট, ১৯৫৭' নিয়ে একদা খুব হৈ-চৈ হয়। কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা শিক্ষার পদ্মবনে মত্ত হস্তীর মতো প্রবেশ করছেন, সরকারী হস্তক্ষেপে শিক্ষার 'স্বাধীনতা' ও বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বাতন্ত্র্য' ক্ষুণ্ণ হবে, এ হেন আপাত-মনোরম শ্লোগান দিয়ে রক্ষণশীল শক্তিসমূহ কেরলরাজ্যে এক বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলে। ঐ আন্দোলনের ফলশ্রুতি হিসাবে শেষপর্যন্ত নাম্বুদ্রিপাদ মন্ত্রিসভাকে বিদায় নিতে হয় এবং তার ফলে ভারতবর্ষে গণতন্ত্রের পরীক্ষা অনেকখানি ব্যাহত হয়। সেই সময় ঐ অ্যাক্ট ও বিল-এর সমর্থনে এবং তথাকথিত 'অটোনমি'র নামে যাঁরা শিক্ষার রাজ্যে স্থিতাবস্থা ও অরাজকতা বহাল রাখতে চান তাঁদের মতামতের সমালোচনা করে 'পরিচয়'-এর পাতায় আমার একটি লেখা প্রকাশিত হয়।

অতি-বাম ও অতি-দক্ষিণ শক্তির ঐক্য

সম্প্রতি 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৬৫', নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ-রাজধানী কলকাতায় কিঞ্চিৎ উত্তাপ সঞ্চারিত হয় এবং ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটার চিহ্ন দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি 'বিশ্ববিদ্যালয় বিল'টি যে-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত সেই 'নীতি' মেনে নিয়ে কয়েকটি আপত্তিজনক ধারার সংশোধন দাবি করে। অন্যদিকে দেখা যায় যে অতি-বাম ও অতি-দক্ষিণ শক্তিসমূহ ঐকতান তুলেছে যে 'বিল'টি "বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, আভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র, অধ্যাপকমণ্ডলীর গণতান্ত্রিক অধিকার ও ভূমিকা প্রভৃতি সমস্ত কিছু সমূলে হরণ ও বিনাশ"

করবার জন্তই রচিত এবং এই বিল পাশ হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "সরকারী শিক্ষাদপ্তরের মারফৎ শাসকদলের সম্পূর্ণ আজ্ঞাবাহী যন্ত্রে" পরিণত হবে (২৬শে নভেম্বরের 'দেশহিতৈষী' দ্রষ্টব্য)। এ-বি-টি-এ সমর্থিত জনৈক এম্ এল্-সি'র মতে "The Bill completely hands over the Calcutta University to the Writers' Building and the autonomy of the University will be a myth hereafter"। বর্তমান 'বিল'-এর পূর্বসূরী শ্রীযুক্ত মালিকের 'খসড়া বিল'-এর আলোচনা (মুদ্রিত সংস্করণ) পাঠ করলেও দেখা যাবে যে তখনও কলেজের ম্যানেজার, অধিকাংশ প্রিন্সিপাল ও ভাইস-প্রিন্সিপাল, 'গভর্নিং বডি'র সদস্য, অর্থব্যয় করে (ঈশ্বর জানেন কেন) যাঁরা সেনেটে এবং সিণ্ডিকেটে প্রবেশ করেন—সবাই 'অটোনমি', 'বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য' নিয়ে নাটকীয়ভাবে অশ্রুপাত করছেন। জনৈক সেনেট-সদস্য তো রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, উপনিষদ্ প্রভৃতি থেকে আবৃত্তি করে বোঝালেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের কোনোও প্রয়োজন নেই, ১৯৫১-অ্যাক্ট পরিবর্তিত হয়েছে কি 'অটোনমি'র অমনি অপঘাত মৃত্যু। শেষের দিকে বক্তা আবেগকম্পিত কণ্ঠে বললেন : "Sir, I stood before this learned gathering today almost like the discredited Talleyrand making his last speech before the French Academy"। আরও উদ্ধৃতি দেওয়া যায় তবে তার প্রয়োজন নেই।

(২)

যুগ্ম-অংশীদারত্ব তত্ত্ব

মার্কসবাদী-লেনিনবাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 'রাষ্ট্রায়ত্ত' শিক্ষাব্যবস্থা এবং মার্কিন মুল্লুকের অনেকখানি 'লেসে-ফেয়ার' শিক্ষাব্যবস্থা এই দুই বিপরীত পথ পরিহার করে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রে এক মধ্যপন্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। সেই মধ্যপন্থা একদিকে 'রেজিমেণ্টেশন্' অন্যদিকে 'লেসে ফেয়ার'কে বর্জন করে "অংশীদারদের কর্তৃত্ব" (control by partnership), এই নীতিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে। বিভিন্ন দেশের শিক্ষাভাবুকেরা আজ স্বীকার করছেন যে, বর্তমান যুগে পরিকল্পনা চাই, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব চাই, সরকারের অংশীদারত্ব প্রয়োজন। আবার শিক্ষার 'স্বাধীনতা'ও কাম্য। পরিকল্পনা, সরকারী তদারকি ও অংশীদারত্বের সঙ্গে 'স্বাধীনতা'কে সমন্বিত করবার প্রশ্নটিই আজ

মৌলিক প্রশ্ন, কী রাজনীতির ক্ষেত্রে, কী শিক্ষাপরিচালনব্যবস্থার ক্ষেত্রে। রবিনস্-কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, যে-দেশ থেকে আমরা 'অটোনমি' প্রত্যয়টি নিয়েছি, সেই খোদ ইংলণ্ডেও আজ 'control by partnership'-তত্ত্বটি প্রায় সর্বজনস্বীকৃত [(ঐ রিপোর্ট: পৃ. ২২৫, ২২৮, ১ম খণ্ড) ও ('Education by W. O. Lester Smith p. 137)]।

(৩)

সমালোচনার ধারা

'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল, ১৯৬৫'র সমালোচনা যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরাই লক্ষ করেছেন যে অতি-দক্ষিণ ও অতি-বামের শিক্ষাগত বক্তব্য প্রায় অভিন্ন। এই দুই তরফের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এঁরা (ক) সেনেট-সভাকে সর্বোচ্চ পরিচালক সংস্থা (Supreme Governing Body) হিসাবে বহাল রাখতে চান, (খ) রাজ্যপালকে পদাধিকারবলে চ্যান্সেলার হিসাবে নিয়োগের যে-পদ্ধতি এখনও প্রচলিত এঁরা সেই নিয়মের বিরোধী, (গ) উপাচার্য, সহ-উপাচার্য (Pro-Vice Chancellor), রেজিস্ট্রার প্রভৃতির নিয়োগের ব্যাপারে সরকারের অংশীদারত্বের এঁরা সম্পূর্ণ বিরোধী। এঁদের মতে এই সব নিয়োগের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমি' ও 'স্বাতন্ত্র্য' ক্ষুণ্ণ হয়, (ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের Statute, Ordinance প্রভৃতিকে এঁরা চ্যান্সেলারের অনুমোদন-নিরপেক্ষ করবার পক্ষপাতী। এঁরা বলেন যে এই সব নিয়মাবলী চ্যান্সেলারের অনুমোদন-সাপেক্ষ হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমি' ক্ষুণ্ণ হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। আশুতোষীয় যুগের এঁরা ভক্ত এবং বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালনব্যবস্থায় সে-যুগের এক কল্পিত 'অটোনমি'র এঁরা গুণগ্রাহী। বামপন্থী কমিউনিস্টরা আরও অগ্রসর হয়ে বলেন যে চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলার প্রভৃতির ক্ষেত্রে সরাসরি 'নির্বাচনপ্রথা' চালু হওয়া প্রয়োজন। সেটাই হল শিক্ষাগত গণতন্ত্র। বর্তমান আলোচনার প্রথমাংশে বামপন্থী কমিউনিস্টদের শিক্ষাতত্ত্ব ও প্রয়োগের অন্তঃসারশূন্যতার কথা আলোচনা করে দ্বিতীয়াংশে সাধারণ আলোচনায় আধুনিক শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে বক্তব্য উপস্থাপিত করব।

আগেই বলেছি যে আমি 'কেরল অ্যাক্ট'কে সাধারণভাবে সমর্থন করে তৎকালে লিখেছিলাম: যুগধর্ম অনুযায়ী এদেশের শিক্ষাব্যবস্থায় সরকার

অংশীদার হিসাবে আবির্ভূত হবেন, সাধারণভাবে শিক্ষার তদারকি করবেন, পরিকল্পনার দায়-দায়িত্ব নেবেন এ সবই আধুনিক শিক্ষানীতিসম্মত। ঐ লেখায় আরও বলেছিলাম যে বৃটিশ আমলে বিদেশী সরকার সম্পর্কে আমরা যে নেতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গির চর্চা করেছি, বর্তমান যুগে নির্বাচিত, জনসমর্থনপুষ্ট স্বদেশী সরকার সম্পর্কে সেই একই দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষতিকর ও অচল। সরকারকে শিক্ষার রাজ্যে বড় হিস্যাদার হিসাবে স্বীকার না করে আজ আর উপায় নেই। বিভিন্ন হিস্যাদারদের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের নীতি নিয়ে অবশ্যই প্রশ্ন উঠবে। সেই প্রশ্ন অতি-সরল নয় এবং 'cliche'-এর সাহায্যে সে প্রশ্নের সমাধানও হবে না। দেশ-বিদেশের আধুনিক অভিজ্ঞতা এবং স্বদেশের বাস্তব অবস্থার কথা মনে রেখেই ঐ প্রশ্নের সমাধান করতে হবে। কিন্তু নীতি হিসাবে যে-কথাটি প্রকৃত শিক্ষানুরাগীদের মেনে নিতে হবে সেটি হল এই: দেশে যদি বয়স্কভোটে নির্বাচিত সরকার শাসন-পরিচালনার দায়িত্ব পায়, দেশে যদি আইনসিদ্ধ বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব থাকে, সর্বগ্রাসী রাষ্ট্রের মনোলিথিক ঐক্যের বন্ধনে সমাজজীবন যদি শৃঙ্খলিত না হয়, তবে সেই নির্বাচিত সরকারকে (সে সরকার কংগ্রেসীই হউক, কিম্বা কমিউনিস্টই হউক, কিম্বা সোশিয়ালিস্টদেরই হউক) শিক্ষার রাজ্যে অংশীদারত্ব দিতে হবে। শুধু দেখতে হবে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাগত 'অটোনমি'র ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ না করে এবং শিক্ষকের 'অ্যাকাডেমিক স্বাধীনতা' বিঘ্নিত না হয়। যদি সে-রকম হস্তক্ষেপ হয় তবে তার বিরুদ্ধে সব শক্তি নিয়ে দাঁড়াতে হবে।

(৪)

ক্রমবর্ধমান সরকারী দায়িত্ব

আশুতোষীয় যুগে, এমনকি স্বাধীনতা-উত্তর যুগেও এদেশে সরকারী কর্তব্যাকর্তব্যের ধারণা ছিল অস্পষ্ট। বিদেশী সরকার তো ইংলণ্ডের উনিশশতকী দর্শনের প্রভাবেও বটে আবার কলোনির শিক্ষাব্যবস্থার দায়দায়িত্ব পরিহার করবার তাগিদেও বটে, ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতীয় মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিল। বিদেশী সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের প্রতিবাদে স্বদেশী প্রচেষ্টায় একদা স্কুল এবং কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। সংগতভাবেই তৎকালে জনসাধারণের দাবি ছিল: বিদেশী সরকার তুমি শিক্ষার রাজ্যে হস্তক্ষেপ করো না। স্বয়ং স্যার আশুতোষ ঘোষণা করেছিলেন ১৯১৭ সনে,

"freedom first, freedom second, freedom always". । কার স্বাধীনতা ? না, জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার। কার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এই স্বাধীনতা সংরক্ষণের উদাত্ত আহ্বান ? না, পরদেশী ঔপনিবেশিক শাসকদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। বলা বাহুল্য এ আহ্বান যুগোপযোগী এবং দেশপ্রেমপ্রসূত ছিল। তারপর যুগের পরিবর্তন হল। স্বদেশী সরকার শিক্ষার ক্ষেত্রে, জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে পরিকল্পনার সাহায্যে স্বতন্ত্র বিকাশের পথ নিলেন। সেই পথচলায় ভ্রান্তি আছে, আছে পিছু-টান। সেই পথচলায় প্রতিক্রিয়ার দুস্তর বাধা আছে। তবুও স্বদেশী সরকার, দ্বিধাগ্রস্তভাবে হলেও, জনকল্যাণমূলক কাজে হাত দিচ্ছেন, শিক্ষার রাজ্যে মনোযোগ দিচ্ছেন। এ যুগের দাবি স্বতন্ত্র, চাহিদা একেবারেই আলাদা। এ যুগের দাবি এই নয় যে—সরকার তুমি শিক্ষার রাজ্যে হস্তক্ষেপ করো না। এ যুগের দাবি এই যে—সরকার তুমি শিক্ষার ক্রমবর্ধমান দায়িত্ব নেও, অন্যান্য স্বয়ং-শাসিত সংস্থার সঙ্গে যুক্তভাবে শিক্ষার প্রসারে ও উৎকর্ষবৃদ্ধিতে বড় অংশীদার হিসাবে সহযোগিতা কর। পেছিয়ে-পড়া দেশে তো এ দাবি আরও অমোঘ।

শুধু যে ভারতবর্ষেই এ দাবি আজ ইতিহাসসম্মত তাই নয়। 'লেসে-ফেয়ার'-এর দেশ ইংলণ্ডেও আজ শিক্ষায় সরকারী কর্তৃত্ব প্রায় সর্বজনস্বীকৃত। শিক্ষার ঐতিহাসিক পট-পরিবর্তন প্রসঙ্গে W. O. Lester Smith লিখছেন : "In 1870 the laissez-faire philosophy was dominant ; in 1902 it still prevailed, though with a question mark ; but by 1944 we had abandoned it for a belief in more positive government and Welfare State."

অধ্যাপক স্মিথ অন্যত্র বলছেন : "Emphasis on public control is an outstanding feature of the 1944 Act in marked contrast to the attitude that prevailed in 1902. It was indeed the first of our Statutes to deal with a great social service with a Welfare State outlook." অধ্যাপক স্মিথ দেখাচ্ছেন যে ১৯৪৪ অ্যাক্টে ন্যস্ত ক্ষমতাবলে এখনকার কোনোও শিক্ষামন্ত্রী দোর্দণ্ডপ্রতাপ হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু সে-পথে বাধা আছে। "The Minister is accountable to Parliament and has to justify his decisions, great and small, at question time or in debate. His actions are

circumscribed by the system of government outlined in the Act and by the whole law of education. Decisions of major policy are not only subject to Parliament but also to close scrutiny by the Cabinet and they can have their repercussions in the electorate."

['Education' by W. O. Lester Smith p. 136]

সত্যকথা ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টারি-ঐতিহ্য আমাদের নেই। সেই ঐতিহ্য-সৃষ্টি সময়সাপেক্ষ। তবু কম-বেশি উপরোক্ত বক্তব্য আমাদের দেশের বেলাতেও প্রযোজ্য। শিক্ষামন্ত্রীর উপর পরিকল্পনার যুগে নিত্যনতুন দায়িত্ব অর্পিত হবে, ফলে সরকারী ক্ষমতাবৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যাবে এ নিয়ে মাথা কুটে লাভ নেই। ক্ষমতার অপব্যবহার হবে না, ভুলভ্রান্তি হবে না, বুরোক্রেসির ক্ষমতালিপ্সা সহজেই অন্তর্হিত হবে, এ কথাও বলা যাবে না। তবে 'স্বাধীনতা'র রক্ষাকবচ একটিই—eternal vigilance, কী রাজনীতির ক্ষেত্রে, কী শিক্ষার ক্ষেত্রে।

(৫)

কেরল বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট, ১৯৫৭

নাম্বুদ্রিপাদ-মন্ত্রিসভা বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামোর যে-সংস্কার (structural reforms) করতে চেয়েছিলেন কেরল-রাজ্যে, সে-প্রচেষ্টা সফল হয় নি। তবুও কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্কারের ক্ষেত্রে কি করতে চান বা করবেন তার বড় প্রমাণ কেরল বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টে লিপিবদ্ধ আছে। আমার সমালোচনা এই যে, কেরল 'অ্যাক্ট'-এর যেসব বৈশিষ্ট্য কমিউনিস্ট মহলে উৎকর্ষের পরিচায়ক বলে বিবেচিত হয়েছিল, 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল'-এ সেগুলিকে অপকর্ষের অপবাদ দেওয়া হচ্ছে।

'দেশহিতৈষী'র অধ্যাপক মহাশয়ের নিজের ভাষায় তাই প্রশ্ন করি: মহাশয়, আপনাদের বৈপ্লবিক নীতি গ্রহণ করে 'কেরল বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট'-এ সেনেটকে 'Supreme Governing Body' করা হয় নি কেন [১৫ (১)]? কমিউনিস্ট-মন্ত্রিসভা চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলার প্রভৃতি নিয়োগের বেলায় 'গতানুগতিক পন্থা' অনুসরণ করেছিলেন কেন? [৮ (১) ও ১০ (১)] তাছাড়া, Statute, Ordinance প্রভৃতিকে চ্যান্সেলারের অনুমোদন-সাপেক্ষ

করে রেখে আপনাদের সরকার কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমি' ক্ষুণ্ণ করবার পথ নিয়েছিলেন কেন? 'অটোনমি'-প্রেমিক অধ্যাপক মহাশয়, আপনারা কি ভুলে গেছেন যে "কেরল বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট"-এ চ্যান্সেলারের উপর যে-ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল, সে ক্ষমতার পরিমাণ "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট"-এ চ্যান্সেলারের উপর অর্পিত ক্ষমতার অপেক্ষা বেশি। শুধু তাই বা কেন? কেরল রাজ্য-সরকার "কেরল অ্যাক্ট"-এর বিভিন্ন ধারায় যে-ক্ষমতা দাবি করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দাবি সে তুলনায় সামান্য। ধরুন, কেরল সরকার দাবি করেছিলেন যে প্রয়োজন হলে অ্যাকাডেমিক কাজসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কাজের তদারকি ও অনুসন্ধান করবেন কেরল রাজ্যসরকার [৩৩ (৪)]। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ ধরনের ক্ষমতা নিজের হাতে রেখেছেন, (১৯৫১-অ্যাক্টেও ছিল) কিন্তু একটি মূল্যবান ব্যতিক্রম করেছেন—"সম্পূর্ণ শিক্ষাগত বিষয় ছাড়া আর সব কাজের।" [৪৮ (১)]

অধ্যাপক মহাশয়, আপনি হয়তো জানেন যে 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল'-এ এবার 'অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল' ও অন্যান্য নিম্নতর অ্যাকাডেমিক সংস্থাকে শিক্ষাগত বিষয়ে **অন্য-নিরপেক্ষ, প্রায়-নিরংকুশ ক্ষমতা** দেওয়া হয়েছে, কিন্তু 'কেরল অ্যাক্ট'-এ 'অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল' নামে কোনোও সংস্থার অস্তিত্ব নেই। 'ফ্যাকাল্টি' ও 'বোর্ড অব স্টাডিজ' নামে যে দুটি গৌণ সংস্থার স্থান ঐ 'অ্যাক্ট'-এ আছে তাদের শুধুই উপদেষ্টার ভূমিকা [advisory capacity : ২১ (২)]। কেরল অ্যাক্ট-এ প্রকৃত ক্ষমতা সিণ্ডিকেটের উপর ন্যস্ত—কি পরিচালনার ক্ষমতা, কি অ্যাকাডেমিক সংস্থা গঠনের ক্ষমতা। অর্থাৎ সিণ্ডিকেটই সংস্থা-শিরোমণি, আর সব সংস্থাই গৌণ। এবং এও আপনার জানা যে, চৌদ্দজন সদস্যবিশিষ্ট কেরল বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে ১। চ্যান্সেলার-মনোনীত উপাচার্য ২। রাজ্যের শিক্ষা-অধিকর্তা ৩। শিক্ষা-দপ্তরের সেক্রেটারি সবাই উপস্থিত। এ অবস্থায় আপনি অধুনা যে 'অটোনমি'-র ভক্ত হয়েছেন, সে 'অটোনমি' বাঁচে কি করে? আর এ কথাই বা আপনারা কেমন করে গোপন করবেন যে 'কেরল অ্যাক্ট'-এ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী পদাধিকারবলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-চ্যান্সেলার [৯ (১) ও (২)] ও পদটি শুধুই শোভাবর্ধক নয়। কেননা অ্যাক্ট-এ লিপিবদ্ধ আছে যে চ্যান্সেলারের অনুপস্থিতিতে কিম্বা চ্যান্সেলার কাজ করতে অপারগ হলে

শিক্ষামন্ত্রী প্রো-চ্যান্সেলারই চ্যান্সেলারের সব ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন। অধ্যাপক মহাশয়, তথাপি আপনারা বলেছেন, কেরল বিশ্ববিদ্যালয় অপাপবিদ্ধ 'অটোনমি' ভোগ করেছে এবং পদ্মনাভনদের দল প্রতিক্রিয়াশীল। কিন্তু কেন? আপনারা double-think-এর আশ্রয় নিয়ে অবশ্যই বলতে পারেন, "কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা 'অটোনমি' হনন করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বাধীনতা' ও স্বাতন্ত্র্য বিকশিত হয়ে ওঠে, আর অ-কমিউনিস্ট মন্ত্রিসভা শিক্ষার রাজ্যে অংশীদারত্ব দাবি করলে 'অটোনমি' বিপন্ন হয়ে ওঠে।" এ বক্তব্য আমাদের মতো অ-কমিউনিস্টদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে উৎস-নিরপেক্ষভাবে 'অটোনমি'-হননের আমি বিপক্ষে। তবে আমি মনে করি কী কেরল বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট, কী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল—কোনোটিই প্রকৃত অটোনমি-হননপ্রয়াসী নয়। দুটি 'অ্যাক্ট'-ই 'লেসে-ফেয়ার' বর্জন করে শিক্ষার রাজ্যে অংশীদারদের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চেয়েছে।

(৬)

'অটোনমি'র তাৎপর্য বিচার

প্রকৃতপক্ষে 'অটোনমি' কি তাই নিয়ে রাজনীতি-ব্যবসায়ী ও শিক্ষাশাস্ত্রীদের মধ্যে মতভেদ। অথচ 'অটোনমি'-র প্রসঙ্গে শিক্ষাশাস্ত্রীদের ঐকমত্য আছে। 'সোশ্যালিজম্' কি আলোচনাপ্রসঙ্গে একদা এক ইংরেজ দার্শনিক বলেছিলেন: 'Socialism is like a hat that has lost its shape because everybody wears it'.। কথাটিকে 'অটোনমি' প্রসঙ্গেও ব্যবহার করা চলে। বলতে ইচ্ছে হয়, autonomy is like a hat that has lost its shape because everybody wears it.। কলেজম্যানেজার, কলেজমালিক, কলেজের প্রিন্সিপাল মায় পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্রের নিন্দুক 'বাম কমিউনিস্ট'—সবাই সুবিধামত 'অটোনমি'র পূজারী। এ থেকেই বোঝা যায় যে 'অটোনমি' পদটি নানা অর্থে এবং অনেক সময়ে সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত। ফলে 'অটোনমি'র অর্থবিকৃতি ঘটেছে এবং শিক্ষানীতির সার্থক আলোচনা ক্রমশই দুর্লভ হচ্ছে।

'অটোনমি'-প্রত্যয়ের বিচার

'অটোনমি' প্রত্যয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষাসম্মেলনে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে। এদেশে রাধাকৃষ্ণণ কমিশন (১৯৪৯), ভাইস-চ্যান্সেলার

সম্মেলন (১৯৬০) প্রভৃতি থেকেও 'অটোনমি'র প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে ভারতীয় শিক্ষাশাস্ত্রীদের অভিমতের পরিচয় মেলে। ডাঃ কোঠারির নেতৃত্বে গঠিত 'মডেল অ্যাক্ট কমিটি'-ও 'অটোনমি'র সারবস্তু নিয়ে আলোচনা করেছেন। সেই সব আলোচনা সংক্ষেপিত আকারে এইরূপ (মডেল অ্যাক্ট কমিটির রিপোর্ট দ্রষ্টব্য):

প্রথমতঃ, মনে রাখা প্রয়োজন যে 'অটোনমি' সার্বভৌমত্ব নয় এবং "Universities which are established by law can have the rights given to them by law" (মডেল অ্যাক্ট কমিটির রিপোর্ট পৃ. ৮)। **দ্বিতীয়তঃ,** অটোনমির চরমমূল্য নেই, আছে শুধু উপকরণমূল্য। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ রূপায়ণে 'অটোনমি' কতখানি সহায়তা করেছে, 'অটোনমি'র কার্যকারিতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মতৎপরতা কতটা বর্ধিত করেছে, 'অটোনমি'র পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্তিত্বের কতখানি সার্থকতা প্রতিপন্ন হয়েছে, এ সব কথা মনে রেখেই 'অটোনমি'র বিচার। হোয়াইট্‌হেড্ (The Aims of Education, পৃ. ১৩৯) বলেছেন: "The justification for a University is that it preserves the connection between knowledge and the zest of life, by uniting the young and the old in the imaginative consideration of learning. At least, this is the function which it should perform to society. A University which fails in this respect has no reason for existence."। তথাকথিত 'অটোনমি' যদি জ্ঞানানুশীলনের ব্যাঘাত ঘটায়, হোয়াইট্‌হেড্ কথিত ভূমিকা পালনে বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য না করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে উপদল গঠনে সাহায্য করে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মধারায় অচলাবস্থার সৃষ্টি করে, তবে সেই 'অটোনমি'র মূল্য খুব বেশি নয় (ভাইস-চ্যান্সেলার সম্মেলনের রিপোর্ট, ১৯৬০ দ্রষ্টব্য)। **তৃতীয়তঃ,** বর্তমান যুগে 'অটোনমি'র অর্থ জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সাজুয্য স্থাপন। অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোও স্বকীয়, নিরালম্ব উত্তুঙ্গ সত্তা আছে, জাতীয়জীবনের কর্মধারার সঙ্গে বিচ্ছেদেই সেই সত্তার পূর্ণতা, 'অটোনমি'র এই অর্থ কদর্থের নামান্তরই হবে। "Autonomy does not mean isolation or aloofness from national purposes or a claim for some superior status or position." (মডেল অ্যাক্ট কমিটির রিপোর্ট, পৃ. ৮)। **চতুর্থতঃ,** 'অটোনমি'র সঙ্গে

ভাবরাজ্যে ও জ্ঞানচর্চায় সামরিকীকরণ (regimentation)-এর বৈপরীত্য-সম্বন্ধ। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞানানুশীলনে যদি বহিরঙ্গ শক্তি, বিশেষত রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করে, পুস্তকনির্বাচনে, পাঠ্যসূচীপ্রণয়নে, পরীক্ষার পদ্ধতি ও মান নির্ণয়ে ঐ শক্তি যদি ফতোয়া দেয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি ঐ শক্তির কাছে মাথা নোয়ায় তবে বুঝতে হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমি' নেই। "It does imply that the University ought not to be harnessed for securing regimentation of ideas or drawn into the ambit of party or power politics." (ঐ রিপোর্ট, পৃ. ৮)

'অটোনমি'র অধিষ্ঠান

'অটোনমি'র অধিষ্ঠান (locus) কোথায়? কোন্ সংস্থার 'অটোনমি'র উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমি' প্রধানত নির্ভরশীল? 'অটোনমি'র অস্তিত্ব বিচারের মাপকাঠি কি? সেই মাপকাঠি হল এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসন আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান ও গবেষণাকার্য সংগঠনে এবং সাধারণভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অ্যাকাডেমিক ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব আছে। 'মডেল অ্যাক্ট কমিটি' বলছেন, শিক্ষাব্রতীদের সংস্থা 'অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল'-এর অন্য-নিরপেক্ষ ক্ষমতাই 'অটোনমি' বিচারের সুনির্দিষ্ট লক্ষণ। "It is the powers of Academic Council that requires to be carefully safeguarded. It is this freedom that indicates the measure of autonomy of the University. No one from outside should be in a position to indicate to a University what its standards should be or what the contents of its courses should be, apart from the University Grants Commission acting within its statutory powers" (পৃ. ২০)। ফরাসীদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমি'র সমস্যা আলোচনা-প্রসঙ্গে Prof. Bouchardও প্রায় একই কথা বলেছেন: "If the time should ever arrive when the Universities were tightly controlled from above, and occupied in work assigned and organised by some outside agency which would determine the direction and content of research and teaching, then

at that moment the Universities would forfeit at the same time the last vestiges of their autonomy." [The Universities in France : Freedom and Autonomy : Bulletin of the Committee of Science & Freedom No. 19].

রবিনস্ কমিটি ও 'অটোনমি'

বৃটেনের শিক্ষাব্যবস্থার পর্যালোচনা করে সম্প্রতি রবিনস্ কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়-'অটোনমি'র আরও কয়েকটি লক্ষণ বর্ণনা করেছেন। (ক) শিক্ষার বিষয়বস্তু স্থির করবার ব্যাপারে এবং ডিগ্রিপ্রদানের মাননির্ণয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য আছে কি না দেখা (complete autonomy in the determination of the content of education and in the control of degree standards), (খ) শিক্ষা এবং গবেষণার মধ্যে সমতা নির্ধারণের ক্ষমতা, কোন্ দিকে গবেষণাকর্ম অগ্রসর হবে সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত কিনা বিচার করা (the selection of growing points or lines of research is also a matter for Universities themselves), (গ) ছাত্র নির্বাচনের ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব নির্বাধ কি না দেখা (A further important feature of the University's autonomy is their responsibility for the selection of students), (ঘ) তাছাড়া, শিক্ষকপদে নিয়োগের ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত কি না লক্ষ্য করা (the Universities are free to appoint whom they judge suitable to a particular academic post) (ঙ) বেতনহারের কোন্ স্তরে প্রার্থী নিযুক্ত হবে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতাও অটোনমির অন্যতম লক্ষণ (They can determine into which grade or at which point in the scale within the grade they make an appointment), (চ) 'অটোনমি'র অন্য একটি পরিচয় হল এই যে, নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর চাকুরির সর্তাদি নির্ধারণ করবার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপরই ন্যস্ত (finally, Universities determine the conditions and terms of tenure attached to their appointments) [Report on Higher Education, Appendix four, by Lord Robbins pp 12]। আমার মনে হয় যে দেশী-বিদেশী শিক্ষাভাবুকদের

'অটোনমি'-তত্ত্ব আলোচনা থেকে এ কথা বলা চলে যে, "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল" এ 'অটোনমি'-নাশের প্রচেষ্টা নেই। রাজনীতির চশমা পরে 'বিল' এর আলোচনায় না নামলে "autonomy will be a myth" এই সিদ্ধান্ত করা চলে না।

অ্যাকাডেমিক 'অটোনমি'-ই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমির' সারবস্তু :

'অটোনমি'র স্বরূপলক্ষণ যেহেতু 'অ্যাকাডেমিক অটোনমি' সেইহেতু সরকারী অংশীদারত্ব মাত্রেই 'অটোনমি' হানি ঘটাল এমন কথা বলা চলে না। সরকারী অংশীদারত্ব 'অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল' ও অন্যান্য অ্যাকাডেমিক সংস্থার ক্ষমতাকে যদি সংকুচিত না করে, এবং বিশ্ববিদ্যালয় যদি বিধিবদ্ধ ক্ষমতার অধিকারী হয়, তবে বিশ্ববিদ্যালয়-পরিচালন ব্যবস্থায় সরকারী অংশীদারত্ব বৃদ্ধি পেলেই 'অটোনমি-হ্রাস' তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। অটোনমি-হ্রাস-ভীরু বহুমানভাজন ব্যক্তিরা 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট' আলোচনায় 'অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল', 'ফ্যাক্যাল্টি', পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েট কাউন্সিল এবং 'পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েট বোর্ড অব স্টাডিস'-এর গঠনপ্রণালী ও ক্ষমতা বিশ্লেষণ করে 'অটোনমি-নাশ' তত্ত্বে উপনীত হন নি। তাঁরা অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলে বিভ্রম সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা বলছেন, দেখ, চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলার, দু'জন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার, রেজিস্ট্রার —সবাই কোনো-না-কোনো ভাবে সরকার নিযুক্ত। কাজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমি' ক্ষুণ্ন হল। সিণ্ডিকেটে সরকারী পক্ষ ছয় (ছাব্বিশজনের মধ্যে), সেনেটে সর্বসাকুল্যে ছাব্বিশ (২০০ জনের মধ্যে)। অতএব, 'অটোনমি' নষ্ট হল। এইসব বহুমানভাজন ব্যক্তিরা অবশ্যই অন্যান্য 'অটোনমাস্' সংগঠনের কথা জানেন। যথা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রাণ্টস কমিশনের প্রতি এদের আপাত-আনুগত্যও সোচ্চার। কিন্তু সেই কমিশনের গঠনপ্রণালী কি রকম ? কমিশন নয় জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এই নয় জন সদস্যই কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। কমিশনের নয় জন সদস্যের মধ্যে ভাইস-চ্যান্সেলার হবেন তিনজন, কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী দু'জন এবং বাকি চারজন কেন্দ্রীয়-সরকার-নির্বাচিত খ্যাতিমান শিক্ষাব্রতী। সভাপতি হবেন বেসরকারী ব্যক্তি তবে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে নিযুক্ত করবেন। এবংবিধ গঠনপ্রণালী হওয়া সত্ত্বেও মঞ্জুরী কমিশন যে সরকারী কুক্ষিগত সংস্থা নয়, পার্লামেণ্ট

কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যে কমিশন স্বয়ং-শাসিত সংস্থা এ কথা সকলেই স্বীকার করেন। করেন এই কারণে যে, পার্লামেণ্ট-অ্যাক্টে কমিশনকে বিধিবদ্ধ, প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং সেই ক্ষমতার ব্যবহার কেন্দ্রীয় সরকারের মনোরঞ্জনসাপেক্ষ নয়। 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট'-এর আলোচনায় কিন্তু সমালোচকদের অন্য নীতি। বিশ্ববিদ্যালয়কে যে আইনসভা পূর্বেকার তুলনায় অনেক বেশি ক্ষমতা অর্পণ করল, অ্যাকাডেমিক বিষয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতা প্রায় নিরঙ্কুশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষমতাও যে সরকারী-মনোরঞ্জনসাপেক্ষ নয়, এ সব কথা প্রচ্ছন্ন রেখে অফিসার-নিয়োগের পদ্ধতি থেকেই সমালোচকেরা 'অটোনমি'-হানি-তত্ত্বে পৌঁছেছেন। সমালোচকেরা বলুন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন 'অটোনমাস্' সংস্থা কিনা। মঞ্জুরি কমিশনের সব সদস্যই যখন সরকার মনোনীত তখন মঞ্জুরি কমিশনের অটোনমি-নাশ তত্ত্ব তাঁরা স্বীকার করেন কি না। জানি তাঁদের চেতনায় 'অটোনমি'র তাৎপর্য ভিন্ন এবং শিক্ষাশাস্ত্রীদের বক্তব্যের উপর সে তাৎপর্য প্রতিষ্ঠিত নয়।

(৭)

অ্যাকাডেমিক **স্বাধীনতার তাৎপর্য :**

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমি'র সমস্যার সঙ্গে অন্য যে-সমস্যাটি সব দেশের শিক্ষাশাস্ত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে সেটি হল শিক্ষকদের 'অ্যাকাডেমিক ফ্রীডম্' সংরক্ষণের সমস্যা। 'অ্যাকাডেমিক ফ্রীডম্'-এর পরিসরে যে বাস্তব ফ্রীডম্গুলি অন্তর্ভুক্ত সেগুলি হল: (ক) পাঠ্যসূচী নির্বাচনে শিক্ষকদের ভূমিকা (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি নিরূপণে শিক্ষকদের অংশীদারত্ব (গ) পঠনপাঠন-পদ্ধতি নির্বাচনে, পাঠ্যপুস্তক অনুমোদন ব্যাপারে, ব্যক্তিগত যোগ্যতা বৃদ্ধিতে, জ্ঞানানুশীলনে ও গবেষণাকর্মে শিক্ষকদের উদ্যোগ ও অংশীদারত্বের সুযোগ। W. F. T. U-র আন্তর্জাতিক শিক্ষকসংস্থা আন্তর্জাতিক শিক্ষকসনদে (Teachers' Charter) শিক্ষকের অ্যাকাডেমিক ফ্রীডমের পরিসর বর্ণনা করেছেন (৪ নং ধারা) "In matters which concern the curriculum and educational practice, the pedagogical and professional liberty of teachers must be respected and their initiative encouraged."। শিক্ষকের কি কি ফ্রীডম্? "Particularly in the choice of teaching methods and text books and

through the participation of their representatives in the study of pedagogical and professional problems" ['Teachers and the International working class movement' by Paul Delanoue —pp 38].

ইংলণ্ডের রবিনস্ কমিটিও 'অ্যাকাডেমিক ফ্রীডম্' প্রসঙ্গে বলেছেন: "Academic freedom means the absence of discriminatory treatment on the grounds of race, sex, religion and politics; and the right to teach according to his conception of fact and truth" (Robbins committee Report, Vol I, pp. 229). অর্থাৎ 'অ্যাকাডেমিক ফ্রীডম'-এর বাস্তব মূর্ত রূপ আছে এবং অ্যাকাডেমিক ফ্রীডমের আলোচনায় গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন বিভ্রান্তিরই সৃষ্টি করে। সমালোচকদের সুবিধা এই যে তাঁরা বিমূর্ত অনির্ণীত-লক্ষণ 'অটোনমি'র আওয়াজ তুলে মূর্ত 'অটোনমি'র প্রশ্নটিকে এড়িয়ে যান। আবার অ্যাকাডেমিক ফ্রীডমের সঙ্গে গণতান্ত্রিক অধিকারের রাজনৈতিক প্রশ্নকে একাকার করে ফেলে কোনোও প্রশ্নেরই সদুত্তর দিতে ব্যর্থ হন।

(৮)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিলের বিশ্লেষণ:

'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল (১৯৬৪) ১৯৬৫' সাতটি অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে সূচনা ও নামকরণ, সঙ্গে পরবর্তী অধ্যায়ে ব্যবহৃত পদসমূহের সংজ্ঞা প্রদত্ত হয়েছে (short title and commencement : Definitions)। দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবিধ বিধিবদ্ধ ক্ষমতার বিবরণ (৩-৫ ধারা); তৃতীয় অধ্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ-পদ্ধতি, ক্ষমতা প্রভৃতির বর্ণনা (৬-১৭ ধারা), চতুর্থ অধ্যায়ে সেনেট, সিণ্ডিকেট, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল, ফ্যাকাল্টি, পোষ্ট গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েট কাউন্সিল অব স্টাডিজ, পোষ্ট-গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েট বোর্ড অব স্টাডিজ প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্থার গঠনপ্রণালী, ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রভৃতির বিবরণী (১৮-৩৫ ধারা), পঞ্চম অধ্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়-সংস্থা সম্পর্কিত বিবিধ বিধানের বর্ণনা (৩৬-৪২ ধারা) (general provisions governing all authorities or other bodies of the University), ষষ্ঠ অধ্যায়ে

বিশ্ববিদ্যালয় তহবিল, রাজ্যসরকারের দেয় অর্থ, হিসাব, অডিট প্রভৃতি বিষয়ের বর্ণনা (৪৩-৪৮ ধারা), সপ্তম অধ্যায়ে Statute, Ordinance ও Regulation প্রভৃতি প্রণয়নের পদ্ধতির বর্ণনা (৪৯-৫৪ ধারা) এবং শেষ অধ্যায়ে বিবিধ ও স্বল্পকালীন নিয়মাবলীর বর্ণনা (transitory provisions) [৫৫-৫৯ ধারা] প্রথম অধ্যায় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে ১৯৫১ অ্যাক্টের সংজ্ঞা-প্রকরণের সঙ্গে এই বিলের কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। 'স্পনসরড্ কলেজ' কিম্বা 'গভর্নমেণ্ট কলেজ' কাকে বলে, 'শিক্ষক' বলতে কাদের ধরা হবে ১-২৪ ধারায় এমনি বিভিন্ন পদের ব্যাখ্যা দেওয়া আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৪ (১) থেকে ৪ (৩১) ধারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর ন্যস্ত ক্ষমতার বর্ণনা আছে। ১৯৫১-অ্যাক্টে মাত্র আঠারটি ধারায় যে যে ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর অর্পিত হয়েছিল্ বর্তমান বিলে কলেজ কোড কমিশন-অনুমোদিত অন্যান্য ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্পণ করায় সেই ক্ষমতার অনেকখানি বিস্তার ঘটেছে। এই ক্ষমতার বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বিশ্ববিদ্যালয় আজ আণ্ডার-গ্রাজুয়েট স্তর সম্পর্কে বিধিবদ্ধ ক্ষমতায় বলীয়ান হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলার, দুইজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার, রেজিস্ট্রার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ কর্মচারীর নিয়োগ-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং এঁদের ক্ষমতার পরিসর আলোচিত হয়েছে। চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলার ও রেজিস্ট্রারের নিয়োগপদ্ধতি ১৯৫১-অ্যাক্টে যে ভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছিল বর্তমান বিলে হুবহু সেভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে। বর্তমান বিলে যে নতুন পদটি সৃষ্টি হয়েছে সেটি হল "Pro-Vice-Chancellor for Academic Affairs." এই প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলারকে চ্যান্সেলার শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিযুক্ত করবেন। অপর প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার ১৯৫১-অ্যাক্টের ট্রেজারারের নবীকৃত সংস্করণ। অবশ্য ১৯৫১-অ্যাক্টে ট্রেজারার নিয়োগে সিণ্ডিকেটের সামান্য হাত ছিল কিন্তু প্রস্তাবিত 'Pro-Vice-Chancellor for Business Affairs and Finance'কে চ্যান্সেলার শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে নিযুক্ত করবেন। ১৯৫১-অ্যাক্টে ট্রেজারার প্রায় নিরংকুশ ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু বর্তমান বিলে 'প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার অব বিজনেস অ্যাফেয়ার্স' উপাচার্যের নির্দেশ ও কর্তৃত্ব মেনে চলবেন [১১ (১)]। অন্যান্য পদ (post) সৃষ্টির ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর একান্তভাবে ন্যস্ত। বিলের চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অথরিটি' হবে কোন্ কোন্ সংস্থা। ১৯৫১-অ্যাক্টের সঙ্গে বর্তমান বিলের মৌলিক পার্থক্য এই যে নতুন

বিলে বিভিন্ন সংস্থার ক্ষমতার পৃথকীকরণের চেষ্টা হয়েছে। সেনেট আর সর্বোচ্চ পরিচালক সংস্থা নয়, সে স্থান অধিকার করেছে সিণ্ডিকেট। এবং অ্যাকাডেমিক বিষয়ে ক্ষমতা অর্পিত হয়েছে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের উপর, সেনেট ছাড়া যে ক্ষমতার সীমিত অংশীদারও আর কেউ নয়। বর্তমান বিলে সিণ্ডিকেট প্রকৃত পরিচালক সংস্থা (real Governing Body) হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম 'অথরিটি'—'ফিনান্স কমিটি'র গঠনপ্রণালী পরিবর্তিত হয়েছে। ১৯৫১-অ্যাক্টে ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন ট্রেজারার এবং উপাচার্য ঐ কমিটির সদস্যও ছিলেন না। বর্তমান বিলে ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে উপাচার্যের স্থান হয়েছে এবং বিজনেস অ্যাফেয়ার্সের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলারকে ভাইস-চেয়ারম্যানের আসন দেওয়া হয়েছে। এই কমিটির গঠন, কর্মপ্রণালী, দায়দায়িত্ব পরবর্তীস্তরে সিণ্ডিকেট Ordinance করে লিপিবদ্ধ করবে (৩১ ধারা)। বিলের ৩২ ধারায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও রীডার নিয়োগের পদ্ধতি ও 'সিলেকশন কমিটি'র গঠনপ্রণালী লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১৯৫১-অ্যাক্টের তুলনায় সিলেকশন-কমিটির গঠনে কিঞ্চিৎ উন্নতি লক্ষিত হচ্ছে। ভাইস-চ্যান্সেলার, অ্যাকাডেমিক প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার, সংশ্লিষ্ট ডীন এবং চ্যান্সেলার-মনোনীত জনৈক বিশেষজ্ঞ ছাড়া সিণ্ডিকেট-মনোনীত বিশেষজ্ঞের সংখ্যা একজনে এনে সংশ্লিষ্ট পোষ্ট-গ্রাজুয়েট কাউন্সিলকে অপর একজন বিশেষজ্ঞ মনোনয়নের অধিকার দেওয়া হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ের ৪৯-৫৪ ধারায় Statute, Ordinance, Regulation প্রভৃতি রচনার বিধিবদ্ধ প্রণালী বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হয়েছে। বর্তমান অ্যাক্টে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সিণ্ডিকেট কিম্বা সেনেট রচিত নিয়মাবলীর নাম Statute এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল রচিত অ্যাকাডেমিক নিয়মাবলীর নাম Regulation। বর্তমান বিলে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের Regulation-রচনার ক্ষমতা প্রায় নিরঙ্কুশ। সেনেটের পর্যালোচনার সীমিত ক্ষমতা ছাড়া কি সিণ্ডিকেট, কি কোনোও বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার, কি রাজ্য-সরকার, কারোই অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের বক্তব্য না মেনে উপায় নেই। পরিচালন সম্পর্কিত গৌণ নিয়মাবলী অর্থাৎ Ordinance রচনার দায়িত্ব সিণ্ডিকেটের এবং এক্ষেত্রেও চ্যান্সেলার কিম্বা রাজ্যসরকারের হস্তক্ষেপের সুযোগ নেই। বর্তমান অ্যাক্টে চ্যান্সেলারের উপর ন্যস্ত ক্ষমতা বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত আছে। সে ক্ষমতা অনেকখানি আনুষ্ঠানিক,—কিঞ্চিৎ প্রশাসনিক। তবে

দুই দফায় বর্তমান বিলে চ্যান্সেলারের উপর বাড়তি ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছে। (ক) প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার অব অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্সকে নিয়োগের ক্ষেত্রে (১২); (খ) সিণ্ডিকেটে দুইজন মনোনীত সদস্য প্রেরণের ক্ষেত্রে [২২ (১) (এক্স)] রাজ্যসরকার বর্তমান বিলে একটি নতুন ক্ষমতা নিতে চেয়েছেন (অন্যান্য সব ক্ষমতাই ১৯৫১-অ্যাক্টে অর্পিত ক্ষমতার সঙ্গে প্রায় অভিন্ন)। সেই ক্ষমতাটি হল অনুমোদনদানের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যসরকারের মতামত নেবেন—অর্থাৎ কলেজ-অনুমোদন পদ্ধতিটি দ্বিপাক্ষিক হবে। [২৩ (১) (এক্স-আই)]

(৯)

অসমীন শিক্ষানীতি :

বর্তমান বিলটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে কয়েকটি নেতিমূলক বৈশিষ্ট্য ও আপত্তিজনক ধারা সত্ত্বেও সমগ্রভাবে বিলটি ১৯৫১-অ্যাক্টের অপেক্ষা অনেক উন্নত। নীতিগতভাবে বহুলাংশে বিলটি 'রাধাকৃষ্ণণ কমিশন' ও 'মডেল অ্যাক্ট কমিটি'র সুপারিশসমূহকে মনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংবিধান রচনা করতে চেয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতিও তাই বিলটির দফা-ওয়ারি সমালোচনায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখেছেন, সমগ্রভাবে এ'টির নিন্দা করেন নি। অধ্যাপক সমিতি তো পরিষ্কার ভাবে বলেছেন যে (ক) সেনেটসভা নীতি-নির্ধারক, পর্যালোচক সভার ভূমিকা নেবে, সর্বোচ্চ পরিচালক সংস্থা হবে না (Supreme Governing Body), (খ) সিণ্ডিকেটই প্রকৃত 'গভর্নিং বডি' হিসাবে কাজ চালাবে, (গ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল শিক্ষাগত বিষয়ে সর্বোচ্চ সংস্থা হবে এবং ঐ সংস্থার সিদ্ধান্ত সেনেটের অনুমোদন-সাপেক্ষ হবে না। বর্তমান অবস্থায় এই structural reform মেনে নিলে বর্তমান বিলের সামগ্রিক মূল্যায়নে অসুবিধা থাকে না। আমি জানি "Universities are no exception to the general rule that a great gulf lies between constitutions on paper and government in practice. A description of the function and composition of statutory bodies is not necessarily an analysis of the real sources of initiative and power; these depend partly on the imponderables of specific circumstances and individual

personalities, and are almost impossible to determine". (Report on Higher Education, Appendix Four by Lord Robbins— p 17).। ১৯৫১-অ্যাক্টের আমলেও দেখা গেছে যে আসলে কয়েকজন ব্যক্তি কিম্বা এক বা একাধিক উপদলই বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। যে তেজস্বিতা, চারিত্রমর্যাদা, স্বার্থলেশহীনতা সারস্বতভবনকে কলুষকালিমা থেকে মুক্ত করতে পারে, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে, আজ সেই সবেরই অভাব। ফলে বর্তমান বিলে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল হয়তো সার্বভৌমই হল কিন্তু ক্ষমতা হয়তো বর্তাবে কয়েকজনের হাতে। এ সম্ভাবনা যে নেই এমন কথা বলবো না। তবুও শিক্ষাসম্মত সংস্কার প্রয়োজন আছে, institutional machinery-র গুরুত্ব আছে, শুদ্ধাচারী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে খুচরো সংস্কারকে অগ্রাহ্য করাও চলে না। বর্তমান বিলে বিবিধ খুচরো সংস্কার সন্নিবিষ্ট হয়ে অনেক পরিমাণে উন্নত বিধান আমরা পেয়েছি। ভবিষ্যতে এই বিলের গুণাগুণ প্রয়োগের কষ্টিপাথরে কি রকম দাঁড়াবে, সে কথা আজই বলা অসম্ভব।

'মডেল অ্যাক্ট কমিটি'র সুপারিশ ও বিশ্ববিদ্যালয় বিল

পূর্বেকার বক্তব্যের পটভূমিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংবিধানের অন্তর্লীন শিক্ষানীতিসমূহের তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম কথা এই যে, নতুন সংবিধান সাম্প্রতিক 'মডেল অ্যাক্ট কমিটি'র সুপারিশ-সমূহকে মনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামোর পরিবর্তন করতে চেয়েছে। 'মডেল অ্যাক্ট কমিটি' বলেছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে দুটি মূলনীতির কথা মনে রাখা প্রয়োজন : (ক) বহিরঙ্গ কর্তৃত্ব থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বাধীনতা'কে রক্ষা করা এবং (খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষানীতি ও কর্মসূচী প্রণয়নে শিক্ষাব্রতীদের কার্যকর অংশীদারত্ব দেওয়া। নেতিমূলক কয়েকটি ধারা সত্ত্বেও সমগ্রভাবে এই নীতি থেকে নতুন সংবিধান বিচ্যুত হয়নি বলেই আমার ধারণা।

তবুও নতুন সংবিধানের সমালোচকেরা সেনেট, সিণ্ডিকেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টনের পদ্ধতির বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলেছেন যে, সেনেটকে শুধু বিতর্কসভার মর্যাদা দেওয়া হল। সিণ্ডিকেটকে 'গভর্নিং বডি'র ক্ষমতা দেওয়াও তাঁদের অনুমোদিত নয়। বিতর্কের সূত্রপাত এই

কারণে যে, ১৯৫১-অ্যাক্টে সেনেটকে বলা হয়েছিল 'Supreme Govering Body'.। ফলে সেনেটের নিকট উপস্থাপিত না হলে কী শিক্ষাগত কী প্রশাসনিক কোনো কার্যাবলীই বিধিসম্মত হত না। বর্তমান সংবিধানে 'মডেল অ্যাক্ট কমিটি'র অভিমত অনুসরণ করে inter-locking of functions পরিহারের চেষ্টা হয়েছে এবং ক্ষমতার পৃথকীকরণের নীতি গৃহীত হয়েছে। 'মডেল অ্যাক্ট কমিটি' বলছেন: "It is necessary to clearly demarcate the functions of these bodies, each having a specified authority, as confusion can arise by each trying to advise the other with regard to its functions."।

আদিতে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল' ছিল না এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের পরিসর শুধুই পরীক্ষার আয়োজনে সীমিত ছিল। তৎকালে সেনেট বা কোর্টকে Supreme Governing Body বলবার হেতু ছিল। আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের পরিসর বহুধাবিস্তৃত, শিক্ষাদান গবেষণা প্রভৃতি কাজই আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বলে স্বীকৃত। ফলে শিক্ষাগত ব্যাপারে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল যে প্রধান, অন্য-নিরপেক্ষ ভূমিকা নেবে, এ তো স্বাভাবিক। এবং অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলই যদি Supreme Academic Body হয় তবে Senate-কে আর 'Supreme Govering Body' বলা চলে না (মডেল অ্যাক্ট কমিটির রিপোর্ট পৃ ১৯)। 'মডেল অ্যাক্ট কমিটি'র সুপারিশ অনুযায়ী নতুন সংবিধানে সিণ্ডিকেটকে পরিচালক সংস্থার (Executive Body) মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শিক্ষকনিয়োগ ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে, টাকাকড়ি আদায়, পরীক্ষার ফী ধার্য করা, পরীক্ষাকার্য সম্পাদন এমনি সব চলতি প্রশাসনিক কাজের দায়িত্ব এককভাবে সিণ্ডিকেটের।

তাহলে সেনেটের ভূমিকা কি হবে? 'মডেল অ্যাক্ট কমিটি' বলছেন যে সেনেট শুধুই consultative সংস্থা হবে এবং কতক পরিমাণে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে reviewing body-র কাজ করবে। "The Court (Senate) is not to be regarded as a superior Body to revise the decisions of the Executive Council (Syndicate) or the Academic Council. Legislation by the Executive Council or by the Academic Council need not require confirmation by the Court. It should

operate as a Body concerned with general policy and the well-being of the University" (p 9).।

'মডেল অ্যাক্ট কমিটি' বলছেন পরিবর্তিত অবস্থায় সেনেটের দায়-দায়িত্বের পরিবর্তন হবে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিরা সেনেটে আসবেন। এই সংস্থা বিশ্ববিদ্যালয় ও জনসাধারণের মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ করবে—"in general the Court (Senate) is intended to bring into the University the lay element and this has the advantage of bringing the University into contact with eminent men in public life, in industry and trade, and those who provide finances for it (p 19).।

সেনেটের ক্ষমতা :

নতুন বিশ্ববিদ্যালয় বিলের কুড়ি ধারায় সেনেটের ক্ষমতার বর্ণনা আছে। নতুন বিদ্যায়তন প্রভৃতি স্থাপন, অধ্যাপক প্রভৃতির নতুন পদ সৃষ্টি, ডিপ্লোমা, সার্টিফিকেট প্রদান, স্কলারশিপ, ফেলোশিপ, স্টাইপেণ্ড প্রাইজ প্রভৃতির প্রবর্তন, ডি, ফিল, ডি, এস-সি প্রভৃতি ডিগ্রি প্রদান—এ সব ক্ষমতাই সেনেটের উপর ন্যস্ত হবে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব-নিকাশ ও বাজেটের আলোচনা, বাৎসরিক বিবরণী (report) আলোচনা করবার অধিকারও সেনেটের থাকবে। এ আলোচনার মধ্য দিয়ে সেনেট সাধারণ নীতি নির্ণয় করবে, সিণ্ডিকেটের কাজের পর্যালোচনা করবে। ২০ (এক্স) উপধারায় সেনেটকে পরামর্শদানের ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে। ২০ (এক্স) (৩) উপধারায় সেনেটের উপর এই ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে যথা—"to consider and suggest measures for the improvement of the administration and finances of the University, and generally for the furtherance of its objectives".। কাজেই এ কথা সুস্পষ্ট যে, অন্যান্য ক্ষমতার সঙ্গে সেনেটকে নীতি-নির্ধারণ সভার মর্যাদাও দেওয়া হয়েছে।

যদিও নব-বিধানে ক্ষমতা পৃথকীকরণের নীতি স্বীকৃতি লাভ করেছে এবং সেনেট সর্বোচ্চ পরিচালক সংস্থা নয়, তবুও সেনেটকে আরও পাঁচ দফায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পর্যালোচনা (review) করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে : (ক) সিণ্ডিকেট রচিত বাজেট সংশোধনের ক্ষমতা [২০ (১) (৮)] ; (খ)

কলেজ থেকে অনুমোদন-প্রত্যাহারের সিণ্ডিকেটসিদ্ধান্ত সংশোধনের ক্ষমতা (২৩ (১) (১৪)] ; (গ) সিণ্ডিকেট-প্রণীত statute সংশোধন অথবা বাতিল করবার ক্ষমতা [৫০ (১)] ; (ঘ) অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল প্রণীত regulation সংশোধন অথবা বাতিল করবার ক্ষমতা [৫৪ (৩)] ; (ঙ) সিণ্ডিকেট-প্রণীত ordinance সংশোধন অথবা বাতিল করবার ক্ষমতা [৫২ (৩)]। আগেই বলেছি যে 'মডেল অ্যাক্ট কমিটি' বলেছেন যে "Legislation by the Executive Council or the Academic Council need not require confirmation by the Court."। বর্তমান বিলে তথাপি সেনেটকে reviewing power দেওয়া হয়েছে অন্য সংস্থার পৃথকীকৃত ক্ষেত্রে। কিন্তু সেই ক্ষমতার প্রয়োগ যাতে প্রকৃত গণতন্ত্রসম্মত হয় এবং তাৎকালিক উত্তেজনা-প্রসূত না হয়, সেজন্য বলা আছে যে, এই সব ক্ষমতা প্রযুক্ত হবে "by a majority of the total number of members existing at that time."। এস্থলে স্মরণযোগ্য যে সেনেটসভার দুশ চার জন সদস্যের মধ্যে শিক্ষকের সংখ্যা একশ বার জন। সেনেট যদি সর্বোচ্চ সংস্থা না হয় অথচ যদি review করবার ক্ষমতা ঐ সংস্থাকে দিতে হয় তবে সে ক্ষমতার প্রয়োগ কিছুটা কঠিন করাটাই বাঞ্ছনীয়।

অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল :

'অটোনমি'র প্রশ্ন আলোচনাকালে বলেছি যে "মডেল অ্যাক্ট কমিটি" জোর দিয়ে বলছেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বাধীনতা', 'স্বাতন্ত্র্য'—সবকিছুই অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের গঠনপ্রণালীর উপর নির্ভরশীল। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের ক্ষমতা অন্য-নিরপেক্ষ হবে এবং এই ক্ষমতার অংশীদার কি সেনেট, কি সিণ্ডিকেট, কি রাজ্যসরকার কেউ-ই হবেন না।

"The Academic Council represents in one way the core of the University. This body should remain sovereign in its field. Its decisions except for financial reasons should not be subject to modification or approval by anyone else."। যদি মুক্তমন নিয়ে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের উপর ন্যস্ত ক্ষমতার বিশ্লেষণ করা যায় (২৫ ধারা) তবে দেখা যায় যে বর্তমান অ্যাক্টে বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্মবাণী অর্থাৎ 'অ্যাকাডেমিক অটোনমি' অক্ষুণ্ণ আছে।

সেনেটকে অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের regulation বিচারের, সংশোধনের এবং প্রয়োজন হলে বর্জনের যে ক্ষমতা নববিধানে দেওয়া হয়েছে সেটাই আপত্তিজনক, তবে সে ক্ষমতা সচরাচর প্রয়োগ করা যাবে না এটাই ভরসা।

অন্যান্য অ্যাকাডেমিক সংস্থা

নতুন বিলের ২৬, ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৩০ ধারায় অন্যান্য যে সব অ্যাকাডেমিক সংস্থার কথা আছে যথা—ফ্যাকাল্টি, পোস্ট-গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েট কাউন্সিল, পোস্ট-গ্রাজুয়েট ও আণ্ডার-গ্রাজুয়েট বোর্ড অব স্টাডিজ—সেই সব সংস্থাও শিক্ষাব্রতীদের নিয়ে গঠিত এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে অ্যাকাডেমিক ক্ষমতার অধিকারী। নববিধানে আণ্ডার-গ্রাজুয়েট স্তরের শিক্ষাকে কিঞ্চিৎ মর্যাদা দিয়ে এই সর্বপ্রথম "কাউন্সিল্স্ অব আণ্ডার-গ্রাজুয়েট স্টাডিজ" গঠিত হতে চলেছে। F. I. S. E.-র আন্তর্জাতিক শিক্ষকসনদের চতুর্থধারা যদি স্মরণ করি তবে দেখি যে প্রাক্-স্নাতক শিক্ষকেরা এই সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ের 'শিক্ষানীতি' নিরূপণে সহযোগিতা করে 'অ্যাকাডেমিক ফ্রীডম'-এর পথ অনেকখানি প্রশস্ত করতে সক্ষম হবেন।

(১০)

পুনরায় 'অটোনমি'র কথা :

বর্তমান বিলের সমালোচকেরা অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল থেকে আলোচনা আরম্ভ না করে অন্য পথে শরনিক্ষেপ করে লক্ষ্যভেদ করতে চেয়েছেন। তাঁরা বলছেন, চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলার, দুজন প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার ও রেজিস্ট্রারের নিয়োগপদ্ধতি আপত্তিজনক। যদিও এ কথা ঠিক যে চ্যান্সেলার, ভাইস-চ্যান্সেলার ও রেজিস্ট্রারের নিয়োগপদ্ধতি ১৯৫১-অ্যাক্টে যা ছিল বর্তমান বিলেও হুবহু তাই আছে, তবুও "মডেল অ্যাক্ট কমিটি"র সুপারিশ অনুযায়ী এঁদের নিয়োগ হলে ভালো হত। ১৯৫১-অ্যাক্টের ট্রেজারার বর্তমান সংবিধানে হবেন "প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার অব বিজ্‌নেস্ অ্যাফেয়ার্স"। বর্তমান নিয়োগপদ্ধতি কিছুটা স্বতন্ত্র। 'প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার অব অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্স্' পদটি নতুন সৃষ্টি। তবে দু'জন সহ-উপাচার্যই নিযুক্ত হবেন "by the Chancellor in consullation with the Minister." এ-ব্যবস্থা সত্যই আপত্তিজনক। আপত্তিজনক এই কারণে নয় যে এই পদ্ধতির

প্রয়োগে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমি' কলুষিত হবে। আপাত্ত এজন্য যে এঁদের নিয়োগপদ্ধতি শিক্ষাশাস্ত্রীদের অভিমতসম্মত নয়। অনেক সমালোচক বলেছেন 'প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার অব অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্স' পদটির কোনোও প্রয়োজন নেই। কিন্তু রাধাকৃষ্ণণ কমিশনের নিকট সাক্ষ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই পদটির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছিল। সেনেট সভায় শ্রীযুক্ত মালিকও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে দেখিয়েছিলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রমবর্ধমান কর্মের ক্ষেত্রে উপাচার্যের সহকারীর প্রয়োজন আছে। "মডেল অ্যাক্ট কমিটি"ও এই মত সমর্থন করেছেন (পৃ. ১৫)।

(১১)

অবশিষ্ট রইল সমালোচকদের আর তিনটি যুক্তি।

(ক) চ্যান্সেলার নববিধানে সিণ্ডিকেটে দুজন সদস্য মনোনীত করবেন :

(খ) বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনদানের (affiliation) ক্ষমতা কিঞ্চিৎ সীমিত হল :

(গ) বিশ্ববিদ্যালয়ের Statute, Ordinance প্রভৃতিকে চ্যান্সেলারের অনুমোদন-সাপেক্ষ করে রাখা :

অতএব, প্রমাণ হল রাজ্যসরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে কুক্ষিগত করে ফেললেন। আমার মতে এ যুক্তি একেবারেই অচল।

সিণ্ডিকেটে চ্যান্সেলারের নমিনী

প্রথমত, সিণ্ডিকেটে দুজন সদস্য মনোনীত করবার প্রশ্ন। ছাব্বিশজন সদস্য-বিশিষ্ট সিণ্ডিকেটে এবার চ্যান্সেলার দুজন সদস্য মনোনীত করবেন। সরকারী ব্যক্তিদেরই করবেন এমন কোনোও কথা নেই। তবুও ধরে নিলাম যে সব মিলিয়ে সিণ্ডিকেট হয়তো সরকারী ভাষ্যকার হবেন ছয়জন (প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলারদের হিসাবের মধ্যে ধরে)। বাকি সবাই **নির্বাচিত** প্রতিনিধি। কথা উঠেছে চ্যান্সেলারের উপর ন্যস্ত এই ক্ষমতা শিক্ষাস্বার্থসম্মত নয়। বর্তমান অ্যাক্টে সিণ্ডিকেটকে 'গভর্নিং বডি'র মর্যাদা দিয়ে বিবিধ ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। ফলে 'control by partnership' নীতি অনুযায়ী রাজ্যসরকার দাবি করতে পারেন যে, সিণ্ডিকেটে রাজ্যসরকারের ও শিক্ষাদপ্তরের বক্তব্য যথাযথ উপস্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। বিশেষত আজ

যখন নানা খাতে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে লক্ষ লক্ষ টাকা দিচ্ছেন। সমালোচকেরা যে কথাটি প্রচ্ছন্ন রেখেছেন সেটি হল এই যে, 'রাধাকৃষ্ণণ কমিশন' (পৃ. ৪৩২) এবং সম্প্রতি 'মডেল অ্যাক্ট কমিটি' বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে অথবা এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে চ্যান্সেলারের অথবা 'ভিজিটর'-এর "মনোনীত প্রার্থী" রাখবার কথা বলেছেন। কাজেই রাজ্যসরকার শিক্ষা-শাস্ত্রীদের অভিমতকে অগ্রাহ্য করে সিণ্ডিকেটে সরকারী ব্যক্তিদের প্রাধান্য স্থাপনে সচেষ্ট, এ অভিযোগ যথার্থ নয়।

অ্যাফিলিয়েশন প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় প্রশ্ন: অনুমোদনদানের ক্ষমতাপ্রসঙ্গে। নতুন সংবিধানে রাজ্য-সরকার দাবি করেছেন যে কোনও নতুন কলেজকে অনুমোদন দেবার পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় রাজ্যসরকারের মতামত বিচার করবেন ['to grant after considering the views of the State Government, affiliation or recognition to a College or an Institution etc.'—23 (1) (xi)]. বলা হয়েছে যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মূলত একটি অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়, কিন্তু এর অনুমোদনদানের ক্ষমতাও যদি অন্য-নিরেপক্ষ না হয় তবে আর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বাধীনতা' কোথায় রইল ? প্ল্যানিং আরম্ভ হবার বহু আগে 'রাধাকৃষ্ণণ কমিশন' ঠিক এই প্রশ্নটির আলোচনা করেছেন। সম্প্রতি 'মডেল অ্যাক্ট কমিটি'ও এই প্রশ্ন সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য বলেছেন। শিক্ষাশাস্ত্রীরা বলছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় দরাজ হাতে অনুমোদন দেয়। অনেক সময় নানা প্রকারের চাপের নিকট বিশ্ববিদ্যালয় নতি স্বীকার করে। ফলে কলেজ স্থাপিত হয়, অনুমোদন পায়, অথচ সংগতি, আয়োজন, পরিচালন-ব্যবস্থা, শিক্ষকদের বেতন প্রভৃতির বিচারে হয়তো ঐ অনুমোদন সমর্থন করা চলে না। রাধাকৃষ্ণণ কমিশন তাই ১৯৪৯ সনে বলেছিলেন: "The University with its concern for standards and the government as the source of grants must be jointly satisfied that a college deserves affiliation (পৃ. ৪১৯)." "মডেল অ্যাক্ট কমিটি"ও প্রায় ঐ একই কথা বলেছেন: "Even if by law the power of affiliation is vested in the University, it becomes extremely difficult to deny affiliation, if the local authorities express-

a strong desire that affiliation should be given to a particular institution. In a matter like this it is not possible to safeguard standards unless the Universities and the Government work in close cooperation and mutual understanding" (পৃ. ২৭).। তবে সরকারী দীর্ঘসূত্রতার জন্য অনুমোদনদান বিঘ্নিত না হয়, Statute-এ সে ধরনের কোনোও ধারা সন্নিবিষ্ট হওয়া উচিত।

স্ট্যাটুট প্রভৃতি প্রসঙ্গে

তৃতীয় প্রশ্ন: Statute, Ordinance প্রভৃতিকে চ্যান্সেলারের অনুমোদন-সাপেক্ষ করবার যৌক্তিকতা। বামপন্থী কমিউনিস্টরা এই লোক-ঠকানো প্রশ্ন তুলে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বাতন্ত্র্য-হানি'-তত্ত্ব প্রতিপন্ন করতে চেয়েছে। প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে 'কেরল বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট, ১৯৫৭'-এ চ্যান্সেলারের উপর অনুরূপ ক্ষমতা ন্যস্ত হয়েছিল। বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্টকে যদি মৌলিক বিধান বলি তবে এই অ্যাক্ট অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয় স্বকীয় ক্ষেত্রে যে বিধিবিধান রচনা করে তাদের নাম Statute, Ordinance এবং Regulations.। বর্তমান সংবিধানে বলা আছে যে, সিণ্ডিকেট/সেনেট যে Statute রচনা করবে সেই Statute আইনসিদ্ধ হবে যদি মন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে চ্যান্সেলার ঐ Statute অনুমোদন করেন। ১৯৫১-অ্যাক্টেও ঐ একই ব্যবস্থা। সিণ্ডিকেট-প্রণীত Ordinance-এর বেলায় চ্যান্সেলারের ক্ষমতা নেহাৎ-ই সীমিত। সেনেটকে মতামত প্রকাশের সুযোগদানের জন্য চ্যান্সেলার সাময়িকভাবে নির্দেশ দিতে পারেন যে Ordinance-টি স্থগিত থাকুক, এর বেশি ক্ষমতা চ্যান্সেলারের নেই। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের Regulation চ্যান্সেলারের অনুমোদন-সাপেক্ষ মোটেই নয়।

প্রশ্ন হবে, Statute-কেই বা চ্যান্সেলারের অনুমোদন-সাপেক্ষ করবার হেতু কি ? Statutory সংস্থা ও Chartered সংস্থার পার্থক্য আলোচনা করে রবিনস কমিটি (Robbin's Committee) বলছেন :

"A statutory corporation only has such rights as are conferred directly or indirectly by the Statutes creating it, and can only do such acts as are directly or indirectly authorised by those statutes. Its powers.

extend no further than is expressly stated in those statutes or is necessarily required for carrying out the purposes of its incorporation or is incidental to or consequential upon the things authorised by the Legislature. Any act which is not expressly or impliedly authorised by the Statutes is *ultra vires* and prohibited."

বিশ্ববিদ্যালয় আইনসভা-প্রণীত অ্যাক্ট অনুযায়ী গঠিত 'স্ট্যাটুটারি সংস্থা।' আইনসভা কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিশ্ববিদ্যালয়ও 'স্ট্যাটুট' তৈরি করতে পারে। ঐ স্ট্যাটুটে (ক) বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন পদ সৃষ্টির ঘোষণা (খ) অ্যাক্টে বর্ণিত সংস্থা ব্যতীত অন্যান্য 'অথোরিটি' স্থাপন (গ) এই সব সংস্থার গঠনপ্রণালী, ক্ষমতা প্রভৃতির ঘোষণা (ঘ) বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট, সিণ্ডিকেট ও অন্যান্য সংস্থার নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়ম তৈরি (ঙ) শিক্ষকদের চাকুরির সর্তাদি নির্ধারণ (চ অনুমোদনদান-পদ্ধতি ও অনুমোদন-প্রত্যাহারের পদ্ধতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে বিধান রচিত হতে পারে। উপরোক্ত বিষয়গুলি শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ বিষয় নয় বরং এমন বিষয় যে বিষয়ে সাধারণ রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট, শিক্ষক, পরিচালকমণ্ডলী প্রভৃতি বিভিন্ন স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষ বর্তমান। এই সব বিষয়ের সঙ্গে আর্থিক প্রশ্ন এবং আইনী প্রশ্নও জড়িত থাকবার সম্ভাবনা। এই কারণে স্ট্যাটুট-তৈরি ক্ষমতা যুগ্ম-দায়িত্বের পর্যায়ে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্ট্যাটুট-তৈরির ক্ষমতা থাকে আবার সেই স্ট্যাটুট চ্যান্সেলারের অনুমোদন-সাপেক্ষ হয়। বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থার প্রায় সর্বত্র এটাই স্বীকৃত রীতি এবং 'কেরল বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট'-এও এই নীতির প্রতি আনুগত্য ছিল অকুণ্ঠ। এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট'-এ (১৯৫১-অ্যাক্টের তুলনায়) Statute-এর ক্ষেত্রে কোনোও বাড়তি ক্ষমতা চ্যান্সেলারের উপর ন্যস্ত হয় নি।

(১২)

নেতিমূলক বৈশিষ্ট্য

"কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিল"-এর নেতিমূলক বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমত, এই 'বিলে'-এ সেনেট, সিণ্ডিকেট ও 'অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল'-এর ক্ষমতার পৃথকীকরণ পূর্ণতা লাভ করে নি এবং অ্যাকাডেমিক-কাউন্সিল-প্রণীত

Regulation সংশোধনের ক্ষমতা সিনেটকে প্রদত্ত হয়েছে। ফলে কোনোও কোনোও ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনব্যবস্থায় ঋজুতা ও সরলতার অভাব দেখা দেবে বলে আশঙ্কা হয়। অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল-এ অ-শিক্ষক প্রতিনিধির আসনের ব্যবস্থা, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলারদ্বয়ের নিয়োগ-পদ্ধতি, রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট কেন্দ্রে ফ্যাকাল্টি-অনুযায়ী আসন বিভক্ত না করা, এ সবই শিক্ষাগত দিক থেকে আপত্তিজনক। তাছাড়া, সিণ্ডিকেটে অধ্যক্ষদের জন্য আসন-সংরক্ষণ করে কী কলেজশিক্ষক, কী বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষক কারো জন্যই আসন-সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। সর্বাপেক্ষা আপত্তিজনক হল এই যে, বর্তমান 'বিল'-এ ১৯টি স্পনসরড কলেজকে, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ার-বহির্ভূত করবার প্রচেষ্টা হয়েছে। নীতি হিসাবে সব কলেজের উপরই বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকি ও সাধারণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। স্পনসরড কলেজকে অন্তত 'বিশেষ ধরনের কলেজ' হিসাবে পৃথকীকরণের কোনো সংগত কারণ নেই। বিশ্ববিদ্যালয় স্পনসরড কলেজের শিক্ষকদের চাকুরি প্রভৃতির সর্তাদি, শিক্ষক-সংসদের গঠনপ্রণালী, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের নিয়মাবলীর উপর তদারকি করতে অক্ষম হবেন এবং সরকারী লালফিতার বন্ধনে স্পনসরড কলেজের শিক্ষকেরা জর্জরিত হবেন, কলেজ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিরোধের ক্ষেত্রে তাঁরা সালিসীর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন, এ-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসঙ্গত। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-সমিতি এই নেতিমূলক দিকটির প্রতি সর্বাগ্রে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে সঠিক কাজই করেছেন।

সদর্থক বৈশিষ্ট্য

পূর্বেই বলেছি 'বিল'টির সদর্থক বৈশিষ্ট্যও আছে এবং এর বিভিন্ন ধারায় যে structural reform প্রস্তাবিত, সেই সংস্কার শিক্ষার ও শিক্ষকের স্বার্থের অনুকূল। প্রস্তাবিত বিলে সেনেট, সিণ্ডিকেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল-এর মধ্যে ক্ষমতা-বণ্টনের মোটামুটি সঠিক নীতি, প্রাক-স্নাতক স্তরের শিক্ষাকে কাউন্সিল-গঠনের মাধ্যমে মর্যাদাদান, ১০০টি বেসরকারী কলেজের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্ব স্থাপনের ব্যবস্থা, 'কলেজ কোড কমিশন'-প্রস্তাবিত 'সালিসী ট্রাইবুনাল' গঠনের প্রস্তাব, এ সবই অধ্যাপকসাধারণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফল। অনুমোদিত কলেজের কর্মধারার সমন্বয়, প্রয়োজনমতো,

বিশেষ অবস্থায়, এই সব কলেজকে আর্থিক সাহায্য দান, অযোগ্য অথবা দুর্বিনীত 'গভর্নিং বডি'র অপসারণ প্রভৃতি শিক্ষকদাবিসম্মত বিভিন্ন ধারার সন্নিবেশও অ্যাক্টটির সদর্থক বৈশিষ্ট্য। তাছাড়া, 'মডেল অ্যাক্ট কমিটি'র সুপারিশ অনুযায়ী 'অ্যাকাডেমিক সংস্থা'সমূহের হাতে প্রায় অন্য-নিরপেক্ষ ক্ষমতা ন্যস্ত করে নতুন সংবিধান বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাডেমিক 'অটোনমি'র সারবস্তুকে রক্ষা করেছে। বহিঃশক্তির হাত থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম—শিক্ষাদান, গবেষণা প্রভৃতিকে রক্ষা করে শিক্ষকদের 'অ্যাকাডেমিক ফ্রীডম' সংরক্ষণের অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছে।

আগেই বলেছি বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসারদের নিয়োগপদ্ধতি (বিশেষতঃ 'প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার অব অ্যাকাডেমিক অ্যাফেয়ার্সের') আপত্তিজনক। 'মডেল অ্যাক্ট কমিটি'র সুপারিশ মেনে নিয়োগপদ্ধতির নবীকরণ কাম্য ছিল। কিন্তু তা থেকে এ কথা অনুসৃত নয় (entailed) যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অটোনমি' নষ্ট হল, বিশ্ববিদ্যালয় সরকারের কুক্ষিগত হল। 'কেরল বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাক্ট'-এ যেমন যুগোপযোগী structural reform প্রস্তাবিত হয়েছিল, বর্তমান অ্যাক্টেও অনুরূপভাবে বিবিধ যুগধর্মসম্মত সংস্কারের কথা আছে। 'কেরল অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে রক্ষণশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, বঙ্গদেশে সেই শক্তি চেষ্টা করেও সংস্কারের বিরুদ্ধে তেমন শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি। তফাৎ শুধু এইটুকু।

আগেই বলেছি যে সংবিধান যত ভালো হোক না কেন কাগজী সংবিধান ও বাস্তব শিক্ষাপরিচালনা-ব্যবস্থার মাঝখানে সর্বদাই ব্যবধান থাকে। তাই যদি না হবে তবে বিদেশী গভর্নর মনোনীত স্যার আশুতোষ কিংবা স্যার জন অ্যাণ্ডারসন মনোনীত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রতিকূল পরিবেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করলেন কেমন করে? আর ১৯৫১-অ্যাক্টের দৌলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থাই বা সৃষ্টি হল কেন? আবার তাই রবিনস্ কমিটির বক্তব্যের পুনরুক্তি করেই সমাপ্তি টানি :

"Universities are no exception to the general rule that a great gulf lies between constitutions on paper and government in practice. A description of the function and composition of statutory bodies is not an analysis of the real sources of initiative and power; these

depend partly on imponderables of specific circumstances and individual personalities, and are almost impossible to determine."

খুবই সত্য কথা। এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রগতিশীল সংস্কারের চেষ্টা করতে হবে। সেটাই পথ, অন্য পথ আর নেই।

পরিশিষ্ট

Kerala University Act, 1957

(A) *Chancellor's powers*

(1) Head of the University (C L 8), (2) shall preside at meetings of the Senate and any convocations (Cl. 8), (3) shall exercise such powers as may be conferred on him under the provisions of this Act or the Statutes [8 (2)], (4) shall appoint the Vice-Chancellor (10), (5) shall approve temporary filling up of the post of the Vice-Chancellor [10 (4)], (6) shall appoint Five Life Members to the Senate [13 (3) (i)], (7) shall nominate not more than Twelve Members to the Senate [13 (4)], (8) shall sanction, disallow Senate Statutes or remit the same for further consideration [25 (3)], (9) No Statute or amendment or repeal of an existing Statute made by the Senate shall have effect until it has been assented to by the Chancellor [25 (4)], (10) All Syndicate Ordinances shall be submitted to the Chancellor [(27)], (11) The Chancellor may direct that the operation of any Ordinance shall be suspended until such time as the Senate has had an opportunity of considering them [27 (2)], (12) Dispute as to the constitution of University 'authority' or body or regarding the interpretation of any provision of the Act or of

any Statute, Ordinance, Regulation or Rule etc. shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final (38).

(B) *Powers of the State Government*

(1) Previous sanction of the Government to maintain, affiliate or recognise any College or Institution exclusively for Women [6] ; (2) The Education Minister shall be the Pro-Chancellor of the University [9 (2)] ; (3) In the absence of the Chancellor or during his inability to act, the Pro-Chancellor shall exercise all the functions of the Chancellor [9 (2)] ; (4) The control of all Institutions vested in the University at the commencement of this Act shall vest in the Government except the Research Institutions (and other Institutions) as may be specified by the Government [23 (2)] ; (5) power to transfer to the University any Institution subject to such terms and conditions as the Government may deem fit to impose [23 (3)] ; (6) Accounts and Annual Report to be submitted to Government [31 (2) and 32] ; (7) The Government shall appoint auditors of the accounts of the University and the Institutions under the management of the University [35] ; (8) The Government shall have the right to cause an inspection to be made, by such person or persons as they may direct, of the University's buildings, laboratories, libraries, museums, workshops and equipment, and of any Institutions maintained, recognised or approved by, or affiliated to, the University, and to cause an enquiry to be made in respect of any matter connected with the University [33 (4)] ; (9) Power of the Government to advise the University upon the action to be taken on results of such enquiry [33 (5)] ; (10) Power of the Government to

receive report on action taken by the University [33 (6)]; (11) When the University does not take action to the satisfaction of the Government, power of the Government "to issue such directions as they may think fit and the Senate and the Syndicate shall comply with such directions" [33 (7)]; (12) Power to nominate a Member on the Arbitration Board [34 (2)]; (13) Power to receive within a month of the date of the meetings copies of the proceedings of the Senate and the Syndicate [37 (4)]; (14) Power to remove difficulties arising out of operation of this Act [(41)]; (15) Power of according approval to the First Statutes, Ordinances and Bye-laws before they are brought into force [40 (7)].

* কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন সম্পর্কে পরিচয় সম্পাদকের মন্তব্য ইতিপূর্বে (অগ্রহায়ণ, ১৩৭২) প্রকাশিত হয়েছে। সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য শ্রীসতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর ভিন্নমত এই সংখ্যায় প্রকাশিত হল। এ-সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা আমরা সাগ্রহে প্রকাশ করব।

—সম্পাদক, **পরিচয়**

শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শুকনো নাকে প্রাণপণ সিকনি টেনেও ফল হয় না। অথচ ভুটভাট আওয়াজ শোনা যায়। ঝিরঝিরে ধোঁয়া দেখা যায়।

এগিয়ে গিয়ে উঁক মারবে? তিন-ইটের উনোনে-চাপানো হাঁড়িতে উঁকি মারবে?

পা বাড়িয়েও পিছু হটে। ভারি ডেঙ্গারাস বুড়ি! কাছে ঘেঁষতে দেয়া দূরস্থান, কাছাকাছি ভিখিরি দেখলেই যা কটমটিয়ে তাকায়!

হেমন্ত অবিশ্যি ভিখিরি নয়। পরনে ফরসা জামাকাপড়=ভদ্রলোক। ভদ্রলোকের দয়াতেই ভিখিরি বেঁচে থাকে। এবং ভিখিরি বেঁচে-থাকা= ভদ্রলোক বহাল-থাকা।

কিন্তু বুড়ি কি অতশত বোঝে? কোমরে-ত্যানা উদোম-বুক বেগুন-পোড়া মাই গাছতলার এই ভিখিরি বুড়ি?

হেমন্ত পড়ে যায় দারুণ ধাঁধায়।

কোনোদিন বুড়িকে এক নয়ার দয়া দেখানোরও হদিশ পায় না স্মৃতি আঁচড়ে। বরং কেবলি মনে পড়ে ভিক্ষে চাইলে না-শোনার ভান করেছে, মুখোমুখি এসে দাঁড়ালে ধমক হাঁকিয়েছে।

বুড়ি যদি চিনে রেখে থাকে? কেশবের মত তাকেও যদি চিনে রেখে থাকে?

আহা, কেশব যদি এখন থাকত!

উসকে দিলেই 'কী রাঁধছ গো মেয়ে?' বলে হাঁড়ির উপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ত। 'এসো বাপ এসো।' বলে নিদাঁত দুই মাড়ি দেখিয়ে বুড়িও তাকে আপ্যায়িত করত।

করবে না! হররোজ শেতলাতলায় একটা প্রণাম ঠুকে আর বুড়িকে একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে ডবল আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ছুটতে ছুটতে গিয়ে ট্রেনে চাপত। ডবল সেই আশীর্বাদের দৌলতেই না—

বন্ধুর প্রতি অকথ্য ঈর্ষায় প্রাণটা হেমন্তর জলেপুড়ে যায়। ইলেকট্রিক পোস্টে মাথা-ছাতু-হওয়া বন্ধুর প্রতি অকথ্য ঈর্ষায়।

অচমকা অমন মিনিমাগনা ফৌত-হয়ে-যাওয়া কম ভাগ্যি!

জ্বলজ্বল করে বন্ধুর মুখ।

শুধু মুখ! পাঁজরার হাড়, বুকের লোম, পেটের আঁচিল, মায় কুঁচকির ফোঁড়া-কাটার দাগ অব্দি। ছেলেবেলার বন্ধু বলে কথা!

পাছে পুলিশটুলিশের হাঙ্গামায় পড়ে অপিসে ফের লেট হয়ে যায়, বন্ধুকে সেদিন বন্ধু বলে জানান দেয় নি। ভাগ্যিস দেয় নি! দিলে কি আর আস্ত শরীর সমেত আস্ত মুখখানা তার জ্বলজ্বল করে উঠত?

মাথা-ছাতু বন্ধুর মুখে শত্রুর মুখে ফারাক থাকে? কেশবের মুখে এম-ডি'র মুখে?

এম-ডি'র মুখের জন্যে একদলা থুতু আর কেশবের মুখের জন্যে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে পকেট থেকে হেমন্ত সিগারেটের প্যাকেট বের করে।

'একটু আগুন দেবে গা?'

বারেক তাকিয়ে বুড়ি একরাশ শুকনো ঘাস-পাতা উনোনে ঠেসে দেয়।

দরদে-খাবি-খাওয়া গলায় হেমন্ত ডাকে, 'ও মেয়ে—!'

বুড়ি ঘুরে বসে।

দেখন-হাসি হেসে হেমন্ত বলে, 'একটু আগুন—'

'দুটো নয়া দাও।'

'অ্যা!' হাসি হেমন্তর উবে যায়।

'দুটো নয়া।' বুড়ি হাত বাড়ায়।

ওরে হারামজাদী! সাত নয়ায় একটা দেশলাই। একটা দেশলাই—অফিসিয়ালি পঞ্চাশ আসলে চল্লিশ-বিয়াল্লিশ কাঠি। ∴ দু-নয়ায় চোদ্দ। কী কারবার! বিনা মূলধনেই—

'দাও।'

'কাল দেবখন—'

'কাল আগুন নিওখন।'

'এখন ভাঙানি—'

'ভাঙো দিচ্ছি।'

কী চটপটে জবাব! দু-চোখ নাচিয়ে নাচিয়ে জবাব!

'লোট আছে? পাঁচ ট্যাকার না দশ ট্যাকার লোট?' বুড়ি মাড়ি দেখায়।

বুড়িকে ফুটবল বানানোর অথৈ সাধ মনে হেমন্তর ঘাই দিয়ে ওঠে।

কিন্তু হায়! কটা সাধ আর মানুষ মেটাতে পারে? হেমন্তর মত মামুলী মানুষ!

এবং তামাম দুনিয়াকে ফুটবল বানানোর দুর্দম সাধ হর্দম যার মনে চাগায় নগণ্য একটা পথের ভিখিরিকে ফুটবল বানিয়ে আশ কি তার মিটবে?

'তোমাকে রোজ দিই—।' অভিমানে তাই গলা হেমন্ত বুজিয়ে ফেলে।

'দাও?'

'দিই না?' ধমক হাঁকায়। সে না দিক কেশব দিত। প্রাণের বন্ধু কেশব দিত।

ধমক দিয়েই অবিশ্যি ভড়কে যায়। 'কবে দিয়েছিসরে মুখপোড়া?' বলে বুড়ি যদি এখন চ্যালাকাঠ নিয়ে তেড়ে আসে? দৌড় লাগালে দমাদ্দম খিস্তি ছুঁড়ে মারে?

কিন্তু ফ্যালফ্যালিয়ে বুড়ি চেয়ে থাকায় হেমন্ত বোঝে ধমকে তার কাজ হয়েছে।

ভদ্রলোকের ধমক যে! ভিখিরিকে ভদ্রলোকের ধমক!

'রোজ তোমাকে পয়সা দিই, আর আজ—' কথা মুলতুবি রেখে শ্বাস টানে, 'আর আজ—' ঘন ঘন টানে, 'আজ একটু আগুনের জন্যে—' ঢক ঢক হাওয়া গেলে, 'একটু আগুনের জন্যে তুমি—' আরেক ঢোঁক, 'তুমি—আচ্ছা—বেশ!' শেষ ঢোঁক হাওয়া গিলে নিয়ে হাঁটা শুরু করে দেয়।

'নে যাও বাবা, নে যাও নে যাও।'

এই গন্ধের ত্রিসীমায় আর না।

'অ বাপ!'

লম্বা লম্বা পা চালায়।

'অ বাপ!'

রাগ দেখিয়ে এখন কেটে পড়াই সুবিধে। আর কক্ষনো বুড়ি তাহলে ভিক্ষে চাওয়ার ভরসা পাবে না।

সবাই দিলেও সে দেয় না বলে মনটা কখনো খচখচ করবে না।

রাগ তো নয়, লক্ষ্মী!

মোড় ঘুরে হেমন্ত দেশলাই বের করে। সিগারেটের প্যাকেট থেকে বিড়ি।

গন্ধটা বড়ই উতলা করে তুলেছিল। এখনও নাকে ভাসছে। জলে সারা মুখ সপসপ করছে। কড়া বিড়ি ছাড়া রেহাই পাওয়ার উপায় নেই।

শত্তুর শত্তুর! এই শত্তুরের কথা ভাবাও পাপ।

এর চেয়ে রুটি ভালো। খেলে কেমন অম্বল হয়। এ-বেলা খেলে ও-বেলা উপোস। উপোস=নো খরচা।

তবু যে কেন মরতে সাতসকালে কলকাতা দাবড়েছিল!

বউয়ের সাথে ঝগড়া করে, পড়ানোর ছলে ছেলেমেয়েদের একচোট ঠ্যাঙানি দিয়ে, চায়ের দোকানে রাজাউজির মেরে বেলা বারোটা অব্দি খাসা কাটাতে পারত। দুপুরে ঘুমিয়ে বিকেলে ছেলেমেয়েদের যেচে আদর করে রাত্তিরে বউকে নিয়ে শুলে দেহ-মন দিব্যি ঝরঝরে হয়ে যেত। আদর্শ বাপ আদর্শ সোয়ামীর দেহ-মন।

কাল থেকে ফের নটা-বারো পাঁচটা-পঞ্চান্ন।

ছ-দিনের-মেহনতে-রোজগার একটা বরাবর নাহক বরবাদ!

তাও যে কেন সরোজের কাছে গেল! শুয়োরের বাচ্চা সরোজের কাছে!

সকাল আটটা থেকে বেলা বারোটা তক হারামজাদা হরেক কিসিমের লেকচার শোনাল—স্রেফ এক কাপ চা ঠেকিয়ে!

তার সাত-সাতটা চারমিনার ফুঁকে দিল—মুখ ফুটে একবার বলল না যে এত বেলায় যাবি দুটি ডালভাত খেয়ে যা।

বন্ধু! বাঞ্চোৎ!

হ্যাঁ, বন্ধু ছিল বটে কেশব। মাথা ছাতু হওয়ার সেকেণ্ড কয়েক আগেও ফুটবোর্ড থেকে 'হেম-হেম-হেমন্ত!' বলে কী ডাকটাই ডেকেছিল! লোকে যেমন শেষ সময়ে 'হরিটরি' বলে যায় কেশব তেমনি 'হেম-হেম-হেমন্ত' বলে গেছে।

নির্ঘাৎ স্বর্গে গেছে। সাতজন্মের পুণ্যের ফল না থাকলে ওভাবে কেউ ফৌত হয়? নো রোগে ভোগাভুগি=নো ডাক্তারবদ্যি ওষুধপথ্যি। ∴ নো ধারকর্জ।

সরোজের বদলে যদি অবিনাশের কাছে যেত! 'অনেকদিন আসতে পারি নি, কেমন আছেন মাসিমা?" বলে অবিনাশের হাবাগোবা মাটাকে চৌকোশ একখানা প্রণাম ঝারলে—

উঁহু, অবিনাশের ওখানে যাওয়া=বাসভাড়া দশ-দশ বিশ নয়া। তার ওপর আহাম্মকটা এখনও আত্মীয়কুটুমকে লাই দেয়, বাড়তি কার্ড নেই। রেশনের চাল যদি বাড়ন্ত হয়ে গিয়ে থাকে? ডাহা লোকসান।

অবিনাশের বদলে সুনীল—

ওরেঃ ফাদার! ছাঁটাই হব-হব হয়েছিল, হয়ে গিয়ে থাকলে নির্ঘাৎ ধার চেয়ে বসত।

বরং নিতুর কাছে গেলে—

বেস্ট হত শিবপুর। বাসভাড়া সতের-সতের চৌত্রিশ বটে, কিন্তু সুদে-আসলে উশুল হয়ে যেত।

দুপুরে ভরপেট ভাত। চাল নেই? ব্ল্যাকে কেনো। মাছ-মাংস ডালফাল চাটনি-দই। মাসের শেষ? হাওলাত কর। জামাই না!

দুপুরে বেমক্কা ঘুমিয়ে পড়তে পারলে বিকেলে পুরোদস্তুর টিফিন।

ভদ্রতা করে রাত্তিরেও কি খেয়ে যেতে বলত না? সম্বন্ধী না বলুক, শাশুড়ি?

রাত্তিরে খেলে থাকার জন্যে সাধাসাধি? দু-দুটো সোমত্থ শালী আছে না!

রাত্তিরে থেকে-যাওয়া=পরের দিন সকালেও দমভর। তারপর পান চিবুতে চিবুতে বেলা নটায়—

তিন-তিন বেলা পেটপুরে ভাত!

মাস-দেড়েক-এক-নাগাড়ে-রুটি-গিলে-গিলে-হল্লাক পেটে তিন-তিন বেলা ভাত!

তবে কিনা, সম্বন্ধী শালাও বড্ড সেয়ানা। বোনাইকে তিনবেলা খাওয়ানোর শোধ তুলতে বোনের খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে প্রাণটা যদি তার আঁকুপাঁকু করে ওঠে? সেই সঙ্গে ভরগুষ্টির প্রাণগুলিকেও যদি আঁকুপাঁকু করে তোলে? তারপর আঁকুপাঁকু প্রাণগুলিকে বগলদাবা করে বিরাটি এসে হাজির হয় যদি?

আড়াই টাকা কিলোর চাল আজ হারাম বলে না। ছুঁলেও বাপ বাপ বলে তখন—

এক লাথিতে ভেজানো সদর হাট করে ভেতরে ঢোকে।

'এই তো বাবা এসে গেছে!'

'আমার কিশলয় এনেছ বাবা ?'

'আমার খাতার কাগজ ?'

'আমার ইতিহাস ?'

'আমার—'

'কাল আনব।' দুপদাপ পা ফেলে হেমন্ত দাওয়ায় ওঠে।

'কাল! তুমি তো রোজই—'

বাপকে অবিশ্বাস! 'যা অ্যাকসিডেণ্টের হাত থেকে আজ—'

'তোমার কি বাপু রোজই—'

স্বামীকে অবিশ্বাস! কেন, অ্যাকসিডেণ্ট হয় না কলকাতায়? রোজ হচ্ছে না? অ্যাকসিডেণ্টের ফলাফল জানে না? চোখের সামনে কেশবের সংসারটার হাল দেখেও—

'তাহলে তুমি বাবা পয়সা দাও।'

'হ্যাঁ বাবা, আমরা জগুদার দোকান থেকেই—'

'আমার একটাকা দু-আনা—'

'আমার সাড়ে তিন টাকা।'

'আমার –'

ভিখিরি! ভিখিরি! শাড়ি ফ্রক প্যাণ্টুল পরা ভিখিরির পাল! ভাগ! ভাগ!

'দেবেখন। এখন সর দেখি তোরা। একটু জিরোতে দে।'

দেবেখন! হেমন্ত পয়সার গাছ। নাড়া দিলেই শিউলির মতো টুপটাপ পয়সা ঝড়বে।

'তাই দিও বাপু। তোমার যখন আনা হয়ে উঠছে না –'

দিতে হবে বইকি। নইলে লেখাপড়া শেখা যে বন্ধ থাকছে। লেখাপড়া শিখে ভদ্দরলোক হয়ে-ওঠা, ভদ্দরমহিলা হয়ে-ওঠা যে পিছিয়ে যাচ্ছে।

যেমন ছা তেমনি মা! শাড়ি-বেলাউজ-পরা ভদ্দরমহিলা! কিন্তু খোলস ছাড়িয়ে রাস্তায় ছেড়ে দাও—

গাছতলার ওই বেগুন-পোড়া মাই বুড়ি।

আহা, ওই বুড়িটা যদি—বুড়িটাই যদি—

মা হত!

আজকালকার মা নয়, আগেকার দিনের মা। নির্ভেজাল মা। অন্নপূর্ণা-মার্কা মা। এক্ষুনি তাহলে ছুটে গিয়ে—

'খেতে দাও।' হেমন্ত হাসলে ওঠে।

'হাতমুখ ধোবে তো!'

'ধেত্তেরি!' মাছের ঝোলভাত হলে হাত-মুখ ধুয়ে এসে আসনপিঁড়ি হয়ে বসার মানে হয়।

কাঁড়া-আঁকাড়া ভিক্ষের চালের ভাত হলেও হয়। স্রেফ ভাতে-ভাত হলেও। রাস্তার ধারে গাছতলায় বসে খেতে হলেও।

কিন্তু গিলবে তো ছাই পচা গমের রুটি আর হাবিজাবির ঘণ্ট। তার জন্যে হাত-মুখ ধোয়ার বায়নাক্কা!

'অ্যাদ্দূর এলে—দুদণ্ড জিরোও—হাতে মুখে জল দাও—'

'লেকচার থামিয়ে পিণ্ডি আন। খিদেয় পেটের নাড়িভুড়ি—'

'মাংসটা একটু গরম করে—'

'মাংস?' হেমন্ত বিষম খায়।

'আমি এনেছি বাবা। সামনের রাং থেকে—

'তোমার জন্যে একটা মেটুলি আছে বাবা।'

'মাংসটা যা মার্ভেলাস হয়েছে না বাবা!'

'কে রেঁধেছে দেখতে হবে।'

'ওরে মিথ্যুক!'

'মাংস?' ফ্যালফ্যাল করে এর-ওর মুখের দিকে তাকায়। 'মাংস মানে? হঠাৎ—'

'বলে গেলে না?'

বলে গেলে! ধপ করে হেমন্ত বসে পড়ে।

হ্যাঁ, গিয়েছিল বটে বলে।

নিজে বন্ধুর বাসায় ভাত মারবে আর বউছেলেমেয়ে গিলবে সেই খোড়-বড়ি-খাড়া—বড্ড মায়া হয়েছিল।

খেতে বসে বউ-ছেলেমেয়ের কথা মনে পড়ে গেলে খাওয়ার মেজাজ পাছে ছরকুটে যায়—তিন শো মাংস সাত শো আলুর দরাজ ফরমাস করে গিয়েছিল।

কিন্তু তখন কি জানত সরোজ শালা হারামজাদা শুয়োরের বাচ্চা—

এ কী ভয়ংকর তার মায়ার পরিণাম!

নিজের হাত কামড়াতে প্রাণ চায়। পেঁয়াজ-রসুন-তেল-নুন-লঙ্কা-হলুদ-ঘি-গরমমশলা দিয়ে রান্না মাংস ফেলে কচ কচ করে নিজের কাঁচা মাংস চিবোতে প্রাণ চায়।

অসীম রায়

ভাসা ভাসা ভাষা

ভাষা নিয়ে যাঁদের কারবার তাঁরা জানেন কল্পনায় তাঁদের শক্তি যতই অসমান্য হোক, যতই চারিত হোক অভিজ্ঞতা চৈতন্যের গভীরতায়, যতই—সচরাচর যেমন বলা হয়—বিষয়বস্তুর উপর দখল জন্মাক, অনুপ্রেরণার উৎক্ষেপণায় কিংবা অভ্যাসের অনুদ্দীপনায় ঘটুক প্রকাশ, কবি হোন, দার্শনিক হোন, বৈজ্ঞানিক কিংবা সমাজসেবক হোন, এ ভূমণ্ডল কুৎসিত কিংবা সুন্দর লাগুক, তাঁদের বক্তব্যে তাৎপর্য থাক কি না থাক, তাঁরা সকলেই জানেন কারুর কারুর আত্মপ্রবঞ্চনাজনিত ঘাড়নাড়া সত্ত্বেও, ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ অনিশ্চিত ও রহস্যে পূর্ণ।

অনিশ্চিতি এ ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী কারণ ভাষার রূপ ব্যাখ্যায় একই সঙ্গে কতগুলো অসম অর্থের প্রতিশব্দ যথা গুরুত্বপূর্ণ, অসম্ভব, দুর্লঙ্ঘ্য, চমৎকার, অনির্বচনীয় সবকটাই ব্যবহার করা যেতে পারে যেগুলো প্রত্যেকটাই সত্য। বস্তুত মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একই সঙ্গে এমন ভঙ্গুর ও মজবুত অর্থাৎ অনিশ্চিত সম্ভাবনাপূর্ণ সৃষ্টি আর দ্বিতীয়টি ঘটে নি। এই হ্যামলেটের প্রেতাত্মা যা আমাদের মনের মধ্যে সবদা উপস্থিত অথচ যাকে ধরতে গেলেই মহামুস্কিল তা তো শুধু লিখিত জগতেই নির্ধারিত সীমা নয়, তা আমাদের অস্তিত্বের সবত্র। শৈশবের অভ্যাসেই বা সঞ্চারিতবেগেই ভাষা বলতে অভ্যস্ত বলে অনেকসময় ভাষার অঙ্গাঙ্গী অসম্পূর্ণতা আমাদের এড়িয়ে যায়। যাঁরা লেখেন তাঁদের কথা বাদ দিলেও প্রত্যহের ভাষায় আমরা অনেক সময় হোঁচট খাই। আর হোঁচট খাই প্রধানত দুই কারণে: আমার বক্তব্যের ঠিক প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে না কারণ সেই সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভর ভাষা যা আমার প্রকাশের বাহন এবং যা অন্যেও বুঝবে তা আয়ত্তে নেই আর দ্বিতীয়ত চারপাশের আপ্তবাক্য, সত্যের ঔজ্জ্বল্যে বিকীর্ণ মিথ্যাভাষণ, অর্ধসত্য, যা আমি বলতে চাই না কিন্তু মানসিক দুর্বলতায় বলে ফেলি, অর্থাৎ ব্যক্তিগত মানসিক অসম্পূর্ণতা আমাদের প্রধান বাধা। ভাগ করে বললে প্রথমটি শব্দতত্ত্বের এবং দ্বিতীয়টি মনস্তত্ত্বের কারণ। আর এই দুই কারণই উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত জগতে উপস্থিত।

হ্বিটগেনস্টাইন রচিত ট্র্যাক্‌টাটাস বইতে শব্দব্যবহারের প্রথম সমস্যার বোধহয় প্রথম উল্লেখযোগ্য আলোচনা। উনিশশো আঠারো সালে রচিত এ লেখা রাসেলের ছাত্র এবং একদা ভিয়েনার বাগানের মালি জ্ঞানপাগল হ্বিটগেনস্টাইন এক মন্ত্রের নিশ্চয়তায় শেষ করেন: যা আমাদের প্রকাশের বাইরে তা আমরা নিঃশব্দে বর্জন করব। কারণ তাঁর মূল বক্তব্য, যা প্রকাশ করা যায় তাই প্রকাশিতব্য। সেদিক থেকে ভাষা প্রকাশের এক নিশ্চিত সীমারেখা তিনি টেনে দিয়েছেন আর এই সীমারেখার বাইরে যা পড়ে তা বিচার্য নয়। স্পষ্ট চিন্তা মানেই তাঁর মতে স্পষ্ট প্রকাশ। যা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট তা ত্যজ্য। স্পষ্ট চিন্তা ও স্পষ্ট প্রকাশের সম্পর্ক অঙ্গাঙ্গী, ওতোঃপ্রোত।

এই তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে তিনি মানুষের চিন্তাধারা বিশেষ করে দর্শনচিন্তার প্রতি দৃষ্টি দেন এবং বলেন যে ভাষার মূলসূত্র অনেকাংশে অস্বীকৃত। তার ফলে দার্শনিক বক্তব্য বলে যা দাঁড় করানো হয় তা মোটেই দার্শনিক নয়। বেশির ভাগ দার্শনিকের বক্তব্য ও প্রশ্ন আসলে প্রকাশের মূলসূত্র অস্বীকারে। অর্থাৎ ভাষাপ্রকাশের নিশ্চিত সীমারেখার বাইরে তাদের বক্তব্য। কাজেই হ্বিটগেনস্টাইনের মতে মূঢ়তা। এ-প্রসঙ্গ থেকেই তাঁর বক্তব্য। দর্শনের মোটেই কাজ নয় দার্শনিক বক্তব্য উপস্থাপন করা, বক্তব্য প্রাঞ্জল বা ব্যাখ্যা করাই দর্শনের কাজ।

হ্বিটগেনস্টাইনের বক্তব্য চিন্তাজগতে আলোড়ন আনে। রাসেল তো ট্র্যাকটাটাসের ভূমিকায় পরিষ্কার সন্দেহ প্রকাশ করেন এ-ধরনের সম্পূর্ণ যুক্তিগ্রাহ্য নির্ভুল ভাষা তৈরি করা যায় কিনা যদিও ভাষাকে নির্দিষ্ট সীমারেখায় চিহ্নিত করার জন্যে আঙ্কিক সমীকরণেই মনীষার মুক্তি রাসেলের এই সূত্র অবলম্বনেই ট্র্যাকটাটাস রচিত। কেউ কেউ ভেবেছেন যাঁরা কেবল জীবনের তাৎপর্য কি তাই বলতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন তাঁদের প্রসঙ্গেই হ্বিটগেনস্টাইনের বক্তব্য প্রযোজ্য। অর্থাৎ রাখাও যায় না ফেলাও যায় না এভাবে অনেকের কাছে তাঁর বক্তব্য এসে পৌঁছায়।

ফেলা যায় না কারণ উভয়ত ধ্বনি ও অর্থগত কারণে এক নির্ভুল যুক্তিগ্রাহ্য যোগাযোগ সর্বদা ভাষার আদর্শ। লেখকদের সবসময় অতৃপ্তি তাঁদের ভাবমণ্ডলের সার্থক অবয়ব আবিষ্কারে। বারে বারে লিখে বারে বারে ছিঁড়ে ফেলা, বলতে গিয়ে থমকে দাঁড়ানো কিংবা সম্পূর্ণ মৌন আশ্রয় নেওয়া প্রত্যেক দক্ষ ভাষা-কারিগরের অত্যাবশ্যক মেথডলজি। হ্বিটগেনস্টাইনের লক্ষ্য কোনোদিনও সিদ্ধ

হবে না কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টায় ভাষা বা মানুষের পরস্পরের যোগাযোগের সবচেয়ে শক্তিশালী মাধ্যমের প্রকাণ্ড অসম্পূর্ণতায় সচেতন হয়ে আমরা অনেক আপ্ত বাক্য থেকে বাঁচতে পারি, অনেকখানি স্বচ্ছ চিন্তার দিকে ঝুঁকতে পারি।

ভাষার সমস্যায় বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্নরূপে আলোড়িত। ভাষা যদি কেবল শব্দ ব্যবহারের সমস্যা হোত তাহলে কতকগুলি নির্দিষ্ট সূত্রে তাকে বেঁধে ফেলে সেই সূত্রগুলো আয়ত্ত করলেই প্রকাশের সমস্যা চুকত। কিন্তু ভাষা তো এরকম কষ্টিপাথরের বিগ্রহ নয় যে তার একটাই নির্দিষ্ট আদল। তা যে ক্রমশ বদলাচ্ছে আর বদলাবে। তার বিশেষ বিশেষ অর্থ, তার ব্যবহারে ক্রমাগত পরিবর্তন। তা যেন মেঘের সমাবেশ বা বৃষ্টিবিদ্যুৎ; তা সৌরজগতের নির্দিষ্ট ছন্দে ঘোরে না, ঝড় জল মেঘের গতিতে বা মেটিওরেলজিকাল অনিশ্চয়তায় তার বাস। 'আজ সকালে খেয়েছি' এবং 'কাল সকালে খেয়েছি' এই দুই বাক্যে একই ক্রিয়া কিন্তু আজ এবং কালকের খাওয়ার মধ্যে থাকতে পারে প্রকাণ্ড প্রভেদ যেমন প্রভেদ আজ ও কালকের মেঘে।

ভাষার অসম্পূর্ণতায় সচেতন হয়ে ঠিক বিপরীত প্রশ্নে আসেন পদার্থবিজ্ঞানী ব্রিজম্যান। চিন্তা ও ভাষা প্রসঙ্গে এই আমেরিকান অধ্যাপকের মনে হয় চিন্তা প্রকাশের মাধ্যম অপেক্ষা অসংখ্যগুণসমৃদ্ধ কারণ চিন্তায় থাকা সম্ভব ভাষার কনোটেশানের ক্রমাগত পরিবর্তনশীল পটভূমিকা সম্পর্কে সচেতনতা। এই পরিবর্তনশীল পটভূমিকা ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। ভাষার চেয়ে চিন্তা মানুষের অভিজ্ঞতার আরও নিকট আত্মীয়। পরিষ্কার করে বলতে গেলে, প্রত্যেক কথার কনোটেশান দ্বিতীয়বার ব্যবহারে এক নয়। আমাদের জীবনের গতিময়তার সঙ্গে তা এমন সংযুক্ত যে বারে বারেই তা একটু একটু করে পাল্টে যায়। ভাষার ভবিতব্য তাই আংশিক সাফল্যে, কেবল অ্যাপ্রক্সিমেশানে। কারণ অভিজ্ঞতা আর প্রকাশের মাঝখানে একটা পুরোপুরি মজবুত সেতু নির্মাণ অসম্ভব। বলা যেতে পারে, অভিজ্ঞতার কিছু দিক এবং প্রকাশের কিছু দিকের সাজুয্য ঘটানোই ভাষার কাজ। চারপাশের গতিময় জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কতকগুলি বস্তু তুলে তাকে জমাট করে ভাষার সৃষ্টি অথচ অভিজ্ঞতার বনেদই গতিময়তায়। তাই ব্রিজম্যানের বক্তব্য, জমাট নিরেট বস্তুতে পরিবর্তনশীল প্রকাণ্ড অভিজ্ঞতার জগৎ ধরা পড়ে না।

ব্রিজম্যানের বক্তব্য যদিও প্রকাশের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে পাঠক ও শ্রোতার

মনে সচেতনতা আনে তবু তা ভাষা ও ভাবের মাঝখানে যে নিয়ত পরিবর্তনশীল গতিময় সম্পর্ক সে বিষয় নীরব। বস্তুত হ্বিটগেনস্টাইন বা রাসেলের মতানুযায়ী শেষপর্যন্ত ভাষা কতগুলো নিরেট প্রতীক বা গণিতের চিহ্ন। কারণ গণিতই কেবল ভাষাকে নির্দিষ্ট স্থিরসত্তা অস্তিত্ব দানে সক্ষম। এভাবে ভাবলে মানুষের বক্তব্যের প্রকাশ কেবল আঙ্কিক সমীকরণের মারফত। এক্ষেত্রে অস্পষ্টতা নেই, গতিময়তার অসম্পূর্ণতা নেই, নেই দ্বর্থ্যক বোধ বা ব্যঞ্জনা। বক্তব্য নির্দ্বন্দ্বে এক নিরেট কাঠামে ফেলাই লক্ষ্য। অস্পষ্টকে স্পষ্ট করার যে স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক মেজাজ সেই মেজাজে পরিচালিত হয়ে ভাষাকে একটা গণ্ডী টেনে মুক্তিদানের প্রয়াস। এই শৃঙ্খলাবদ্ধ স্বাধীনতা ব্রিজম্যান মানেন না। পরবর্তী কালে শব্দতত্ত্ব চর্চায় যে সব প্রশ্ন উঠেছে সে সম্পর্কে তিনি সচেতন। কিন্তু তিনিও ভাব ও ভাষাকে আলাদা আলাদা বিচ্ছিন্ন সত্তারূপে দেখতে অভ্যস্ত। তাই তাঁর কাছে ভাব ও ভাষা দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি, অথবা বলা যেতে পারে, ভাষা ঠিক ভাবের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, ভাবের মাইনর পার্টনার। ভাষা সৃষ্টি যেহেতু মানুষের সভ্যতার সবচেয়ে বড় নির্ণায়ক তাই এভাবে চিন্তা করলে আমরা তার শক্তি ও সম্ভাবনা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দিহান হতে পারি। সত্যিই যদি গতিময় জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে কতগুলো বস্তু আলাদা করে তুলে তাকে জমাট করে ভাষা সৃষ্টি হয় তাহলে ভাষা নিশ্চয়ই মাইনর পার্টনার এবং শেষপর্যন্ত হ্বিটগেনস্টাইনের বারে বারেই জোর পড়ে ভাব ও ভাষার মাঝখানে নিবিড় গতিময় দ্বন্দ্বে। এ দ্বন্দ্বে কোনটা বড় কোনটা ছোট ভাববার প্রয়াস নেই। যেমন নেই ভাষাকে কোনো সীমারেখায় নির্ণীত করার প্রয়াস তেমনি অনুপস্থিত ভাষা কেবল ভাবের অনুষঙ্গ বা ভাব শুধু মৌন কথা এরকম চিন্তার মারফত অনড় সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস।

ট্র্যাকটাটাসের প্রায় দশবছর পর প্রকাশিত, তৎক্ষণাৎ বাজেয়াপ্ত, এবং সাম্প্রতিক কালে পুনঃপ্রকাশিত বিখ্যাত রুশ শব্দতাত্ত্বিক ভিগটস্কির 'ভাব ও ভাষা' এই নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। শিশুর আপনমনে কথা বলা বা স্বগতোক্তির পিছনে যে মেজাজ কাজ করে ফরাসী মনীষি পিয়াজে তার নাম দিয়েছেন আত্মকেন্দ্রিক চিন্তা। এ চিন্তা নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টের মাঝখানে এক ভোর, চেতন ও অবচেতনের মধ্যে তার অধিষ্ঠান। বস্তুত পিয়াজের চেষ্টায়, বিভিন্ন শিশুমনের তথ্যসংগ্রহনির্ভর ব্যাখ্যায় শুধু প্রকাশের সমস্যাই সহজ হয় নি সঙ্গে সঙ্গে ফ্রয়েডীয় অনেক শব্দের খাঁচাও (শিশু কেন আঙুল চোষে তার যে অনড় ব্যাখ্যা ইত্যাদি) ভেঙ্গে দেয়। পিয়াজের ব্যাখ্যা অবলম্বন করে ভিগটস্কি

সাবালক মানুষের অন্তর্নিহিত ভাষার সন্ধান দেন। তাঁর কৃতিত্ব কোনো অনড় ব্যাখ্যায় নয়, ভাষা ও ভাবের মাঝখানে কোনো সমীকরণ আবিষ্কার নয়, বরং ভাষা ও ভাবের মাঝখানে যে নিয়ত পরিবর্তনশীল সমৃদ্ধ সম্পর্ক তার রূপদানে। যেরূপেই বলা হোক না, ভাষা ও ভাবের সম্পর্ক এক স্থির অনড় সম্পর্ক ভাবা হোত, যে সম্পর্ক অক্ষয়, যা চিরকাল টিঁকে থাকবে। ক্রমাগত অনুসন্ধানের ফলে দেখা যায় যে এ-সম্পর্ক অতি সূক্ষ্ম ও পরিবর্তনশীল। যার ফলে ভাষা ও ভাবের যে কাঠামো দাঁড়ায় তার অসীম জটিলতা ও গতিময়তা।

কারণ পিয়াজের শিশুমনের প্রকাশ বা দীর্ঘ স্বগতোক্তির সূত্র অবলম্বন করে সাবালক মানুষের মনে যে অন্তর্নিহিত ভাষার সঞ্চার হয় সেই ভাষা থেকে সুবোধ্য বাক্যবিন্যাসে রূপান্তর জর্মান থেকে ফরাসী বা বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ নয়। কাজেই শুধু নির্দিষ্ট প্রতীক বা আঙ্কিক চিহ্নে মানুষের এই প্রকাশের অভিধান নির্দিষ্ট করা অসম্ভব।

তারপর এই বিচিত্র পথপরিক্রমার পর যে বাক্যবিন্যাসের জন্ম তার তাৎপর্য শুধু তো কথার অর্থেই ধরা পড়ে না। সে কথা কেন ব্যবহার করা হচ্ছে, তার জন্মের কারণ যদি শ্রোতা বা পাঠকের কাছে ধরা না পড়ে তাহলে তা নিরালম্ব বাক্যের ধ্বনি মাত্র। স্তানিস্লাভস্কি নাটক পরিচালনায় কেমনভাবে কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বা সাবটেক্সট অভিনেতা অভিনেত্রীর কাছে তুলে ধরতেন সেই পাদটীকা তুলে তুলে ভিগটস্কি দেখান কেমনভাবে সে নাটকের অভিনেতা ও অভিনেত্রী যা মুখে বলছেন তাঁদের হাবভাবে সে বক্তব্যের প্রায় বিপরীত আচরণ তাঁদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়। কারণ তাঁরা মুখে যা বলছেন তাই তাঁদের মনের কথা বা অন্তর্নিহিত ভাষা নয়।

ভাব ও ভাষার এই বিরামহীন সমৃদ্ধ সম্পর্ক আবিষ্কারে সচেষ্ট নয় বলে ব্রিজম্যান ভাব ও ভাষা আলাদা আলাদা ভাবে বিচার করে ভাবকে অসংখ্যগুণ-সমৃদ্ধ ভাবেন এবং মনে করেন ভাবের পরিবর্তনশীল কনোটেশান ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব। 'প্রকাশমাত্রেই ভাব মিথ্যা' এই রকম আপ্তবাক্যে ভিগটস্কি মনে করেন শেষপর্যন্ত দাঁড়াতে হয় যদি ভাব ও ভাষা আলাদাভাবে কেউ বিচার করেন। তাঁর মতে ভাষার মারফত ভাবের জন্ম। ভাবশূন্য কথা নিষ্প্রাণ। আবার ভাষার কাঠামোর বাইরের ভাবনা মরীচিকা।

আজ বাংলাভাষার দিকে চেয়ে হ্বিটগেনস্টাইনের অন্তর্নিহিত নৈরাশ্যে আবার

ভিগটস্কির আশাবাদে আমরা যুগপৎ ভুলি। কারণ একদিকে জনপ্রিয় সাহিত্য ও সাংবাদিকতার বন্যায় মনে হতে পারে বুঝি ভাষার পুনর্জন্ম ঘটল। ভাব-প্রকাশের জটিলপদ্ধতি সম্পর্কে অনায়াস সচেতন দৃষ্টির প্রয়োজন নেই সেক্ষেত্রে। যা আসছে মাথায় তাই লিপিবদ্ধ করায় যেন ভাষার গণতান্ত্রিক জাগরণ ঘটছে। চারপাশে এই অস্পষ্ট ভাসা ভাসা ভাষা ট্র্যাকটাটাসের নির্দিষ্ট সীমায় নির্ণীত ভাষা সৃষ্টির অনুশাসনেরই সমর্থন। কোনোদিনই সেই সম্পূর্ণ যুক্তিনির্ভর ভাষা সৃষ্টি হবে না জেনেও অসম্পূর্ণ ভাষার মত্ততায় পীড়িত মন ভাবের ব্যর্থ প্রকাশে শেষপর্যন্ত গাণিতিক চিহ্নেই আশ্রয় খোঁজে যদি সীমিত হলেও শক্ত জমিতে ওঠা যায় এই আশায়।

আর একদল ভাষার কারিগর ভাবেন বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ কেবল পরিভাষা বিস্তারের সম্ভাবনায়। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা সরকারের তরফ থেকে মাঝে মাঝে ভাষা ভাবনার যে পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষণীয়। তাঁরাও আসলে ভাষা অবলম্বন করে এক অনড় প্রতিমা গড়ার অভিলাষী। ভাষা ও ভাবের যে চিরন্তন দ্বন্দ্বের সজীবতায় প্রকাশের গভীর আশ্রয় যা আমাদের গতিময় চলমান জগতের সঙ্গে সংপৃক্ত তা তাঁদের চিন্তার বাইরে।

ভাষা শুধু ভাসা ভাসা অস্পষ্টতার অর্থেই নয়। ভাষা ভাসা মানে এই ভাসন্ত জীবন্ত জীবনের গতিরই রূপক। আর সেই গতির কথা চিন্তা করলে বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ শুধু বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির উপর দাঁড়িয়ে নেই। তা আমাদের পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসীর সামাজিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক বিকাশে বা বলা যায় বিভিন্ন স্তরের মানুষের চৈতন্যের বিস্তারে। ইংরেজি ভাষার সমৃদ্ধির জন্যে উইলিয়াম শেক্সপীয়রই দায়ী নন। এ-সমৃদ্ধি বিভিন্ন স্তরের অসংখ্য মানুষের ভাবপ্রকাশের সামর্থ্যে। একা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা কিছু সাহিত্যিকের চেষ্টায় বাংলাভাষার পুনর্জন্ম বা অপমৃত্যু ঘটবে না। বাংলাভাষার পুনর্জন্ম প্রকারান্তরে সমস্ত বাংলাদেশেরই পুনর্জন্ম।

দেবেশ রায়

যযাতি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

রেণু

সেই সাতসকালে কাক না-ডাকতে ঘুম থেকে উঠি। তখনো রোদ ওঠে না। সকালে উঠলেই গোবর-ছড়া দেয়ার কথা মনে হয়। আমার জ্যাঠাইমা দিতেন। খুব ছুচিবাই ছিল। নিজের চোখের সামনে দু-দুটো তরতাজা ছেলে মারা গেল, ব্যাটার বৌরা বিধবা হলো, তারপর থেকে জ্যেঠিমা নিজে বিধবার মতো থাকতেন—চুল ছোট করে ছেঁটে ফেলেছিলেন, পরণে থান। এমনকি সিঁথিতে সিঁদুর পর্যন্ত দিতেন না। শুধু হাতে একটা নোয়া ছিল। উনি যে সধবা, সেটাই তার একমাত্র চিহ্ন। জ্যেঠিমা যে এমন বিধবা সেজে থাকতেন তাতে জ্যাঠামশাই কিন্তু কোনোদিন আপত্তি করেন নি। আমি যদি এমনভাবে সাজতাম, উনি আমাকে বাড়ি থেকে বের করে তো দিতেনই, আবার বিয়ে করতেও পারতেন। উনি আছেন বলেই আমি আছি, আমার ছেলেমেয়ে আছে, আর সব কিছু আছে। আমি যদি বিধবার পোশাক পরি, তাহলে তো ওঁকেই অস্বীকার করা হয়। অথচ আমার একেবারে আকাট মুর্খ জ্যাঠামশাই তাঁর স্ত্রীর বিধবার পোশাক দেখে নিশ্চয়ই ভাবতেন ছেলেদুটো যে নেই সেই কথা, তিনি যে বেঁচে আছেন সেই লজ্জার কথা। আমার ছেলেটা কোথায় জানি না, খেতে পায় কিনা জানি না, পথে-পথে শোয় নাকি একটা ঘর জোটে জানি না,—আর আমরা দিব্বি খাচ্ছি, দাচ্ছি, ঘুমোচ্ছি। ছেলেটা যে বেঁচে আছে, যদি থাকে, সেটাই আমাদের লজ্জার কথা। এমন ছেলে পেটে ধরেছিলাম—এটাই আমার লজ্জার কথা। কিসে যে মানুষের লজ্জা আর কিসে যে না—। জ্যেঠিমা সেই অন্ধকার থাকতে উঠে গোবর-ছড়া দিতেন সারাটা বাড়িতে আর বিড়বিড় করে কি বলতেন। পরে, আমাদের যখন বারো-তেরো বছর বয়স জ্যেঠিমা আমাদের গোবর-ছড়া দেয়া শেখাতেন। এখন আর দিতে গেলে পারবো না। আজলায়

জল নিয়ে এমনভাবে ছড়িয়ে দিতে হয় অনেকদূর পর্যন্ত যাতে যায়, আর তার সঙ্গে-সঙ্গে ছড়া বলতে হতো—"আলি ভূত কালো ভূত, আব্ধি-ব্যাধি জ্বরজারি, সব চ-লে যা, চ-লে যা"—এমনি সব কত কি। যখন উনি এখানে চাকরি নিয়ে এসে বাসা ভাড়া করলেন, তখন, বিয়ের পর সেই প্রথম, গোবর-ছড়া দিতাম। গোবরলেপা উঠোন দেখলেই পুজো-পুজো মনে হয়, আমার নিজের বাড়িটা দেখলে সবসময় পুজো-পুজো মনে হতো। দু-চার বছর পর একদিন উনি খুব রাগারাগি করলেন, খোকা তখন বড়, খুকু হয় নি। আর আমার উপর রাগারাগি করলেই তো উনি বাপের বাড়ির খোঁটা দেবেন—চাষার বাড়ির মেয়ে, গোবর দেয়া ছাড়া আর কি শিখবে, গোবর দেয়া আর ঢেঁকি কোটা এই তো জানো—এই সব আরো অনেক কিছু বলেছিলেন—সব সময়ই যা বলেন। তারপর থেকে আর গোবর-ছড়া কোনোদিন দেই নি। ঐ বাসাবাড়িতে থাকতে তাও রান্নাবান্নার পর উনুন লেপার জন্য একটু গোবর লাগাতাম। এ-বাড়িতে উঠে আসার পর তো আর সে বালাই-ও নেই। এক ধোঁয়া-ছাড়া উনুন বানাতেই উনি সাত-আটশ টাকা খরচ করেছেন, তারপর তো কুকিং রেঞ্জ ই এসেছে। কিন্তু এসেছেই পর্যন্ত, এখানকার যা ইলেকট্রিক কোম্পানি, একশ পাওয়ারের বালব জ্বলে একটা মোমবাতির মতো, কুকিং রেঞ্জে রাঁধতে হলে সবাইকে চাল চিবিয়ে অফিস-কাছারি যেতে হতো। গোবর-ছড়াও দেই না, বাড়িটাকেও আর পুজো-পুজো মনে হয় না, হঠাৎ-হঠাৎ গোবরলেপা উঠোন দেখলে পুজোর কথা মনে পড়ে যায়। উনি ঠিকই বলেন আমরা চাষা-বাড়ির মেয়ে—নইলে সংসার বলতেই আমার নাকে এসে গোবরের গন্ধ, নতুন ধানের গন্ধ, ঢেঁকিতে ধানকোটার গন্ধ, খেজুরগুড়ের গন্ধ—লাগে কেন। পৃথিবীতে কি আর কোনো গন্ধ নেই?

আর অস্বীকার করে-ই বা লাভ কি? এতদিন তো চেষ্টা করলাম। পুতুলের মতো উনি যা করতে বলেছেন করেছি। বাপের বাড়ি যে আছে তা ভুলে গেছি। ওঁর চোখের দৃষ্টি দেখে বুঝেছি কখন কী চাইতেন—নিজেকে সেইমতো তৈরি করেছি। কিন্তু তাতে লাভ হলো কি? তিরিশ বছর ঘর করার পর পঞ্চাশের কোঠায় পা দিয়ে মনে হচ্ছে এতদিন যা করেছি সব বাজে, কোনো মানে হয় না, তাতে কারো-ই কোনো লাভ হয় নি। আমি যে আমি সেটা এত বেশি করে মুছে ফেলেও আমার বড় ছেলে, আমার খোকা-কে বাঁচাতে পারলাম না। বিশবছর বয়সে যাকে পেটে ধরেছি সেই ছেলের জন্য

এই পঞ্চাশবছর বয়সে আমার এত লজ্জা কেন, যেন খোকা আমার অবৈধ পুত্র। সিধু-খুকুর বাবা এতদিন পর যেন গলা ফাটিয়ে জগৎ-সংসারকে জানালো—যে, খোকার বাবা সে নয়। খোকা আমার গর্ভের লজ্জা। খোকা কি জানতো, তার মাকে লজ্জা দিতেই সে জন্মেছিল। খোকার বছর দেড়েক বয়স থেকেই আমার একটা প্রিয় খেলা ছিল, খোকাকে দেখলেই চোখে আঁচল চাপা দেয়া। খোকা আমার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে চোখ থেকে আঁচল সরাতে চাইত আর মা-মা বলে চেঁচাত, আমি যত খোকার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতাম, খোকা তত বেশি করে ঝাঁপিয়ে পড়ত, আর চোখ থেকে আঁচল সরাতে চাইত, শেষে না-পেরে ভ্যাঁ করে কেঁদে দিত, তখন আমি চোখ থেকে আঁচল সরিয়ে খোকার মুখের উপর ফ্যাক করে হেসে দিতাম,—খোকা সেই কান্নার মধ্যে-ই হে-হে করে হেসে ফেলত। খোকা বোধহয় তখুনি জানত পরে ওর জন্য আমাকে কত কান্না না-কাঁদতে হবে। আর অস্বীকার করেই বা লাভ কি যে চাষার বাড়ির মেয়ের মতো গলা ফাটিয়ে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। অস্বীকার করেই বা লাভ কি যে সেই গোবরের, নতুন ধানের, ঢেঁকিতে ধান কোটার আর খেজুর গুড়ের গন্ধে-ই আমার সংসার। এই ব্র্যাসোর গন্ধে নয়।

অথচ সেই গন্ধগুলি ভুলে যেতে তো আমি কম চেষ্টা করি নি। এই গন্ধগুলি কতদিন ধরে নাড়াচাড়া করছি, তবু এরা আমার মনের সঙ্গে মিশে যেতে পারে নি। এই গন্ধ যদি মরার পর-ও আমার নাকে এসে লাগে, আমার মনে হবে কারা যেন আমাকে আর খোকাকে পিষে-পিষে মারছে। সাতসকালে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে চায়ের জল তুলে দেই। জল যতক্ষণ গরম হতে থাকে, ততক্ষণ আমি ব্র্যাসোর কৌটো নিয়ে এ-বাড়ির দোতলা একতলার যত দরজা-জানালা-আলমারির হাতলে মাখিয়ে রেখে আসি। পরে যখন সবাই স্কুলে-কলেজে-অফিসে চলে যায়, আমি আবার সবগুলো ঘষে-ঘষে মুছি। সকালবেলার এই ব্র্যাসো লাগানো আর চায়ের জল গরম হওয়ার ব্যাপারটা কোনোদিন ঠিক-ঠিক সময়তো ঘটলো না। প্রায়ই দেখি জল অতিরিক্ত ফুটে গেছে, চায়ে স্বাদ হয় না। দু-একদিন ব্র্যাসো লাগিয়ে এসে চায়ের জল তুলেছি। তখন আবার গালে হাত দিয়ে বসে থাকতে হয় কখন জল গরম হবে—এই আশায়। বিরক্তিকর। মাঝে-মধ্যে খুকু দেখতাম চা করছে। বেশ লাগত। কিন্তু তা তো রোজ হত না।

কত কাজ! কাজ যেন আর ফুরোতে চায় না। সাতসকালে সবার

মুখে-মুখে চা যোগাতে হবে, চা খেতে-খেতে খুকু ওঠে, চা খেয়ে সিধু। উনি সকালে পরপর দু-গ্লাস চা খান। জব্বলপুরে বেড়াতে গিয়ে একটা শ্বেতপাথরের গ্লাস কিনেছিলেন, সেটাতে। দ্বিতীয় গ্লাস চা দিয়ে আমাকে তেতলায় উঠে যেতে হয়। লাইব্রেরি আর অফিস-ঘরটার সমস্ত দরজা-জানলা খুলে দেই, টেবিল চেয়ারগুলো মুছি, কাগজপত্রগুলো একটু গোছাই, তারপর নেমে আসি। ইতিমধ্যেই ওঁর দ্বিতীয় গ্লাস শেষ, উনি বাথরুমে, বিছানা থেকে উঠেই সারাটা দিনের মতো তৈরি হয়ে তিনি উপরে ওঠেন। বেলা গোটাদশেক পর্যন্ত লাইব্রেরিতে, তারপর হয় বাইরে বের হন, নয় অফিসঘরে বসে কাজ করেন। দুপুরে দুটো নাগাদ খেতে নাবেন। খাওয়া-দাওয়া হবার আগেই লাইব্রেরি ঘরে আমি ডেক-চেয়ারটা মুছে, হাতলের উপর পান, সিগারেট, দেশলাই আর ছাইদানি রেখে আসি। বেলা সাড়ে চারটা পর্যন্ত আমি স্বাধীন। সব ধোয়া-মোছা করতে-করতে বেলা তিনটে বাজে। মদনের মা আসে দুটো নাগাদ। এসেই সব ঘর ধোয়া-মোছা করে, তারপর বাসনকোসন নিয়ে বসে। আমার থালাটা টেবিলের উপর ঢেকে রেখে বাকি সব কলতলায় নামিয়ে দেই। মদনের মা সব বাসনকোসন ধুয়ে শেষ করতে-করতে আমার খাওয়া-দাওয়া হয়ে যায়। খাওয়ার পর একটু এলাচ মুখে দিয়ে পশ্চিমের দরজার কাছে পা ছড়িয়ে বসি। চব্বিশটি ঘণ্টার মধ্যে মাত্র ঐ এক কি দেড়ঘণ্টা সময় আমার। ভাগ্যিস উনি এই সময় নামেন না। নইলে দরজার কাছে মেঝের উপরে হাতের উপর মাথা দিয়ে যদি আমাকে ঘুমোতে দেখতেন, তবে আমার চোদ্দপুরুষের শ্রাদ্ধ করতেন। আর কথাটাও সত্যি। ঐভাবে শুয়ে পড়লেই জ্যেঠিমার গোবর-ছড়া-দেয়া পুজো-পুজো উঠোন মনে পড়ে। চৌকাঠের পাশে শুতে আমার ভালো লাগে বলে আমি শুই না। বিছানায় শুলে যদি বেশি ঘুমিয়ে পড়ি, ঠিকসময়ে যদি জাগতে না পারি! প্রতিদিনই ভাবি দরজার কাছে বসে বসে এলাচের খোসা ছাড়াই বা বইয়ের পাতা ওল্টাই। আর প্রতিদিনই দেখতে-দেখতে ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসে। আর প্রতিদিনই তখন লম্বা হই। ঠিকসময়ে ঘুম ভাঙে। আমি গিয়ে রান্নাঘরের দরজা খুলে চায়ের জল চাপাবার উদ্যোগ করতে-করতেই সিধুর পায়ের শব্দ পাওয়া যায়, তার কিছু পরেই খুকুর, তার কিছু পরে ওঁর উপর থেকে নামার শব্দ। ওঁর পাঞ্জাবি-ধুতি-স্টিক-জুতো সাজিয়ে রাখা আছে। হাত মুখ ধুয়ে উনি বেড়াতে বেরোন। রাত্রির ব্যাপারটা খুব বিস্তারিত নয়। সন্ধ্যাবেলায় ওটা খুকুর দখলে থাকে।

নানা বন্ধুবান্ধব আসে, তাদের চা-খাবার ইত্যাদি। তারপর ভাতটুকু তুলে দিলেই হয়। তরিতরকারি তো ওবেলারই থাকে। ঠিক দশটার সময় উনি খেয়ে নেন। আটটার সময় এসে উনি শোবার ঘরে বসেন, তারপর খুব জরুরি কিছু না-থাকলে ফোনেও কথা বলেন না।

তিরিশ বছর ধরে সংসার করছি। এর মধ্যে কতবার যে এই রুটিন বদলালেন। যখন আমরা বাসাবাড়িতে ছিলাম, লোকের মধ্যে আমি এবং উনি আর এইটুকু খোকা—তখনো বাড়ির কাজকর্মের জন্য একজন লোক ছিল, সে চাকরের কাজও করত, টুকটাক রান্নাও করত, চা-টা তো করতই। তারপর যখন এত বড় বাড়িতে উঠে এলাম, তখন লোকও বেশি, অথচ লোক রাখা হলো না। আমি ওঁকে জিজ্ঞাসা করি নি লোক রাখবে কিনা বা কেন রাখবে না ইত্যাদি। জিজ্ঞাসা করাটা ঠিকও হত না। উনি নিশ্চয়ই ভেবে চিন্তেই যা-করার করেছেন। একদিন নিজেই বলেছিলেন—"এ-বাড়িতে কোনো ঠাকুর-চাকর রাখব না বুঝেছ, বাসনটাসন মাজার জন্য একজন ঠিকে-ঝি রেখে নিও। এতবড় বাড়িতে বাইরের লোকজন দিয়ে কাজ করালে দেখবে কারো সঙ্গে কারো কোনো সম্পর্কই থাকবে না, আর লোকও তো তেমন কিছু বেশি না, তোমার একটু কষ্ট হবে, সে আর কি করা যাবে, নিজের স্বামী-পুত্রকে খাওয়াতে তো একটু কষ্ট হবেই।"—এ-কথাগুলি উনি না বললেও পারতেন। কারণ আমি নিজে লোক তো রাখতাম-ই না, লোক রাখার কথা বলতাম-ও না। উনি সব কাজের অবিশ্যি এমন ব্যাখ্যা করতেন না। আমি ঠিক বুঝতেই পারি নি উনি কি বলতে চেয়েছেন। বোধহয় ভেবেছিলেন এতবড় বাড়িতে একজনের সঙ্গে অপরের যোগাযোগ এমনিতেই থাকে না, যে যার নিজের মতো থাকে, সেখানে রান্নাবান্না খাওয়া দাওয়া-ও যদি অন্যের হাতে হয় তাহলে আর কোনো যোগাযোগই থাকবে না। কথাটা তো এমনি সত্যি-ই মনে হয়। ওখানে, বাসাবাড়িতে, একটুখানি উঠোনে দু-দুটো মাত্র ঘর। রান্নাঘর শোবার ঘরের গায়ে-গায়েই। রান্নাঘর আর শোয়ার ঘরের মাঝখানে কুয়ো। কেউ যদি একলা থাকতে ভালোবাসে, তাহলে ও-বাড়িতে সে একলা থাকার মতো জায়গাই খুঁজে পেত না। ও-বাড়িতে যতদিন থেকেছি, আমি কোনোসময়ই একলা হতে চাই নি। হঠাৎ একদিন বুঝলাম, উনি একটু একলা থাকতে চান। আমি খোকাকে নিয়ে বারান্দায় খেলছিলাম, সেই খেলা, আমি চোখ ঢেকে কাঁদছি আর খোকা আমার দুহাত চোখ থেকে সরাতে চেষ্টা করছে,

আর না পেয়ে ভ্যাঁ করে কাঁদছে আর আমি চট্ করে মুখ থেকে হাতটা সরিয়ে খোকার মুখের উপর হেসে দিচ্ছি আর খোকা চোখ-গাল ভেজানো জল নিয়ে হে-হে করে হাসছে। হঠাৎ তাকিয়ে দেখি উনি। আমি মজা করে বলতে গেছি "দেখো-দেখো", আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই উনি চেঁচিয়ে উঠলেন "তাহলে তোমার ছেলে নিয়েই তুমি থাক, আমি কাজকম্ম করার জন্য পাড়ার লোক ডেকে আনি—।" আমি আর খোকা দুজনই একেবারে হতভম্ব হয়ে চুপমেরে গিয়েছিলাম। আমি খোকাকে কোলে করে ঘরের ভেতর চলে গেলাম, সেখান থেকেও ওঁকে দেখা যায়; বাইরের ঘরে গেলাম, সেখান থেকেও ওঁকে দেখা যায়। তারপর কতদিন কতবার ওঁকে একলা থাকতে দিতে আমার একলা হওয়ার দরকার হয়েছে। জায়গা খুঁজতে হয় নি। আর এখন এ-বাড়িতে তো সবাই-ই আলাদা-আলাদা। আমাকে দিয়ে রান্না করিয়ে ঘর মুছিয়েও উনি সবাইকে এক রাখতে পারলেন না। তা কি হয়। এত সব লোক থাকতে উনি কিনা আমাকে বাছলেন জোড়া লাগাবার কাজ করতে। না তা নয়। জোড়া-না-ভাঙার কাজ করতে। আমি কি এ-বাড়ির কারো সঙ্গে কোনো যোগাযোগ বোধ করি। সিধুর সঙ্গে, খুকুর সঙ্গে, এমনকি ওদের বাবার সঙ্গে। এখন তো কোনো কথাই নেই। খোকা এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে। আর কোনোদিন ফিরবে না। ওর বত্রিশ নাড়ি আমার চেনা। এ-বাড়িতে ফেরা ছাড়া গত্যন্তর না থাকলে খোকা আত্মহত্যা করবে। আমিও তো এ-বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে পারতাম। আমার দাদার কছে। কিংবা অন্য কোথাও। আমি যাই না কেন। আত্মহত্যা করে খোকা একদিন ফিরবে বলে। এ বাড়ির সঙ্গে এইটুকুই আমার একমাত্র যোগ। কিন্তু আত্মহত্যা করেও কি খোকা এ-বাড়িতে ফিরবে? আমি সেজন্যই এ-বাড়িতে আছি। খোকাকে যদি আত্মহত্যা করতেই হয় তবে এ-বাড়ির ত্রিসীমানায় ঢুকবার আগে যাতে ওর মৃতদেহটা আমি নিয়ে নিতে পারি। খোকার কথা ভাবতে চাই না। হাত-পা অবশ হয়ে যায়। কাজকর্ম করতে পারি না। খোকা যেন আমার মনে না আসে। যেন না আসে। খোকা বলে আমার কেউ নেই।

—ক্রমশ

হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা

ইহুদি মেনুহিন ভাবাকে আধুনিক কালের লিওনার্দো দা ভিঞ্চি বলে অভিহিত করেছিলেন। অতি উচ্চশ্রেণীর বৈজ্ঞানিক মেধার সঙ্গে শিল্প, সংগীত, স্থাপত্যে দক্ষতা ও সৃজনী প্রতিভার সমাবেশ সব যুগেই বিরল। লিওনার্দো প্রধানত শিল্পীরূপে পরিচিত, ভাবার খ্যাতি মুখ্যত বিজ্ঞানে। লিওনার্দো পৃথিবীবিখ্যাত হয়েছেন তাঁর একক শিল্পকর্মগুলির মাধ্যমে, ভবিষ্যতের কাছে ভাবা স্মরণীয় হয়ে থাকবেন তাঁর প্রয়োগধর্মী বিজ্ঞানপরিকল্পনা ও তাদের সার্থক রূপায়ণের জন্যে। উভয়ের মধ্যে তুলনা করাটা হয়তো কিয়দংশে অযৌক্তিক, কিন্তু মেনুহিন ভাবার চরিত্রের সম্পূর্ণতার প্রতি যে-বিশেষণ আরোপ করেছেন তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অতিরঞ্জন নেই।

১৯০৯ সালে এক বিত্তবান পার্শীপরিবারের হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার জন্ম। তাঁর মা বিখ্যাত টাটাপরিবারের কন্যা। পিতৃকুলেও বিদ্যাগৌরব ও ধনগৌরবের অভাব ছিল না। তাঁর পিতামহ ডঃ এইচ. জে. ভাবা সি. আই. বহুদিন মহীশূর রাজ্যের শিক্ষা-অধিকারের অধিকর্তা ছিলেন। পিতা জে. এইচ. ভাবা বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের কাউন্সিল সদস্য ছিলেন। ভাবার লেখাপড়া শুরু হয় বম্বেতে। অতি অল্পবয়সেই ভাবা চিত্রবিদ্যায় অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করেন। কিন্তু পিতার আগ্রহাতিশয্যে এঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য কেমব্রিজ যান সতেরো বছর বয়সে। মেকানিকাল এঞ্জিনিয়ারিং-এ কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পাশ করেন ১৯৩০ সালে। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকার সময় তিনি পদার্থবিজ্ঞানে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩২ পর্যন্ত বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ পি. এ. এম. ডিরাক ও এম. ই. মট-এর কাছে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানে পাঠ নেন। এরপর ট্রিনিটি কলেজের বৃত্তি নিয়ে তিনি যান জুরিখে অধ্যাপক পাউলির কাছে। এখান থেকেই তাঁর প্রথম গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। তারপর একবছর কাটান পদার্থবিজ্ঞানের আর-এক দিকপাল রোমের এনরিকো ফার্মির কাছে। ১৯৩৪ সালে তত্ত্বীয় পদার্থ-বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই পি. এইচ. ডি. উপাধি লাভ করেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত ডঃ ভাবা কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে

অধ্যাপনা করেন। এই সময় তিনি ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের নানাস্থানে বক্তৃতা করেন। ইউরোপে পাঠ্যাবস্থায় ও গবেষণাকালে মাঝে মাঝেই গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি দেশে আসতেন। ১৯৪০ সালে দেশে ফেরার পর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য তিনি আর ইংলণ্ডে ফিরে যান নি। দেশে এসে তিনি বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সে প্রথমে রিডার হিসেবে যোগদান করেন ও পরে অধ্যাপক হন। দেশে ফেরার পরের বছরেই অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার আমন্ত্রণে তিনি কলকাতায় মহাজাগতিক রশ্মির উপর কয়েকটি বক্তৃতা দেন। ভাবা তখনও এদেশে অপরিচিত। কলকাতার বিজ্ঞানীসমাজ এই ভেবে শ্লাঘা অনুভব করতে পারেন যে অধ্যাপক ভাবার প্রতিভার যোগ্য স্বীকৃতি দিতে তাঁদের দেরি হয় নি। ১৯৪১ সালেই মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে লণ্ডনের রয়াল সোসাইটির সদস্যপদে নির্বাচিত হবার দুর্লভ সম্মান তিনি লাভ করেন।

বাঙ্গালোরে অধ্যাপক ভাবা মহাজাগতিক রশ্মি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু করেন। এখানে থাকার সময় কোয়ণ্টাম তত্ত্বের সাহায্যে মহাজাগতিক কণা বিশ্লেষণের কাজে পরের বছর তিনি এডামস্ পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৪৫ সালে তিনি বাঙ্গালোর থেকে বম্বে চলে যান নবপ্রতিষ্ঠিত টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চের ডিরেক্টর হয়ে।

ডক্টর ভাবার গবেষণা শুরু হয়েছিল পরমাণুবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে। ভাবা ও হাইটলারের 'ক্যাসকেড শাওয়ার থিওরি' প্রকাশিত হওয়ার পরই তিনি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েন। এই থিওরি এখনও পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্রদের অবশ্যপাঠ্য তালিকায় পড়ে। অল্পদিন পরেই পরমাণুবিজ্ঞানে ইলেকট্রন পজিট্রন বিক্ষেপনের তত্ত্ব প্রকাশিত হয়—এটি এখন ভাবা স্ক্যাটারিং নামে খ্যাত। মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণায় বহু মৌলকণা আবিষ্কার হওয়ার পর তাদের ধর্ম বিশ্লেষণে মৌলকণাগুলিকে সুসংবদ্ধ শ্রেণীবিভাগ করাও ডক্টর ভাবার অন্যতম কীর্তি। এছাড়া পদার্থবিজ্ঞানের বহুবিভাগে ডক্টর ভাবা তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

বিজ্ঞানী হিসাবে অসামান্য প্রতিভা এবং গঠনমূলক গবেষণার কাজে কৃতিত্বের জন্য ভাবার নাম স্মরণীয় হয়ে থাকত সন্দেহ নেই। কিন্তু শুধু এখানেই তাঁর অবদান শেষ হয় নি। তাঁর চরিত্রের যে সর্বাঙ্গীন পরিণতির কথা প্রবন্ধের গোড়ায় বলা হয়েছে তার পরিপূর্ণ বিকাশের সুযোগ উপস্থিত হল স্বাধীনতার পর, নেহরু যখন পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যানরূপে অতি গুরুত্বপূর্ণ

কাজের ভার তাঁর উপরে ন্যস্ত করলেন। পারমাণবিক যুগের প্রকৃত তাৎপর্য এবং আমাদের দেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার ভবিষ্যৎ ভূমিকা যে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অনুধাবন করেছিলেন এবং এই বিষয়ে পরিকল্পনার ভার ভাবার হাতে দিয়েছিলেন এটি আমাদের পক্ষে অসীম সৌভাগ্যের বিষয়।

জীবনযাত্রার মান উন্নত করে তোলার পরিকল্পনার গোড়াতেই এক বিরাট বাধার সম্মুখীন হতে হল দেশকে। দেখা গেল আপাতদৃষ্টিতে ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ অপর্যাপ্ত মনে হলেও শিল্পোন্নত হবার পক্ষে যথেষ্ট শক্তির উৎস আমাদের নেই। সাধারণত কোনো দেশে জীবনযাত্রার মান কত উন্নত তার হিসেব করা হয় সেই দেশের মাথাপিছু শক্তিখরচের হার থেকে। বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের প্রধান উৎস কয়লা সারা পৃথিবীতেই ক্রমশ ফুরিয়ে আসছে। তবু সোভিয়েত রাশিয়াতে বর্তমান সঞ্চয় মাথাপিছু ২৫,০০০ টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ৭,০০০ টন, যুক্তরাজ্যে ৩,২০০ টন আর ভারতবর্ষে বর্তমান জনসংখ্যার হিসাবে মাথাপিছু ১০০ টন। শিল্পোন্নত হবার পক্ষে আমাদের প্রধান অন্তরায় হয়ে উঠছে জ্বালানীর অভাব। এই অভাব দু-একদিনের মধ্যে নয়, ক্রমে প্রকাশ পাবে। সবরকমভাবে জলশক্তি প্রয়োগ করলেও বিদ্যুৎ যা উৎপন্ন হবে চাহিদার তুলনায় তা কিছুই নয়। আমাদের পক্ষে তাই একমাত্র উপায় হল পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার, যার জ্বালানী ইউরেনিয়ম ও থোরিয়ম আমাদের দেশে যথেষ্ট আছে। ভারতবর্ষে পারমাণবিক জ্বালানী কোথায় কোথায় আছে, কী পরিমাণে আছে, কীভাবে তাকে কাজে লাগান যেতে পারে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান আরম্ভ করল পারমাণবিক শক্তি কমিশন। ১৯৪৮ সালে গঠিত এই কমিশন অতিসামান্য অবস্থা থেকে আজ বিরাট ও জটিল আকার ধারণ করেছে। অল্প সময়ের মধ্যে ইউরেনিয়ম নিষ্কাষণ, তাকে জ্বালানী হিসেবে পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করে পাইলট প্লাণ্ট চালু হয়েছে। তারপর পূর্ণ উদ্যমে আরম্ভ হয়েছে ব্যবহারিক ভিত্তিতে পরমাণুশক্তি উৎপাদনের কাজ। তারাপুর কেন্দ্র থেকে কয়েক বছরের মধ্যেই পশ্চিম ভারতের অনেক জায়গায় বিদ্যুৎশক্তির সরবরাহ আসবে। ভাবার পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি বছরে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের জন্য একটি করে নতুন রিঅ্যাকটর তৈরি করতে পারলে আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির ভিত্তি শক্ত গাঁথুনীর উপর স্থাপিত হবে। এই পরিস্থিতি আজ আর কল্পনার বস্তু নয়। ভারতবর্ষের মতো অনুন্নত দেশে এইরকম বিরাট পারমাণবিক শক্তি পরিকল্পনায় হাত দেওয়া সমীচিন কিনা এই নিয়ে প্রথমদিকে অনেকে

সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন। এ কথা ঠিক যে গোড়ার দিকে বৈদেশিক সাহায্য না পেলে হয়তো আমরা এত তাড়াতাড়ি এগোতে পারতাম না। আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা ও আরো নানা দেশ যে আমাদের সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিলেন তারও মূলে ছিল ভাবার অক্লান্ত প্রচেষ্টা। তবে এই দুরূহ পরিকল্পনা চালিয়ে যাবার ক্ষমতা ও লোকবল আমাদের যে আছে এই বিশ্বাস ও প্রচণ্ড আশাবাদ নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন তিনি। সেই সময় ডক্টর ভাবার নেতৃত্ব পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল বলেই দেশ আজ দুই দশকেই প্রায় অর্ধশতাব্দী অতিক্রম করে আসতে পেরেছে। অনুকূল পরিবেশ, অপর্যাপ্ত সরকারী সাহায্য ও লক্ষ্মী-সরস্বতীর অকৃপণ কৃপার আশ্চর্য সমাবেশ ভাবার জীবনে ঘটেছিল। অক্লান্ত প্রয়াসে তিনি তাদের পূর্ণ সদ্ব্যবহারও করেছিলেন।

ভারতবর্ষে বিজ্ঞানের আলো জ্বালিয়ে সাধারণের উন্নতির স্বপ্ন যাঁরা দেখেছেন ডক্টর ভাবা তাঁদের অন্যতম। তাঁর সমস্ত জীবন দিয়ে এই স্বপ্ন দেখার যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছিলেন। প্রমাণ করেছিলেন এই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেবার ক্ষমতা আমাদের আছে। তাঁর দূরদৃষ্টি ও উদ্যমের সাক্ষ্য বহন করছে টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ, পরমাণু শক্তি সংস্থার ইউরেনিয়ম ফ্যাক্টরি, রেয়ার আর্থ কেমিকাল ফ্যাক্টরি, ট্রম্বের পরমাণু শক্তি প্রতিষ্ঠান যেখানে আছে অপ্সরা ও ক্যানেডিয়ান ইণ্ডিয়ান রি-অ্যাকটর, ইলেকট্রনিক্স ও ধাতুবিদ্যা-বিষয়ক ফ্যাক্টরি, প্লুটোনিয়ম প্ল্যাণ্ট প্রভৃতি। ডক্টর ভাবার নতুন কর্মসূচীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মহাকাশ গবেষণার জন্য থুম্বায় রকেট স্টেশন স্থাপন। ভারতীয় বিজ্ঞানকে যাঁরা আধুনিক করেছেন, সাবালক করেছেন এবং সাধারণ মানুষের জীবনের অঙ্গ করে তুলতে চেয়েছেন ভাবা তাঁদের অন্যতম। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ জল্পনা-কল্পনা চলেছে ভারত তার পরমাণু শক্তি বোমা তৈরির কাজে লাগাবে কিনা। করবে কিনা সেটা নীতিগত প্রশ্ন কিন্তু করার ক্ষমতা যে আছে এ-বিষয়ে আজ আর সংশয়ের অবকাশ নেই। ডক্টর ভাবা পরমাণু শক্তি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন শান্তির জন্য। ১৯৫৫ সালে শান্তির কাজে পরমাণুশক্তি ব্যবহারের জন্য জেনিভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি ছিলেন প্রধান সভাপতি। এই সভায় তিনি পৃথিবীর ক্ষীয়মান খনিজ জ্বালানীর সমস্যা উপস্থাপিত করেন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পরমাণুশক্তির ব্যাপক ব্যবহারের অপরিহার্যতার উল্লেখ করেন। ঐ সম্মেলনে তিনি আরও একটি ভবিষ্যদ্বাণী

করেন যে এই শতাব্দীর মধ্যেই মানুষ তাপকেন্দ্রীন বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এবং তার জ্বালানী হাইড্রোজেনের অভাব নেই; সুতরাং জ্বালানী সমস্যার সেটাই হবে সব থেকে সুচারু সমাধান। এই বিষয়ে গবেষণার বর্তমান অবস্থা আশাপ্রদ।

ডক্টর ভাবা নিজে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারতেন এবং অধীনস্থ কর্মী ও বিজ্ঞানীদের কাছে অনুরূপ পরিশ্রম আশা করতেন। কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পালন তাঁর গবেষণাগারগুলির অন্যতম বিশেষত্ব। সমস্ত কাজ নিখুঁত করা তাঁর স্বভাব ছিল। তত্ত্বের গাণিতিক সূত্র, যন্ত্রের বহিরাবয়ব বা গবেষণাগার-সংলগ্ন উদ্যান যাই হোক না কেন তাঁর বিজ্ঞানী ও শিল্পী চোখে নিখুঁত না হওয়া পর্যন্ত তিনি স্বস্তি পেতেন না এবং তার জন্য তিনি যে-কোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। পারিপাট্যের প্রতি তাঁর অত্যধিক মনোযোগ অনেক সময় আতিশয্যের পর্যায়ে পৌঁছে যেত। গবেষণা পরিচালনায় ডক্টর ভাবার সাফল্য আজ সর্বজন বিদিত। কুড়ি বছরের মধ্যে একটি নবজাত গবেষণাগারকে জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় সম্মানে উন্নীত করাটাই তার সম্যক পরিচয়। গবেষণা পরিচালনায় ডক্টর ভাবার দৃষ্টিভঙ্গির দুটি দিক বিশেষ উল্লেখযোগ্য—প্রথমটি হল মৌলিক গবেষণার দিক, অন্যটি যন্ত্রপাতি তৈরি করায় আত্মনির্ভরতার চেষ্টা। মৌলিক গবেষণা যাকে তিনি প্রেস্টিজ রিসার্চ বলতেন তার জন্য তিনি অকুণ্ঠ অর্থব্যয়েও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যন্ত্রপাতি কিনতে পশ্চাদপদ হতেন না। গবেষকদের কাজ জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিগন্ত প্রসারিত করা, অন্য কোনো সমস্যা যাতে তাদের প্রয়াসে বাধা সৃষ্টি না করে তার দিকে তিনি বিশেষ লক্ষ রাখতেন। এই প্রচেষ্টায় সুফল পেতে দেরি হয় নি। অন্য দিকটিও সমান চমকপ্রদ। ব্যবহারিক বিজ্ঞানীর যন্ত্রশালায় যা-কিছু প্রয়োজন হতে পারে দেশী মালমশলা দিয়ে তা তৈরি করার প্রচেষ্টাও ডক্টর ভাবা গোড়া থেকেই শুরু করেন। এ-পথে বাধা অনেক। কারিগরি বিদ্যার ছোট-বড় নানা কলা-কৌশল আয়ত্ত করে দক্ষ কারিগরগোষ্ঠী তৈরির কাজ সহজ হয় নি। আজ বিদেশী বিশেষজ্ঞরাও স্বীকার করেন যে পরমাণুশক্তি উৎপাদনে স্বয়ংভর হওয়ার পথে ভারত অনেক এগিয়ে এসেছে। বিরাটাকার, জটিল বা সূক্ষ্ম কলকব্জা তৈরি বা চালান ভারতীয় এঞ্জিনিয়ারদের কাছে আর অসম্ভব নয়। বিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যা পরস্পর নির্ভরশীল এ কথা সকলেরই জানা। কিন্তু ডক্টর ভাবাই প্রথম একটি বিরাট যোজনায় এই দুই-এর সমন্বয় কার্যকর করে তুলেছিলেন।

যেমন বিজ্ঞানী হিসাবে তেমনি মানুষ হিসাবে ভাবা ছিলেন মার্জিত ও রুচিমান। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সংগীতে বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। নিজে ভালো ছবি আঁকতেন এবং তাঁর নিজস্ব শিল্পসংগ্রহের পরিমাণ নগণ্য নয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানসংস্থাগুলি বিশেষ করে টাটা ইনস্টিটিউটের অন্তর্সজ্জা না দেখলে ডক্টর ভাবার মধ্যে বিজ্ঞান ও চারুকলার সমন্বয় উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তাঁর আচার-ব্যবহারে পরিস্ফুট ছিল গভীর আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিত্ব। বৈজ্ঞানিক মেধা, দূরদৃষ্টি ও সংগঠনী শক্তির এক আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় বহু বিজ্ঞানসংস্থায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন ডক্টর ভাবা। দেশের ও বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে উপাধিতে ভূষিত করেছেন।

আমাদের দুর্ভাগ্য বহু বছর সাধনার পর ডক্টর ভাবা যখন সাফল্যের ও ক্ষমতার শিখরে এসে পৌছলেন ঠিক তখনই বিমানদুর্ঘটনায় তাঁর বহুসম্ভাবনাময় জীবনের অবসান হল। এই ঘটনার আকস্মিকতায় দেশের ও পৃথিবীর গুণীসমাজ বিমূঢ়। মৃত্যুর দ্বারা যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় জীবনের কাজ তাকে পূর্ণ করে তোলা। জীবনের বহমান স্রোত ব্যক্তির অভাবে থেমে থাকে না, সে ব্যক্তিত্ব যতই বিরাট হোক না কেন। তাঁর আরব্ধ কাজ আজও অসম্পূর্ণ। যে আত্মপ্রত্যয় নিয়ে তিনি এই বিরাট যোজনা আরম্ভ করেছিলেন সে আত্মপ্রত্যয় তাঁর একার ছিল না, তার মূলে ছিল ভারতীয় মেধা ও যোগ্যতার প্রতি আস্থা। তাই ভাবার অকালমৃত্যুতে আজ ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের সামনে এসেছে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করার অগ্নিপরীক্ষা।

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়

পুস্তক-পরিচয়

সুখপাঠ্য বিজ্ঞান

বিশ্ববিজ্ঞান : কমলেশ রায়। ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন।

ভূমিকায় বলা হয়েছে বইখানির প্রধানত দুই ভাগ : বিশাল জগৎ ও সূক্ষ্ম জগৎ। প্রথম অংশে জ্যোতির্বিজ্ঞান, ব্রহ্মাণ্ডের রূপ ইত্যাদি আলোচিত হয়েছে; দ্বিতীয় অংশের প্রতিপাদ্য প্রধানত অণু-পরমাণু ও বিবিধ অবপারমাণবিক কণা। পঁচিশটি প্রবন্ধ এই দুই বিষয়ে প্রায় সমান ভাগে বিভক্ত। সুতরাং বইয়ের নামটি এই পরিমিত অর্থে গ্রহণ করতে হবে।

বাংলা ও ইংরেজিতে সাধারণ পাঠকের উপযুক্ত বৈজ্ঞানিক রচনার জন্য লেখক সুপরিচিত। তাঁর পাকা হাতের পরিচয় আছে এ বইয়ের পাতায় পাতায়। আধুনিক বিজ্ঞানের জটিল তথ্য সহজবোধ্য ও উপভোগ্য করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন, প্রাঞ্জল ভাষা ও সাবলীল রচনাকৌশলে বিজ্ঞানী লেখকের সাহিত্যিক দক্ষতা স্পষ্ট প্রতীয়মান। বস্তুত, এক-এক স্থানে ভাষা এতই প্রাথমিক যে মনে হয় তিনি স্কুলের ছাত্রদের উদ্দেশে বই লিখেছেন—কিন্তু তা তো নয়, এই বইতে অবিজ্ঞানী বয়স্কদের জ্ঞাতব্য ও উপভোগ্য বস্তু যথেষ্ট আছে। দ্বিতীয়ত, বইয়ের প্রথম তিন ও শেষ অধ্যায়টি একটু আকস্মিক মনে হয়, যেন প্রধান অংশের সঙ্গে এদের সুরের যোগ খুব স্বাভাবিক হয় নি।

তথ্যপ্রধান গ্রন্থে, বিশেষত প্রথম সংস্করণে, কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা আশ্চর্য নয়। সমালোচকের কর্তব্য সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা, যাতে পরে সংশোধন সম্ভব হয়। এবং এমন সুখপাঠ্য বইয়ের দ্বিতীয় মুদ্রণ অবিলম্বে প্রয়োজন হবে আশা করা যায়।

লেখক ১ পৃষ্ঠায় বলছেন গ্রীসীয় সভ্যতা ও বিজ্ঞান ২০০০ বছর প্রাচীন, ১০ পৃষ্ঠায় ৩০০০ বছর; ৬ পৃষ্ঠায় দেখি গ্রীসীয় বিজ্ঞানের সূচনা খ্রীষ্টপূর্ব ৬-৭ শতাব্দে—এই তারিখটাই ঠিক মনে হয়।

আমেরিকা মহাদেশে মানুষের আবির্ভাব সম্বন্ধে বলা হয়েছে তা ঘটেছিল খ্রীষ্টজন্মের কাছাকাছি সময়ে যখন এশিয়ার মানুষ পদব্রজে বেরিং প্রণালী পার হয়ে সেখানে ঢোকে (পৃ. ২)। কিন্তু প্রায় ১০,০০০ বছর আগে এই

প্রণালী জলমগ্ন হয়। আমেরিকায় যে ১১,০০০ বছর প্রাচীন মানুষের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে তা পুরনো খবর, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক ইঙ্গিত যে টেকসাস রাষ্ট্রে যিশুর ৩৫,০০০ বছর আগেই মানুষের পা পড়ে থাকতে পারে। কালিফর্নিয়ার অদূরে সান্‌টা রোজা দ্বীপে এক ম্যামথ ভোজের চিহ্ন মিলেছে, পোড়া হাড়ের তেজী কার্বন মেপে যার বয়স দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০,০০০ বছর। এই ধরনের সাক্ষ্য আরও আছে। তাছাড়া, কৃষির চিহ্নও মিলেছে খ্রীষ্টজন্মের কয়েক সহস্রক আগে পর্যন্ত।

পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন ঘটনার যে-তারিখ দেওয়া হয়েছে তার অন্তত তিনটি সম্বন্ধে সন্দেহ আছে (পৃ. ১০)। পৃথিবীর জন্ম কি মাত্র ২০০ কোটি (বড় জোর ৩৪০ কোটি) বছর আগে? একই তারিখ ৪৩ পৃষ্ঠায়ও দেখি। এখন অধিকাংশ জ্যোতির্বিদ্‌ সূর্য ও গ্রহকুলের বয়স ধরেন ৪৫০-৫০০ কোটি বছর। মানুষের উদ্ভব ৩ লক্ষ বছর আগে কী করে হয় তাও বোঝা গেল না; মানুষ বলতে যদি আজকের মানুষ (হোমো সাপিয়েন্‌স্‌) বোঝায় তবে তার বয়স ৪০-৫০ হাজার বছরের বেশি নয় এইরকমই সাধারণ ধারণা। আর আদিতম মানব ১০-২০ লক্ষ বছর প্রাচীন। আফ্রিকার কান্‌জেরা মানব এবং ইংলণ্ডের সোআন্‌সকুম মানব প্রায় ৩ লক্ষ বছর প্রাচীন হতে পারে, এবং অনেকে তাদের সঙ্গে এ-যুগের খাঁটি মানুষের সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন, কিন্তু তা এখনও তর্কের বিষয়। কৃষির আবিষ্কার ঘটেছে ১৫,০০০ বছর আগে এ কথাও অত্যুক্তি মনে হয়। মধ্যপ্রাচ্যের আদি নবপ্রস্তর যুগের বসতি জেরিকো ও জারমো গ্রামে কৃষির সাক্ষ্য ৭৫০০-৭০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বেশি প্রাচীন নয়; অবশ্য প্রত্নবিদদের উদ্যোগে নতুন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে প্রথম চাষের তারিখটা ক্রমেই পিছিয়ে যাচ্ছে—যথা করিম শারির ঘাটিতে নাকি ৯০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কৃষির সূচনা—তথাপি ১৫,০০০ বছর আগে মানুষ পুরাপ্রস্তর যুগেই ছিল বলতে হবে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানের ইতিহাস প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন যে কোপার্নিকাস তাঁর সৌরকেন্দ্রিক তত্ত্ব প্রকাশ করবার আগেই মারা যান (পৃ. ১২); আসলে মৃত্যুর দিনই বইখানি তাঁর হাতে আসে। গ্যালিলিওর বন্দীদশা (পৃ. ১৩) নামে মাত্র, শৌখিন বাসব্যবস্থার মধ্যে নিজের প্রকৃত ক্ষেত্র বলবিদ্যা ও গতিবিদ্যার গবেষণায় তাঁর শেষজীবন কাটে।

৩২ পৃষ্ঠায় দেখি সৌরলোকে উপগ্রহের সংখ্যা ২৯, তা সম্ভবত ছাপার

ভুল। প্রকৃত সংখ্যা ৩১—পঞ্চম অধ্যায় ও ৫৫ পৃষ্ঠার তালিকা থেকেও তা প্রতীয়মান। শুক্রগ্রহের মেঘ কী বস্তু দিয়ে তৈরি তা এখনও এই রহস্যময় জ্যোতিষ্কের অন্যতম প্রধান রহস্য; যদিও লেখক বলছেন, "এই মেঘ জলের বাষ্প নয়, ধূলির আঁধি" (পৃ. ৪২), আসলে বিভিন্ন গবেষকের মতে তা জল, আঙ্গারিক গ্যাস, আলেয়া গ্যাস (মিথেন), নাইট্রোজেন সবই হতে পারে; ধূলির কথা কেউ বলেছেন বলে জানি না।

সম্প্রতি কয়েকটি গ্রহ সম্বন্ধে চাঞ্চল্যকর নতুন তথ্য প্রকাশ পেয়েছে, সম্ভবত আলোচ্য বইখানি তার আগেই মুদ্রাকরের হাতে চলে গিয়েছে—আশা করি, আগামী সংস্করণে লেখক এ-সব খবরের দিকে নজর দেবেন। বুধের আবর্তন কাল এখন আর প্রদক্ষিণ কালের (৮৮ দিন) সমান ধরা হয় না, পৃথিবীর বৃহত্তম রেডিও দূরবীণের সাহায্যে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী গর্ডন পেটেন্‌জিল দেখিয়েছেন এই আবর্তন কাল হয় ৫৪-৬৪ দিন (যদি এই গতি প্রদক্ষিণের সঙ্গে একমুখী হয়), নয়তো ৪১-৫১ দিন (যদি গতি হয় বিপরীত বা প্রতীপ)। ১৯৬৫ সালের আর-এক গবেষণার ইঙ্গিত যে দূরতম গ্রহ প্লুটো যত ক্ষুদ্র ভাবা গিয়েছিল ততটা নাও হতে পারে—হয়তো সে প্রায় পৃথিবীর সমান; তা যদি হয় তো প্রতিবেশী গ্রহ নেপচুন ও ইউরেনাসের কক্ষে যে অসংগতি দেখা যায় তার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। শুক্র গ্রহের আবর্তন কাল ও আহ্নিক গতিও এক বড় সমস্যা—২৪ ঘণ্টা থেকে ২২৫ দিন পর্যন্ত এই কাল এযাবৎ অনুমিত হয়ে এসেছে। আধুনিক কৌশল ব্যবহার করে সম্প্রতি এ-সম্বন্ধে নতুন সংখ্যা কিছু পাওয়া গিয়েছে, এবং সবগুলিই প্রদক্ষিণ কালের (প্রায় ২২৫ দিন) বেশি: ম্যারিনার-২ রকেটযানে রক্ষিত যন্ত্রে ২৫০ দিন (১৯৬২), জন্‌স হপকিন্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের বেলুনে প্রেরিত যন্ত্রে ২৪৭ দিন (১৯৬৪), এবং বৃহত্তম রেডিও দূরবীণের সাহায্যে ২৪২-২৫২ দিন (১৯৬৫)।

ধূমকেতু সম্বন্ধে লেখক বলেছেন যে তা শুধু কাঁকর ও ধূলিকণা দিয়ে তৈরি (পৃ. ৬১), কিন্তু তাহলে পুচ্ছ আসে কোথা থেকে? ফ্রেড হুইপ্‌ল ধূমকেতুর বর্ণনা করেছেন "নোংরা বরফপিণ্ড" বলে, এই জ্যোতিষ্কগুলির উপাদান সম্বন্ধে নানা মত থাকলেও অনেকেই তাদের মধ্যে বরফ ও জমানো গ্যাস (যথা অ্যামোনিয়া ও আলেয়া গ্যাস) সন্দেহ করেন, কাঁকর ও ধূলি ছাড়াও। আর, ধূমকেতুর নিজের কোনও আলো নেই তাও কি জোর করে বলা যায়? প্রতিফলিত সূর্যালোক ছাড়াও উজ্জ্বল গ্যাস সন্দেহ করা হয়।

নক্ষত্রলোকের আলোচনায় দেখি ছায়াপথ নীহারিকায় তারার সংখ্যা দেওয়া হয়েছে ২০,০০০ কোটি (পৃ. ৬২), এবং তার বাইরে লক্ষিত নীহারিকার সংখ্যা ১০ লক্ষ (পৃ. ৬৫)। দুটি সংখ্যাই ১০,০০০ কোটির কাছাকাছি হবে কিনা তা লেখককে বিবেচনা করে দেখতে বলি। একই তারা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যুগ্ম তারার সৃষ্টি অবশ্য সম্ভব যেমন লেখক বলেছেন (পৃ. ৬৬), কিন্তু এও কি সম্ভব নয় যে আদি গ্যাস ও ধুলি দানা বেঁধে যখন তারা সৃষ্ট হচ্ছিল তখন খুব কাছাকাছি দুটি কেন্দ্র পরস্পরের মহাকর্ষে বাঁধা পড়ে জোড়া তারায় পরিণত হয়েছে? অষ্টম অধ্যায়ে বিভিন্ন তারার বাংলা নাম দেওয়া হয়েছে, এর মধ্যে কয়েকটি (যেমন লুব্ধক, অগস্ত্য ও অভিজিৎ) অবশ্য সুপ্রচলিত, কিন্তু মার, মহিষাসুর ইত্যাদি নাম সম্বন্ধে সন্দেহ থাকল। যেখানে উপযুক্ত পারিভাষিক শব্দ নেই সেখানে গ্রীসীয় ব. রোমক নাম ব্যবহারে কোনও আপত্তি থাকা উচিত নয়।

ব্রহ্মাণ্ড ও মহাকাশ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে ১৭৭ কোটি আলোকবর্ষ দূরে যে-নীহারিকা তা আলোর সমান দ্রুত, সুতরাং সেইখানে আমাদের দৃষ্টির সীমা। বস্তুত, হাব্‌ল থেকে আরম্ভ করে এখন অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর ধারণা এই 'নৈসর্গিক দিগন্ত' ১০০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে। ৯৭ পৃষ্ঠায় এ-ও দেখি যে এপর্যন্ত দূরতম নীহারিকা যা দেখা গিয়েছে তা আছে ১৫ কোটি আলোকবর্ষ দূরে; আসলে ২০০ ইঞ্চি দূরবীণ দিয়ে জ্যোতির্বীরা প্রায় ৭০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের নীহারিকা পর্যন্ত দেখেছেন। রেডিও দূরবীণের পরিধি আরও বেশি, সম্প্রতি মার্টেন শ্‌মিড নতুন বর্ণালী পদ্ধতি ব্যবহার করে ৯০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের এক কোআজার (৩C ৯) ধরেছেন। ৯৭ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে এই ব্রহ্মাণ্ড ৫-১০ লক্ষ কোটি বছর প্রাচীন; এই সংখ্যাটি লেখক কোথায় পেলেন জানি না, কিন্তু এই বিশ্বের সূচনা যদি এক মহাবিস্ফোরণ দিয়ে হয়ে থাকে (যা অধিকাংশ বিজ্ঞানী এখন বিশ্বাস করেন) তবে তার প্রসারণের হার থেকে হিসাব করে দেখা যায় সেই মহাক্ষণ এসেছিল মোটামুটি ১৩০০ কোটি বছর আগে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে বিশ্বের সূচনা ও চরিত্র সম্বন্ধে যে তিনটি প্রকল্প আছে তার সবগুলির উল্লেখ করলে বইখানি আরও সুসম্পূর্ণ হত। প্রতিবস্তু (antimatter) সম্বন্ধে আমরা সম্প্রতি যেসব আশ্চর্য তথ্য জেনেছি আশা করি পরবর্তী সংস্করণে তাও বাদ পড়বে না। ১৬৫ পৃষ্ঠায় হাইড্রোজেনের

এক আইসোটোপ সম্বন্ধে এই উক্তি আছে যে “এর নাম ডিউটেরন বা ডিউটেরিয়াম” ; কিন্তু ডিউটেরন কি ডিউটেরিয়াম নিউক্লিয়াসের নাম নয় ?

নামের বানান সম্বন্ধেও এক-এক জায়গায় অসংগতি দেখা যায় : টাইকো ব্রাহে (পৃ. ৯ ও ৪৫) টিকো ব্রাহে হলেই ভালো, ডেকার্টে (পৃ. ১১৪) এবং আইরিন ফ্রেডারিক জোলিও কুরী (পৃ. ১৮৬) ফরাসী উচ্চারণ নয়। রিলেটিভিটি থিওরিকে “আপেক্ষিক তত্ত্ব” (পৃ. ১৫৩) করলে রিলেটিভ থিওরির মতো শোনায় না কি ? একই শব্দের দুই বানানও চোখে পড়ল, যথা অপশরণ ও অপসরণ (পৃ. ৯২ ও অন্যত্র), তেজষ্ক্রিয় ও তেজস্ক্রিয় (পৃ. ১৪৮, ১৬৬, ১৮৬)-এর ভুল বানানটিই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হয়েছে। বইখানির অধিকাংশ মুদ্রণ দোষমুক্ত, যদিও কোথাও কোথাও ভুল থেকে গিয়েছে, যেমন যথাক্রমে ১৩৩ ও ১৪৮ পৃষ্ঠায় তেজস্কিয়তা ও ঘন্টা।

শেষ অধ্যায় “জড় ও জীব” সবচেয়ে কম সন্তোষজনক হয়েছে। পৃথিবীতে প্রাণের সূচনা সম্বন্ধে আজ নানা জায়গায় যে বৈপ্লবিক গবেষণা চলছে তার কোনও উল্লেখ নেই। ক্যালভিন প্রমুখ কর্মীরা দেখিয়েছেন কী করে আদি পৃথিবীর বায়ুতে জলীয় বাষ্প, আঙ্গারিক গ্যাস, আলেয়া গ্যাস, অ্যামোনিয়া, হাইড্রোজেন ইত্যাদি সরল বস্তু থেকে বিদ্যুৎক্ষরণ বা হ্রস্ব অতিবেগনি রশ্মির সাহায্যে অ্যামিনো অ্যাসিড ও অন্যান্য নাইট্রোজেন সংবলিত প্রাথমিক প্রাণবস্তু তৈরি হয়ে থাকতে পারে। কোষকেন্দ্রস্থিত DNA অণুর যে-তাৎপর্য ক্রিক ও অন্যান্যরা উদ্‌ঘাটিত করেছেন, এই অণুর মধ্যে কী করে প্রাণীর ভাগ্য লিখিত থাকে তার আশ্চর্য কাহিনীও খুঁজে পাওয়া গেল না। লেখক “সরলতম জীবকোষ ও জীবাণুর” উল্লেখ করেছেন, কিন্তু উপরোক্ত প্রাণবস্তুগুলি তৈরি হয়ে যাওয়ার পরে আদিম সাগরের জলে কী করে তা কোষের সীমার মধ্যে আবদ্ধ হল তা আজ বিজ্ঞানীদের এক বড় সমস্যা—অনেকের ধারণা এই কাজে প্রাণ অভিব্যক্তির প্রায় অর্ধেক সময় কেটে গিয়েছে, তারপরে দেখা গিয়েছে সরলতম জীবকোষ।

উপরে আলোচিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রামাণিক তথ্য সংগ্রহ করে লেখক যদি বইখানার (বিশেষ করে প্রথমার্ধের) যথাযোগ্য পরিবর্তন করেন তবে তা সর্বগুণসম্পন্ন হবে।

শচীন্দ্রনাথ বসু

ফরাসী নবতরঙ্গ ও জাক্ দেমি

ফরাসী সিনেমায় নবতরঙ্গের দোলা এক নিমেষে চলচ্চিত্র-জগতের এতদিনকার চেনা চেহারাটা যেন পাল্টে দিল। ছবি করার চেনাজানা নিয়মকানুন সব বদলে নতুন নতুন বিধিবিধান তৈরি হল। প্রথাসিদ্ধ ফ্ল্যাশব্যাক মুছে দিয়ে অতীত স্মৃতির প্রক্ষেপণে নতুন কায়দা আমদানী করলেন রেণে "হিরোশিমা মন আমুর"-এ; ফ্রীজ্ শট্ চলচ্চিত্রের "অনন্ত মুহূর্ত" তৈরি করল; হাতে-ধরা ক্যামেরায় বাস্তবতার এক নতুন মাত্রা আবিষ্কৃত হল, সূর্যের দিকে ক্যামেরা ফোকাস্ করে ফোটোগ্রাফিতে বিপ্লব আনলেন কুতার্দ; সম্পাদনার নতুন ভঙ্গী ছবিকে অন্যভাবে বুঝতে শেখাল। আসলে আজকের জীবনের জটিলতা প্রকাশের জন্যেই এইসব নতুন রীতিনীতির দরকার পড়ল। গল্প বলার ভঙ্গীতেও পালাবদল ঘটল। প্রচলিত নিটোল গল্পের কাঠামোকে ভেঙে, টুকরো টুকরো মুহূর্ত নিয়ে, খণ্ড খণ্ড অনুভবের অনুষঙ্গ তৈরি হল; পর্দার উপরে প্রতিফলিত বাস্তব আর ছবিঘরের অন্ধকারের সাহচর্যে গড়ে উঠল নতুন সিনেমার লজিক। সার্থক চলচ্চিত্রকারের নতুন সংজ্ঞা তৈরি হল "পরিপূর্ণ স্রষ্টা" (auteur complet) হিসেবে। এই দলের ছবি-করিয়েরা সিনেমার আবহাওয়াতেই মানুষ, চলচ্চিত্রের ইতিহাস তাঁদের নখদর্পণে (আসলে এদের মধ্যে অনেকেই "কাহিয়ে দ্যু সিনেমা"র সমালোচক হিসেবে জীবন আরম্ভ করেন) আর এই অধীত বিদ্যার ছাপ ছড়িয়ে আছে তাঁদের শিল্পকর্মে। তাই এঁদের ছবিগুলো পূর্বসূরীদের কাজের রেফারেন্সে ভরা। অবশ্য এ-ব্যাপারটা কিন্তু মোটেই নকলনবিশী নয়; পথিকৃৎদের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে নিজেদের সৃষ্টিতে আত্মস্থ করে নতুন শিল্প-আঙ্গিক তৈরির চেষ্টা। আমেরিকান সিনেমার প্রতি তাই এঁদের অগাধ শ্রদ্ধা। কারণ সিনেমার আদিযুগ থেকে আরম্ভ করে বহুদিন পর্যন্ত আমেরিকাতে চলচ্চিত্র-শিল্পের উজ্জ্বল বিকাশ যে-কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষেই সশ্রদ্ধ চর্চার যোগ্য। তাই হিচকক্, হক্স্, জোসেফ ওয়েলস্, লোজে, নিকোলাস রে, অটো প্রেমিংগার-এর মতো হলিউডের প্রথম সারির সিনেমাকারেরা এঁদের গুরুস্থানীয়। প্রবীণদের মধ্যে ভিগো, রেনোয়া, স্টানবার্গ, ওফ্যুলস্, ল্যাং ইত্যাদিকেও এঁরা খুবই

খাতির করেন। তাছাড়া ম্যাপস্লিকের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের সার্থক উত্তরাধিকারী জেরি লিউইসের অসম্ভবের জগৎ কিংবা ইতালীয় পরিচালক কোত্তাফাভিয় বর্ণাঢ্য এপিকধর্মী সিনেমাও এ দের কল্পনাকে উত্তেজিত করে। আশ্চর্যের কথা এই যে এঁদের বিচারে সিনেমার অগ্রসর স্রষ্টাদের মধ্যে অনেকে কিন্তু সাধারণ চলচ্চিত্র-ইতিহাসিকদের কাছে আমলই পান না। কিন্তু এ কথা অনস্বীকার্য যে সিনেমা এঁদের হাতেই বয়স্ক হয়েছে এবং চলচ্চিত্রভাষার স্বাধীন বিকাশে এঁদের ভূমিকা অনেক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পরিচালকের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়। এঁদের মধ্যেই সেই কাহিয়ে-কথিত *Mise-en-Scene* (আক্ষরিক অনুবাদ সম্ভব নয়। শুধু বলা যেতে পারে যে সিনেমার ভাষার মাধ্যমে একটি বিশেষ ভাব বা মুড্ প্রকাশের চেষ্টা, যাকে আস্ত্রুক বলেছেন: "a certain way of extending the *elans* of the soul in the movements of the body") প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

এই নবতরঙ্গ আন্দোলনের এক বড় শরিক হলেন জাক্ দেমি। দেমির ছবিগুলোর মধ্যে বেশির ভাগই তাঁর স্বরচিত চিত্রনাট্য নিয়ে তৈরি, তাই সাহিত্য-নিরপেক্ষ মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের স্বাতন্ত্র্যের প্রকাশে দেমির অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেমির "লোলা" ছবিটি ম্যাকস্ ওফ্যুলস্‌কে উৎসর্গ করা এবং দেমির মেজাজের সঙ্গে ওফ্যুলস্-এর মেজাজের বেশ মিল লক্ষ করা যায়। ওফ্যুলস্-এর অনেক ছবির মতো দেমির ছবির কাঠামোও বৃত্তাকার। ঘটনা ঘুরে ঘুরে আসে, তারপর যেখানে শুরু হয়েছিল, সেখানেই শেষ হয়। তাছাড়া ওফ্যুলস্-এর অনেক ছবির গল্পের কেন্দ্র যেমন ভিয়েনা বা এমন কোনো শহর যার মধ্যে ওফ্যুলস্-এর সাধের স্ট্রাউস্-কনসার্ট-নন্দিত, অপেরাগীত-মুখরিত ভিয়েনা নগরীর আদল পাওয়া যায়, দেমির ছবিগুলোও তেমনি গড়ে উঠেছে ফ্রান্সের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চলগুলোকে (ন্যান্টীস্, শেরবুর্গ, নীস্) ঘিরে। এঁরা দুজনেই আবার ক্যামেরা ব্যবহারেও প্রায় একই ধরনের রীতির পক্ষপাতী। পুরনো নীতি অনুযায়ী এক শট্ থেকে আর-এক শট্-এ গতিসঞ্চারের বদলে এঁরা শটের মধ্যে ক্যামেরার গতির উপর জোর দেন বেশি। মণ্টাজ থেকে আধুনিক ধারার বিবর্তনে এ এক গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। ওফ্যুলস্-ছবির বিশেষ পরিচিত ভঙ্গী হচ্ছে তাঁর বিখ্যাত ট্র্যাকিং শট্ (জেমস্ ম্যাসন একবার ঠাট্টা করে ছড়া বেঁধেছিলেন: "A shot that does not call for tracks / Is agony for poor dear Max")। প্রসঙ্গত, "লোলা মণ্টেজ"-এর

সার্কাস দৃশ্যে ক্যামেরার স্বচ্ছন্দ গতি কিংবা ক্যানভাসে তুলি বোলানোর মতো "মাদাম ত্ত"-এর প্রসাধনকক্ষে ক্যামেরার অবিশ্রাম পরিক্রমা ওফ্যুলস্-এর শিল্পরীতি বিশ্লেষণে বিশেষ করে মনে পড়ে। দেমির দুটি ছবি "লোলা" এবং "আমব্রেলাজ অফ শেরবুর্গ"-এও ক্যামেরার একই ধরনের গতিময়তা চোখে পড়ে। ঘরে-বাইরে ক্যামেরা চরিত্রগুলোর সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় আর তাঁদের চলাফেরার গতির উপরই ক্যামেরার গতি নির্ভর করে। চরিত্রের সাথে চরিত্রের সম্পর্কে, সংঘাতে, আচার ব্যবহারে দেমির বৃত্তনির্ভর শিল্পভাবনা সহজেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই ফ্ল্যাশব্যাক ব্যবহার না করেও দেমি অতীত ও বর্তমানকে একই পটভূমিকায় উপস্থিত করতে পেরেছেন।

দেমির বিষয়বস্তু কি ? ওফ্যুলস্-এর খুব প্রিয় বিষয় যেমন নারী ও নারীর প্রেম, সেরকম দেমিব এক নায়কের সংলাপের মধ্যেই ("First love is always strong,"—"লোলা" ছবিতে রোঁলার উক্তি) পরিচালকের চিন্তাসূত্রটি ধরা পড়ে। প্রথম প্রেমের উৎকণ্ঠা, আনন্দ, উচ্ছ্বাস, বেদনা, এই অনুভূতিগুলোর রসোত্তীর্ণ সমাহারেই তৈরি দেমির শিল্পলোক। প্রেমের সমস্ত দিকগুলোই দেমি তাঁর ছবিতে এনেছেন আর তাঁর ছবিতে প্রেমের বিচিত্র গতি লক্ষ করেই সমালোচকেরা তাঁর ছবির সঙ্গে "অ্যাজ্ ইউ লাইক ইট"-এর তুলনা করেন। দেমির চরিত্ররা তাই তাদের সমস্ত অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও ছবির শেষে এক চরম পরিপূর্ণতায় হাজির হয়, কারণ দেমি জানেন যে আজকের পৃথিবীর অনিশ্চয়তা, ভয়, উদ্বেগ, ক্লান্তি সমস্তই দূর হয়ে যায় প্রেমের পবিত্র ছোঁয়ায়। আর এই জন্যেই বলা হয় যে দেমির পৃথিবীতে মৃত্যু ও পাপবোধ অনুপস্থিত। এমন নয় যে দেমি এগুলোর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর ভাবনার পরিমণ্ডলে এগুলো একেবারেই বেমানান। "আমব্রেলাজ অফ শেরবুর্গ"-এ দুটি মৃত্যুর ঘটনাই (এলিজ্ ও মাদাম এমেরী) ঘটেছে নেপথ্যে, দর্শকের অলক্ষ্যে। মৃত্যু এখানে আত্মার বিনাশ নয়, তার নবরূপান্তরমাত্র, (দেমির শিল্পচিন্তায় গীতার দার্শনিক প্রভাবের ইঙ্গিত অবশ্য আমার উদ্দেশ্য নয়) কারণ প্রেম মৃত্যুহীন, তাই ছবির পর ছবিতে চরিত্ররা নতুন নতুন সাজে ঘুরে আসে, প্রেমের ক্লান্তিহীন রঙ্গ অবিরাম গতিতে আবর্তিত হয়। প্রেমের রূপায়ণে দেমি আবেগের প্রশ্রয় দেন অবশ্যই, কিন্তু তাঁর ছবিতে আবেগের প্রকাশটাই অন্যরকম। এখানে আবেগ অর্থে চিরাচরিত সিনেমার নায়ক-নায়িকার ন্যাকামি নয়, আবেগ এখানে সমস্ত অনুভূতির শুদ্ধ নির্যাস। দেমির ছবিতে দৈব যোগাযোগগুলো তাই মোটেই আকস্মিক

নয়, ছবির প্রয়োজনেই তৈরি। বহুদিন পরে শৈশবসঙ্গিনীর সঙ্গে হঠাৎ দেখার যে-আনন্দ (লোলা-রোঁলা সাক্ষাৎ), রূপকথার রাজকন্যার শবরীর প্রতীক্ষাশেষে প্রিয়মিলনের পুলকময় মুহূর্ত (লোলা-মিশেল কাহিনী) কিংবা ব্যর্থ প্রেমের বেদনাবিধুর স্মৃতি ("আমব্রেলাজ-"এ রোঁলার সংলাপ), দেমি এগুলোকেই অক্ষয় করে রাখতে চান পর্দার বুকে। প্রেমের পবিত্র স্পর্শে তুচ্ছ ঘটনাগুলোও কাব্যিক দ্যোতনা পায়। তাই "আমব্রেলাজ অফ শেরবুর্গ"-এ সাধারণ সংলাপও গান হয়ে ওঠে, রঙের বিচিত্র ভঙ্গিমায় দৈনন্দিন জীবনযাত্রা এক বাস্তবাতিক্রান্ত রূপ পায়। তাই "লোলা"র সূর্যস্নাত ফোটোগ্রাফি কিংবা নাগরদোলায় স্লো-মোশন দৃশ্য নিছক চালাকি হয়ে থাকে না, বরং প্রথম প্রেমের চাঞ্চল্য ও স্বপ্নিল আবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

আগেই বলা হয়েছে দেমির কাছে প্রেমই মহত্তম পাবক। তাই লোলা সমস্ত পঙ্কিলতাশেষে প্রেমের যাদুস্পর্শে এক চরম শুদ্ধতায় উত্তীর্ণ হয়। লোলা—লোলার পাপ, লোলা মন্টেজের প্রায়শ্চিত্ত পার হয়ে দেমির লোলার উত্তরণ ঘটে এক স্বর্গীয় প্রশান্তিতে ! লোলা মন্টেজ-এর মতো আনুক এইমির লোলাকেও মনে হয় "a daughter of Eve, inheritor of Original Sin, still dizzy from the fall" ; কিন্তু এক সমালোচক যেমন বলেছেন যে ওফ্যুলস্ লোলা মন্টেজের চরিত্রের আধ্যাত্মিক মহিমা পুরোপুরি উপলব্ধি করবার জন্যই, অত নিপুণভাবে নরকের ছবি এঁকেছেন, তেমন "লোলা"-তে আনুকের চরিত্রায়ণে প্রেমের মত্ততা ও পবিত্রতা দুই-ই সার্থকভাবে চিত্রিত হয়েছে। "আমব্রেলাজ অফ শেরবুর্গ"-এ প্রাথমিক বিচ্ছেদ, বেদনা ও ব্যর্থতা সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত সমস্ত কিছুই জীবনে শিকড় খুঁজে পায়। আমার অবশ্য মনে হয় যে দেমি শেষ অবধি তাঁর মৌল বক্তব্যেই ("First love is always strong") স্থির থাকেন আর মিলনের চরম মুহূর্তেও নিশ্চয় সবাইকার মনেই রয়ে যায় সেই প্রথম প্রেমের ব্যথা, উদ্দামতা আর যন্ত্রণার অনুরণন। সেই বিচিত্র অনুভূতির সার্থক শিল্পরূপই জাক্ দেমির সিনেমা।

মৃগাঙ্কশেখর রায়

জাক্ দেমি নির্মিত দুটি ছবি "লোলা" ও "আমব্রেলাজ অফ শেরবুর্গ" কলকাতায় ফিল্ম-সোসাইটির প্রদর্শনী ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র-উৎসবে দেখানো হয়েছে।

কলকাতায় সোভিয়েত ব্যালে

প্রথমে প্লিসেৎস্কায়ার নাম শোনা গেছল, তারপর স্ত্রুচ্‌কোভার। শেষ পর্যন্ত বল্‌শই-এর বালেরিনাদের মধ্যে এলেন একা য়েলেনা রিয়াবিন্‌কিনা। য়েলিজাভেতা গের্ট্‌-এর দুই শিষ্যা প্লিসেৎস্কায়া ও স্ত্রুচ্‌কোভাই শ্রীমতী গালিনা উলানোভার পরে বল্‌শই-এর সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র। কলকাতার মঞ্চে বছর-বারো আগে প্লিসেৎস্কায়াকে দেখা গেছে। বিপরীত মেজাজ ও রীতির শিল্পী রাইসা স্ত্রুচ্‌কোভা সম্পর্কে তাই গভীর কৌতূহল ছিল। কিন্তু তাঁদের জায়গায় এলেন ভেরা ভাসিলিয়েভার শিষ্যা, প্লিসেৎস্কায়া-স্ত্রুচ্‌কোভার পরের জেনারেশনের শিল্পী রিয়াবিন্‌কিনা। প্লিসেৎস্কায়া 'মৃত্যুমুখিনী মরালী' নেচেছিলেন, রিয়াবিন্‌কিনাও নেচেছেন। কোনো তুলনা বোধহয় অধিকারবহির্ভূত। কিন্তু তবু প্রবেশেই 'পা দ্য বুরে' অর্থাৎ কেবল 'পয়েন্ট্‌স্‌'-এর উপর 'গ্লাইড্‌' করে প্রায় এক দীর্ঘ অর্ধবৃত্ত পরিক্রমান্তে এক আশ্চর্য কমনীয় পিরুয়েৎ-এর অখণ্ড মুভ্‌মেণ্টেই শ্রীমতী রিয়াবিন্‌কিনা মরালীর রূপকে প্রতিষ্ঠা করেন; পরে ঐ পা দ্য বুরে-র চলনেই হাতদুটোর ক্লান্ত ঝাপট উন্নত গ্রীবার ধারে জোড় বাঁধে। মঞ্চভূমির ব্যবহারে প্রথম অখণ্ড মুভ্‌মেণ্টের পরেই অন্য মুভ্‌মেণ্টগুলি যখন অপেক্ষাকৃত অনির্দিষ্ট হয়ে ভেঙে ভেঙে যেতে থাকে, তখনই মরালীর কমনীয় রূপের সঙ্গে মৃত্যুর ইঙ্গিত এসে লাগে। শেষ ভেঙে পড়ার সম্পূর্ণ নিশ্চলতায় নৃত্য সম্পূর্ণ হয়। ধ্রুপদী ব্যালে মাইম-এর দ্বারস্থ না হয়ে কেবল নৃত্যের অর্থময়তার উপরই নির্ভর করতে চায়। এই নৃত্যও তাই মূলত ব্যালেটিক্‌ থেকেছে, ধ্রুপদী ব্যালে-র পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত ভঙ্গিগুলির মধ্য থেকেই অপরূপ সুন্দরের মৃত্যুর নাটকীয়তা রচনা করেছে।

রিয়াবিন্‌কিনা-র 'মৃত্যুমুখিনী মরালী' ও পরে 'ডন্‌ কিয়োটে'-র 'কোর দ্য বালে' কিংবা মালিকা সাবিরোভা-র এক-একটি 'ভ্যারিয়েশন'-এ মনে হচ্ছিল, সোভিয়েৎ ব্যালে-র ধ্রুপদী রীতিতে নৃত্যশিল্পী ও গ্রাউণ্ড্‌-স্পেস্‌ বা মঞ্চভূমির পরস্পর-সংযোগেই বোধহয় কম্পোজিশনের বা নৃত্যরূপের প্রাণ, পশ্চাৎপটের ভূমিকা বোধহয় ততটা বড় নয়। বল্‌শই-এর নাট্যগৃহের বিরাটত্ব ও বহুস্তর গ্যালারির কথা স্মরণ রাখলে এটাই স্বাভাবিক মনে হয়। খ্যাতিমান ব্যালে-

তাত্ত্বিক আর্নল্ড্ হ্যাস্কেলের কোনো একটি লেখায় ড্রেস্সার্ক্ল্ বা ব্যাল্কনি থেকে ব্যালে দেখবার উপদেশটি হঠাৎ মনে পড়ে যায়। শ্রীমতী সাবিরোভা-র এক একটি পরিক্রমা শেষ হবার পরেও যেন মঞ্চভূমির গাত্রে একটি স্পষ্ট রেখার আউট্লাইন্ চোখে খানিকক্ষণ লেগে থাকে। 'রেমণ্ডা'-য় অবশ্য কোর ত্য বালে-র সমৃদ্ধতর রূপ দেখা যায়। শুধু মঞ্চভূমির গায়ে নয়, তার ওপরেও কম্পোজিশনের রূপটা চোখে পড়ে। রিয়াবিন্কিনা ও রোমানেঙ্কোকে পৃথক্ দুটি বৃত্তে ঘিরে, তারপর বৃত্ত দুটি ভাঙবার মুভ্মেণ্টেই পরস্পরকে পরস্পরের মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে দেওয়া, কিংবা রিয়াবিন্কিনার প্রবেশকে 'হাইলাইট্' করার জন্য তাঁর পিছনে একটি তির্যক প্রাচীর রচনা ও প্রবেশের মুভ্মেণ্ট অন্তেই আরো পিছিয়ে ছড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে ধরা পড়ে একক বালেরিনার সঙ্গে কোর ত্য বালে-র সমবেত নৃত্যের বিশেষ পারস্পরিক সম্পর্ক। অবশ্য বল্শই-এর চল্লিশজনের কোর ত্য বালে-র জায়গায় নিউ এম্পায়ারের অপরিসর মঞ্চে মাত্র আটজনের নৃত্যে সমষ্টির ভূমিকার কী আর পরিচয় পাওয়া যায়?

ব্যালে-র সামগ্রিক জটিলতায় শিল্পীর সঙ্গে পশ্চাৎপট, মঞ্চভূমি, ও কোর ত্য বালের পারস্পরিক সম্পর্ক বা ইণ্টার-অ্যাক্শনের মতোই বালেরিনা ও পুরুষ শিল্পীর মধ্যেকার সম্পর্কও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি 'পা ত্য দ্যো' বা দ্বৈত নৃত্যই প্রেমের নৃত্য। স্বভাবতই বালেরিনার প্রতি সহযোগী শিল্পীর গভীর মমত্ববোধ নারীদেহ ধারণের বা পরিচালনের প্রতিটি মুহূর্তেই স্পষ্ট হয়ে ওঠা উচিত। মাকারভ ও একিস্-এর নৃত্যে সেই আত্মবিস্মৃত সমর্পিতপ্রাণ পুরুষের ভূমিকা দেখা যায়। তাঁদের হাতে নারীদেহ যেন ভঙ্গুর কাচের বেলোয়ারী ঝাড়, এত সতর্ক, এত সাবধানী এই দেহধারণ। বরং রোমানেংকোর কাঠিন্য ও কিছুটা 'স্ট্রেন'-এর ভাব কিছুটা অস্বস্তির কারণ হয়েছিল।

এই মমত্ববোধের কোমলতা ও বহমানতা অবশ্য 'কোস্ট্ অফ হোপ'-এর আদাজিয়ো-য় রেভ্গেনি কুজ্মিনের নৃত্যে গভীরতর আন্তরিকতার স্পর্শে স্টাইলাইজেশন ছাড়িয়ে প্রচণ্ড মানবিক হয়ে উঠেছে। আধুনিক প্রতিদিনের পোশাকে ক্রনিনা ও কুজ্মিন্ প্রথমাংশে ব্যালের শুদ্ধ, রীতিপ্রকরণের মধ্যে চলতে চলতেই কুজ্মিনের একটি অতর্কিত চুম্বনে হঠাৎ থমকে দাঁড়ান। সহজবোধ্য মাইমে কুজ্মিনের আশঙ্কা, ক্রনিনার সংকোচ, কিছুক্ষণ দুজনে দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে তারপর ক্রনিনার সসঙ্কোচ সলজ্জ হাসির অঙ্গীকার, সঙ্গে সঙ্গেই কুজমিনের বাঁ হাতের একটি উদাত্ত ভঙ্গী, ক্রনিনার এগিয়ে আসা, এবং

নৃত্যের আবার গতিলাভ, এই দ্বিতীয় অংশটির নৃত্যভাষা এত পরিচিত ও ইম্‌প্রোভাইজেশনধর্মী, অথচ কোথায়ও এতটুকু সুর কাটে না। সাবেকী রীতির মধ্যেও নতুন চিন্তার এই বিপুল সম্ভাবনা আবার ধরা পড়ে বোচারোভা ও বভ্‌ট্-এর 'পুতুল' নৃত্যে। পুতুলের আড়ষ্টতা কখনও হাতের কখনও পায়ের সঞ্চালনে ধরে, ব্যালের ভঙ্গিগুলি অভিনয়ের চেষ্টা ও সেই চেষ্টায় ব্যর্থতা সার্কাসের ক্লাউনডের ধারাকে নিয়ে আসে। সচলতা ও আড়ষ্টতার ঐ পৌনঃপুনিক বিরোধে ব্যালে-র সাবেকী গাম্ভীর্যে সুস্থ পরিমিত কমিক্-এর অনুপ্রবেশ ঘটে।

যে পা দ্য বুরে 'মৃত্যুমুখিনী মরালী'র কমণীয় গতিময়তার দ্যোতনা, সেই একই পদচালনা 'পাথরের ফুল'-এর (প্রোকফিয়েভ্-এর শেষ ব্যালে, পাভেল বাঝভের লোককাহিনী অবলম্বনে) আদাজিয়োয় তাম্রপর্বতের মায়াবিনী দেবীর ভূমিকায় ফেদিচেভার অভিনয়ে মায়া ও শঠতার দ্যোতনা আনে। তাঁর সারা দেহের শাদা টাইট্‌স্-এ পাথরের শিরার বক্ররেখা ও দেহভঙ্গির সর্পিলতাই এই সর্পিল চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা করে। দানিয়েলার ভূমিকায় সোলোভিয়েভের চোখের দৃষ্টি ও দেহভঙ্গির অনিশ্চিত ভাঙা গতি ও ফেদিচেভার লতানো জড়িয়ে যাওয়ার তরল প্রবাহের বৈপরীত্যে একটিমাত্র পা দ্য দ্যো-র মধ্যেও নাটক গড়ে ওঠে। গ্রিগরভিচ্ ও ভিরসালাদ্‌জে-র আদি দৃশ্য পরিকল্পনায় সমগ্র মঞ্চ কালো মখমলে মুড়ে একটি গাঢ় সবুজ পশ্চাৎপটে হাল্‌কা সবুজ শিরা এঁকে দেওয়া হয়েছিল। শ্রীতাপস সেনের হাল্‌কা সবুজ ফিল্‌টারে আমাদের স্বাদ মেটাতে হল। চাইকভ্‌স্কি-র বিখ্যাত 'মরাল হ্রদের' তৃতীয় অঙ্কে ওদিলে-র ভূমিকায় আদিরখায়েভা আরেকটি খল-চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। পিরুয়েৎ ও ফুয়েত্তের সূক্ষ্ম নিপুণতায় এবং আবার কালো পোশাকের অর্থময়তায় তিনি ঐ মায়াবিনীর শক্তি ও প্রেমকে রচনা করেছেন। দেহভঙ্গির সাবলীল কুশলতায় অবশ্য 'কন্‌সোলেশন্' নৃত্যের শেষ মুভ্‌মেন্টে বিলালোভার আরাবেস্ক্ থেকে পিরুয়েৎ, পিরুয়েৎ থেকে অ্যাটিটিউডের আবর্তন পর্ব থেকে পর্বান্তরের সাবলীল পরিক্রমায় হঠাৎ অদ্ভুত চমক লাগায়। চাইকভ্‌স্কির 'রিফ্লেক্‌শন্' গ্রীগ-এর 'শিকারী ও পাখী' নৃত্যে এমা মিন্‌চোলক প্রধানত মাইম-এর উপরই নির্ভর করেছেন, হস্তকর্মের প্রাঞ্জলতায় ও ভাবাভিনয়ে তিনি খুব সহজেই তাঁর ভূমিকা সম্পন্ন করেছেন।

শুদ্ধ ব্যালে-র পরিধির বাইরে বভ্‌ট্-এর গোপাকের উদ্দাম রঙ্গে যেমন অ্যাক্রোব্যাটিক্‌স্-এর সহজ মজা পাওয়া যায়, বাশিরোভার ভারতীয় নৃত্যে

তেমনই হতাশ হতে হয়। বিশেষত, ভারতীয় সাজের সঙ্গে ব্যালের জুতোর দৃষ্টিকটু ব্যবহার স্তানিসলাভ্‌স্কির নামধন্য মিউজিক একাডেমির শিল্পীর কাছে অপ্রত্যাশিত। মাইকেল ফোকীন তো বহুকাল আগেই মিশরী বা গ্রীক পরিবেশে ব্যালে শূজ-এর ব্যবহার বর্জন করেছিলেন। ব্যালেটিক্ বাস্তবতার এই সহজ কথাটা আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে কেন?

অনুষ্ঠানশেষে মঞ্চের উপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী বলশই-এর খ্যাতিময়ী শিল্পী আইরিনা তিখোমির্নোভাকে দেখতে পাওয়া সৌভাগ্য বিবেচনা করেছি। হাতে প্রোগ্রাম নিয়ে মনে হয়েছিল, 'দিভের্তিস্‌মঁ'র বিচ্ছিন্ন পরস্পর-নিঃসম্পর্ক নৃত্যের ভিড়ে কী বা পাব? তাছাড়া আক্ষেপও তো ছিল: নিউ এম্পায়ারের অপরিসর মঞ্চের অসুবিধে, কিংবা কোথায় প্লিসেৎস্কায়া, স্ত্রুচকোভা, ফাদেচেভ্, লাপাউরি? কিন্তু দেখতে দেখতে খেদ ভুলতে হয়েছিল। তবু সব শেষে আক্ষেপ রইল: একটি পুরো ব্যালে নাট্য কবে দেখতে পাব? রবীন্দ্রস্মরণী তো সম্পূর্ণপ্রায়! এবার তো আর মঞ্চের সংকীর্ণতা বাধা হবে না! আর স্থানীয় আমলাতন্ত্রের কুৎসিত টিকিটের কেলেঙ্কারি থেকেও হয়ত মুক্তি আসন্ন।

অভিজিৎ ভট্টাচার্য

সোভিয়েত ব্যালে। বলশই থিয়েটার, লেনিনগ্রাদ একাডেমিক থিয়েটার অফ্ অপেরা অ্যাণ্ড্ ব্যালে, নোভসিবিস্ক্ থিয়েটার অফ অপেরা অ্যাণ্ড ব্যালে, ল্যাট্‌ভিয়ার স্টেট থিয়েটার, কাজাক স্টেট একাডেমিক থিয়েটার এবং স্তানিস্লাভ্‌স্কি নেমিরোভিচ্-দানচেংকো মস্কো একাডেমিক মিউজিক থিয়েটারের শিল্পীবৃন্দ। ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ভারতে সফররত। নিউ এম্পায়ার। ২৬শে ফেব্রুয়ারি।

বিবিধ প্রসঙ্গ

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে

পুরস্কার দিয়ে গুণের মূল্যায়ন হয় না; কিন্তু গুণীজন তার প্রাপ্য পুরস্কার না পেলে গুণের কদর যারা বোঝে, তাদের পক্ষ থেকে অভিযোগের কারণ নিশ্চয়ই ঘটে। অনেকেরই বিশ্বাস, বিষ্ণু দে সম্প্রতি সাহিত্য অকাদমির যে-পুরস্কার পেয়েছেন, তা তাঁর পাওয়া উচিত ছিল আগেই। কেননা এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে উত্তর-রবীন্দ্র যুগের শ্রেষ্ঠ কবিদের তিনি অন্যতম, হয়তো শ্রেষ্ঠতম, তবে এ বিষয়ে নিশ্চয় মতভেদের অবকাশ আছে।

বিষ্ণু দে-র কাব্যসাধনার আদিপর্ব সুরু হয়েছিল কল্লোল-যুগের শেষ পর্বে এবং তাঁর অন্তত একটি কবিতা যে-জাতীয় কল্লোলীয় কবিতা শনিবারের চিঠিকে খোরাক যোগাত তার নমুনা হিসেবে ঐ পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়েছিল। আধুনিক বাঙলা কবিতার ইতিহাসে এই কবিতাটির একটি বিশিষ্ট স্থান আছে কেননা কিশোর বিষ্ণু দে-রচিত এই কবিতাটির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ছিল, তার লক্ষ্য কল্লোলীয় কৈশোর মনোবৃত্তি।

এরপর বিষ্ণু দে-র কবিতায় যে-পরিণতি দেখা যায়, তার সাক্ষ্য রয়েছে 'পরিচয়'-এর সেই আদিযুগ থেকে সংখ্যার পর সংখ্যায়। সুতরাং বিষ্ণু দে-কে আমরা দাবি করতে পারি বিশেষভাবে 'পরিচয়'-এর কবি বলে। এ কথাও স্মরণীয় যে 'পরিচয়'-এর সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অগ্রজের মতন স্নেহে বিষ্ণু দে-কে একদা উপস্থিত করেছিলেন বাঙলার পাঠকসমাজে।

১৯৩৯ সালের একটি শুক্রবারের সন্ধ্যার কথা মনে পড়ছে। সেদিন 'পরিচয়'-এর সাপ্তাহিক অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন সরোজিনী নাইডু। সুধীন্দ্রনাথ তাঁকে পড়ে শোনালেন তাঁর নিজের ও অন্যের রচিত কতকগুলি বাঙলা কবিতা। যে দু'চারটি কবিতা সরোজিনী নাইডুকে বিশেষ স্পর্শ করেছিল, তার মধ্যে একটি 'চোরাবালি'। কবিতা বোঝার মতন ভালো বাঙলা অবশ্য তিনি জানতেন না কিন্তু ছন্দের কান তো ছিল। তাছাড়া, এ কবিতাটির মধ্যে আছে যে-প্রাণশক্তি, যে দুরন্ত আবেগ, যা বিশেষ করে ফুটেছিল সুধীন দত্তের গলায়, শ্রোত্রীকে তা মুগ্ধ না করে পারেনি।

বিষ্ণু দে-র এখনকার কবিতা পড়লে হয়তো মনে হবে সে তাপ হারায়ে

গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান; কিন্তু এ কথা নিশ্চিত যে বিষ্ণু দে-র লেখনীর গতিবেগ স্তিমিত হলেও তা নিরুদ্দেশ নয় এবং তাঁর কাব্যসাধনা নিশ্চয়ই প্রাচীন পাষাণে পরিণত হয় নি। সেই প্রথম প্রয়াসের জলোচ্ছ্বাস আজ হয়েছে অন্তঃসলিলা আর তাঁর কবিতায় বিকীর্ণ হচ্ছে এক বিরল গাঢ়বর্ণ। প্রবীণ বিষ্ণু দে অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠ হয়েছেন তাঁর স্বভূমিতে। আজকে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে…the Gods approve the depth, and not the tumult, of the soul.

কিন্তু বিষ্ণু দে-র কাব্য আলোচনা করার উদ্দেশ্যে এ প্রসঙ্গের অবতারণা করা হয় নি। তিনি আজ রাষ্ট্রীয় সম্মান অর্জন করেছেন: তার মূল্য যাই হোক না কেন আমরা, যারা 'পরিচয়'-এর আদি থেকে তাঁকে একান্ত আপন জন বলে জেনেছি, বন্ধু হিসেবে তাঁকে সমাদর করব—এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে যে রাজদ্বারে এবং অন্য দু'চারটি ক্ষেত্রে যে বান্ধব সেই হল প্রকৃত বান্ধব।

হিরণকুমার সান্যাল

গণ-অভ্যুত্থান

বসিরহাট থেকে আরম্ভ করে গত তিন সপ্তাহকাল ধরে (১৭ই ফেব্রুয়ারি—১০ই মার্চ) পশ্চিম বাংলায় যে প্রবল গণবিক্ষোভ বাহিত হচ্ছে, তাকে আকস্মিক বা অভাবনীয় বলবার উপায় নেই। সর্বাপেক্ষা বড় মিথ্যাচার তাকে শুধু 'রাজনৈতিক পার্টিদের প্ররোচনা' বলে শাসক-পার্টির নেতাদের আত্মসমর্থনের চেষ্টা। চোখ থাকলে স্পষ্টই বোঝা যায়—বিপুল জনসমাজের এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভের সৃষ্টি করতে পারে এমন পার্টি এখনো এদেশে জন্মায় নি, সম্ভবত তাকে সমুচিতভাবে পরিচালিত করতে পারে, এমন পার্টিও দেশে এই মুহূর্তে নেই;—বরং এইটাই বোধহয় এদেশের এখন প্রধান ট্রাজিডি। যে প্রতিজ্ঞায় রসিদ আলী দিবসের মিছিলের ছেলেরা পুলিশের বন্দুককে তুচ্ছ করে এগিয়ে যায়, এ-কালের কংগ্রেস-শাসকদের কেউ হয়তো তার সংবাদও রাখেন না। সেদিনও (১৯৪৫-এ), অবশ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব যে তার মর্ম বুঝেছিলেন, তা নয়। সে বিক্ষোভের নিন্দা করে, আর তার পরবর্তী

জনবিদ্রোহকে বিনষ্ট করেই তাঁরা রাজতক্তে পৌছেছেন। তথাপি জনশক্তির সঙ্গে সেদিনের সেই নেতাদের একটা মৌখিক পরিচয়ও ছিল। শাসকপর্যায়ে সমাসীন বর্তমান কংগ্রেস নেতাদের তাও অনভিপ্রেত। দেশবাসীর সঙ্গে তাঁদের একমাত্র যোগ ভোটের দায়ে—ভোটযন্ত্র আয়ত্ত থাকলে জনসমাজের মুখদর্শনেও তাঁদের ইচ্ছা নেই। আরামবাগের প্রফুল্ল সেন যদিই বা তার অর্থ বুঝতেন, রাজভবনের প্রফুল্ল সেনের পক্ষে অসম্ভব সে কথা বোঝা—কি করে চিরদিনের মৃদু-স্বভাব কৃষ্ণনগরের মানুষ পুলিশের উঁচানো রাইফেলের সামনে বুক এগিয়ে দিয়ে বলে—'করো গুলি। দেখি কত গুলি আছে তোমাদের রাইফেলে।' নন্দা সুব্রহ্মণ্যম-এর মতো নয়া দিল্লীর পুতুলদেরও যদি চোখ থাকত তাহলে বুঝতে দেরি হত না—কলকাতার এই শহীদের মৌন-শোভাযাত্রাকে স্তোকবাক্য দিয়ে রচনাও করা যায় না, থামানোও যায় না। যুগে যুগে মানুষের বুকে মহামানবের যে জন্মমন্ত্র কোলাহলে আচ্ছন্ন হয়েও স্তব্ধ হয়ে যায় না, এ জন-অভ্যুত্থানে সে মন্ত্রেরই উদ্ভাস। তা রাজনীতি-বর্জিত নয়, কিন্তু তার রাজনীতি জীবননীতির অঙ্গীভূত। তা বাচাবার মন্ত্র—মানুষ বাঁচতে চায়, খেয়ে-পরে বাঁচতে চায়, মানুষের মতো বাঁচতে চায়। আর সেই সাধারণ অধিকারও যখন কিছুতেই তার ভাগ্যে জোটে না, তখন সে মরীয়া হয়ে ওঠে,—মরতেও আপত্তি করে না, মারতেও না। রাজনৈতিক বোধ স্বচ্ছ থাকলে জনগণই তখন সেই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে সুশৃঙ্খলিত উদ্যমে-আয়োজনে সার্থকও করতে পারে। রাজনীতির ও রাজনীতিকদেরও তাই দায়িত্ব।—জনসমাজের বাঁচবার প্রচেষ্টাকে কর্মে ও বুদ্ধিতে সাফল্যদান করতে না পারলে রাজনীতিক পার্টির বাঁচা নিষ্ফল—সেই নিষ্ফলতার রাজনীতি থেকেই পরিত্রাণের আহ্বান নিয়ে এসেছে জনসমাজের এই বিপুল প্রাণোচ্ছ্বাস।

বুদ্ধি দিয়ে পরিষ্কার করে বোঝা দরকার—কী যন্ত্রণা বুকে নিয়ে বাঙালি জনসাধারণ জ্বলছে—আর কতদিন থেকে তার উপর সেই পীড়ন। যুদ্ধে, মন্বন্তরে, মহামারিতে, আর দেশবিভাগে ক্ষত-বিক্ষত মানুষ কতখানি ধৈর্য শৌর্য ও সংযমেরও পরিচয় দিয়েছে, তা কি কেউ ভেবে দেখে? বাঙালি বলতে যা-কিছু ছিল তার বাস্তব ও মানসিক আশ্রয় তার কতখানি সে হারিয়েও ধৈর্য হারায় নি। ভাত খায় বাঙালি ভাত জুটবে না; সে মেনে নিয়েছে নয় গমও সে খাবে; আধপেটাও থাকবে। মাছ খায় বাঙালি,

মাছ সে পাবে না; সর্ষের তেল ছাড়া তার রান্না হয় না,—সে যে-কোনো তেল চাইলে তা তার পক্ষে দুর্লভ। রসগোল্লা-সন্দেশ তার রুচি ছিল—তা এখন কলকাতায় নিষিদ্ধ, দিল্লীর বিলাস। এমনকি, বাঙালির বাংলাদেশও বাঙালির নয়—সেখানেও সে অর্থনৈতিক জীবনে উদ্বাস্তু। তার বাংলা ভাষা ও বাংলা সংস্কৃতিই কি সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ? তবু তো আসামের পীড়নে বাঙালি ক্ষিপ্ত হয় নি। তামিল অন্ধ্র-মহারাষ্ট্র-পাঞ্জাবের মতো ভাষার যুদ্ধে গৃহযুদ্ধ ঘোষণা করে নি। ভারতবর্ষ, ভারতরাষ্ট্রের ঐক্য, ভারতীয়তাবোধ বাঙালির মজ্জাগত ঐতিহ্য। ভারতের যে-কোনো রাষ্ট্রের তুলনায় বাঙালি বেশি এই ভারতীয় ঐক্যপন্থী। এই স্বাধীনতার যুগে আবার বাঙালি বেশি পীড়িত, বেশি সহনশীল এবং বেশি সংগ্রামী হয়েও বেশি সংযমী। এই মূল সত্য মনে না রাখলে, তাকে অপমান করা হবে। তার এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ অনেকদিনের ও অনেকদিকের অবহেলার ও পীড়নের বিরুদ্ধে আত্মার আর্তনাদ। এবং নিতান্তই শাসকগোষ্ঠী গুলিবর্ষণে তাকে শায়েস্তা করতে অগ্রসর না হলে, এই মুহূর্তেও সেই প্রধূমিত অগ্নি এমন জন-অভ্যুত্থানে জ্বলে উঠত না। এই অভ্যুত্থানে যে-সত্য বিঘোষিত হয়েছে তা এই—অন্ন চাই, প্রাণ চাই আর বর্তমান শাসননীতির অবসান চাই। আজ আঠার বৎসর যে-নীতিতে দেশ শাসিত হয়েছে, তার সপক্ষে বলবার মতো কথা নিশ্চয়ই আছে। নিশ্চয়ই বিদেশীয় শাসনে এই কলকারখানা, বাঁধ প্রভৃতি গড়া সম্ভব হত না। দু-চারজন টাটা বিড়লা এখন ফুলছেন, দু-চার হাজার কংগ্রেসম্যানই ফেঁপে উঠছেন। তাতে যার পেটে ভাত নেই, ঘরে আলো জ্বলবার একবিন্দু তেল নেই, তার কি সান্ত্বনা? সে বরং আপনার অভিজ্ঞতা হতেই বোঝে—ইংরেজ বিদেশী—শোষণই তো তার প্রধান লক্ষ্য হবেই, লুণ্ঠনই হবে তার পদ্ধতি। কিন্তু যারা দেশের নাম নিয়ে আজ গদিতে সমাসীন, সব বিষয়ে শাসনের ভার নিয়েছে, তারা সব বিষয়েই শোষণকে করেছে জঘন্যতর, সবদিকেই লুণ্ঠনকে করেছে অপ্রতিহত, দলগত ও ব্যক্তিগত চুরি, জোচ্চুরি, দুর্নীতিকে করেছে তাদের প্রধান পরিচয়। একদিকে দেশকে এই শাসকগোষ্ঠী দিয়েছে চোরাকারবারের হাতে তুলে, অন্যদিকে দেশকে দিচ্ছে বিদেশীয় ধনিকস্বার্থের কাছে বিকিয়ে। জাতির গণতান্ত্রিক জীবন-বিন্যাসকে করেছে দুর্নীতিগ্রস্ত ভোট-যন্ত্রের দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ। একচ্ছত্র পার্টি-রাজত্বের নিকট গণতান্ত্রিক নীতিকে একে একে দিয়েছে বলি, আর সমস্ত রাষ্ট্রকেই করে তুলেছে বন্দুক-সর্বস্ব কংগ্রেস লুণ্ঠনের বাহন।

বাঙালির এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে তার ক্ষুধার জ্বালা, বাঁচবার তাড়না এই মুহূর্তে একত্র হয়েই তাকে একবারের মতো উন্মাদনায় উদ্বেল করেছে। স্বতঃস্ফূর্ত এই জনতার অভিযানের পিছনে আছে ক্ষুধা, অভাব, সুদীর্ঘ গঞ্জনা; অন্তরের এই সুনিশ্চিত উপলব্ধি—এই শাসক-পার্টি ও শাসন-যন্ত্রের কাছে কোনো আশা নেই।—চালের নয়, ডালের নয়, তেলের নয় কেরোসিনের নয়, মাছের নয়, শিক্ষার নয়, স্বাস্থ্যের নয়, মনুষ্যত্বের নয়। নিজের শক্তিতেই পেতে হবে নিজের প্রয়োজন, প্রাণ দিয়েই বাঁচাতে হবে প্রাণ।

এইখানেই অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও পরীক্ষা।—শুধু কংগ্রেস শাসনকে উৎপাটন করাই যথেষ্ট নয়, চাই বাস্তব শুভবুদ্ধির যোগে এই জন-চেতনাকে সুস্থকর্মে সংগঠিত করা, জেলায়-জেলায় শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র-শিক্ষক সকলের সমবেত কর্মপরিষদ সুপ্রতিষ্ঠিত করা, তাকে আত্মগঠনে সক্রিয় করা; ধ্বংসে নয়, উৎপাদনে, বণ্টনে সৃষ্টিমূলক সাধনায় জয়ী করা। তাই চাই যা আশু প্রয়োজন সেই দাবিকে প্রথম আয়ত্ত করা—পুলিশের ও মিলিটারির অত্যাচার ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গঠন, চাই আরও খাদ্য, আরও কেরোসিন তেল; এই বন্দুক-বিলাসী সন্ত্রাসবাদী শাসনব্যবস্থার বিচার ও বন্দিমুক্তি। সঙ্গে সঙ্গে এই গণতন্ত্রনাশী বিচারহীন ব্যবস্থার অবসান; জরুরি অবস্থার বিলুপ্তি। সর্বশেষে, কংগ্রেস-শাসনের নির্বাসন; জনমুক্তি, জনতার দলসমূহের এক মুক্ত স্বাধীন সমবেত ফ্রণ্টের শাসন প্রতিষ্ঠা।

কংগ্রেসের পরীক্ষার দিন আজ আর নেই—তা শেষ হয়ে গিয়েছে। এখন এসেছে সত্যকারের জনমুক্তিবাদী দলসমূহের পরীক্ষার মুহূর্ত। না, দল নয়, খাদ্য হোক, জীবন হোক এখন লক্ষ্য।—ক্ষমতা নয়, জনসংগঠন, জনতার আত্মপ্রতিষ্ঠা হোক সাধনা॥ ১৬।৩।৬৬ ইং

গোপাল হালদার

পশ্চিম বাংলায় পুলিশী সন্ত্রাস : বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ

প্রায় একপক্ষ কাল ধরে পশ্চিমবাংলা জুড়ে যে শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেল, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, এ বিষয়ে বাংলাদেশের প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের বৃহত্তম অংশের মধ্যেই বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। নেতৃত্বহীন মানুষ নির্মমতম পুলিশী নির্যাতনের মুখে নিষ্ফল আক্রোশে সরকারী সম্পত্তির উপর

আক্রমণ চালিয়েছে। তারপর পুলিশী অত্যাচার তীব্রতর হয়েছে। চব্বিশ পরগণায়, কলকাতায়, নদীয়ায় একই ঘটনা—আগে পুলিশের বেপরোয়া গুলীচালনা, তারপর বিক্ষুব্ধ মানুষের প্রচণ্ড রোষ। ১৫ মার্চ তারিখ থেকে আনন্দবাজার পত্রিকা যে আঞ্চলিক সমীক্ষা প্রকাশ করে চলেছেন, তাতে পুলিশী অত্যাচারের নারকীয় রূপের নগ্ন প্রকাশ যে-কোনো সৎ মানুষকে স্তম্ভিত করে। একদিকে যখন মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী কী আশ্চর্য বালিকাসুলভ প্রত্যয়ে প্রশ্ন করেন, "এ-আন্দোলনের পিছনে পরিকল্পনাই যদি না থাকবে, তবে অতগুলো জায়গায় একই সঙ্গে আন্দোলন হয় কেন ?"—কিংবা রাজ্যের আত্মসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী ৬৪,০০০-এর পুলিশবাহিনীকে আরো বাড়াবার সুপারিশ করেন, তখন রাজ্যব্যাপী পুলিশী দৌরাত্ম্যের পেছনে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের গণতন্ত্র-নিধনের সুচারু পরিকল্পনার ছায়া দেখা যায়—জনসাধারণকে সামান্যতম অছিলায় ইতরতম কাপুরুষোচিত নির্যাতনে নিগৃহীত করে তার গণতান্ত্রিক বিক্ষোভ প্রকাশের সহজাত আবেগকেই ত্রাসে স্তব্ধ করে দেবার এ এক চক্রান্ত।

এবারের পুলিশী সন্ত্রাসের পিছনে এই কুৎসিত রাজনৈতিক চাল বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীরা শুরুতেই লক্ষ্য করেছিলেন। তাই ৯ মার্চ তারিখে ডঃ নলিনাক্ষ্য সান্যাল, শ্রীঅজিতকুমার দত্ত, ডাঃ নীহারকুমার মুনশী প্রমুখ কয়েকজন এক বিবৃতিতে ১০ মার্চের সাধারণ ধর্মঘটের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বলেন : "ক্ষুধার্ত মানুষের কান্না রাইটার্স বিল্‌ডিংকে টলাতে পারে নি। বিধানমণ্ডলীর মাধ্যমে সংবিধানগত পন্থায় সংকট সমাধান করতে দেওয়া হয় নি। এমনকি কয়েকজন কংগ্রেসী সদস্য সৎপরামর্শ দেওয়ার চেষ্টা করতে গিয়ে বহিষ্কারের হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন। বড় জোতদার, মুনাফাশিকারী ও মজুতদারদের স্বার্থরক্ষায় কিংবা মূলত রাজনৈতিক অভিসন্ধি নিয়েই বামপন্থী নেতারা এই খাদ্য আন্দোলন কেঁদেছেন বলে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন যেভাবে তাঁদেরই উপর দায়িত্ব চাপিয়েছেন, তা আদৌ বিশ্বাস হয় না। শাসকশ্রেণীকে পুলিশের লাঠি ও বুলেটের উপর নির্ভর করতেই হয়, তাঁর এই দাবিও কেউ-ই সমর্থন করবেন না। সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা, অভিযান, এবং জনসমর্থনলাভের জন্য সভাসমাবেশের যে গণতান্ত্রিক অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত, সেই অধিকার কখনই ছেড়ে দেওয়া চলে না।" সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা জনসাধারণের কাছে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার আবেদন জানান।

১০ ও ১১ মার্চ অবস্থার আরো অবনতি ঘটে। ১১ মার্চ রাত্রে

ডঃ ত্রিগুণা সেন, ডঃ বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী, শ্রীশৈবাল গুপ্ত, শ্রীসত্যজিৎ রায়, শ্রীঅজিতকুমার দত্ত ও শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রীকে এক তারবার্তা পাঠান: "পরিস্থিতি শোচনীয়। নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত। জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার স্বার্থে আলোচনা শুরু করার জন্য আপনার উপস্থিতি ও হস্তক্ষেপ প্রয়োজন।"

১২ মার্চ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কলকাতায় এলে সিনে টেক্‌নিশিয়ান্‌স অ্যাণ্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের পক্ষে সর্বশ্রী সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর কাছে এক খোলা চিঠিতে লেখেন: 'প্রিয় নন্দাজী, কলকাতা এবং সমস্ত পশ্চিমবাংলা জুড়ে গত কয়েকদিন ধরে যে-ঘটনা ঘটে চলেছে তা যে কোনো সংবেদনশীল মানুষকে ক্ষুব্ধ, বিস্মিত ও ব্যথিত করে তুলবে। অনেক ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর, অনেক প্রাণ নষ্ট হবার পর আজ আপনি কলকাতায় এসেছেন শান্তি ফিরিয়ে আনতে। এর আগেও আপনি একবার এসেছিলেন। কলকাতায় তখন ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় কালো রক্তের স্রোত বইছিল। সেদিন কলকাতার কলঙ্ককে শক্ত হাতে মুছে ফেলতে যে সাহসের ও সততার প্রয়োজন ছিল, কলকাতার পুলিশের না থাক, আপনি সেদিন তা দেখিয়েছিলেন। আপনারই রাজ্য সরকারের উদ্যোগে মনুমেন্টের তলা থেকে সেদিন দাঙ্গার বিরুদ্ধে শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। তার পুরোভাগে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের অনেকেই আজ আপনারই ভারতরক্ষা আইনে আটক। আজ আবার আপনি এসেছেন, আবার আজ রক্তের স্রোত বইছে কলকাতায় এবং সমস্ত পশ্চিম বাংলায়। এবং এই নৃশংসতার মূলে রয়েছে আপনারই রাজ্য সরকার, আপনারই মুখ্যমন্ত্রী, আপনারই পুলিশ।

নন্দাজী, আমরা রাজনীতি বুঝি না। কিন্তু দেশের মানুষের মনের কাছাকাছি আমরা আছি। তাই আমরা বুঝি যে, আজ সমস্ত বাংলাদেশ আপনার রাজ্য সরকার, সরকারের মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর পুলিশের দিকে অভিযোগের তর্জনী তুলে ধরেছে। তাই আজ আর আপনার কাছে আমরা রাজ্যসরকারের সাফাই শুনতে প্রস্তুত নই। বিনা দ্বিধায় এবার বলুন: (১) পুলিশী জুলুমের বিচার-বিভাগীয় তদন্ত অবিলম্বে করবেন। (২) ভারত-রক্ষা আইনে ধৃত সমস্ত রাজবন্দীদের মুক্তি দেবেন। (৩) খাদ্য ও কেরোসিনের হাহাকার ঘোচাবেন। (৪) জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে তাকে মেনে নেবেন।

সর্বশেষ আমরা এইটুকু আশা করব যে দেশে আপনারা এমন অবস্থার সৃষ্টি করবেন যাতে সরকারের একরোখা দম্ভ, মন্ত্রীদের বিকৃত মানসিকতা এবং পুলিশের নৃশংসতাণ্ডব আর কখনও আমাদের না দেখতে হয়।"

১৩ মার্চ তারিখে শহরদম্পতিতে এক অভূতপূর্ব সুদীর্ঘ মৌন শোকমিছিল কলকাতায় পথ পরিক্রমা করে। শোভাযাত্রার সূচনায় শহীদবেদীতে মাল্যদান করেন শ্রীসত্যজিৎ রায়। সেদিনকার শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন শ্রীরায় ছাড়াও সর্বশ্রী মৃণাল সেন, তাপস সেন, বিজনাবরণ সেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, শোভা সেন, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত, সবিতাব্রত দত্ত, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, দেবব্রত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ শিল্পীসাহিত্যিকেরা। সেইদিনই সর্বশ্রী ত্রিগুণা সেন, গোপাল গুপ্ত, সত্যজিৎ রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, নীহার মুন্সী, অমিয় বসু ও অরুণ সেন এক বিবৃতিতে বলেন: "গত কয়েকদিনের বেপরোয়া জীবন এবং সম্পত্তি নষ্টের ঘটনা পরিতাপের বিষয় কিন্তু সেই সঙ্গে আমরা সমস্যাকে অবহেলা করতে পারি না!" তাঁরা সকল রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবি জানিয়ে সরকার ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে বৈঠকের প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, ও খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সরকারী এবং বেসরকারী প্রতিনিধিদের নিয়ে সারা বাংলা খাদ্য ও কৃষি সম্মেলনের প্রস্তাব করেন। ঐদিনই শ্রীনন্দার সঙ্গে সাক্ষাৎকালে তাঁরা সমগ্র সংকটের জন্য রাজ্যসরকারকে দায়ী করে জানিয়ে দেন যে এই আন্দোলন খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব থেকেই উদ্ভূত, এ-আন্দোলন রাজনৈতিক নয়। আলোচনাকালে তাঁরা অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি জানান। ডঃ ত্রিগুণা সেন শিক্ষকাশিক্ষিকা ও ছাত্রছাত্রীদের ছুটির সময়ে ধান সংগ্রহের কাজে নিয়োগের প্রস্তাব করেন।

একদিকে যেমন বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীসমাজের বৃহত্তর অংশ সুস্থ নাগরিক চেতনা থেকেই এই স্বতঃস্ফূর্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, অন্যদিকে তেমনি একাংশ বিভ্রান্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি-উন্নয়ন পরিষদের পক্ষে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, আবু সয়ীদ আয়ুব, মৈত্রেয়ী দেবী, নারায়ণ চৌধুরী প্রমুখের বিবৃতিতে জাতীয় সম্পত্তির ধ্বংসে অতি সংগত ক্ষোভ ও "উদ্‌ভ্রান্ত হিংসাত্মক কার্যকলাপের" বিরুদ্ধে প্রতিবাদের পাশাপাশি গুলিচালনা ও প্রাণনাশের বিস্ময়কর অনুল্লেখে বিবৃতির "নৈতিক"

সুরটি অত্যন্ত ফাঁপা, কৃত্রিম ও অর্থহীন বলে ঠেকে। শ্রীনির্মলকুমার বসুও যখন 'হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় গণতন্ত্ররক্ষার প্রয়োজনে "সরকারকে সবকিছু করে দিতে না বলে নিজেরাই সরকারের সাহায্যে" কাজে নেমে পড়ার প্রস্তাব রাখেন, এবং রাজ্যসরকারের স্বতন্ত্র অধিকারে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন, তখন বাস্তব পরিস্থিতি ও রাজ্যসরকারের মনোভাব বিবেচনা করে তাঁর চিন্তা অত্যন্ত সাধু অথচ অবাস্তব বোধ হয়। শ্রীবসু নিঃসন্দেহেই ভারতের সর্বাগ্রগণ্য জীবিত সমাজতাত্ত্বিক। সমাজের চেহারা কি তিনি তাকিয়ে দেখতে পান না? বিধানমণ্ডলীর মধ্যে সরকারপক্ষের আচরণে, জনপ্রতিনিধিদের কারারুদ্ধ করে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে সমূহ আলোচনার সম্ভাবনাকে হত্যা ও পুলিশী নির্যাতনের অনাচারে গণতন্ত্রের কতটুকু অবশিষ্ট থাকে, শ্রীবসু ভেবে দেখবেন কী? গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্যই এবার কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের দাবি উঠেছিল। রাজ্যসরকারের হাতে গণতন্ত্রই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। ১৬ মার্চ তারিখের বিবৃতিতে ডঃ সন্তোষকুমার ভট্টাচার্য, শ্রীঅমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ও ডঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ কয়েকজন বিরোধী পক্ষের নেতৃত্বের ব্যর্থতায় জনসাধারণের হিংস্র ধ্বংসলীলায় দুঃখপ্রকাশ করেও মুখ্যমন্ত্রীকেই দায়ী করেছেন: "আলোচনায় বসবার যে-প্রস্তাব বিরোধী দলগুলি এনেছিলেন, সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাই পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান অপরাধ। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেই মুখ্যমন্ত্রী দেখিয়ে দেন যে তিনি কোনো মতৈক্যে পৌছনোর প্রয়াসকেও বাধা দিতে বদ্ধপরিকর।"

অঞ্জিষ্ণু ভট্টাচার্য

এই আকাশের নিচে

সম্প্রতি ভারতসরকারের হুকুম জারি হয়েছে যে শ্রীযুক্ত মৃণাল সেনের ছবি 'নীল আকাশের নিচে' আর দেখানো চলবে না। খবরটা কাগজে পড়ে অনেকেরই একটু আশ্চর্য লেগেছে কেননা ছবিটা বেশ কয়েক বছরের পুরনো আর তা অনেককালই দেখানো হয় নি। তাহলে হঠাৎ এই নিষেধাজ্ঞা কেন? ভারত-সরকার কি সহসা প্রত্নতত্ত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন? আর ছবিটিতে এমন কী-ই বা আছে যার জন্যে এইরকম হুকুমজারির প্রয়োজন ছিল? নানা ঘটনার চাপে পুরনো কথা মনে রাখা একটু কঠিন হয়ে পড়েছে। যাই হোক,

অনেক মাথা চুলকিয়ে মনে পড়ল এই ছবির নায়ক এক চীনে ফেরিওয়ালা, যে আজন্ম বাস করেছে কলকাতায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত সে ফিরে গেল দেশে। কী সর্বনাশ! দেশে যে তখন বিপ্লবী চীনেদের রাজত্ব, যারা হানা দিয়েছে ভারতের সীমান্তে—যদিও সেই পঞ্চশীলের যুগে এসব ব্যাপার কিছুই ঘটে নি। কিন্তু তবু তো বোঝা উচিত ছিল যে চৈনিক বিপ্লবের পরিণতি হবে ভারত-আক্রমণ! অবশ্য শুধু মূঢ় মৃণাল সেন বোঝেন নি তা নয়, আমাদের কর্তৃপক্ষও যে এ-সম্পর্কে খুব সজাগ ছিলেন তার কোনো পরিচয় পাওয়া যায় নি। কিন্তু আমাদের সরকারবাহাদুর অর্থাৎ আমলাতন্ত্র, যাঁদের পরামর্শে অনেক সরকারী নীতি নির্দিষ্ট হয়, সম্প্রতি যে ইতিহাসসচেতন হয়েছেন তা খুব আশার কথা। শুধু ইতিহাসসচেতন নয়, ত্রিকালদর্শী। কেননা ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকে তাঁরা দেখছেন এক অখণ্ড পারমার্থিক বোধে।

আমার কিন্তু ছবিটির প্রতি কেমন একটু মায়া হয়ে গেছে, মনে হয় আরেকবার দেখলে খুশি হতাম। তাই মৃণাল সেনকে আমার একান্ত অনুরোধ যে তিনি এই ছবিটির একটি উপসংহার রচনা করুন। তাতে থাকবে ঐ বিভ্রান্ত চীনবাসী স্বদেশে বিপ্লবের ব্যাভিচার দেখে এতই বেদনা পেলেন যে ত্বরিতে ও ত্রস্তপদে একক অভিযানে ভারত-চীনের সীমান্ত অতিক্রম করে আবার ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করে বড় বড় আমলাদের বাড়িতে নানাজাতীয় দুষ্প্রাপ্য শৌখিন জিনিস সরবরাহ ও সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান চীন সম্বন্ধে বিক্ষোভ-প্রকাশ শুরু করলেন। এরকম একটি পরিশিষ্ট হলে ছবিটি নিশ্চয় দেশাত্মবোধের প্রকৃষ্ট নিদর্শন হিসেবে আমলাতন্ত্রের সাগ্রহ অনুমোদন অর্জন করবে।

হিরণকুমার সান্যাল

মঞ্জুলিকা দাশ

সম্প্রতি তরুণ কবি মঞ্জুলিকা দাশ রক্তের কর্কট রোগে পরলোকগমন করেছেন। প্রতিশ্রুতিময়ী এই কবির অকালমৃত্যু সত্যই বেদনাদায়ক ও শোকাবহ। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিজন ও বন্ধুদের সমবেদনা জ্ঞাপন করছি। শ্রীযুক্তা দাশের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত রচনাবলীর একটি সুনির্বাচিত সংকলন প্রকাশ করে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে কোনও প্রকাশক এগিয়ে এলে আমরা যথার্থই আনন্দিত হব। ঐ গ্রন্থ প্রকাশ করেই তাঁর স্মৃতির প্রতি যথাযোগ্য শ্রদ্ধা দেখানো সম্ভবপর।

তরুণ সান্যাল

পা ঠ ক গো

একটি প্রস্তাব

'পরিচয়ে'র পৌষ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র মহাশয়ের সুদীর্ঘ প্রবন্ধে ভাস্কর্যে "সম্মুখীন তত্ত্বের" অনেক কথা আছে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত মিথুন তত্ত্বের গোড়ার কথা তেমন নাই।

আমি পরিচয়ের পাঠক মহাশয়দের অনুরোধ করিতেছি যেন তাঁহারা 'রূপম্' পত্রিকার ১৯২৫ সালের এপ্রিল-জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত "Mithuna in Indian Art" প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখেন।

শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সংনাট্যের অভিধা: ভ্রমসংশোধন

বিগত পৌষ ১৩৭২ সংখ্যা 'পরিচয়ে' প্রকাশিত 'সংনাট্যের অভিধা' শীর্ষক প্রবন্ধে আমার অনবধানতাবশত ত্রুটিপূর্ণ উক্তি প্রকাশিত হয়েছে। সেগুলির সংশোধিত রূপ লেখা হল। আগামী সংখ্যা পরিচয়ে এই ভ্রমগুলি সংশোধন করলে বাধিত থাকব।

৭৩৪ পৃ. দ্বিতীয় প্যারায় ৭ম লাইনে পড়তে হবে মঞ্চসজ্জা শুধুমাত্র রিপ্রেজেন্টশন্যাল হল না—অনেক তুচ্ছতা, বাহুল্যকে পরিহার করে গভীরতা আনার ও অর্থবহ করার চেষ্টা হল।

৭৪৬ পৃ. এবং ৭৪৭ পৃ. টলস্টয়ের নাম যুক্ত করে যে কাহিনীর কথা বলা হয়েছে তা গোর্কির নামের সঙ্গে যুক্ত হবে।

৭৪৮ পৃ. ৮ম লাইনে পড়তে হবে 'পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে ব্যক্তিমানুষের এ ট্রাজেডি যেন বার বার না অভিনীত হয়।'

কুমার রায়

'লঘুগুরু' প্রসঙ্গে: নাট্যকারের কৈফিয়ৎ

'পরিচয়'-এর আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় ঋতায়ন নাট্যগোষ্ঠী প্রযোজিত 'লঘুগুরু' নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখক আমাকে না বলে পরস্বাপহরণের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানাই ঋতায়ন নাট্যগোষ্ঠী কর্তৃক

অভিনীত হবার অনেক আগেই নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে (নব গ্রন্থকুটীর, কলকাতা-১২) এবং তাতে অস্কার ওয়াইল্ডের কাছে যথোচিত ঋণস্বীকার করা হয়েছে। কোনো নাট্যসংস্থা যদি তাঁদের কোনো অনুষ্ঠানে তা অনুল্লেখ রাখেন, তার জন্যে লেখককে গালাগালি করা ধীরবুদ্ধির পরিচায়ক নয়। সমালোচক শ্রীঅজিষ্ণু ভট্টাচার্য যিনি সম্প্রতি (শারদীয় 'বহুরূপী') রবীন্দ্র-কথিত 'কটুভাষাব্যবসায়ী সাহিত্যিকগুণ্ডা' উক্তিটির প্রতি আমাদের সময়োচিত দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাঁর কাছ থেকে আর একটু সতর্কতা আশা করেছিলুম।

অতনু সর্বাধিকারী

মাকীয়তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদ

গত কার্তিক সংখ্যার 'পরিচয়ে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'মাকীয়তত্ত্ব ও আপেক্ষিকতাবাদ' আলোচনাটি নিশ্চয়ই আমার মতো আরও অনেক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অত্যন্ত দুরূহ বিষয়ে সহজ আলোচনার সূত্রপাত করার জন্যে শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্যবাদার্হ। কিন্তু তাঁর আলোচনা অনিবার্য কারণেই সচেতন পাঠকের মনে কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করবে, যে-প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর না পেলে এ-আলোচনার সঠিক পটভূমি অনুমান অসম্ভব।

শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনার লক্ষ্য যদি হয় মাকীয়তত্ত্বের সঙ্গে আপেক্ষিকতাবাদের সম্পর্ক নির্ণয় এবং 'পরিচয়ে'র মতো একটি বাংলা মাসিকে এ-আলোচনা প্রকাশের উদ্দেশ্য যদি হয় আমাদের মতো সাধারণ পাঠকের সামনে এই দুই জটিল তত্ত্বের পরস্পরনির্ভরতার একটা সহজ পরিচয় তুলে ধরা তাহলে বলব গোড়াতেই তাঁর উদ্দেশ্য লক্ষ্যভ্রষ্ট। কারণ মাকীয়তত্ত্বটা যে আসলে কী তা তিনি সমস্ত আলোচনায় কোথাও স্পষ্ট করে বলেন নি। তিনি আলোচনা শুরু করছেন বিশপ বার্কলির উদ্ধৃতি দিয়ে যেখানে তিনি বলেছেন আপেক্ষিক গতি ছাড়া অন্য কোনো গতির কথাই ভাবা যায় না। তারপর তিনি বললেন মাকও নিউটোনীয় চরমশূন্যের কথা অস্বীকার করেছেন এবং তার থেকে সিদ্ধান্ত করলেন মাকও নৈয়ায়িক সদর্থবাদী (logical positivist)। কিন্তু এটা আদৌ বোঝা গেল না যে এই অস্বীকারের দ্বারাই কি মাক নৈয়ায়িক সদর্থবাদী হয়ে গেলেন ?

অতঃপর অসিতবাবু এক লাইনে সদর্থবাদ কী এবং সম্ভবত সদর্থবাদের

সমর্থনে গণিতবিদ্ পঁয়করও যে সদঅর্থবাদী ছিলেন সে-কথা বলে শেষ করেছেন। হঠাৎ পঁয়করের নাম উঠল কেন, এবং উঠলই যদি, তিনি কেন এবং কোন অর্থে সদঅর্থবাদী সে-কথা একটু পরিষ্কার করে বললে আলোচনাটা স্পষ্ট হত না কি? কিন্তু এহ বাহ্য। অসিতবাবু লিখছেন: "গণিতবিদ সহজ সরল কোনো গাণিতিক স্থত্রের মাধ্যমে দুরূহ কোনো অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করেই খালাস।" সম্ভবত সঙ্গে সঙ্গে অসিতবাবুও খালাস, তাই তিনি লিখলেন: "তাকে উল্টে-পাল্টে বুদ্ধি দিয়ে, চিন্তা দিয়ে বোঝা অনাবশ্যক।" হ্যাঁ অনাবশ্যকই তো। নিশ্চয়ই অনাবশ্যক, কারণ উল্টানো-পাল্টানোর সমস্ত ব্যাপারটাই গাণিতিক ব্যাখ্যাতে হয়ে গেছে, তার পরের যা কাজ সেটা প্রয়োগবিদের। কিন্তু সৎ গণিতবিদ যেমন আইনস্টাইন, ম্যাক্স প্লাঙ্ক এমনকি মাক্ বা বোগদানভও যে গাণিতিক ব্যাখ্যা খাড়া করেছেন সেটাই কিন্তু যথেষ্ট এবং সেটাই প্রমাণ করে যে জগতের স্বরূপ বাস্তব এবং দ্বান্দ্বিক, আর ঠিক সেইজন্যেই বুর্জোয়া বৈজ্ঞানিকেরা উল্টে-পাল্টে দেখতে ভয় পান পাছে আসল সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং সেই সত্যকে চাপতে গিয়ে তাঁরা হয়ে পড়েন নৈয়ায়িক সদঅর্থবাদী এবং লেনিনের করুণার পাত্র (Materialism and Emperio-Criticism, Ch. 1)। অতঃপর অসিতবাবু সমস্ত ৪০২ পাতায় যে-বক্তব্য রেখেছেন তাতে মাকীয়তত্ত্ব বোঝাতে কি সুবিধা হলো ঠিক বোঝা গেল না। ৪০৩ পাতার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বিদ্যুৎচৌম্বকক্ষেত্রতত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতত্ত্ব স্পষ্ট বোধগম্য হল কিন্তু যখন অসিতবাবু বললেন: "আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদে মাকীয়তত্ত্বের চরিত্রটি সব সময় খুব স্পষ্ট না হলেও তিনি যে এর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই...," তখন কিন্তু আমাদের তাঁর নিজের বোধশক্তি সম্পর্কেই সন্দেহ জাগে। কারণ তিনিই বলছেন: "আইনস্টাইনের ধারণায় এবং মাকীয়তত্ত্বে এই জায়গায় একটা ঠোকাঠুকি লেগে যাচ্ছে," অর্থাৎ গোড়াতেই গলদ, মূলেতেই পার্থক্য। পরেও সমীকরণে নতুন সংখ্যার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে আইনস্টাইন যে দ্বিধামুক্ত হতে চেয়েছেন তাতে তিনি মাকের দ্বারা প্রভাবান্বিত হলেন না মাকের প্রভাবকে অস্বীকার করলেন সে-কথা অসিতবাবু পরিষ্কার করে বললেন না।

অসিতবাবুর প্রবন্ধের শেষ অংশে নারলিকারতত্ত্বের সহজবোধ্য আলোচনার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ। কিন্তু এখানেও একটা প্রশ্ন থেকে গেল। সবিনয়ে সেই প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করে শেষ করছি: মাকীয়তত্ত্ব কীভাবে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে নতুন মহাকর্ষতত্ত্বের জন্ম হলো?

তিমিররঞ্জন মুখোপাধ্যায়

পরিচয়

১৯৫৬ সালের সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) আইনের
৮ ধারা অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

১। প্রকাশের স্থান—৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

২। প্রকাশের সময়-ব্যবধান—মাসিক

৩। মুদ্রক—অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ভারতীয়, ৪০ রাধামাধব সাহা লেন, কলিকাতা-৭

৪। প্রকাশক— " " " "

৫। সম্পাদক—গোপাল হালদার ; ভারতীয়

৬। পরিচয় প্রাইভেট লিমিটেডের যে সকল অংশীদার মূলধনের একশতাংশের অধিকারী তাঁদের নাম ও ঠিকানা :

১। গোপাল হালদার, ফ্ল্যাট নং ১৯ ; ব্লক "এইচ", সি. আই. টি. বিল্‌ডিংস্‌, ক্রিস্টোফার রোড, কলিকাতা-১৪ ॥ ২। সুনীলকুমার বসু, ৭৩।এল, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা- ৯ ॥ ৩। অশোক মুখোপাধ্যায়, ৭ ওল্ড বালিগঞ্জ রোড, কলিকাতা-১৯ ॥ ৪। হিরণকুমার সান্যাল, ৮ একডালিয়া রোড, কলিকাতা-১৯ ॥ ৫। সাধনচন্দ্র গুপ্ত, ২৩ সার্কাস এভিনিউ, কলিকাতা-১৭ ॥ ৬। স্নেহাংশুকান্ত আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলিকাতা ২৭ ॥ ৭। সুপ্রিয়া আচার্য, ২৭ বেকার রোড, কলকাতা-২৭ ॥ ৮। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ৫বি ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ৯। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১।৩ ফার্ন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ১০। শীতাংশু মৈত্র, ১।১।১ নীলমনি দত্ত লেন, কলকাতা-১২ ॥ ১১। বিনয় ঘোষ, ৪৭।৪ যাদবপুর সেন্ট্রাল রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ১২। সত্যজিৎ রায়, ৩ লেক টেম্পল রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ১৩। নীরেন্দ্রনাথ রায়, ৪২।৭এ বালিগঞ্জ প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ১৪। হরিদাস নন্দী, ২৯এ কবির রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ১৫। ধ্রুব মিত্র, ২২বি সাদার্ন এভিনিউ, কলকাতা-২৯ ॥ ১৬। শান্তিময় রায়, কুসুমিকা, গরফা মেন রোড, যাদবপুর ॥ ১৭। শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ, ভুবনেশ্বর, ওড়িষ্যা ॥ ১৮। স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য ॥ ১৯। নিবেদিতা দাশ, ৫৩বি গরচা রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ২০। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ৯০।১ বৈঠকখানা

রোড, কলকাতা-৯ ॥ ২১। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, কলকাতা-২০ ॥ ২২। শান্তা বসু, ১৩।১এ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা-৬ ॥ ২৩। বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ৬২ ডাঃ শরৎ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা-২৯ ॥ ২৪। ধীরেন রায়, ১০।৬ নীলরতন মুখার্জি রোড, হাওড়া ॥ ২৫। বিমলচন্দ্র মিত্র, ৬৩ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলকাতা-১৩ ॥ ২৬। দ্বিজেন্দ্র নন্দী, ১৩ডি ফিরোজ শাহ্ রোড, নয়াদিল্লী ॥ ২৭। সলিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ৫০ রামতনু বসু লেন, কলকাতা-৬ ॥ ২৮। সুনীল সেন, ২৪ রসা রোড সাউথ (থার্ড লেন), কলকাতা-৩৩ ॥ ২৯। দিলীপ বসু, ২০০ এল, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলকাতা-২৬ ॥ ৩০। সুনীল মুন্সী, ১।৩ গরচা ফার্স্ট লেন, কলকাতা-১৯ ॥ ৩১। গৌতম চট্টোপাধ্যায়, ২ পাম প্লেস, কলকাতা-১৯ ॥ ৩২। হিমাদ্রিশেখর বসু, ৯এ বালিগঞ্জ স্টেশন রোড, কলকাতা-১৯ ॥ ৩৩। শিপ্রা সরকার, ২৩৯এ নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৪৭ ॥ ৩৪। অচিন্ত্যেশ ঘোষ, ৩ যাদবপুর সাউথ রোড, কলকাতা-৩২ ॥ ৩৫। চিন্মোহন সেহানবীশ, ১৯ ডঃ শরৎ ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা-২৯ ॥ ৩৬। রণজিৎ মুখার্জি, পি ২৬, গ্রেহামস্ লেন, কলিকাতা-৪০ ॥ ৩৭। সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯বি, হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা-২৯ ॥ ৩৮। অমল দাশগুপ্ত, ০৬ আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৫ ॥ ৩৯। প্রদ্যোৎ গুহ, ১এ মহীশূর রোড, কলিকাতা-২৬ ॥ ৪০। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, ৪০ রাধামাধব সাহা লেন, কলিকাতা-৭ ॥ ৪১। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, ৯বি হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা-২৯ ॥

আমি অচিন্ত্য সেনগুপ্ত এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য ॥ (স্বাঃ) অচিন্ত্য সেনগুপ্ত

পরিচয়

আন্তর্জাতিক গল্পসংখ্যা

বর্ষ ৩৫ । সংখ্যা ৮-৯

ফাল্গুন-চৈত্র ১৩৭২

সূচীপত্র

প্রচ্ছদপট : পিকাসোর আঁকা বার্লিনার অঁসঁব্‌ল্‌-এর প্রতীক

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

আমাদের কথা

গত বছর 'পরিচয়' আন্তর্জাতিক গল্প সংখ্যা ও তারই পরিবর্ধিত গ্রন্থরূপ 'দেশান্তরের গল্প'-এর অভাবিত জনপ্রিয়তাই এবারও আমাদের উৎসাহিত করেছে। সাহিত্যের বিচিত্র ধারাগুলির মধ্যে ছোট গল্পই বিশেষভাবে আমাদের এই শতাব্দীর নিজস্ব ধারা। এই শতাব্দীর সমূহ প্রশ্ন ও আর্তি ছোট গল্পের মধ্যে প্রকাশিত হতে চেয়েছে। ফলে পরীক্ষা নিরীক্ষার বৈচিত্র্যে এই ধারাটি আশ্চর্য অভিনব ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। আজকের ছোট গল্পের এই বৈচিত্র্যময় রূপের পরিচয় দেবার চেষ্টাই আমরা করেছি।

গতবারের মত এবারেও আমাদের নীতি ছিল, কেবলমাত্র জীবিত লেখকদের রচনাই এই সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হবে; এঁদের মধ্যেও তরুণদেরই প্রাধান্য থাকবে। অবশ্য বারট্রাণ্ড রাসেল, অঁরি মিশো, টাইবর ডেরি, ক্যাথারিন সুজানা প্রিচার্ড বা আর্নল্‌ড্‌ ৎসোয়াইগ্‌-এর মত খ্যাতিমান প্রবীণ লেখকদের লেখা যখন আমরা গ্রহণ করেছি, তখন লেখকদের বয়সের কথা ভাবি নি, লেখার সজীব নতুন রীতির কথা ভেবেই এই গল্পগুলি নিয়েছি। নবনিরীক্ষার তাগিদ যে ছোট গল্পের জন্মসূত্রে প্রাপ্ত, তারও প্রমাণবহ প্রবীণ লেখকদের লেখা এই অভিনব গল্পগুলি। পাশাপাশি নানা দেশ ও নানা বয়সের লেখকদের লেখা এই গল্পগুলি এমনভাবে সাজানো হয় যাতে ছোট গল্পের যেন এক আন্তর্জাতিক মানচিত্রের ধারণা আসে।

বলা বাহুল্য, মূল ভাষার সঙ্গে অপরিচয় হেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমরা অনুবাদের অনুবাদ করতে বাধ্য হয়েছি—সব কটি অনুবাদই ইংরেজি ভাষা থেকে। তবু সযত্ন সম্পাদনায় আমরা অনুবাদের মানরক্ষায় চেষ্টার ত্রুটি করি নি। আমাদের অনুরোধে সাড়া দিয়ে পোল্যাণ্ড, হাঙ্গেরি, মঙ্গোলিয়া, ঘানা, যুগোশ্লাভিয়া, বুলগেরিয়া, ভিয়েৎনামের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভারতস্থ দূতাবাসগুলি, চেকোশ্লোভাকিয়া ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের কলিকাতাস্থ দূতস্থান এবং জর্মন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বাণিজ্য-দূতাবাস তাঁদের দেশের গল্প বেছে দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। অন্য দেশগুলির গল্প আমরাই বিভিন্ন সূত্র থেকে সংগ্রহ করি। বর্তমান সংখ্যার সম্পাদনায় আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীশান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকেও এই সূত্রে ধন্যবাদ জানাই।

অথ গ্রহলোকের উদ্ভাসপর্ব

বারট্রাণ্ড রাসেল

মঙ্গলগ্রহে বিজ্ঞানের অসামান্য দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছিল। এই গ্রহের এলাকা দুই বৃহৎ সাম্রাজ্যে বিভক্ত, আল্‌ফা ও বিটা। দুই সাম্রাজ্যে প্রবল রেষারেষি। আর প্রধানত এই রেষারেষির জন্যেই দুই সাম্রাজ্যে যন্ত্রবিদ্যার বিপুল উন্নতিও। তবে তার ফলে কোনো একটি পক্ষ অপর পক্ষের উপরে টেক্কা দিতে পেরেছে তা বলা চলে না। এ-কারণে সমগ্র এলাকাতেই একটা অশান্তি। কেননা প্রত্যেক পক্ষেরই ধারণা, একমাত্র তার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার উপরেই গ্রহের ভবিষ্যৎ জীবনের নিরাপত্তা নির্ভরশীল। মঙ্গলগ্রহবাসীদের মধ্যে যাঁরা অধিকতর চিন্তাশীল তাঁরা অনেকে এমনও ভাবছেন যে অন্যান্য গ্রহ জয় না করা পর্যন্ত নিরাপত্তা সম্ভব নয়।

● ব্রিটেন ●

অবশেষে একদিন আল্‌ফা ও বিটা, উভয়পক্ষই, নিজেদের একটি ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারল। তা হচ্ছে পৃথিবীর দিকে প্রক্ষেপক প্রেরণ। প্রক্ষেপকের মধ্যে ছিলেন মঙ্গলগ্রহের বিজ্ঞানীরা। আর তাঁদের জন্যে এমন ব্যবস্থা ছিল যাতে অজানা পরিবেশে গিয়েও তাঁরা প্রাণরক্ষা করতে পারেন। উভয় পক্ষই একযোগে পৃথিবীর উদ্দেশে প্রক্ষেপক রওনা করেছেন। প্রক্ষেপক দুটি যথাসময়ে লক্ষ্য-স্থানে পৌঁছল। একটি প্রক্ষেপক গিয়ে পড়ল পৃথিবীর

এমন একটি স্থানে, পৃথিবীর অধিবাসীদের কাছে যার নাম 'যুক্তরাষ্ট্র'। অপরটি যেখানে পড়ল তার নাম 'রাশিয়া'। কিন্তু বিজ্ঞানীদের হতাশ হতে হল। অনেক-কিছু পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা করবেন বলে তাঁরা আশা করেছিলেন। কিন্তু কোনোটাই সম্ভব হল না। তাঁদের পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা দেখলেন মস্ত মস্ত শহর, আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত; মস্ত মস্ত যন্ত্র, কতকগুলো তখনো চালু; মস্ত মস্ত গুদাম, খাদ্যবস্তুতে বোঝাই; মস্ত মস্ত জাহাজ, উত্তাল সমুদ্রে এলোপাথারি ভাসমান। আর যেখানেই এসব দৃশ্য চোখে পড়ল সেখানেই একই সঙ্গে চোখে পড়ল মনুষ্যদেহ। কিন্তু কোনো মনুষ্যদেহেই প্রাণ নেই।

মঙ্গলগ্রহের বিজ্ঞানীরা তাঁদের সুপার-রেডারের সাহায্যে পূর্বেই আবিষ্কার করেছিলেন যে মঙ্গলের মত পৃথিবীতেও দুই ক্ষমতাশীল পক্ষ। পৃথিবীতে তাদের নাম 'এ' ও 'বি'। মঙ্গলগ্রহের বিজ্ঞানীরা আশা করেছিলেন, পৃথিবীতে যে অদ্ভুত জীবের বাস তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারলে মঙ্গলের অধিবাসীদের আরো জ্ঞানলাভ হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত প্রক্ষেপক এসে পৌঁছবার কয়েক মাস আগেই পৃথিবী থেকে জীবন লোপ পেয়েছিল।

গোড়ায় মনে হয়েছিল বিজ্ঞানের দিক থেকে এটা খুবই হতাশ হবার মত ব্যাপার। কিন্তু পৃথিবীর এই অদ্ভুত জীবগুলো মরে যাবার আগে বিপুল পরিমাণ নথিপত্র সংগ্রহ করে রেখে গিয়েছিল। এই সমস্ত নথিপত্রের পাঠোদ্ধার করতে মঙ্গলগ্রহের সাংকেতিক লিপিবিদ, ভাষাবিদ ও ইতিহাস-বিদদের খুব বেশি সময় লাগল না। পার্থিব ভাবনাচিন্তা ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁরা অনেক-কিছু আবিষ্কার করলেন ও তারই ভিত্তিতে অতি-বিস্তৃত রিপোর্ট রচনা করলেন। একটি রিপোর্ট আল্‌ফাদের, আরেকটি বিটাদের, উভয়পক্ষ পৃথক পৃথক ভাবে। দুই রিপোর্টের মধ্যে পার্থক্য কিন্তু সামান্যই। যদি জানা না থাকে পৃথিবীর কোন্ বিশেষ পক্ষের কথা বলা হচ্ছে তাহলে মনে হবে—'এ'-পক্ষ নিজেদের সম্পর্কে ও 'বি'-পক্ষভুক্তদের সম্পর্কে যেসব কথা বলেছে, হুবহু সেই একই কথা বলেছে 'বি'-পক্ষ নিজেদের সম্পর্কে ও 'এ'-পক্ষভুক্তদের সম্পর্কে। তা থেকে মনে হবে, পরস্পরের বিরুদ্ধে উভয় পক্ষের একই অভিযোগ: বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা ও হৃদয়হীন কর্মচারীদের সর্বশক্তিমান করে তোলার অভিলাষ। শেষোক্তরা একপক্ষের অভিধায় আমলা, অপরপক্ষের অভিধায় পুঁজিবাদী।

একপক্ষ অপরপক্ষ সম্পর্কে এই বক্তব্য তুলে ধরেছে যে তারা একটি আত্মাবর্জিত যান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলার পক্ষপাতী, যার মধ্যে থেকে পেষাই হয়ে বেরিয়ে আসছে যুদ্ধের যন্ত্র—মানুষ সুখী হবে কিনা সে-বিবেচনা করার কোনো প্রয়োজন হয় নি। একপক্ষ অপরপক্ষ সম্পর্কে এই বিশ্বাস পোষণ করেছে যে তাদের বিবেকহীন চক্রান্ত বিশ্বযুদ্ধ বাধাবার জন্যে সতত উদ্যত, বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বিপদ যে সকলেরই এই স্পষ্ট কথাটা জানা থাকা সত্ত্বেও। উভয় পক্ষই উঁচু গলায় ঘোষণা করেছে: 'আমরা ন্যায়, সত্য ও শান্তির পক্ষে। কিন্তু অপর পক্ষ অতিশয় শয়তান। এ-অবস্থায় সতর্কতা শিথিল করার ও অস্ত্রসজ্জা বৃদ্ধি না-করার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না।' এমনিভাবে মঙ্গল-গ্রহের আল্‌ফা ও বিটারা দুটি পৃথক রিপোর্ট রচনা করে পৃথিবীর এ ও বি দের কথা বললেন। এ ও বি-দের মধ্যে যেমন অভিন্নতা তেমনি অভিন্নতা এই রিপোর্ট দুটির মধ্যেও। উভয় রিপোর্টেই আপন আপন গভর্নমেন্টের পক্ষে শিক্ষণীয় যে বিষয়টি তুলে ধরা হল তা এই: 'পৃথিবীর বাস্তব পরিস্থিতির প্রত্যক্ষ শিক্ষা ছিল এই যে অপর পক্ষের তুলনায় অধিকতর শক্তিশালী হতে হবে। পৃথিবীর নির্বোধ অধিবাসীরা এই শিক্ষা নিতে পারে নি। গভর্নমেন্টের কাছে রিপোর্ট পেশ করতে গিয়ে আমরা আশা রাখব, আমাদের সহযোগী গ্রহের বিপর্যয়ের মধ্যে যে ভয়ংকর সতর্কীকরণ রয়েছে তার মঙ্গলকর শিক্ষাটি তাঁরা গ্রহণ করবেন।'

পার্থিব বিশেষজ্ঞদের দ্বারা রচিত এই রিপোর্ট দুটি একযোগে পৌঁছল আল্‌ফা ও বিটা গভর্নমেন্টের হাতে। দুই গভর্নমেন্টই রিপোর্ট দুটি প্রণিধান করলেন এবং প্রত্যেক পক্ষই স্থির করলেন যে অপর পক্ষের চেয়ে তাদের অধিকতর শক্তিশালী হতে হবে। আল্‌ফা ও বিটা কর্তৃক এই নীতি গ্রহণের কয়েক বছর পরে দুটি প্রক্ষেপক এসে পৌঁছল বৃহস্পতি থেকে মঙ্গলে। বৃহস্পতিগ্রহটিও দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত, আলেফ ও বেথ। উভয় পক্ষই আপন আপন প্রক্ষেপক প্রেরণ করেছে। মঙ্গলগ্রহের পর্যটকরা পৃথিবীতে গিয়ে যা দেখেছিলেন, বৃহস্পতিগ্রহের পর্যটকরা মঙ্গলে এসে ঠিক তাই দেখলেন। জীবনের কোনো চিহ্ন তাঁরা খুঁজে পেলেন না। কিন্তু অত্যল্পকালের মধ্যেই খুঁজে পেলেন সেই দুটি রিপোর্ট যা পৃথিবী থেকে মঙ্গলে নিয়ে আসা হয়েছিল। রিপোর্ট দুটি তাঁরা পেশ করলেন স্ব-স্ব গভর্নমেন্টের কাছে। মঙ্গলগ্রহের জন্যে লিখিত এই দুটি রিপোর্টের শেষে মঙ্গলের গভর্নমেন্টের কাছে

গ্রহণীয় যে শিক্ষার কথা বলা হয়েছিল বৃহস্পতিগ্রহের দুই গভর্নমেণ্টের কাছেও তা গ্রহণীয় মনে হল।

কিন্তু, আলেফ ও বেথ এই দুই বিরোধী রাষ্ট্রের শাসকবর্গ যখন স্থির করছিলেন রিপোর্টের উপরে তাঁরা কী মন্তব্য করবেন—সেই সময়ে উভয় শাসকবর্গেরই একটি অদ্ভুত ও অস্বস্তিকর অভিজ্ঞতা হল। একটি চলন্ত আঙুল হাজির হয়ে তাঁদের বিস্মিত হাত থেকে কলম কেড়ে নিল, তারপর তাঁদের কোনো রকম সহযোগিতা ছাড়াই নিচের কথাগুলো লিখে রাখল: 'নোয়া-র সময়ে আমি যে এতটা নির্বিকল্প ছিলাম, সেজন্যে এখন আমার দুঃখ হচ্ছে। (স্বাঃ ' ব্রহ্মাণ্ডের কর্তা।' উভয় রাষ্ট্রেই সেন্সর কর্তৃপক্ষের হুকুমে কথাগুলো মুছে ফেলা হল। এবং এমন একটি অদ্ভুত ঘটনা যে ঘটেছে তা একান্ত গোপন রাখা হল।

অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত

ITALY : SEED AMONG THORNS *by* GUISSEPPE BARTO

নিষ্ঠুর কাঁটা ঃ বিনষ্ট বীজ

গিসেপ্পি বার্তো

'আর কতকগুলি কাঁটা-বনে পড়িল।
কাঁটা বাড়িয়া সেগুলিকে চাপিয়া
ফেলিল এবং তাহা ফলিল না।'
—মার্ক লিখিত সুসমাচার ৪ : ৭॥

● ইতালি ●

একটা মানুষ বিছানায় শুয়ে থাকতে পারে। দৈহিক বেদনায় বিদ্ধ হতে পারে। তথাপি ক্লিষ্ট নাও হতে পারে। তার মাথায় রক্ত যেন মথিত হচ্ছে। শিরদাঁড়ায় কখনও যেন প্রচণ্ড টান। আবার কখনও-বা যেন সেটা অত টান সইতে না পেরে ছিঁড়ে শিথিল হয়ে যাচ্ছে—এমনি একটা অনুভূতি। পেটে একটা অস্ত্রোপচারজনিত ক্ষত। স্টিচ করা। গজ ভরা। ব্যানডেজ বাঁধা। আর সেই ক্ষতটাই এখন তার সব ভাবনা-যন্ত্রণার কেন্দ্র। কাশি পেলে সে যতটা সম্ভব, যতক্ষণ সম্ভব, চেপে রাখে। তবু যখন কেশে ফেলে তখন মনে হয় যেন ক্ষতটাতে একটা বর্শার আঘাত এসে লাগল। ব্যথাটা যেন যেতে আর চায় না। কিন্তু তবু এখন তাকে যা কষ্ট দিচ্ছে তা সম্পূর্ণ অন্য কিছু।

বাইরে বারান্দা দিয়ে একজন আরদালি চলে গেল। কাঠের মেঝেতে ভারী পায়ের শব্দ। দরজার কাছে চকিতের জন্য একটি নার্সের উদয়। 'ভালো তো?' নিতান্ত মামুলি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েই তার অন্তর্ধান। একটু দূরের

অফিস-ঘর থেকে কে শিস দিয়ে গাইছে, "এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একী বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু।" ঘুরেফিরে এই একটি লাইন। আর ঠিক এই সব ব্যাপার, যদি একটু মনোযোগ পায়, দুঃখের উৎস হয়ে ওঠে। এদের উপেক্ষা করতেই হবে। তোমার ভাবনা-বেদনা সম্পর্কে তোমার পরিবেশ যে নির্বিকার এই তথ্যটিকে নির্বাসন দিতেই হবে তোমার মন থেকে। না-হলে আত্ম-করুণা অনিবার্য। আর একজন মানুষের পক্ষে, একজন বন্দীর পক্ষে, একজন বেদনাবিদ্ধের পক্ষে আত্ম-করুণা বিপজ্জনক। অনেক-বেশি বিপজ্জনক—পেটে অস্ত্রোপচারজনিত ক্ষতের চেয়ে। একান্তভাবে দৈহিক যে-কোন যন্ত্রণার চেয়ে।

ছোট্ট হাসপাতালের এই ঘরটিতে এমন আর কীই-বা আছে যা চিন্তাধারাকে অন্য খাতে নিয়ে যাবে? হালকা কাঠের দেওয়াল। রং বিবর্ণ হলুদ। ছাদও তথৈবচ। ছাদের একটু নিচে চারদিকের দেওয়াল ঘিরে জলের পাইপ। সেটার রংও বিবর্ণ হলুদ! এককোণে পাইপের সঙ্গে একটা ভ্যালভ্ লাগানো। আগুন লাগলে নেভানোর জন্যই বোধ হয়। ছাদের ঠিক মাঝখানে একটা বিজলী-আলো। তার একটা ঢাকনা আছে। ঢাকনাটার সঙ্গে একটা সরু রশি ঝুলছে। রশিটায় টান দিয়ে আলোটা দরকারমত বাড়ানো-কমানো হয়ে থাকে।

একটা জানলাও আছে অবশ্য। কিন্তু সেটা শুয়ে-থাকা লোকটির মাথার পিছনে। অর্থাৎ তার চোখের নাগালের বাইরে। জানলা দিয়ে দেখারও বিশেষ কীই-বা ছিল! কাঁটা-তারের বেড়া আর পাহারাদারদের কয়েকটা কাঠের গুমটি।

রোদ্দুর? হ্যাঁ, রোদ্দুর আসে। তারও শর্ত আছে। প্রথমত, রোদ ওঠা চাই। দ্বিতীয়ত, দিনের ঠিক যে-সময়টিতে ওই জানলার কাছে রোদ থাকে তখনই, শুধু সেই সময়টুকুর জন্যই, তার প্রবেশাধিকার। তবে রোদ্দুর আসা-না-আসার গুরুত্ব লোকটির কাছে আগের মত নেই। আগের মত মানে, এই হাসপাতালে আসার আগে সে যখন বন্দী-শিবিরে ছিল, তখনকার মত। তখন দিনের শেষে সূর্যকে ঢলে পড়তে দেখতে তার কী ভালোই যে লাগত! না—বিবর্ণ, বন্ধ্যা, বিস্তৃত সেই ভূমিতে (যার নাম প্রেইরি) সূর্যাস্ত একটা দর্শনীয় বিষয় নয়। তবু ব্যারাকের একটি বিশেষ কোণে থেকে সে দেখত, সে বুঝত যে, অস্তসূর্য রোজ নিয়মিতভাবে একটু একটু করে উত্তরে অথবা একটু

একটু করে দক্ষিণে সরে যাচ্ছে। আর এটা ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। এই দিয়ে মাপা যেত সময়ের পদক্ষেপ। হ্যাঁ, কখনও কখনও সেটা জানা খুব দরকার, খুবই আনন্দের, যে, কালের রথচক্র সত্যই আবর্তিত হচ্ছে। যদিও তার সঙ্গে সঙ্গে ভাগ্যচক্র আবর্তিত হচ্ছে এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই।

মোট কথা, এই ছোট্ট হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে থেকেও মনটাকে ব্যস্ত রাখা যায়। আর তা রাখতেই হয়। আর কিছু না পারো, কড়িকাঠ গোনো। যাঃ, ভুল হয়ে গেল, কাঠের ছাদে কড়িকাঠ কোথায়? বেশ, চৌকো-চৌকো হালকা-কাঠের টুকরোগুলো দিয়ে জোড়া ছাদের গজালগুলোই গোনো। সবগুলো অবশ্য চোখে পড়বে না। যেগুলো ভালো করে পিটিয়ে বসানো বা যেগুলোতে এখনও রং লেগে আছে সেগুলো নজর এড়িয়ে যাবে। চোখে পড়বে মাথা-ওঠা, রং-চটা গজালগুলোই শুধু। গুনতিতে ভুল হবেই। আর তাই তো চাই। বেদনা-বিদ্ধ মানুষের কাছে এই ভুলের মূল্য যে অপরিসীম। তাকে দেখতে হবে না হৃদয়হীনা সেবিকার রুটিনমাফিক আগমন-অন্তর্ধান! শুনতে হবে না "এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একী বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু"-র ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি। ব্যক্তিগতভাবে কেউ যদি বেদনায় বিদীর্ণ হয় তথাপি মনুষ্যজাতির কাছে ব্যাপারটা তুচ্ছ। আর অন্য সকলের কাছে যে এটা তুচ্ছ, এ নিয়ে তার হা-হুতাশ নিষ্প্রয়োজন।

অতঃপর রাত্রির জন্য প্রস্তুতি। যদিও সে পুরোপুরি প্রস্তুত হতে পারে না, কারণ, রাত্রি এলে তার ব্যথাটাও বাড়ে। বাড়ে তাপমাত্রা। সাহায্য চাইতে হয়। নার্স আসে। সাদা পোশাক। মাথায় টুপি। টুপি ঠিক নয়, এক টুকরো ভাঁজ-করা কাপড়, কড়া-করে-মাড় দেওয়া। জ্যোতির্চক্রের মত চুলের সঙ্গে আটকানো। নার্স এসে লোকটিকে ধীরে-ধীরে পাশ ফিরিয়ে দেয়। বালিশগুলো ঠিকঠাক করে। তারপর লোকটি শিরদাঁড়া বরাবর নার্সের আঙুলের স্পর্শ অনুভব করে। সে স্পর্শ তার মাঝে মাঝে ভালো লাগে। তারপর নার্স তাকে কখনও একটা লাল ক্যাপসুল দেয়। কখনও হলদে। তারপর ইনজেকশন। নার্স চলে যাওয়ার পর লোকটির মনে হয় যে, সে কেন নার্সকে ভালো করে দেখে নি! কেমন তাকে দেখতে? মনে পড়ে না।

আলোটি ওদিকে ফের ঢেকে দেওয়া হয়েছে। আবার একা। ব্যথাটা অনেক কম। গলা খুশ খুশ করছে। কিন্তু কাশা চলবে না। বারান্দা থেকে

একটু আলো এসে ঘরের অন্ধকারকে ঈষৎ ফিকে করে দিচ্ছে। ও আলোটা সারা রাত জ্বলে।

ছোটো ঘর। আধো-আঁধার। চারিদিকের দেওয়ালে ছায়া কালো-কালো। যেন অন্য এক জগৎ। ওই ছাদ, ওই পাইপ সব যেন কেমন একরকম দেখায়। মনের মধ্যে থেকে উঠে আসে নানা বিচিত্র ভাবনা। ওই ছাদ, ওই পাইপ থেকে যেন তারা উদ্ভূত কিন্তু নিঃসম্পর্কিত। তারা উঠে আসে। অমূর্ত ভাবনার দল। অসংখ্য চিন্তা-কণা। মনকে আচ্ছন্ন করে। চাপা পড়ে যায়, হারিয়ে যায়, তলিয়ে যায় আগের যন্ত্রণা, তাপ, অনুতাপ।

একটা তীব্র আলো। ওঁরা এলেন। দুই পাহারাদার। সর্বদা জোড়ে আসেন। মাথায় হেলমেট, হাতে ছড়ি। কর্ম: বিছানায় উঁকি দিয়ে দেখা লোকটি পালিয়েছে কিনা! ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে মজার। যে বন্দী-বেচারীর কদিন আগে পেটে অস্ত্রোপচার হয়েছে, এক গেলাস জল হাত বাড়িয়ে মুখে তোলার শক্তিটুকুও যার নেই তার পালানোর আশঙ্কা! তবে কিনা, নিয়ম নিয়ম। নিয়ম থাকবেই কারাগারে, বিদ্যালয়ে, ফৌজে। আর এ স্থানটি তো তিনেরই সমাহার। অবশ্য পাহারাদার-বাবাজিদ্বয়ের চালচলনে কোথাও উদ্বেগের কিঞ্চিন্মাত্র পরিচয় নাস্তি। নিয়মরক্ষা করেই দ্রুত তাঁদের নির্গমন।

আবার একা। একা! একা! মাঝে মাঝে কাঠের বাড়ির এখানে-ওখানে ক্যাঁচ-কোঁচ, কড়-কড় শব্দ। ছায়া। ছায়া! ঘুম? ঘুম! ছায়া-স্বপ্ন-জাগরণ-নিদ্রায় একাকার।

...কটা বাজল? রাত একটা? তিনটে? রাত-ডিউটির নার্সের রবার-লাগানো জুতোর হালকা নরম শব্দ। শুধু অভ্যস্ত কানেই ধরা পড়ে। শব্দটা এগিয়ে আসছে। আধো-অন্ধকারে আবছা মূর্তি।

একটি ধীর, মৃদু কণ্ঠস্বর: "কিছু চাই?"

"না। কিছু না।"

মূর্তিটি সরে গেল। মিলিয়ে গেল। হঠাৎ লোকটির মনে হল তার বলা উচিত ছিল 'ধন্যবাদ।' কিন্তু...দূর ছাই...বিদেশী ভাষায় দুম করে কিছু বলতে যাওয়ার বিপদই এই। ঠিক জায়গায় ঠিক কথাটি বলতে ভুল হবেই।

আবার একা। এমনি করেই কাটবে আরও অনেকক্ষণ। যতক্ষণ না জানলা দিয়ে ভোরের আলো একটু-একটু করে এগিয়ে আসে। বারান্দার আলো একটু-একটু করে পিছু হটতে শুরু করে। ততক্ষণ ধীরে ধীরে ঘুরুক সময়ের

চাকা। চলুক ঢুলুনি। আর মাঝে মাঝে পিঠের ব্যথায় চমকে চমকে ওঠা। হ্যাঁ, একটা ক্যাপসুল আর একটা ইনজেকশনের সাধ্য কী সেই ব্যথাকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে রাখে।

ভোরের আলো ফুটবে। জানলার ভারী ক্যানভাসের পরদার ওধারে এসে অপেক্ষা করবে। আরদালি (সেও এক বন্দী) এসে পরদা সরিয়ে দেবে। আলো ঢুকবে ঘরে। তারপর আরদালি আনবে প্রাতরাশ। কিন্তু হায়রে, খাদ্য এলেই যদি খিদে আসত! সকালে কিচ্ছু খায় না, খেতে পারে না। এরপর আসবে এক সেপাই। বন্দী নয়। আজাদ আদমি। তার কাজ, আরদালির-কাজ-তদারক-করা। আরদালি তখন খুব মন দিয়ে ঘরটি সাফসুফ রাখায় ব্যস্ত থাকে। সেপাই অবশ্য বড় একটা কিছু বলে না। ড'াটসে দাঁড়িয়ে চারদিকে নজর বুলিয়ে নেয় (আরে বাবা, তাকেও তো উপরওয়ালাকে দেখাতে হবে যে, সে সত্যিই ডিউটি দিচ্ছে। ফাঁকি দিচ্ছে না)। আরদালি কিন্তু ভয়ে ভয়ে থাকে। সকলের সামনে দাবড়ানি খেলে মান যাবে। কে জানে ফের-ফিরতি দেবে হয়তো ক্যাম্পে ঠেলে। আর ক্যাম্প মানে তো বাবা পুরোদস্তুর জেলখানা।

তারপর আসবেন সকালের নার্স। তেনার মেজাজ যে কোন্‌দিন কেমন থাকবে দেবাঃ ন জানন্তি। বেচারা রোগীর অবস্থার সঙ্গে তাঁর মন-মেজাজের কোনই যোগ থাকে না। সাধারণত দু-একটা মামুলি প্রশ্ন করেই তিনি বিদায় নেন। দেবী যেদিন অতি প্রসন্না থাকেন সেদিন এগিয়ে এসে লোকটির মাথা তুলে ধরেন। বালিশগুলো একটু নেড়েচেড়ে ঠিকঠাক করে দেন। ভালোই লাগে এই দাক্ষিণ্যটুকু।

এখন সবকিছু ফিটফাট। ঠিকঠাক। ডাক্তারের জন্য প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। ডাক্তার মানুষটি খুব ভদ্র। দয়া আছে শরীরে। ফৌজী ডাক্তার যখন তখন কোন্‌ না মেজর বা ক্যাপটেন হবেন। তবে উর্‌দি পরে আসেন না। পরনে থাকে হাল্‌কা ছাই রঙের স্লিপিং স্যুট। মাথায় গেন্‌জি-জাতীয় কাপড়ের টুপি। আসেন। হাসেন। ভাঙা-ভাঙা ইতালীয়তে প্রশ্ন করেন: 'কামে স্তাই'—কেমন আছ? তারপর পরীক্ষা করেন। তাঁর সঙ্গে আসেন মোটামতন এক লেডি-ডাক্তার। চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা। হাতে একগাদা ফাইল। রোগীদের রেকর্ড। এক-আধটা কথা বলেন (বলা বাহুল্য, ইংরেজিতেই)। লেডি-ডাক্তার নোট করে নেন। তারপর ওঁরা চলে যান।

সময়ের চাকা ধী-রে, ধী-রে ঘোরে। সারা দিনে তিনবার থারমোমিটার নিতে হয় মুখে। সকাল এগারোটা আর বিকাল পাঁচটায় খাবার দিয়ে যায় আরদালি। সন্ধে হলেই অফিসঘর থেকে ভেসে আসবে সেই প্রেমিকপ্রবরের সুর 'এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় ..।'

আবার ছায়া। জল। নার্স। লাল বা হলদে ক্যাপসুল। বারান্দার আলোর একটু-একটু করে এগিয়ে-আসা। দিনের আলোর জানলা দিয়ে একটু-একটু করে পিছু-হটা। ছায়া কালো-কালো। একা। একা। একা!

একদিন সকালে আরদালি যখন এল, তার চোখেমুখে উত্তেজনা। "রাত্তিরে সাইরেন শুনেছিলেন ?" চাপা স্বরে বললে, "উঃ, কী কাণ্ড !"

লোকটি মনের ঔৎসুক্য মুখে প্রকাশ করল না। শান্ত স্বরে হাসতে চাইল, "কী হয়েছিল ?"

"ভীষণ ব্যাপার! কাল রাত্তিরে, বুঝলেন কিনা, ওরা ক্যাম্পের লোকেদের বেধড়ক ঠ্যাঙানি দিয়েছে। মেলা খুলি ফেটেছে।"

"হঠাৎ ?"

"কাল, বুঝলেন কিনা, আপনাদের ক্যাম্পের ব্যারাকে আগুন লেগেছিল। কেউ ধরিয়েই দিক কি এমনিই লাগুক। যাই হোক, আগুন-লাগা মাত্তর শ-দুই সেপাইও ডাণ্ডা-পিস্তল নিয়ে তৈরি। তারপর, বুঝলেন কিনা যেই-না সাইরেন-বাজা অমনি সেপাইরা ঝাঁপিয়ে পড়ল, শুরু হয়ে গেল এলোপাথাড়ি পিটুনি। তা ওরাও অবিশ্যি ছেড়ে দেয় নি। হাতের কাছে বোতল-টোতল যা পেয়েছে, দমাদম ছুঁড়েছে। তবে, বুঝলেন কিনা, এদের সকলের মাথাতেই হেলমেট, তাই খুব একটা সুবিধে করতে পারে নি।"

আরদালি চলে গেল।

খানিক পরেই ফিরে এল : "বুঝলেন কিনা, অপারেশন-কামরা ঘুরে এলাম। বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার, চারদিকে চুল, রক্ত আর ব্যানডেজের ছড়াছড়ি। আর একটা মজার ঘটনা বলি শুনুন। কাল তো সেপাইরা এক-একটা লোককে ধরে ধরে আনছে আর অপারেশন-কামরায় ডাক্তাররা চটপট সেলাই-ফোঁড়াই করছেন। হঠাৎ তাঁরা দেখেন কি একটা সুস্থ লোককেও পাঠানো হয়েছে। তাঁরা তাকে ফেরত পাঠালেন।

সেপাইরা তো প্রথমে অবাক। তারপর তারাও পরীক্ষা-টরিক্ষা করে দেখল লোকটা আস্তই বটে। তখন—" খিল-খিল করে হেসে উঠল আরদালি—"তখন সেপাইরা কী করল জানেন? লোকটাকে আড়ং-ধোলাই দিয়ে মাথা ফুটিফাটা করে ফের-ফিরতি অপারেশন কামরায় দিয়ে এল!"

আরদালি হাসছে। আশ্চর্য! ও নিজেও বন্দী। সেকথা কি ভুলে গিয়েছে? ও যেন এখন 'ওদের' একজন। 'আমাদের' নয়।

এ নিয়ে অনুযোগ করে লাভ নেই। বন্দী মানেই ভেঙে-পড়া মানুষ। আর ভেঙে-পড়া মানুষদের দস্তুরই এই।

কিছুকাল পরের কথা।

লোকটি এখন আগের চেয়ে অনেক ভালো। আরও সপ্তাহখানেক তাকে থাকতে হবে হাসপাতালে। সময়টা আর কিছুতেই কাটতে চায় না। এর মধ্যে অবশ্য সে আরও কিছু জেনেছে তার পরিবেশ সম্পর্কে। হাসপাতাল সম্পর্কেও। নার্সদের সকলকেই এখন চেনে। সংখ্যায় তারা পাঁচ জন। মিস্ মেরী আর মিস্ লেনের বাড়ি কেন্টাকিতে। মিসেস কেনেডির টেকসাসে। ভারি ভালোমানুষ মহিলাটি। কাছেই বাসা। একটি ছোট ছেলে আছে। আর আছেন এক বৃদ্ধা। বাড়ি ওহিয়ো। ধর্মপ্রাণা ক্যাথলিক। মিস্ মেরি স্থূলাঙ্গী। চলন তাঁর হাঁসের মত।

মিস্ লেন তন্বী। তার চালচলন, ধরনধারণ দেখে কেমন একটা বিচিত্র ঔৎসুক্য বোধ করে লোকটি। একটু কি খেয়ালী মিস্ লেন? নিয়মকানুনের ব্যাপারে একটু উদাসীন? একটা মুদ্রাদোষ আছে তার—নাক দিয়ে মাঝে-মাঝে ফোঁৎ-ফোঁৎ শব্দ করা। আর লোকটির সঙ্গে কথা বলার সময় মিস লেন খুব ধীরে ধীরে, প্রত্যেকটি শব্দ আলাদা-আলাদা করে উচ্চারণ করে। ফলে তার ইংরেজি বুঝতে পারে লোকটি। সেটাও তাকে তার ভালোলাগার একটা কারণ।

সেদিন রাত-ডিউটিতে এল মিস লেন। দূর থেকে পায়ের শব্দ শুনেই বুঝেছিল, কে আসছে। মিস লেন এসে আলোর ঢাকাটা রশি টেনে সরিয়ে দিল। মুখে জোর আলো পড়তেই লোকটি চোখ পিট-পিট করল।

"ঘুমোও নি কেন?"

লোকটি চুপ করে চেয়ে রইল। আলো পড়েছে মিস লেনের মুখে, চুলে। সোনালী চুল। মাঝে মাঝে দু-একটি সাদা। পাতলা দুটি ঠোঁট। ছোট্ট নাক। নাক দিয়ে সেই কোঁৎ-কোঁৎ শব্দ।

কী খেয়াল হল, মিস লেনের অনুকরণে ওই রকম শব্দ করল।

ভুরু কোঁচকাল মিস লেন। তারপর হেসে এগিয়ে এল। ঝুপ করে বসে পড়ল খাটে। পাশের টেবিলের উপর থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল। ধরাল।

তাকাল লোকটির দিকে: "ভেংচি কাটা হচ্ছে, না? মুদ্রাদোষ জিনিসটা অবিশ্যি ভালো নয়। (একটু থেমে) তা তো হল, কিন্তু ঘুমোও নি কেন?"

"জানি না। ঘুমোতে চাই। চেষ্টা করি। ঘুম আসে না।"

"না ঘুমোলে কী হবে জানো? অকালে বুড়িয়ে যাবে।"

মিস লেনের চোখের দৃষ্টিতে করুণাধারা। উঠল বিছানা ছেড়ে। আলোটা কমিয়ে দিল। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। চলে যাওয়ার আগে গাঢ় স্বরে বলল, "এবার ঘুমিয়ে পড়ো, কেমন?"

এরপর ঘুমনো যেন আরও কঠিন হয়ে উঠল। রাত্রি। অন্ধকার। টুকটাক শব্দ। বাইরে মাঝে-মাঝে সার্চলাইটের হঠাৎ-আলোর ঝলকানি। ভারি বিশ্রী এই আলোটা। ওটা তাকে মনে করিয়ে দেয় সে বন্দী। অথচ সে যে বন্দী একথা আজকাল অনুভব করে না। একথা ভুলে যেতে চায়।

সময়ের মত আশ্চর্য ব্যাপার কিছু নেই। বিশেষ করে যদি কারও জন্য, কোন কিছুর জন্য প্রতীক্ষমান থাকতে হয়। তখন কখনও সময়কে মনে হবে করুণ-রঙিন অন্তবিহীন পথ। কখনও-বা দ্রুতগামী রথ।

তা যাই হোক লোকটির কাছে এই প্রহর-গণনা যেন মূল্যবান হীরে-জহরৎ নিয়ে নাড়াচাড়া করার মত। সমস্ত মনপ্রাণ তাতে নিবদ্ধ থাকে। বর্তমানের নিগড় থেকে মন যেন এক নীল-নির্জন আকাশে ডানা মেলতে পারে। যে মানুষের অতীত সুদূর ধূসর, ভবিষ্যৎ ঊষা-দিশাহারা নিবিড়-তিমির-মাখা, আর বর্তমান শূন্য শূন্য শূন্য—তার পক্ষে কিছুর জন্য পথ চাওয়াতেই আনন্দ। সেই কিছু যদি কিছু-না-ই হয় ক্ষতি কি?

আবার রাত্রি। লোকটি অনুভব করে সে প্রতীক্ষা করছে। কারও জন্য প্রতীক্ষা। কিছুর জন্য প্রতীক্ষা। ঘুমের ইচ্ছে নেই। মনের ভিতরটা আলোকে-আঁধারে, দিন-রজনীতে, ঊষা-গোধূলিতে কেমন যেন একাকার হয়ে

গিয়েছে। সে আসে, আসে, আসে। এই তো তার পায়ের শব্দ। শব্দ নয়, স্বর। স্বর নয়, সুর।

সে দেখছে না কিন্তু যেন স্পষ্ট দেখছে। সে এল। নার্সদের ঘরে ঢুকল। চাবির জলতরঙ্গ। আলমারিটা খুলল। লাল ক্যাপসুল। হলদে ক্যাপসুল। ইন্‌জেকশন। (কী ভীষণ দেরি করে মিস্ লেন! আলমারি পরীক্ষা—ও তো একটা রুটিন-কাজ, এতো সময় লাগে তাতে! আহা নিয়মের প্রতি কী নিষ্ঠা! রাগ ধরে।) ঠং। বন্ধ হল আলমারি। বাঁচা গেল। এবার কোনো শব্দ নেই। তার মানে, রেজেস্টারি খাতায় কিছু লিখছে। চেয়ার সরানোর শব্দ। এবার তার আসার সময়। সে আসে, আসে, আসে।

নিদ নাহি আঁখিপাতে।

ঘটনাপ্রবাহের একটা বৈশিষ্ট্য, অসম্ভব ও যুক্তির দ্বন্দ্বে যুক্তির স্বর চাপা পড়ে না। কোনো ব্যাপার যে অসম্ভব বা হাস্যকর এটা নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝাতে হয়। আর সে যুক্তির একটা নিজস্ব ধারা আছে। গভীরতর ধারা।

যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে সাধারণ যুক্তি বলবে—মিস লেন অতি সাধারণ মেয়ে, বয়স তিরিশের উপর, ছেলেমানুষ মনে হয় খুব রোগা বলেই, ইত্যাদি ইত্যাদি।

গভীরতর যুক্তি একই কথা বলে অন্যভাবে : মিস লেনের সঙ্গে প্রেম? অসম্ভব। এমনকি হাস্যকর। মিস লেনকে দেখতে খুব ভালো নয় বলে নয়। তার বয়স বেশি বলেও নয়। আসল কারণ—তাকে বলা যাবে না : 'তুমি আর আমি ছাড়া কেউ নেই, কিছু নেই। এসো, ঘর বাঁধি।' বলা যাবে না : 'তুমি আর আমি দুজনের মধ্যে কোনো শত্রুতা নেই।' বলা যাবে না : 'যুদ্ধ মিথ্যা, বন্দী-দশা মায়া।'

তুমি যতক্ষণ বন্দী ততক্ষণ তুমি কিছু আশা করতে পারো না। তোমার জীবনে কিছু ঘটতে পারে না। ওরা তোমায় খাবার দিতে পারে কিংবা পিটুনি। ওরা তোমায় রোদে-জলে বাইরে রাখতে পারে, আবার এক কোণে নিরুপদ্রবে ফেলে রেখে দিতে পারে। কিন্তু ওই পর্যন্তই। লোকটি ভাবে : ওরা আর আমরা দুই ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। হতে পারে, এখানে যারা আছে তারা আমাদের প্রতি খারাপ ব্যবহার করে না। হাসপাতাল এলাকায় সেটা

সরকারীভাবে নিষিদ্ধ বলে। ভালোমানুষির জন্য নয়। আর এও তো সত্যি কথা বাপু যে, ভালোমানুষি পাওয়ার যোগ্য কোন্ মহৎ কর্ম করেছ তুমি? একদিন লড়াই করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে, তারপর ক্লান্তপ্রাণ রক্ষার জন্য রাইফেল ফেলে দুহাত তুলে বা সাদা ঝাণ্ডা উড়িয়ে আত্মসমর্পণ। শুধু এই জন্য তুমি ভালো মানুষ? তুমি একদিন ওদের লক্ষ্য করে গুলি চালাও নি? শত্রুপাতে আনন্দ পাও নি? সুযোগ পেলে আরও গুলি চালাতে না? আরও শত্রুপাত করতে না? তবে? তবে কেন নিজেকে ভাব ভালোমানুষ? প্রত্যাশা কর ভালোমানুষির?

ভালোমানুষি অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, করুণা পেতে পারো বটে। তোমরা এখন ভেঙে-পড়া মানুষ। অতএব করুণার পাত্র। কিন্তু করুণা তো গ্রহণীয় নয়। করুণার সঙ্গে মিশে থাকে অব্যক্ত উপহাস। তা গ্রহণ করলে অন্তরে যে এক অসহ্য অস্বস্তি সৃষ্টি হয়। কাজেই, যদি কোনো মেয়ে এখানে তোমার সঙ্গে একটু হেসে কথা কয়, কিংবা তোমার বিছানায় এসে একটুক্ষণ বসে তার মানে ওইটুকুই। সকালে তোমায় দানাপানি দেওয়ার মত, ক্যাপসুল বা ইনজেকশন দেওয়ার মতই তাই নিয়ে মনে মনে রঙে-রসে জাল বোনা অর্থহীন।

'না, আমি তা বুনব না'। লোকটি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল। দেওয়ালের দিকে মুখ করে পাশ ফিরে শুল। চোখ বন্ধ করল জোর করে। ঘুমোবেই। দাঁতে দাঁত চেপে হাত দুটো মুঠো করল। নিজেকে বোঝাতে সক্ষম হল যে, ইচ্ছে করলেই ঘুমোতে পারে। ওটা কীসের শব্দ? উঁহুঁ, চোখ খুলবে না। মিস লেন এসে যেন তাকে ঘুমন্ত দেখে। অন্তত ঘুমন্ত ভাবে। তারপর যেন চলে যায়। ফিরে যায়। তা সে যে-কারণেই আসুক না কেন।

ভোর হল। লোকটি তখনও দেওয়ালের দিকে মুখ করে শুয়ে। এবং তখনও তার চোখে ঘুম নেই। আরদালি এল। প্রাতরাশ এল। লোকটি নিজে থেকেই আরদালির সঙ্গে অনেক কথা বলল। অনেক প্রশ্ন করল: ক্যাম্পের নতুন খবর কী? বাইরে ঠাণ্ডা কেমন? ইত্যাদি। আসলে কিন্তু তার জিজ্ঞাসা ছিল সম্পূর্ণ অন্য: মিস লেন কেমন আছে? সে কি ছুটি নিয়েছে? তার কোনো অসুখ করে নি তো? কিন্তু এসব জরুরী প্রশ্ন একটাও তোলা গেল না। মনে রয়ে গেল মনের কথা। 'কী এসে যায়, মিস লেন যদি চলে গিয়ে থাকে, এমনকি যদি মরেও গিয়ে থাকে?' লোকটি নিজেকে

বোঝাতে চেষ্টা করল, 'ওর সঙ্গে আমার তো কোনো সম্পর্ক নেই। পরিচয়ও কতটুকুই বা।'

মিস লেন কিন্তু সত্যিই চলে যায় নি। সেই রাত্রেই আবার এল।

"ঘুমোও নি কেন?" মৃদু ধমক দিল, "তুমি দেখছি অকালে না-বুড়িয়ে ছাড়বে না।"

আলোর ঢাকাটা খুলে দিল না মিস লেন। ঘরটা আধো-অন্ধকার। আর সেটার জন্যই যেন বেশি ভালো লাগছিল লোকটির।

মিস লেন এগিয়ে এল। খাটের একপাশে চুপটি করে এসে বসল। লোকটিও চুপ। এরপর হঠাৎ একটা কাজ করে বসল মিস লেন। না, বিশেষ কিছু নয়। কিন্তু এমন কিছু যা ওর করার কোনো কারণ ছিল না। বিছানা ছেড়ে উঠল মিস লেন। ঘরের সঙ্গে লাগোয়া বাথরুমের দরজা খুলে ভিতরে গেল। দরজা খোলা থাকল। আলো জ্বালল। আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মাথার উপর আটকানো মাড়ে-কড়কড়ে কাপড়টা খুলে তাকে রাখল। ক্লিপগুলো দাঁত দিয়ে চেপে ধরল। তারপর চিরুনি দিয়ে কেশপাশ ঠিক করতে লাগল। আর সারাক্ষণ কথা। মনে হচ্ছিল যে, যার সঙ্গে কথা বলছে সে যেন বন্দী নয়।

কী বলছিল মিস লেন? তা তো শোনে নি লোকটি। একে তো ইংরেজি ভালো বোঝে না, তার উপর, মিস লেন দাঁত চেপে কথা বলছে। তাছাড়া লোকটি কিছুই শুনছিলও না। দুটি মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে শুধু দেখছিল একটি নারীকে। একটি মেয়ে, ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে। হাতদুটি তার মাথার উপর। তন্বী সে এমনিতেই কিন্তু এই ভঙ্গিতে তাকে দেখাচ্ছিল যেন আরও ক্ষীণাঙ্গী। শুধু বুক দুটি ছাড়া। দেহবল্লরী ঘিরে থাকা স্কার্টটি গিয়ে থেমেছে যথাস্থানে। লোকটি চেয়ে থাকল অপলক। মেয়েটির কথাগুলির অর্থ সে বুঝল না কিন্তু সেগুলি যেন এক অপরূপ সুর হয়ে তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আকুল হল অন্তর। রক্তে জাগল জোয়ার।

মিস লেন ফিরে এল। আবার বসল পাশটিতে। কিছুক্ষণ দুজনেই নির্বাক। নির্বাক কিন্তু নিস্তরঙ্গ নয়।

"তুমি ..তুমি আসো না কেন রোজ?" লোকটি সাহস সঞ্চয় করে বলল।

"বারে, রোজ রোজ তোমার কাছে এমন করে এলে ওদের মধ্যে কথা উঠবে না ? (একটু থেমে) 'কথা ওঠা' মানে বোঝো ?"

"বুঝি। কিন্তু তুমি না এলে আমার যে ভীষণ খারাপ লাগে।"

"আসব।" বলল মেয়েটি। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চুপটি করে তাকিয়ে থাকল লোকটির মুখের দিকে।

আসব···আসব···আসব···। কথা দিয়েছে, আসবে। সারাদিন স্মরণ করা সেই সংগীতময় প্রতিশ্রুতি। কী মধুর প্রতীক্ষা! মধুর, না হাস্যকর ? হাস্যকর হলেও মধুর।

কথা রাখল। এল পরের রাত্রিতে। তারপর আরও রাত্রিতে। সঙ্গে আনল একগাদা পত্রপত্রিকা আর একজন সৈনিক। সৈনিকটির নাম মাইক। এখানেই থাকে। তাকে চেনে লোকটি।

"তোমার জন্য এগুলো আনলাম।" পত্রিকাগুলি টেবিলে নামিয়ে রাখল। "তোমার পড়া হয়ে গেলে ক্যাম্পে তোমার বন্ধুদের কাছে পাঠিয়ে দিও।" বিছানায় বসে পড়ল।

মাইক পাশের চেয়ারে।

পত্রিকাগুলির জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে লোকটি জল চাইল।

"ভীষণ ক্লান্তি লাগছে।" মিস লেন বলল। তারপর লোহার খাটের একদিকের রেলিংয়ে পিঠ এলিয়ে পা-দুটি টান-টান করে ছড়িয়ে দিল।

লোকটি একটু অস্বস্তি বোধ করল। একরকম তার পাশে প্রায় শুয়েই আছে মিস লেন।

"মাইক, লক্ষ্মীটি, এই গেলাসটা নিয়ে গিয়ে এ-বেচারাকে একটু জল এনে দাও না। আমি আর পারছি না।"

মাইক চলে গেল।

দুজনে এখন একা। লোকটি ইচ্ছে করলে ওকে কাছে টেনে নিতে পারত, কিন্তু নিল না। আসলে তার খুব রাগ হয়েছিল।

"একা আসা যায় না বুঝি!"

মিস লেন জবাব দিল না। হাসল শুধু। লোকটিকে আরও রাগিয়ে দেওয়াই যেন উদ্দেশ্য।

হঠাৎ হাসি বন্ধ করল মিস লেন। করুণ-সুন্দর দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল লোকটির মুখে। তারপর ধীরে ধীরে লোকটির একটি হাতে হাত রাখল। হাতে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল।

রাগ জল হয়ে গেল। ভীষণ ইচ্ছে হল ওকে চুমু খাওয়ার। কিন্তু কিছুই করল না লোকটি। চুপ করে আদর নিতে থাকল।

দূরে ফ্রিজ খোলার শব্দ। মাইক জল নিচ্ছে। ফ্রিজ বন্ধের শব্দ। কিন্তু মাইকের আসার শব্দ নেই। বোধহয় সে নিজেও একটু জল খেয়ে নিচ্ছে।

"এই, মাথায় একটু হাত বুলিয়ে দেবে ?" লোকটি অনুনয় জানাল।

তৎক্ষণে দোরগোড়ায় মাইক এসে গিয়েছে। সে কি শুনতে পেয়েছে কথাটা ? লোকটির নিজের উপরেই নিজের রাগ হল।

মিস লেন উঠে পড়ল। বিছানাটা ঠিক করে দিল। লোকটির গায়ের ঢাকা বিছানার সঙ্গে গুঁজে দিতে দিতে (এই সময় সারাক্ষণ মাইকের সঙ্গে কথা বলছিল মিস লেন) লোকটির মুখে-মাথায় সযত্নে হাত বুলিয়ে দিল। চুলে বিলি কেটে দিল।

যাওয়ার সময় আলো কমিয়ে, মুখ নামিয়ে, নিচু গলায় বলে গেল : "ঘুমিয়ে পড়ো, কেমন ? কাল আবার আসব।"

"সেন্‌তি মালে ?" (অর্থাৎ 'লাগছে নাকি ?')—প্রতিটি স্টিচ কাটার সঙ্গে সঙ্গে ইতালীয়তে জিগ্‌গেস করছিলেন ডাক্তার। আরও কয়েকদিনের মধ্যে উঠে দাঁড়ানোর এবং তারপর একটু-একটু বেড়ানোর নির্দেশ দিলেন।

পায়জামা ও ড্রেসিং গাউন পরে পায়চারি। প্রথমে খাট ধরে; তারপর দেওয়াল ধরে, তারপর ছড়ি-হাতে। ঘর থেকে বারান্দায়।

কষ্ট হয় বইকি। পা-দুটো কেমন যেন নিজের বলে মনে হয় না। মাথা ঘোরে। পেটের কাটা জায়গায় ব্যথাটা চাড়া দিয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। তবু দেহের কষ্ট হলেও মনটা ভালো থাকে। কতদিন পরে আবার জানলার ওপারে আকাশ দেখল। আদিগন্ত হলদে প্রেইরি। মাঝখান দিয়ে রেল-লাইন। সান্‌টিং-এর কাজে ব্যস্ত ছোট মাপের স্টিম-ইনজিন। নীল আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলি। মাঝে-মাঝে এক-আধজন পাহারাদার। বিশেষ করে এক বুড়ো পাহারাদারের সঙ্গে লোকটির বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে।

রাত্রে মিস লেন আসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়। চুলে বিলি কেটে

দেয়। বুকের রক্তে তুফান জাগে। তবু সেই সমুদ্রকে শাসনে রাখে লোকটি। একটা কারণ: বিদেশী ভাষা ইংরেজিতে আবেগ প্রকাশ ওর পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া, এই পরিবেশে আবেগ প্রকাশে সে অনিচ্ছুকও বটে।

তথাপি একদিন তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে: "আমি ভালোবাসি তোমায়।" বলেই অনুতপ্ত হয়, কারণ এভাবে সে কথাটা সত্যিই পাড়তে চায় নি।

মিস লেন রাগ করে না। পাত্‌লা ঠোঁট দুটিতে হাসি ফুটিয়ে বলে: "তুমি কিন্তু তা পারো না। কোন মানে হয় না ওকথা বলার।"

"দুঃখ পেলে, না ?"

আবার হাসল মিস লেন। পাশে বসল। চুপ করে থাকল অনেকক্ষণ। তারপর বলল: "ব্যাপারটা তোমার দিক থেকে কেন ঘটেছে জানো ? তুমি এখানে একা ছিলে। নিঃসঙ্গতায় ভুগছিলে। আবার বাঁচতে চাইছিলে। (একটু থেমে) আমি জানি, কী তীব্র তোমার নিঃসঙ্গতা। তা কাটিয়ে উঠতে তোমাকে সাহায্য করতে চেয়েছিলাম আমি। তাই তোমার সঙ্গে যতদূর পারি ভালো ব্যবহার করতে চেয়েছি। যদিও সব সময় তা পারি নি হয়তো। (লোকটির চোখে চোখ রেখে) একটা কথা কিন্তু তোমার বোঝা উচিত। তোমার জন্যে এমন অনেক-কিছু করেছি আমি যা অন্য রোগীদের জন্য করি না। করি নি। (আবার একটু থেমে) তার কারণ অবশ্য এই যে, অন্যদের চেয়ে তুমি অনেক-বেশি নিঃসঙ্গ।"

"ধন্যবাদ।"

"তুমি আমাকে ভালোবাস," মিস লেন বলল, "একথা কিন্তু সত্যি নয়।"

"সত্যি নয়!"

পাতলা ঠোঁট দুটি চেপে, কপালে একটি রেখা ফুটিয়ে, মাথা নাড়ল মিস লেন: "তোমার মনে হচ্ছে সত্যি। আসলে নয়। আমরা এখানে আছি বলেই তুমি ওকথা ভাবছ। বাইরে হলে আমার দিকে ফিরে তাকাতে না।"

"অতশত বুঝি না।" একগুঁয়েভাবে লোকটি বলল, "আমি শুধু জানি যে, আমি তোমায় ভালোবাসি।"

করুণ হাসল মিস লেন, "কী পাগলামি করছ! আমি তো বুড়ি। তোমার মাসী-পিসী হতে পারতাম। জানো কত আমার বয়েস ? প্রায় পঁয়ত্রিশ।"

"কিছু আসে-যায় না। সারা জীবনে আমি তোমার থেকে বেশি ভালো

কাউকে বাসি নি।" স্বরে বেশ বোঝা যায় ও তার পরম বিশ্বাসের কথা পরম আন্তরিকতার সঙ্গে বলছে।

এবার আর কিছু বলল না মিস লেন। লোকটির উপর ঝুঁকে পড়ে তাকে আদর করতে লাগল। প্রিয়ার মত। মায়ের মত। লোকটি তাকে আরও কাছে টেনে নিল। আর চুলের মধ্যে আঙুল বুলোতে থাকল। কত চুল, কিন্তু কী ছোট্ট মাথাটি! আদর পেতে পেতে, আদর করতে করতে, সে ভাবছিল, বিশ্বাস করছিল যে, এতো সুখী কখনও হয় নি। যদিও একথাও সে বুঝেছিল যে, ভোরের শিশিরের মতই এই সুখ মিলিয়ে যেতে পারে বাস্তবের রৌদ্রতাপে।

এই তো সময় চুম্বনের। কিন্তু সে ভুলে গেল সেকথা। মিস লেন ধীরে ধীরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। বলে গেল, "আসব আবার।"

আবার একা! দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুল লোকটি। মাথার মধ্যে অজস্র ভাবনার টানাপোড়েন। সেগুলোকে যতটা সম্ভব শৃঙ্খলাবদ্ধ করার, নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করতে লাগল। একটি মেয়ে—যে প্রায় যৌবনোত্তীর্ণা, দেখতে খুব সাধারণ, যার চুলে পাক ধরেছে, সেও পারে তোমার কাছে পরমরমণীয় হয়ে উঠতে। সব কিছু নির্ভর করে তোমার জীবনের কোন্ লগ্নে তার আবির্ভাব ঘটল তার উপর। এক-এক বার মনে হয়, ব্যাপারটা স্থায়ী হবে না। হতে পারে না। আবার ভাবে, এমনও তো হতে পারে যে, সে শিবিরে ফিরে যাওয়ার পর মিস লেন তার খোঁজ-খবর নেবে। হয়তো মাঝে-মাঝে এক-আধটা চিরকুট পাঠাতে পারবে। হয়তো প্রতীক্ষা করবে তার জন্য। আর একথা ভেবে দূর হয়ে যাবে তার দুঃখ আর জড়তা। সহনীয় হয়ে উঠবে তার দুর্ভার বন্দী-জীবনের অন্তহীন প্রহরগুলি।

এই সুখ হয়তো একেবারেই হারিয়ে যাবে না।

পরের রাত্রি।

লোকটি ভেবে চলেছে। অনেক ভাবনা নয়। জলের মত কিছু কিছু ভাবনা ছড়িয়ে দিচ্ছে তার হৃদয়ের তৃষিত অঞ্চলের উপর।

হঠাৎ কীসের শব্দ?

পদধ্বনি? কার পদধ্বনি? খুব ধীরে ধীরে কেউ আসছে। মিস লেন।

আরও যেন একজনের পায়ের শব্দ। মাইক? দুটো শব্দই থেমে গেল। মিস লেন-বোধ হয় এবার খাতাপত্র দেখবে। তারপর আসবে।

কিছুক্ষণ কাটল। কই, কেউ আসছে না কেন? কোনো শব্দ নেই কেন? কৌতূহল দমন করতে পারল না। উঠে পড়ল। ভেবেছিল যে, মিস লেন অফিস-ঘরে থাকবে। হঠাৎ তাকে দেখে খুশীই হবে। কিন্তু অফিস-ঘরে কেউ নেই। বারান্দায় গেল। সেখানে কেউ নেই।

হঠাৎ তার চোখ পড়ল ওদিককার একটা ঘরে। দরজা বন্ধ। বন্ধ দরজার নিচের ফাঁক দিয়ে আলো আসছে। ওর বুকটা ধক করে উঠল। ও ঘরটা ফাঁকাই থাকে। ওর ঘরের মতোই ও ঘরেও একটা ছোট খাট, টেবিল, চেয়ার ইত্যাদি আছে। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, আজ এই সময়ে কেউ বা কারা ও ঘরে আছে। কারা? অনুমান করা শক্ত নয়। মাইক এবং মিস লেন।

লোকটির বুকের মধ্যে একটি তীর যেন বিঁধল। ঘরের বাসিন্দারাও নির্ঘাৎ টের পেয়েছে তার উপস্থিতি। এমন জানলে সে কিছুতেই এখানে আসত না।

ঘরটার দরজা একটু ফাঁক হল। বেরিয়ে এল মাইক। প্রথমে তার মুখে ছিল ভয়ের ছায়া (ভেবেছিল, পাহারাদারদের কেউ বোধ হয় এসে হাজির হয়েছে), তারপর সেটা রূপান্তরিত হল বিরক্তি এবং রাগে।

লোকটিও যেন স্থির হয়ে গেল। সারা শরীরে তার তখন কাঠিন্য। মুঠি দৃঢ়বদ্ধ।

"ঘুমোও নি?"

"ঘুম আমার সহজে আসে না।"

"বাইরে ঠাণ্ডা।"

"হোক্।"

"ঘুমোতে গেলেই ভালো করতে। শরীর খারাপ হবে।"

"ধন্যবাদ। ঘুম পেলেই শুতে যাব। আমার স্বাস্থ্য নিয়ে ব্যস্ত হতে হবে না।"

আর একবার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি হানল মাইক। তারপর ঘরের ভিতরে গিয়ে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল।

লোকটি একটা সিগারেট বার করল। ধরাল না। ধীর পায়ে বিছানায় ফিরে গেল। না-ধরানো সিগারেটটা চেপে পিষে ফেলল ছাইদানে। শুয়ে পড়ল। এই লজ্জাকর, হাস্যকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে চেষ্টা করল সংযত হওয়ার, নির্লিপ্ত থাকার।

কিছুক্ষণ পরে—ঠিক কতক্ষণ সে বলতে পারে না—দরজা খোলার শব্দ। দুটি পদক্ষেপ। কিন্তু কত পার্থক্য দুটি পদক্ষেপে। এত ধীরে, এত সংকোচে, এত সন্তর্পণে বুঝি এই হাসপাতালের ভিতর কখনও পা ফেলেনি মিস লেন। পক্ষান্তরে, সশব্দ, উদ্ধত পদক্ষেপ মাইক-এর। আর সেটাই তো স্বাভাবিক। মাইক যে প্রভুদের একজন। যে-কোনো মেয়েকে সে পেতে পারে যখন খুশি, যেখানে খুশি। আর এ বাবদে তাকে আর যাকেই পরোয়া করে চলতে হোক না কেন—একটা বন্দীকে নিশ্চয়ই নয়।

লোকটি ঠিক করল, এ নিয়ে আর ভাববে না। মনের মধ্যে ঘৃণাকে ঠাঁই দেবে না। কিছুতেই নয়। মিস লেন তাকে যা-কিছু দিয়েছিল, যতটুকু দিয়েছিল তার মূল্যও বড় কম নয়। তবে ভাগ্যের সেই দানকে খেলাচ্ছলে নিতে হবে। সে ছিল অসুস্থ, অসুখী, নিঃসঙ্গ। মিস লেন তাকে সুস্থ করতে, সুখী করতে, সঙ্গ দিতে চেষ্টা করেছিল। এর বেশি কিছু নয়। কোন মোহ ছিল না তার মনে। কারও মনে কোনো মোহ সৃষ্টি করতে সে চায় নি। একথা সে নিজেই বলে গিয়েছে। 'যা সে দিয়েছে তার জন্য আমার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত'—লোকটি ভাবল। তবু সে একথাও মনে মনে না-বলে পারল না: 'কখনো তোমার উচিত হয় নি আমার পাশের ঘরেই ওভাবে যাওয়া। উচিত হয় নি। হয় নি। হয় নি!'

পরের দিন সকালে।

নিয়ম-মাফিক আরদালি এল। তারপর এলেন বয়স্কা নার্স মিসেস কেনেডি। এসেই মিষ্টি ধমক: "দুষ্টু ছেলে, কী আরম্ভ করেছ! খাচ্ছো না, ঘুমোচ্ছো না। এমন করলে অসুখ সারে?"

"বারে, আমি তো সেরে গিয়েছি। কিন্তু কী করে জানলেন যে, আমি খাচ্ছি না, ঘুমোচ্ছি না?"

"রাতের নার্স-এর রিপোর্ট থেকে। কাল রাতেও তুমি ঘুমোও নি। রেজিস্টারে মিস লেন লিখে রেখে গিয়েছে। থাক, এখন কিছু খাও দেখি।"

"মিসেস কেনেডি, রাগ করবেন না, একটুও খিদে নেই আমার।"

কিছুক্ষণ পরে ডাক্তার আসতেই লোকটি বলল, "আমি এবার ক্যাম্পে ফিরে যেতে চাই ডাক্তার। যত শিগগির সম্ভব।"

"পারবে?"

"খুব পারব।"

"আমারও মনে হচ্ছে, ক্যাম্পে ফিরে গেলেই তোমার হয়তো ভালো লাগবে।"

"নিশ্চয়ই ভালো লাগবে।"

"বেশ। কাল সকালেই যাতে ফিরে যেতে পার তার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

"অনেক ধন্যবাদ।"

আহ্, কী শান্তি! কিন্তু এখনও বাকি, পুরো একটি দিন, একটি রাত। রাতটা কাটানোই বেশি কঠিন।···রাত্রি এল। দেওয়ালের দিকে ফিরে চুপটি করে শুয়ে থাকল লোকটি। ভাবতে চেষ্টা করল কিছুই ঘটে নি। আর সত্যিই তো, হাসপাতালে কেউ কাউকে ইচ্ছে করে ব্যথা দেয় না। দেয় নি। মিস লেন তো নয়ই। কত রাত সে এসেছে। আদর দিয়েছে। আদর নিয়েছে। এরকম ব্যবহার সে তো আর কোনো রোগীর সঙ্গে করে নি। শুধু তার সঙ্গেই করেছে, আর সকলের চেয়ে সে বেশি অসুখী বলে, নিঃসঙ্গ বলে।

পদধ্বনি। তার পদধ্বনি। আসছে। আলো কমল। এল। বিছানার পাশে। না, জোর করে চোখ বন্ধ করা নয়। মুখের একটি পেশীও যেন কুঁচকে না-থাকে। এই তো, সহজভাবে তার চোখদুটি বন্ধ। এই তো, স্বাভাবিক তার শ্বাস-প্রশ্বাস। এই তো, স্বচ্ছন্দ তার নিদ্রা। মিস লেন দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। কাশল একবার। খুব জোরে নয় অবশ্য। না, ঘুমোচ্ছে লোকটা। পিছন ফিরল মিস লেন। থামল। পা টিপে-টিপে ফিরে যাচ্ছে।

না, সে পিছু ডাকবে না। চোখ খুলবে না। কাঁদবে না। কিছুতেই না। যদিও জানে, জীবনে আর কখনও দেখবে না মিস লেনকে, তবুও না। জগতে আর কোথাও দেখবে না মিস লেনকে, তবুও না।

পরের দিন সকাল নটা।

লোকটি ক্যাম্পে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত। পরনে নতুন পোশাক। পোশাক তো নয়, নামাবলীর স্যুট। আগা-পাশ-তলা 'যুদ্ধবন্দী' 'যুদ্ধবন্দী' ছাপ-মারা।

"মিসেস কেনেডি, চললাম। যদি কখনও কিছু অন্যায় করে থাকি ক্ষমা করবেন।"

"কিন্তু তুমি তো কখনও অন্যায় কিছু করোনি বাছা।" হেসে বললেন মিসেস কেনেডি।

"আপনার ছোট ছেলেটি কেমন আছে ?"

"তার কথা মনে আছে তোমার! ধন্যবাদ। ভালো আছে কিন্তু বড্ড দুষ্টু হচ্ছে।"

লোকটির মনে হল, সে কতদিন কোনো বড্ড দুষ্টু ছোট ছেলে দেখে নি।

এবার কাগজপত্রের জন্য যেতে হল একটি মেয়ে-কেরানির কাছে। ভুরু কামিয়ে এত উঁচু করে ভুরু এঁকেছে মেয়েটি যে সদাই তার মুখে গভীর বিস্ময়ের চিহ্ন আঁকা।

তার হয়ে এক পাহারাদার কাগজপত্রগুলি নিল।

ফটকের কাছাকাছি হতেই হুকুম এল : "হাত তোলো।"

"কিছু মনে কোরো না। এটা একটা দস্তুর মাত্র।" বলল সঙ্গের পাহারাদার।

কাঁটা-তারের বেড়া পার হল ওরা। সামনে পিচ-ঢালা সরু পথ। সামনে পাহারাদার। লোকটির চলতে কষ্ট হচ্ছিল। পেটে এখনও একটু ব্যথা।

"আন্‌দিয়ামো।" (চলে এসো)—তাড়া দিল পাহারাদার।

লোকটি ধীর পায়ে এগিয়ে চলল।

সামনে শিবির। সবুজ ছাউনি দেওয়া সারি সারি ব্যারাক। আবার এখানে থেকে চলবে তার ছায়ারৌদ্রপাত গণনা। আবার যন্ত্রণা। সব কিছু যেমন তার জন্য দুঃখ নয়। যা ছিল তার জন্য দুঃখ। যা হতে পারে তার জন্য দুঃখ। তবু এ এক ভিন্নস্বাদের ব্যথাবোধ। এ ব্যথাবোধ যেন আলনার মত, যাতে ঝুলিয়ে রাখা যায় সব মনোভার, দিনযাপনের গ্লানি, শরমের ডালি। খাওয়া, ঘুম, হাজরি। প্রাণধারণ করে থাকা যায় জীবনের প্রতীক্ষায় থেকে। যে-জীবন, যদি আদৌ কোনোদিন আসে, সেদিন মানুষের মন থেকে অশুভকর সব ভাবনা নিঃশেষিত হবে।

এমন প্রতীক্ষা সুদীর্ঘ হবেই।

অনুবাদ : অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

MONGOLIA : THREE STORIES *by* D. BATBAYAR

মাঙ্গোলিয়ার গল্প

দারামিন বাতবায়ার

মানুষের হাত

হাতের গুণে মানুষ সব পারে। এটা আমি হঠাৎ আবিষ্কার করি আমার সেই শৈশবে, যখন হাজার রকমের 'কেন' সব সময় মানুষের মনকে তোলপাড় করে।

কী করে আবিষ্কার করলাম বলি।

একদিন মাঠে বেড়াতে বেড়াতে ঘাসের মধ্যে দু টুকরো সাদা পাথর পেয়ে গেলাম। যাকে আমরা বলি চকমকি পাথর। পাথরে পাথরে ঠুকতেই দেখি আগুনের ফুলকি। সে রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে আরও কয়েকবার আগুনের ফুলকি বার করলাম। হঠাৎ দেখি আমার হাতের মধ্যে পাথর দুটো ক্রমশ গরম গরম ঠেকছে। তখন আমার কী আনন্দ! এতদিন জেনে এসেছি, যার প্রাণ আছে শুধু তার দেহেই তাপ থাকে। কী অবাক কাণ্ড, কী আনন্দের কথা, আমার ছোট্ট ছোট্ট হাতে দুটো ঠাণ্ডা পাথরে কিনা প্রাণের সাড়া জাগাচ্ছে!

মঙ্গোলিয়া

আর ঠিক তখনি আমার মনে হল: যদি আমি মেঘের মত বড় দুটো পাথর নিয়ে ঠোকাঠুকি করি, তাহলে গর্জে উঠবে বজ্র, ঝিলিক দেবে বিদ্যুৎ...

পাথর দুটো মুঠোর মধ্যে শক্ত করে ধরে তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

...বিছানায় ফের চিনি ছিটিয়েছি বলে মার কাছে পরদিন সকালে কী বকুনিই না খেলাম।

দেশলাই

কখনও কখনও লোকে আমার কাছে আগুন চায়। আমি নিজে অবশ্য বিড়ি সিগারেট খাই না। কিন্তু কাউকে ফেরাতে আমার বিশ্রী লাগে।

সেই জন্যে আমি সব সময় পকেটে একবাক্স দেশলাই রাখি।

আজকাল কেউ আমার কাছে আগুন চাইলেই দেশলাই বার করে দিই। ধরাবার পর তারা বলে, 'ধন্যবাদ!' ঈস্, মাত্র একবাক্স দেশলাই দিয়ে আমি কত লোকের যে উপকারে আসি!

তাহলেই দেখুন, মানুষের উপকার কত সহজে করা যায়—অবশ্যই যদি আপনি করতে চান।

নুন

ঠিক বয়েস কত মনে নেই, তবে এটা জানি তখন আমি খুবই ছোট।

...মা রান্না করছিলেন। আমি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে এক খামচা নুন নিয়ে মুখে পুরে দিয়েছিলাম। প্রথম নুন মুখে দিয়ে আমি যে কী হতাশ হয়েছিলাম কী বলব!

'ঝোলে অমন বিচ্ছিরি জিনিস কেন দাও, মা? তার চেয়ে মিষ্টি মিষ্টি কিছু দিলেই তো হয়। এই ধরো, মিছরি?'

'না, সোনা। খালি যদি মিছরিই খাও, তোমার দাঁত ব্যথা করবে।'

কথাগুলো আজও আমি ভুলি নি। বড় হয়ে যখন আমার চোখের জলের তিক্ত অভিজ্ঞতা হল, তার নোনতা স্বাদ আমার শৈশবের নুনের কথা মনে করিয়ে দিল। আমার ধারণা, জীবনে চোখের জল থাকবেই—যেমন নুন ছাড়া কখনও চলতে পারে না। থাকুক, তবে যতটুকু নইলে নয় শুধু ততটুকু।

অনুবাদ: সুভাষ মুখোপাধ্যায়

POLAND : ANIMAL FRIENDSHIP *by* ARKADY FIEDLER

কাছের মানুষ

আরকাদি ফিয়েদলের

চমৎকার সেই 'স্পাইডার' বানরটার জন্যে ক্লডিও-র সঙ্গে যে বৃথাই দেখা করতে গিয়েছিলাম, আমার সব সময়েই তা মনে পড়ে। যেমন করে হোক, বানরটা আমার চাই—এমনি একটা ঝোঁক চেপেছিল।

নদীর উজান বেয়ে যারা এইমাত্র এসে নেমেছে তাদেরই কিছু লোকের মুখে শুনেছিলাম, ক্লডিওকে তারা তার কুঁড়েঘরে দেখে এসেছে। তৎক্ষণাৎ আমার স্থানীয় দুই সহকারী ভালেন্টিনো আর জুলিওকে সঙ্গে নিয়ে আমি রওনা দিলাম ডিঙিতে চেপে বৈঠা ঠেলে। এখানে আসার পর প্রথমবার যে-ডিঙিতে চেপেছিলাম, এটা সেই একই ডিঙি। বানরটার বিনিময়ে ক্লডিওকে দেওয়ার জন্যে সবচেয়ে ভালো আর বড় মাপের কাপড় বেছে নিয়েছিলাম, বানরটার জন্যে নিয়েছিলাম সবচেয়ে সরেস কলা।

ভাঁটির টানে আমরা বেশ তাড়াতাড়ি লগি ঠেলে এগোলাম। ঘন্টাখানেক বাদেই দেখা মিলল সেই পরিচিত কুঁড়েঘরটির। খুশি হয়ে লক্ষ করলাম, পরিবারটি ঘরেই রয়েছে।

একটু অস্বস্তির সঙ্গেই ক্লডিও আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। বানরটা তার কাছে আছে, হাঁ, ভালোই আছে। কিন্তু রেড ইণ্ডিয়ানটি তাকে বিক্রি করতে চায় না। সে

জানাল—প্রাণীটির প্রতি তার স্ত্রীর ভয়ানক টান, কোন দামেই সে তাকে ছাড়তে রাজি নয়। তার স্ত্রী আমাদের দিকে এগিয়ে এসে ক্লডিওর কথারই পুনরুক্তি করল। এমনকি, লোভনীয় ওই কাপড়গুলো পর্যন্ত তার মনে এতটুকু দাগ কাটতে পারল না।

নদীর তীরে কুঁড়েঘরটির কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলাম আমরা। বানরটাকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আমি একবার দেখতে চাইলাম। ইণ্ডিয়ানরা এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষ পর্যন্ত সকৌতুকে কুঁড়েটির এক কোণ দেখিয়ে দিল। সেই কোণটার পিছনে দেখতে পেলাম শুধু একটা বাদামী মাথার উপরের দিকটা, আর স্পাইডার বানরটার ভয় খাওয়া চোখ দুটি। গভীর মনোযোগের সঙ্গে আমাদের সে লক্ষ করে চলেছে। শরীরের বাকি অংশটুকু দেওয়ালের পিছনে। ওই স্পাইডার বানরটার ঠিক উপরেই বসে রয়েছে আর-একটা বানর—কালো রঙ, মাথাটা আরও কিছুটা বড় আর গোল, নিজেকে লুকিয়ে রাখার ওই জায়গাটিতে বসে অপলক সে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে। ঠিক দুটি বাচ্চা ছেলের মত—যারা অপরিচিত আগন্তুকদের দেখে ভয় পেলেও কৌতূহলকে দমন করতে পারে না।

ইণ্ডিয়ানরা ডাকল বানরদুটোকে। প্রথমে তারা নড়তে নারাজ—ভাবখানা যেন ডাকটা শুনতেই পায় নি। তারপর বড় বানরটা ভয় কাটিয়ে উঠে ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল কুঁড়েঘরের পিছন থেকে।

আমি চিনলাম—এটা 'লেগোথ্রিক্স্' শ্রেণীর বানরের একটা চমৎকার নমুনা—যাদের বলা হয় 'বারিগুডো' বা 'পেটমোটা', দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন শ্রেণীর বানরের মধ্যে সবচেয়ে বড় আকারের। এর শক্ত সমর্থ আঁট-সাঁট দেহ আর ধীরস্থির চলাফেরার সঙ্গে ছিপছিপে-শরীর চঞ্চল স্বভাবের স্পাইডার বানরটার বৈপরীত্যটুকু লক্ষণীয়। এই বারিগুডোর প্রত্যেকটি কাজের মধ্যে রয়েছে একটা অবিচলিত মর্যাদাবোধ। সে কখনও ঝোঁকের মাথায় কিছু করে না বলেই মনে হয়। এদের লোম ধোঁয়াটে রঙের, অনেক ক্ষেত্রে কালো আর পশমের মত।

বড় বানরটা দেওয়ালের পিছন থেকে বাধ্য ছেলের মত বেরিয়ে এল ধীর, ইতঃস্তত পদক্ষেপে। তারপর মাঝামাঝি জায়গায় এসে থেমে গিয়ে, দু পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে, মাথাটা পিছনদিকে ঘুরিয়ে তাকাল কুঁড়েঘরটির দিকে যেখানে রয়ে গেছে তার সঙ্গী। হাতখানা ছড়িয়ে বেশ মর্যাদার ভঙ্গিতে এক

পাক ঘুরিয়ে নিয়ে সঙ্গীকে সাহস জোগাবার চেষ্টা করল। স্পাইডার বানরটাকে আমন্ত্রণ জানাল আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্যে। এই আমন্ত্রণ জানানোটুকুর মধ্যে এমন হাস্যকর কিছু-একটা ছিল যেটাকে ঠিক বর্ণনা করা যায় না—মানুষের হাত নেড়ে ইশারা করার ভঙ্গিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এই ভঙ্গিতেই একজন অভিনেতা নাটকের অভিনয়ের শেষে দর্শকের হাততালির মধ্যে তার নায়িকাকে মঞ্চে এসে দাঁড়াবার জন্যে আহ্বান করে।

নানারকম আদরের আহ্বান জানিয়ে আর ইশারা-ইঙ্গিত করে বানর-দুটিকে আমরা ভোলাবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু তারা শুধু স্বীকৃতি দেয় এমন জিনিসকে যার একটা বৈষয়িক মূল্য আছে। কাম্য ফল শুধু তখনই পাওয়া গেল যখন সোনালী রঙের দুটো কলা আমি ছুঁড়ে দিলাম মাটির উপরে। স্পাইডার বানরটা ভয়ে-ভয়ে বেরিয়ে এল তার আত্মগোপনের জায়গাটি থেকে, দ্রুত লাফে এগিয়ে গেল বারিগুডো বানরটির দিকে। তারপর দুটি বানরই একসঙ্গে আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে থাকল। দুজনেই একটি করে কলা তুলে নিল—স্পাইডার লোভীর মত, বারিগুডো অচঞ্চল ধীর-স্থির ভাবে। দুজনের মেজাজে কী অদ্ভুত পার্থক্য!

কলাগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল তাদের মুখের মধ্যে—নিশ্চয়ই সুস্বাদু, কেননা বানরদুটো আরও কলা পাওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে দেখা গেল।

গাঁট্টাগোট্টা বারিগুডো বানরটার মুখের চামড়া কালো, কোঁচকানো। ভুরু দুটো সামনের দিকে ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। কপাল ছোট। সে তার হাত দুটোকে নাড়ে এমনভাবে যেন কোন উদ্বেগ তাকে পেয়ে বসেছে। ফল খায় এমন এক চিন্তাশীল ভঙ্গিতে কিংবা উত্তেজনার কারণ ঘটলে এমন ভাবে সাড়া দিয়ে থাকে যে সেইদিক থেকেই স্পাইডার বানরটার চেয়ে মানুষের সঙ্গে তার মিল বেশি। কিছুটা বিস্ময়ের সঙ্গেই আমি লক্ষ করলাম, ওই কালো মাথাটির মধ্যে যেসব ভাবনা-চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে সেগুলো যেন অনেকটা মানুষের মত। বারিগুডোর চোখ দুটো শান্ত, অসীম বিশ্বাসের ভাব তাতে ফুটে উঠেছে, তার সমস্ত আবেগ তাতে প্রতিফলিত।

একটা কলা নিয়ে হাত বাড়িয়ে ধরে আমি বানরটার দিকে এগোলাম। স্পাইডার বানরটা আতঙ্কে তাড়াতাড়ি কয়েক পা পিছিয়ে গেল—আদিম মানুষের উদ্দাম নৃত্যের ভঙ্গিতে। পক্ষান্তরে, বারিগুডোটা একটুও নড়ল না। তার তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি আমার দিকে স্থির। আমি তার মুখে দেখলাম

বিপরীত কতকগুলি আবেগের প্রতিফলন : আস্থা আর অস্বস্তি, ভয় ও কৌতূহল। ঘাবড়ে না গিয়ে এবং স্পাইডার বানরটার উদাহরণ অনুসরণ না করার জন্যে সে যে কতখানি মনের জোর প্রয়োগের চেষ্টা করছে সেটা আমি বুঝলাম। আপনার থেকেই বারিগুডোটা মাথার পিছনে নিজের হাতখানা রেখে চুলের উপরে চাপড়াতে লাগল—উত্তেজিত স্নায়ুকে শান্ত করার জন্যে মানুষ যেমন করে।

কলাটা ওকে দিলাম। কোনরকম ব্যস্ততা না দেখিয়ে সেটাকে নিয়ে সে বেশ ভদ্রভাবে মুখের কাছে তুলে নিল। এমন সময়ে স্পাইডারটা হঠাৎ একটা প্রচণ্ড ঈর্ষায় জর্জরিত হয়ে লাফিয়ে তার কাছে এগিয়ে এসে তার মুখ থেকে ছিনিয়ে নিল কলাটা। এই আক্রমণের শিকার হয়েও কিন্তু লোভী খুদে বানরটার সঙ্গে লড়াই শুরু করার দিকে কিংবা তাকে তাড়া করার দিকে বারিগুডো বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখাল না। সে শুধু পলায়মান স্পাইডারটার দিকে এমন একটা দৃষ্টিতে চেয়ে রইল যেটাকে আমার বিস্ময়ের দৃষ্টি বলে মনে হল। তারপর সে আমার দিকে ফিরে তাকাল তার পীড়িত—কিন্তু বাঙ্ময়—দুই চোখের দৃষ্টি মেলে : আরেকটি কলা চায়। দিলাম আরেকটি কলা। তারপরে যা ঘটল, তাতে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। বন্য প্রাণীদের সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা দীর্ঘ কালের, কিন্তু এ পর্যন্ত আমি কখনও এরকম ব্যাপার ঘটতে দেখিনি।

খাওয়াটা তাদের কাছে তাদের অস্তিত্বেরই সবচেয়ে বড় শর্ত। আমি এ পর্যন্ত যত জানোয়ার দেখেছি সবাই পেটুক, আত্মকেন্দ্রিক। বড় জোর, একজন খেলে অন্যেরা বাধা দেয় না। কিন্তু এই বারিগুডো হাতে-পাওয়া কলাটাকে না খেয়ে নিয়ে গেল তার সঙ্গীর কাছে আর অবিশ্বাস্য এক আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে স্পাইডারকে সে কলাটা দিয়ে দিল এমনভাবে যেন বলতে চাচ্ছে : "এই নে, পেটুক হাঁহাকা!"

কী উদারতা, আত্মত্যাগ, বন্ধুত্ব!

তারপর বারিগুডো ফিরে এল আমার কাছে, আরেকটা কলা চেয়ে বসল। দিলাম। কলাটা যখন সে খাচ্ছে, আমি আরেকটু হাত বাড়িয়ে আঙুল দিয়ে তার মাথাটা ছুঁলাম। কিছু মনে করল না। আমি হাতখানা এগিয়ে দিলাম, সে চেপে ধরল, ধরেই রইল আমার হাতখানা।

মুখের বলিরেখাগুলি দেখে তাকে বুড়ো বলে মনে হলেও, স্পষ্টই বোঝা

যায় যে সে যৌবনে পা দিয়েছে। আমার মনে যেটা সবচেয়ে বেশি দাগ কাটল, সেটা তার উদারতা আর সজীব বুদ্ধিমত্তার সেই বিরল গুণটুকু— যেটা এমনকি বানরদের মধ্যেও বড় একটা দেখা যায় না। সুতরাং আমি যে এই বারিগুডোর প্রতি প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হব, তাতে আর আশ্চর্য কি। গোঁয়ার গোবিন্দ ওই স্পাইডারের চেয়ে সে ঢের ভালো। ক্লডিও কি এটাকেও হাতছাড়া করতে বেঁকে বসবে ?

ওকে যে আমি আদর করছি ইণ্ডিয়ানরা তা গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ করে চলেছে। আমার দিকে তারা এগিয়ে এল। গলা খাঁকারি দিয়ে বারিগুডোর দিকে আঙুল দেখিয়ে ক্লডিও বলল, "মাংসটা খুব— ।"

তার কথার তাৎপর্য বুঝলাম না। কিন্তু ভালেন্টিনো তৎক্ষণাৎ বুঝিয়ে বলল যে বারিগুডোর মাংস ভারি সুস্বাদু। এইজন্যেই বনাঞ্চলের বাসিন্দারা মহা উৎসাহে এদের শিকার করে। গভীর অরণ্যে বারিগুডোর সংখ্যা তুলনায় যথেষ্ট বেশি হলেও, মানুষের বসতি এলাকায় এদের খুব কমই মেলে। কারণ সেখানে এদের অস্তিত্বলোপ ঘটেছে।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আর, এটা ? এটাকেও কি ওরা মাংসের জন্যেই পুষছে ?"

ক্লডিও তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে কথাটার সোজা উত্তর দিল না; বারিগুডোটাকে তারা খেতে পারে, আবার না খেতেও পারে বলে ধরে নেওয়া যায়।

স্পাইডারটার দাম হিসেবে আমি কুঁড়েঘরের সামনে একটা গুঁড়ির উপরে ইতিপূর্বে রঙচঙে দুটি কাপড়ের থান রেখেছিলাম—সেটার দিকে ক্লডিও আর তার স্ত্রী লুব্ধ চোখে তাকাল। ক্লডিও আমাকে ওই গুঁড়িটার কাছে নিয়ে এসে, লাল কাপড়টার উপর বারেক হাত বুলিয়ে, দ্বিধার সুরে জিজ্ঞেস করল, "এটা দেবেন ?"

"কোনটার জন্যে ?"

"বারিগুডোটার জন্যে ?"

আনন্দের সুরটাকে গলায় চেপে আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "দুটো থানই দেব।"

এক মুহূর্তের জন্যে ক্লডিও নির্বাক হয়ে গেল। ভেবেছে, আমি নিশ্চয় ঠাট্টা করছি। তারপর খুব তৎপরতার সঙ্গে রাজির হয়ে গিয়ে সে অত্যন্ত ব্যস্তভাবে

তার স্ত্রীকে বলল কাপড়গুলো কুঁড়ের ভিতরে নিয়ে গিয়ে রাখতে—ঝোঁকের মাথায় আমি যে উদারতা দেখিয়ে ফেলেছি তার জন্যে আপসোসে যদি লেনদেনের শর্তটাকে প্রত্যাহার করে নিই !

ফিরে আসার পথে আমার সহকারী দুজন আমাকে বকতে লাগল। তাদের বক্তব্য : আমি খুব চড়া দাম দিয়েছি। বানরটা অত দামী নয় এবং ওই দুই থান কাপড় ভারি সুন্দর। বানরটা অত শান্তশিষ্ট কেন, তাও জানলাম্ : একজন প্রতিবেশী কিছুদিন বারিগুডোটাকে নিজের কাছে রাখার পর তার বন্ধু ক্লডিওকে দিয়েছিল খাবার জন্যে।

নৌকার গলুইয়ের সঙ্গে বাঁধা অবস্থায় বিষণ্ণ মুখে বসে রয়েছে বানরটা। জুলিও তাকে খুঁটিয়ে দেখল হিসেবী দৃষ্টি মেলে। তারপর ভালেন্টিনোর দিকে ফিরে বলল, "মাংস অবশ্য অনেকখানি আছে।...তা, সাহেব বোধহয় ঠকেন নি।"

আমাদের কুমারিয়ায় পৌঁছানোর পরেও বানরটাকে খাওয়া হবে কি হবে-না সে সমস্যার সমাধান হল না। পেড্রো তাকে খুঁটিয়ে দেখার পর আমাকে গম্ভীরভাবে উপদেশ দিল—বারিগুডোটাকে রাত্রে আমি যেন আমার তাঁবুর মধ্যে রাখি এবং তার উপরে ভালোরকম নজর রাখি। কেননা গ্রামের কেউ ওটাকে চুরি করার জন্যে প্রলুব্ধ হতে পারে।

এই ভাবেই আমি বারিগুডোটার মালিক হয়েছিলাম, এপর্যন্ত যতরকম প্রাণীর সঙ্গে আমার মেলামেশা ঘটেছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বন্ধু হিসেবে একে পেয়েছিলাম। একজন মানুষ আর একটি জন্তুর মধ্যে বন্ধুত্ব যতখানি গভীর হওয়া সম্ভব, আমাদের এই বন্ধুত্ব হয়ে উঠেছিল ততখানিই গভীর। আজও যখনই তার কথা ভাবি, মনের মধ্যে জমে ওঠে অথৈ একটা প্রীতির মনোভাব। তার স্বভাবের কোন্ দিকটা আমার সবচেয়ে ভালো লেগেছিল, তার অনন্যসাধারণ আকর্ষণী শক্তির উৎসটা কোথায়, বলা কঠিন। সেটা তার অসাধারণ রকমের শালীন একটি চরিত্রগুণ, না-কি সব সময়েই খুশির ভাব, অথবা তার শান্তশিষ্ট প্রকৃতি—কিংবা, বলতে পারি, নিখুঁত চালচলন—আর সেই সঙ্গে চট করে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা এবং বিস্ময়কর কাণ্ডজ্ঞান ?

তার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের বন্ধনটা অন্য প্রাণীগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বের থেকে ভিন্ন ধরনের। সুদূর অতীতে যখন মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর আত্মীয়তার সম্পর্কটা ছিল আজকের চেয়ে ঘনিষ্ঠতর, সেই সময়কার মনোভাবের কিছুটা পুনর্বিকাশ যে আমাদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ঘটেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের এই বন্ধুত্বের মধ্যে কিছুমাত্র আবেগের ভাবালুতা ছিল না। অতিরিক্ত ভাবাবেগের প্রকাশকে আমি অপছন্দ করি . এই জন্যেই দৈনন্দিন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমাকে কিছুটা নীরস আর রূঢ় বলে মনে হতে পারে) এবং এই বারিগুডোও সেটাকে অপছন্দ করে দেখছি।

সে তার কাছের মানুষদের সকলের প্রতিই প্রায় সমান প্রীতির মনোভাব দেখিয়ে থাকে—আমরা যাঁর অতিথি সেই পারানোভস্কি, পেড্রো, ভালেন্টিনো আর ডলোরেস—সকলের প্রতি। জুলিও সম্বন্ধে তার মনোভাবটা কিছুটা চাপা। বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে আমি তাকে আরও ভালোভাবে জানার পর বাজি ধরতে রাজি ছিলাম যে এই অনুভূতিপ্রবণ প্রাণীটা নিশ্চয় টের পেয়েছিল—ক্লডিওর ওখান থেকে আমাদের কুমারিয়ায় ফিরে আসার পথে জুলিও যে তাকে অমন মনোযোগের সঙ্গে টিপেটুপে দেখেছিল, সেটা তার মাংসটা উপাদেয় হবে কি-না জানার জন্যেই। এবং, এর জন্যে সে কখনও জুলিওকে পুরোপুরি ক্ষমা করে উঠতে পারে নি।

কুমারিয়ায় তাকে আনার তিন দিন পরে আমি তার দড়িটা কেটে দিয়ে স্বাধীনভাবে তাকে চলাফেরা করতে দিলাম। পালিয়ে না গিয়ে সারাদিন সে তাঁবুর চারধারে খেলে বেড়াল, সকলের সঙ্গে ভাব করল।

রোজ সন্ধ্যের সময় সে আমার ঘরে আসে রাত্রি কাটাতে। অন্য জন্তুদের সঙ্গে সে অবশ্য এক ধরনের মর্যাদাবোধের সঙ্গে খেলা করতে ভালবাসে—বিশেষত বাঁদরগুলোর সঙ্গে। ওদের এলেমেলো অস্থির ছুটোছুটি সে এক কৌতুকভরা মনোভাব নিয়ে সহ্য করে। এই কোলাহলপ্রবণ প্রাণীগুলির একটি বিপরীত চরিত্র হিসাবে সে সব সময়েই চুপচাপ।

তার গাঁট্টাগোঁট্টা ভারি শরীর আর মন্থর চলাফেরা দেখে আমি তাকে আলুথালু অলস প্রকৃতির বলে মনে করেছিলাম। কিন্তু আসলে তা নয়। ইচ্ছে করলে সে এমন অবিশ্বাস্য রকমের বিরাট লাফ মারতে পারে আর এমন তৎপরতার সঙ্গে সবচেয়ে উঁচু ডাল বেয়ে উঠতে পারে যে তা দেখে লম্বা হাত-পাওলা অনেক স্পাইডার বানরেরই ঈর্ষা হবে। লম্বা, পাকানো লেজটা দিয়ে

ডাল জড়িয়ে ধরে ঝুলতে ভালবাসে সে। নিচের দিকে মাথা করে শরীরটাকে ঝুলিয়ে এপাশে-ওপাশে দুলতে থাকে ভারি মজার ভঙ্গিতে। এবং সেই অবস্থাতেই এত সহজে মিষ্টি ফলগুলি খায় যেন সে খাড়া হয়েই বসে আছে।

আমি যখন কুমারিয়া থেকে রওনা হবার জন্যে তৈরি হচ্ছি, আমাদের বন্ধুত্বে বিচ্ছেদ ঘটাবার মত প্রথম দুর্ভাবনার কারণটি দেখা দিল—যদিও সেটা খুব গুরুতর প্রকৃতির নয়।

বারানোভ্স্কি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি ওকে পোল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে চান?"

"নিশ্চয়।"

"শুনেছি এই বানরগুলো সাধারণত সমুদ্রে মারা পড়ে ....."

এসব ব্যাপারে পেরুর লোকদের অভিজ্ঞতা আছে। তারা আমাকে আরও স্পষ্টভাবে সাবধান করে দিল। জোরের সঙ্গেই বলল: বারিগুডোদের পক্ষে পারা বন্দর পর্যন্ত টিকে থাকাটা খুব বিরল ঘটনা; সাধারণত আমাজনের মাঝামাঝি অঞ্চলেই মানাউস-এর কাছাকাছি তারা মারা পড়ে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও, একটা পাগলামি ভর করল আমার মাথায়: কুমারিয়ায় আমার সংগ্রহ করে রাখা বিভিন্ন জন্তুর চমৎকার স্বাস্থ্য দেখে উৎসাহিত এবং অর্থহীন এক উচ্চাকাঙ্খায় আচ্ছন্ন হয়ে আমি—শুধু এই বারিগুডোটাকেই নয়—আমার সংগ্রহ করা এই সমস্ত পশুপক্ষীকেই পোল্যাণ্ডে নিয়ে যেতে মনস্থ করলাম। মনে মনে ভাবছিলাম, এরা আমাদের দেশের চিড়িয়াখানাগুলোর কতখানি কাজে লাগবে—এই সব নানা জাতের তোতা, টিয়া, টুকান, সারস, সাপ, থালার মত বড় বড় ব্যাঙ, কত রকমের বানর, পিঁপড়েখেকো, শ্রু, একটি বাচ্চা টেপির, এবং আরো বহু রকমের অদ্ভুত সব প্রাণী।

জাদুঘরের জন্যে সংগৃহীত জিনিসগুলিকে বেশ যত্নের সঙ্গে প্যাক করা আর অনেকগুলো খাঁচা তৈরি হবার পর, একদিন আমি আমার সমস্ত মালপত্র একটি স্টিমারে চাপিয়ে নদীর ভাঁটি বেয়ে উকাইয়ালিয়া স্টিমার-ঘাট থেকে রওনা হলাম—একালের এক নোয়া'র মতই। ছোট স্টিমবোটটা বেশ একটু ঠাসাঠাসি হয়ে উঠলেও, ইকুইটোস পর্যন্ত আমাদের যাত্রাপথের প্রথম অংশটুকু নিরাপদেই পার হলাম।

ইকুইটোস থেকে আমাজনের ভাঁটি বেয়ে পারা পর্যন্ত আমাদের যাত্রাপথের পর্যায় কাটল ঢের বেশি খারাপ অবস্থার মধ্যে। এই স্টিমারে জায়গা

একটু বেশি হওয়ায় পশুপাখিগুলোকে আমি খাঁচার বাইরে বের করে দিয়ে, ডেকের উপরে তাদের বেঁধে রাখার সুযোগ পেলাম। কিন্তু তবু, অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়তে লাগল, আর সেই সঙ্গে আমারও স্নায়ুর উপরে চাপ বেড়ে চলল। ক্রমেই স্পষ্টতরভাবে এবং ক্রমবর্ধমান এক মানসিক অশান্তির সঙ্গে—আমি এই সমস্ত পরিকল্পনার নিরর্থকতা আর অনিবার্য ব্যর্থতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে লাগলাম। অসহায় পশুগুলিকে আমি নির্যাতন করছি—এই বোধটা প্রতিদিন আমাকে বেশি বেশি করে পীড়া দিচ্ছে: প্রাকৃতিক আরণ্যক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে এনে এইভাবে এদের অকালমৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছি বলে নিজেকে আরও বেশি করে অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। ব্রেজিল আর পেরুর সীমান্তে টাবাটিঙ্গার কাছে মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেল তার প্রথম শিকারটিকে। জন্তুগুলিকে নিয়ে গিয়ে রেখেছিলাম নিচের ডেকের এক আলাদা অংশে। দিনে রাত্রে যে-কোন সময়েই যাত্রীরা আর সারেংরা তাদের কাছে যেতে পারে আর সকলেই নির্দোষ কৌতূহলবশে প্রায়ই তাদের দেখে।

দৈনন্দিন রীতি অনুযায়ী একদিন সকালে যখন আমার এই পশুগুলিকে খাওয়াবার জন্যে এসেছি, তখন লক্ষ করলাম টেপিরটা তার জায়গায় নেই। তার গলায় বাঁধা দড়ির ফাঁসটা রাত্রে ঢিলে হয়ে গিয়েছিল দেখা গেল। বৃথাই ডেকের চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করে ফিরলাম। আমার প্রিয় এই পোষমানা প্রাণীটার এভাবে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়ায় মনটা ভার হয়ে উঠল। টেপিরটা কি রেলিং-বিহীন খোলা ডেক থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরেছে? দড়িটাকে খুঁটিয়ে লক্ষ করছি দেখে বারিগুডো আমার কাছে এসে আমার হাতখানা শক্ত করে ধরে ঘন ঘন নাড়াতে লাগল। আগে কখনও সে এরকম করে নি। তার সাধারণত শান্ত চোখের দৃষ্টিতে এখন ফুটে উঠেছে উত্তেজনার দীপ্তি। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে আমার দিকে—যেন কিছু বলতে চায়।

আমার হাতখানা ধরে সে নাড়া দিয়েই চলেছে দেখে শেষ পর্যন্ত আমি খুঁটি থেকে তার দড়িটা খুলে দিলাম। বারিগুডো যেন এরই অপেক্ষায় ছিল: লাফিয়ে উঠে সে আমাকে টেনে নিয়ে চলল ডেক পার হয়ে—এক কোণে গাদা করে রাখা কতকগুলো কেরোসিন কাঠের বাক্সের দিকে। একটি বাক্সের পাশে এসে থামল,—তার মুখে ফুটে উঠেছে নিদারুণ এক ভয়ের ভাব। তারপর একবার দাঁত খিঁচোল সে। স্তম্ভিত হয়ে বাক্সটার পিছনে আবিষ্কার করলাম আমার সেই টেপিরটার চামড়ার একটা অংশ।

কী ঘটেছে বুঝলাম : রাত্রে কেউ টেপিরটাকে চুরি করেছে মেরে খাওয়ার জন্যে। বারিগুডোর মতই টেপিরের মাংসও স্থানীয় লোকদের কাছে বিরল সুখাদ্য হিসেবে গণ্য।

সেদিন থেকে আমি সারাদিন ধরে আমার এই প্রাণীগুলির উপরে নজর রাখতে লাগলাম আর রাত্রে বারিগুডোটাকে নিয়ে গিয়ে রাখতাম আমার কেবিনে। টেপিরটার নিরুদ্দেশ হয়ে যাবার সেই অশুভ ঘটনাটি এক গভীর অশান্তি জাগিয়ে তুলল আমার মনে। অনুভব করতে লাগলাম নিজের প্রতি এক ক্রমবর্ধমান বিতৃষ্ণা, খাঁচা আর দড়িগুলির প্রতি ঘৃণা। নিজের স্নায়ুকে শান্ত রাখা আমার পক্ষে ক্রমশই কঠিন হয়ে উঠতে লাগল।

সৌভাগ্যের কথা, বারিগুডোটা অপ্রত্যাশিতরকম সুস্থ অবস্থায় চলেছে এই নদীপথে। খুব শক্ত সমর্থ পুরুষ-বানর। এই দুঃসময়ে আমরা পরস্পরের আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলাম।

রোজ সকালে আমরা যখন নিচের ডেকে নেমে আসি তখন সারা রাত্রির পরে ক্ষুধার্ত পশুপাখিগুলো মহা বিশৃঙ্খল অবস্থায় প্রবল এক কিচিরমিচির আওয়াজ তুলে সাড়া দেয়। এক কোণে বাঁধা বানরগুলো তাদের দড়িগুলো সব এমন তালগোল পাকিয়ে ফেলে যে তাদের আলাদা আলাদা করে দেওয়ার কাজটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়—বিশেষ করে তারা যখন বিশৃঙ্খলাটাকে আরও বাড়িয়ে তুলে আমার চারপাশ ঘিরে পাগলের মত লাফঝাঁপ করতে থাকে। বারিগুডো তখন সাহসের সঙ্গে এগিয়ে এসে আমাকে সাহায্য করে। আমার পাশে দাঁড়িয়ে কড়া মাস্টারমশাইয়ের মত তার এই বিশৃঙ্খল সহোদরশ্রেণীকে গুঁতো মেরে, দাঁত কিড়মিড় করে ধমক দিতে থাকে। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে তাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনে আর আমি দড়ির পাকগুলো খোলার সুযোগ পাই। আমাকে সাহায্য করার জন্যে তার এই চেষ্টাটুকু সত্যিই মনকে স্পর্শ করার মত।

আমাজন বেয়ে এই যাত্রার দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও কিছু প্রাণী মারা পড়ল। হতাশ হয়ে ভাবতে শুরু করলাম, পরবর্তী কোন স্টিমার-ঘাটে যখন থামব তখন বাদবাকি সমস্ত পশুপাখিকে ডাঙায় নেমে ছেড়ে দিয়ে আসব কি-না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটা আর করি নি।

বারিগুডোটার স্বাস্থ্য বেশ ভালোই রয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যে তার অস্তিত্বটাই হয়ে উঠছে এমন একটা সমস্যা যেটা ক্রমশই আমার পক্ষে সহ্য করা

শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে। আমরা যে পরস্পরের প্রতি এতখানি আসক্ত, সে যে এমন এক বিশ্বস্ত বন্ধু হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই কারণেই দেখা দিয়েছে এই সমস্যাটি। আমি যে তার কোন ক্ষতি করতে পারি না, তা আমি খুব ভালোভাবেই জানি। প্রতিদিনই আরও বেশি করে আমি বিবেকদংশনে জর্জরিত হচ্ছি। ওকে মুক্তি দিয়ে নিজেকেও মুক্ত করার চিন্তাটা ক্রমশই এমন ভাবে আমাকে পেয়ে বসল যে শেষ পর্যন্ত সেটা একটা স্থায়ী নির্যাতনের অনুভূতিতে পরিণত হল।

স্যান্টারেম ছাড়িয়ে পূর্ব-আমাজনের একটি ছোট বন্দরে স্টিমারটা এসে থামার পর, আমি বারিগুডোকে সঙ্গে নিয়ে কাছাকাছি একটা বনে একটু বেড়িয়ে আসার জন্যে নামলাম। নদী ছাড়িয়ে মাইল দুয়েক চলে এলাম। তারপর, একটা ঘন জঙ্গলের আড়ালে বানরটা অদৃশ্য হয়ে গেছে দেখে আমি পিছন ফিরেই পালিয়ে এলাম।

একলা স্টিমার-ঘাটের দিকে এগিয়ে এসেছি দ্রুত পায়ে। স্টিমার ছাড়ার ভোঁ বেজেছে। স্টিমারে ওঠার পাটাতনটিকে তুলে নেওয়া হচ্ছে—এমন সময়ে হঠাৎ দেখা গেল, কালো রঙের একটা গোলাকার প্রাণী প্রচণ্ডবেগে ছুটে আসছে। সারেংরা বারিগুডোকে চিনতে পেরে আবার পাটাতন নামিয়ে দিল, আর হাঁফাতে হাঁফাতে সে কোনরকমে গড়াগড়ি দিয়ে উঠে এল ডেকে।

সারাদিনটা সে যে কী তীব্র ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল—কখনও ভুলব না।

সমুদ্রপথে পারা থেকে রিও-ডি-জেনিরো পর্যন্ত আমাদের যাত্রার তৃতীয় পর্যায়টি পরিণত হল দুঃস্বপ্ন থেকে সামগ্রিক বিপর্যয়ে। ব্রেজিলের উপকূল ঘেঁষে চলেছি আমরা। সোঁ সোঁ শব্দে ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে চলেছে জাহাজের দড়িদড়াগুলোকে দুলিয়ে দিয়ে। খোলা ডেকে আমার পশুপাখিগুলো শীতে আড়ষ্ট হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ক্যাপটেন তাদের ঢাকা জায়গায় আশ্রয় দিতে অস্বীকার করেছে এবং আমার এইসব মালপত্রের জন্যে সে এমন একটা ভাড়া চেয়ে বসেছে যেটা একেবারেই আমার সাধ্যের বাইরে। আমার ইচ্ছে থাক বা না থাক, জাহাজের যাত্রী আর সারেংদের মধ্যে আমাকে এই পশুপাখিগুলি বিলি করে দিতে হল। রাখলাম শুধু কয়েকটা পাখি আর বারিগুডোকে। উকাইয়ালিয়া থেকে রওনা হয়েছিলাম যে-বিরাট পশুপাখির সংগ্রহ নিয়ে তা পরিণত হয়েছে এক নগণ্য সংখ্যায়। কষ্টসহিষ্ণু প্রাণী এই বারিগুডোর স্বাস্থ্যের এতটুকু পরিবর্তন ঘটে নি।

রিও-তে এসে আবার ডাঙায় নেমে আমরা কিছুটা সহজ বোধ করলাম, সূর্যের উষ্ণ স্পর্শে সুস্থ হয়ে উঠলাম। কিন্তু পশুপাখির রক্ষক হিসেবে—কিংবা, বলতে পারি, নির্যাতনকারী হিসেবে—আমার মর্মান্তিক ভূমিকাটি আমার পক্ষে সহ্যের শেষ সীমায় এসে ঠেকেছে : বেচারী এই প্রাণীটার আসন্ন ও অনিবার্য মৃত্যু চোখে দেখার জন্যে তাকে অতলান্তিকের পারে পোল্যাণ্ডে নিয়ে যাবার কথা আমি এখন আর স্বপ্নেও ভাবতে পারি না।

সৌভাগ্যবশত রিও-তে আমি একজন খুব ভালো লোকের সাক্ষাৎ পেয়ে গেলাম। অধ্যাপক তাদেউজ্ গ্রাবোভ্স্কি। বারিগুডোকে তিনি নিয়ে এলেন তাঁর বাড়িতে। তাঁর স্ত্রীও অতি চমৎকার মহিলা। প্রাণীটার প্রতি তিনি যথেষ্ট যত্ন নেবেন বলে কথা দিলেন।

রিও থেকে রওনা হবার দিন সকালে আমি গেলাম আমার বন্ধুটির কাছে বিদায় নিতে। দেখলাম বাগানে একটা লম্বা দড়ির সঙ্গে সে বাঁধা রয়েছে। সহজাত প্রবৃত্তিবশে সে বুঝল আমি কেন এসেছি। আমার হাতখানা চেপে ধরল,—কিছুতেই ছাড়বে না। আমার সঙ্গে তাকে কয়েক পা টেনে আনতে হল—দড়িতে যখন টান পড়ল শুধু তখনই তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিলাম। এমন একটা প্রচণ্ড জোরের সঙ্গে সে আমার দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করতে লাগল যে দড়ির ফাঁসটা তার গলায় কেটে বসে যাবার মত অবস্থা।—এই বেদনাদায়ক দৃশ্য বা প্রতীকটাকে আমি কোনদিন ভুলব না।

কয়েক পা এগিয়ে গেছি—এমন সময়ে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। বারিগুডোটা কখনও কোনদিন আওয়াজ করে নি, সম্পূর্ণ নির্বাক থেকেছে। এখন, দুঃখে আচ্ছন্ন অবস্থায়, তার দমবন্ধ হয়ে আসা গলা থেকে এমন একটা আওয়াজ বেরিয়ে এল যেটা শোনাল মর্মভেদী একটা আর্ত চিৎকারের মত :

'চা—আ—আ—আ ...'

ইওরোপের দিকে যখন একা রওনা দিলাম, ভেবেছিলাম—অনুতাপের দংশনে আর আমার বিবেক জর্জরিত হবে না। কিন্তু না, মুক্তি আমি পাই নি। খাঁচা আর দড়ির সেই যন্ত্রণাদায়ক স্মৃতি—আমি যার নাম দিয়েছি উকাইয়ালিয়া স্টিমার-ঘাটের দুঃস্বপ্ন—সেটা অতলান্তিক পারেও আমার মনের মধ্যে জেগে

রইল। যন্ত্রণাবোধের সঙ্গে এই উপলব্ধিটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে বারিগুডোটার প্রতি আমি অন্যায় করেছি। তাকে মুক্তি দেওয়াই উচিত ছিল এবং এমনকি, দরকার হলে জোর করেও তাকে বনে ফিরিয়ে দিয়ে এলেই ঠিক হত। শেষদিনে সেই দড়ির ফাঁসে আটকানো গলায় তার আর্ত চিৎকার এক দুঃস্বপ্নের মত আমাকে প্রতি রাত্রে পীড়া দিয়েছে।

পোল্যাণ্ডে ফিরে আসার দু মাস পরে রিও-ডি-জেনিরো থেকে একটা চিঠি পেলাম। বারিগুডোকে যাঁর তত্ত্বাবধানে রেখে এসেছিলাম সেই ভদ্রমহিলা তাঁর চিঠিতে যা ঘটেছে তা জানিয়ে ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন: আমি চলে আসার পরে বারিগুডোর মধ্যে পরিবর্তন দেখা দেয়। প্রতিদিন সে ক্রমেই বেশিরকম বুনো হয়ে উঠতে থাকে, কেউ কাছে এলেই কামড়াবার চেষ্টা করে। তারপর একদিন রাত্রে কোনোরকমে গলা থেকে দড়ির ফাঁসটাকে আলগা করে সে পালিয়ে যায়। বেশ কয়েকদিন ধরেই অনেকে তাকে দেখেছে ঘন বনে ঘেরা পাও-দাজুকার পাহাড়ে। কেউ তাকে ধরতে পারে নি। অবশেষে সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। স্পষ্টতই, শহর থেকে দূরের আরও জনবিরল কোন অঞ্চলে সে চলে গেছে।

যেদিন এই চিঠিখানা পেলাম, সেদিন সন্ধ্যায় বন্ধুবান্ধব আমাকে দেখে নিশ্চয়ই বিস্মিত হয়েছিলেন। আমার মত লোকের এতখানি হাসিখুশি ভাব তাঁরা আর কখনো দেখেন নি কিনা।

অনুবাদ: রবীন্দ্র মজুমদার

HUNGARY : LOVE by TIBOR DERY

ভালোবাসা

টাইবর্ ডেরি

সেলের দরজা খুলে রক্ষী কি-একটা ভিতরে ছুড়ে দিল।

'নাও, ধর।'

কয়েদীর সামনে মেঝের উপর একটা নম্বরী বস্তা এসে পড়ল। বি. দাঁড়িয়ে উঠে গভীর শ্বাস টেনে রক্ষীর মুখের দিকে তাকাল।

'তোমার পরনের কাপড় গো,' রক্ষী বলল। 'পরে নাও। ওরা তোমারে খেউরি করতে এসেছে।'

সাত বছর আগে ছেড়ে-রাখা জামাকাপড়, জুতো বস্তাটার ভিতর। জামাগুলো দোমড়ানো-মোচড়ানো, সেঁতিয়ে যাওয়া; জুতোজোড়ায় ছাতা ধরে গেছে। কামিজটাও ছাতাপড়া। কয়েদী সেটাকে কোনরকমে টেনেটুনে সোজা করে নিল। পোশাক পরা শেষ হলে জেলের নাপিত এসে কামিয়ে দিয়ে গেল।

এক ঘণ্টা পরে ওকে জেলখানার ছোট্ট অফিসঘরে নিয়ে আসা হল। জনা আট-দশ কয়েদী সামনের বারান্দাটায় এদিক-ওদিক দাঁড়িয়ে। সকলেই নিজের নিজের পোশাক পরা। তবু ওরই তলব পড়ল প্রথমে। অফিসঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছনোর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই।

ডেস্কের ধারে জনৈক সার্জেন্ট। আরেকজন পাশে দাঁড়িয়ে। একজন ক্যাপ্টেন ধীরেসুস্থে ছোট্ট ঘরটার এমুড়ো-ওমুড়ো পায়চারি করছে।

'ইদিকে এসো' ডেস্‌কের ধারে-বসা সার্জেন্ট বললে।—'নাম ?'...'মায়ের নাম ?'...'গন্তব্যস্থল ?'...

'জানি না,' বি. জবাব দিলে।

'তার মানে ?' সার্জেন্ট শুধলো, 'যাবে কোথায় তা জান না ?'

বি. বললে, 'কী করে জানব ? কোথায় আমায় নিয়ে যাওয়া হবে, তার আমি কী জানি !'

বিরক্ত হয়ে মুখ বাঁকাল সার্জেন্ট। বললে, 'ওরা আবার তোমারে কোথায় নে যাবে ? আরে, তুমি এখন বাড়ি যাবে, বুড়ি মা-র সাথে রাতের খানা খাবে। রাতে শোবার বিছানাও পাবে। বুঝলে ?'

কয়েদী এবার জবাব দিল না।

'তাহলে, গন্তব্যস্থল ?'

'সতেরো নম্বর সজিল্‌কা স্ট্রিট।'

'বুদাপেস্তের কোন মহল্লা ?'

'তুইয়ের মহল্লা,' বি. জবাব দিলে। পরে জিজ্ঞেস করলে, 'আমায় ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে কেন ?'

'বোঝো কাণ্ড,' গাঁ-গাঁ করে উঠল সার্জেন্ট, 'আরে, তোমারে যে খালাস দেওয়া হচ্ছে। মেয়াদ বোঝ, মেয়াদ ? সেই মেয়াদ শেষ। কেন, এখেন থেকে ছাড়া পেয়ে মন উঠচে না নাকি ?'

পাশের ঘর থেকে কয়েদীর ব্যক্তিগত জিনিসপত্র আনা হল। জিনিস বলতে একটা শস্তাদামের হাতঘড়ি, ফাউন্টেন পেন আর পৈতৃকসূত্রে-পাওয়া একটা সবজেটে-কালো জীর্ণ বটুয়া। বটুয়াটা একদম খালি।

'সই দাও দেখি,' সার্জেন্ট বললে। হাতঘড়ি, কলম, আর বটুয়া ফেরত পাওয়ার রসিদ।

বেতন বাবদ একশো ছেচল্লিশ ফোরিন্টের দরুন আরেকটা রসিদ বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'এখেনেও একটা।' কয়েদীর হয়ে ওরাই নোটগুলো গুনে গুনে টেবিলের উপর রাখলে।

'নাও, রেখে দাও,' সার্জেন্ট বললে।

বটুয়া বের করে বি. তার মধ্যে কাগজের নোট আর ভাঙানিগুলো পুরে ফেললে। বটুয়াতেও ছাতাপড়া সোঁদা গন্ধ। শেষ যে-বস্তুটি ওর হাতে দেওয়া হল, তা হচ্ছে ওর জেল-খালাসের হুকুমনামা। কাগজটার যে-অংশে

'গ্রেপ্তারের কারণ' কথাগুলো লেখা, তার পাশের লাইনটানা অংশটা একদম ফাঁকা।

বারান্দায় আরো প্রায় ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তারপর আরো তিনজন কয়েদীর সঙ্গে ওকে সদর গেটে নিয়ে যাওয়া হল। গেটে পৌঁছনোর ঠিক আগে একজন সার্জেন্ট ভিতর থেকে দৌড়ে এসে ওদের থামাল। চারজন কয়েদীর মধ্যে একজনকে বেছে নিয়ে টমিগানধারী দু-জন রক্ষীর মাঝখানে তাকে রেখে ফিরিয়ে নিয়ে চলল জেলখানায়। আর লোকটার সন্থ-কামানো মুখখানা হঠাৎ কেমন হলদেটে দেখাল, চোখদুটো মনে হল কাচের। বাকি তিনজন গেটে এসে উপস্থিত হল। দেহ-তল্লাসী শেষ হলে পর জেল-খালাসের হুকুমনামাটা ফিরিয়ে দিয়ে রক্ষী বি. কে বললে, 'ওই-যে টেরাম, চল্যে যাও।'

মাটির দিকে তাকিয়ে বি. তবু দাঁড়িয়ে রইল।

'দাঁইড়ে আছ কিসের ল্যেগে ?' রক্ষী জিজ্ঞেস করলে।

তবু দাঁড়িয়ে, রইল বি., একভাবে মাটির দিকে দুটো চোখ নামিয়ে।

'আরে, যাও-না, যাওঃ,' এবার খেঁকিয়ে উঠল রক্ষী, 'বলি, গড়িমসি কিসের ল্যেগে, অ্যাঁ ?'

'যাচ্ছি, যাচ্ছি,' বি. বললে, 'তাহলে···বলছ···যেতে পারি ?'

রক্ষী জবাব দিল না। জেল-খালাসের হুকুমনামা পকেটে ফেলে গেট দিয়ে বেরিয়ে এল বি.। কয়েক-পা এগিয়ে ওর ইচ্ছে হল, পিছন ফিরে দ্যাখে। কিন্তু ইচ্ছেটা দমন করে ফের এগিয়ে চলল। কান পেতে একবার শোনার চেষ্টা করল। নাঃ, পেছনে কোন ভারি পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। ট্র্যাম পর্যন্ত যেতে যেতে কেউ যদি আমার ঘাড় চেপে না ধরে, কিংবা পেছন থেকে চেঁচিয়ে নাম ধরে না ডাকে, তবে বুঝতে হবে সত্যিই আমি স্বাধীন—ও ভাবল। নাকি ? সত্যিই স্বাধীন বটে তো ?

ট্র্যাম-স্টপে পৌঁছে হঠাৎ ফিরে দাঁড়াল ও। নাঃ, কেউ পিছু নেয় নি। কপালের ঘাম মোছার জন্যে রুমালের খোঁজে আতিপাতি করে পকেট হাতড়ালো, পেল না। তীব্র আওয়াজ করে একটা ট্র্যাম এসে দাঁড়াতে ও উঠে পড়ল। মুখে বসন্তের দাগ, জেলের একজন শান্ত্রী ট্র্যামটার পিছনের কামরা থেকে নামল। প্রথম কামরার পাশ দিয়ে যেতে যেতে বি. কে ছোট্ট কুতকুতে চোখ মেলে একবার আপাদমস্তক ওকে নিরীক্ষণ করলে। বি. দেখে সেলাম করল না। ট্র্যামটা ছেড়ে দিল।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে—শাস্ত্রীকে সেলাম না-করা আর ট্রাম ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে এক মুহূর্তের ভগ্নাংশটিতে—সারা পৃথিবী যেন শব্দে শব্দে ঝন্‌ঝনিয়ে উঠল। ঠিক যেমনটি সিনেমায় দেখা যায়। প্রোজেক্টর বিগড়ে যাওয়ায় ফিল্মটা কিছু সময় নিঃশব্দে চলার পর কোন একটা বাক্য বা শব্দের মাঝখানে অভিনেতার হাঁ-মুখ থেকে যেমন আচমকা আওয়াজ আছড়ে পড়ে, অনেকটা সেইরকম। কিংবা, যেমন থিয়েটর। কালা-বোবা এক-টুকরো ফাঁকা—শূন্যতা, যার ভিতরে বসে এমনকি দর্শকরাও তার তৃতীয়-মাত্রিক অস্তিত্বের কথা ভুলে থাকে, আর হঠাৎ এক নিমেষে তার কড়ি-বরগা পর্যন্ত কেঁপে ওঠে উচ্চকিত গান-বাজনায়, সংলাপে। বি.-র চতুর্দিকে যেন রঙে রঙে বিস্ফোরণ শুরু হয়ে গেল। হলুদ রঙের যত রকমফের ওর জানা, উলটোদিক থেকে ছুটে-আসা ট্র্যামটার রঙ তাদের সবার চেয়ে বেশি হলদে ঠেকল। ট্র্যামটা এত সাংঘাতিক জোরে একটা নিচু ঝলমলে পাঁশুটে রঙের বাড়ির পাশ দিয়ে চলে গেল যে বি. ভাবল ট্র্যামটাকে আর কখনই বুঝি বাগ মানানো যাবে না। রাস্তার ওধার ঘেঁষে আফিম ফুলের মত ঘোর লাল রঙের দুটো ঘোড়া একটি খালি মালবওয়া গাড়ির আগে-আগে ছুটছে। গাড়িটার ঝন্‌ঝনানির জাদু শাদা মেঘের ডোরাকাটা আকাশে মেঘপরীদের যেন নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ছোট্ট এক ফালি সবুজের ঘোরলাগা বাগান, দুটো ঝকমকে কাচের গোলক, রান্নাঘরের খোলা একটা জানালা ঢেউ খেলে পেছিয়ে গেল। লক্ষ লক্ষ লোক ফুটপাথগুলোয় গুঁতোগুঁতি করছে—সবাই অসামরিক পোশাক পরা, প্রত্যেক দুটি লোক একেবারে আলাদা ধরনের, একে অপরের চেয়ে বেশি সুন্দর। অনেকে আবার আশ্চর্য রকম খুদে, মাথায় মাত্র হাঁটুর সমান, কাউকে কাউকে আবার কোলেও বইতে হচ্ছে। আর কী-সব স্ত্রীলোক! আহা!

বি. অনুভব করল, মাথাটা ঘুরছে। কামরার ভিতরে ঢুকল ও। মেয়ে-কণ্ডাক্টরটির গলা এত জোরালো অথচ ভারি নরম তো! টিকেট কেটে বি. কামরার একদম শেষে গিয়ে প্রথম সিট্‌টায় বসল। বসে সব কটা ইন্দ্রিয় বন্ধ করে রাখল। ওরা খোলা থাকলে নিজেকে বাগ মানাতে পারবে না ও। এক সময় জানলা দিয়ে দেখল, উলটোদিকের ফুটপাথে মদের ভাটিখানার গেটের পাশে দাঁড়িয়ে একজন লোক একটি অল্পবয়সী মেয়ের গাল টিপে আদর করছে। রুমালের খোঁজে আবার ও ট্রাউজারের পকেট হাতড়াল। নাঃ, নেই। কপালে সদ্য ফুটে-ওঠা ঘামের ফোঁটাগুলো মুছবে-যে এমন কিচ্ছু নেই।

উল্‌টোদিকের খালি সিট্‌টায় একজন মজুর এসে বসল। সঙ্গে মুখখোলা হাতব্যাগে আধ-ডজনখানেক বিয়ারের বোতল।

কণ্ডাক্টরটি হেসে উঠল।

'মাত্রা একটু বেশি চড়ো যাবে না?'

'আরে, আমার ঘরের বউ, বোঝলে বোন, আমার ইস্তিরি গো—দেখতে চায় তার মরদ একটু বেশি গিলচে।' মজুরটি বললে।

কণ্ডাক্টর আবার হাসল।

'খালি দেখতেই চায়?'

'আবার কী।'

'এ কাল্‌চে বিয়ার, তাই না?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'কিন্তু হাল্‌কা রঙের বিয়ারই তো খেতে ভালো।'

'কী করব। আমার ইস্তিরি আবার কাল্‌চে রঙটাই দেখতে পছন্দ করে।'

কণ্ডাক্টরটি আবার হেসে উঠল।

'আমারে এক বোতল দেবে?'

'কালো বিয়ার?'

'তা কালো কালোই সই।'

'কিসের ল্যেগে?

'কত্তার ল্যেগে ঘরে নিয়ে যেতাম আর কি।'

'তা, ওর তো হালকা বিয়ার পছন্দ। কালো বিয়ার লিয়ে করবে কী?'

কণ্ডাক্টর হাসল। ট্র্যাম এসে একটা স্টপে দাঁড়াতে বি· নেমে পড়ে ট্যাক্সি ডাকল।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার টীনের ফ্ল্যাগটা ঝনাত্‌ করে নামিয়ে দিলে।

সওয়ারি কিছু বলছে না দেখে সে জিজ্ঞেস করলে, 'যাবেন কোথায়?'

বি· বললে, 'বুদায়।'

ঘাড় ফিরিয়ে প্যাসেঞ্জারকে এবার ভালো করে দেখলে ট্যাক্সি-ড্রাইভার।

'কোন ব্রিজ ধরে?'

বি· সোজা সামনের দিকে তাকাল। সত্যিই তো, কোন ব্রিজ?

'নতুন এসেচেন বুঝি?' ড্রাইভার প্রশ্ন করলে।

উত্তরে বি· বললে, 'মার্‌গিট ব্রিজ ধরে চলুন।'

ট্যাক্সি চলতে শুরু করল। পেছনে হেলান না দিয়ে সোজা হয়ে বসল বি.। রৌদ্রোজ্জ্বল রাস্তার ধুলো আর পেট্রোলের গন্ধ, ট্রামগাড়িগুলোর ঘন্‌ঘনে ঘণ্টার আওয়াজ ট্যাক্সির খোলা জানলা দিয়ে ছুটে আসতে লাগল। ফুটপাথ আর পথচারীদের ছায়ার উপর সূর্য সমানে অগ্নিবর্ষণ করে চলেছে আর ছায়াগুলোকে লোকের পায়ের কাছে গুটিয়ে এনে পথ-চল্‌তি লোকের সংখ্যা যেন দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুলল। ফুটপাথের মিষ্টির দোকানে শামিয়ানার নিচে সিগারেটমুখে একটি তরুণী বসে। শামিয়ানার কম্‌লারঙের ডোরার মধ্যে দিয়ে লালচে-বাদামি আলো মেয়েটির গায়ে চুঁইয়ে পড়ছে। হঠাৎ দেখা গেল একটা রাস্তার মোড়ে ছোট্ট বাদাম গাছে কুঁড়ি ধরেছে। নিচে অল্প একটুখানি জালি-কাজ-করা চোখজুড়নো ছায়া।

'সিগারেট কিনতে হবে। যদি কোথাও দাঁড়ান তো বড় ভালো হয়…' ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বি. বললে।

রাস্তার তৃতীয় বাড়িটার সামনে ট্যাক্সি দাঁড়াল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল বি.।

একটা ছোট সবজির দোকানের খোলা দরজার একেবারে সামনে দাঁড়িয়েছে ওরা। ভিতরে আঁটি-বাঁধা স্তূপীকৃত রাঙা মুলো, মণ মণ সবুজ লেটুস-পাতা, থরে থরে সাজানো লাল আপেল। দোকানটার পাশেই তামাকওয়ালার দোকানে ঢোকবার গলি।

'সিগরেট আমিই আনছি,' ট্যাক্সি-ড্রাইভার বললে। তারপর ফিরে তাকিয়ে, 'কোন্‌ ব্র্যাণ্ড লাগবে?'

বি. মুলোর স্তূপের দিকে তাকিয়ে ছিল। হাতদুটো অল্প-অল্প কাঁপছে।

'কোস্ট্যাথ্‌ চলে?'

'হ্যাঁ' এবার বি.বললে, 'আর ওই সঙ্গে এক বাক্স দেশলাই।' ড্রাইভার ট্যাক্সি থেকে নামল। বলল, 'থাক, ব্যস্ত হবেন না। ভাড়ার সঙ্গে সিগারেটের দামটাও ধরে দেবেন অখন। এক প্যাকেট তো?'

'হ্যাঁ ভাই,' বি. বললে।

ড্রাইভার ফিরে এল।—'এখুনি ধরান না একটা।…জানেন, আমার সম্বন্ধীরও দু-বছরের মেয়াদ হয়েছিল। ছাড়া পেয়ে সে করলে কী, প্রথমেই সিগরেট কিনে বসল। পরপর দুটো কোস্ট্যাথ্‌ টেনে তারপর বাড়ি ফিরেছিল।'

একটু চুপ করে থেকে বি. বললে, 'বুঝলেন কী করে যে আমি…।'

'বোঝা যায়, অল্প-বিস্তর বোঝা যায়,' মাথা নেড়ে ড্রাইভার বললে, 'আমার সম্বন্ধীরও এমনিধারা রুগ্ন-রুগ্ন চেহারা হয়েছিল। অবিশ্যি, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও এমনি দেখায়। তবে সেখানে কাপড়চোপড় অমন দুমড়ে-মুচড়ে তো আর রাখে না। আপনার ক-বছরের মেয়াদ ?'

'সাত বছর,' বি. জবাব দিলে।

উত্তরে ড্রাইভার একটা শিস্ দিল।—'রাজবন্দী ?'

বি. বললে, 'হ্যাঁ। কনডেমড-সেলে ছিলুম দেড় বছর।'

'শেষ পর্যন্ত ছাড়লে আপনারে ?'

'তাই তো দেখছি,' বি. বললে, 'অনেকদিনের কয়েদ, তাই না ?'

ড্রাইভার কাঁধদুটো উপরে তুলে ফের ঝাঁকি দিয়ে নামাল।— 'সা—ত বছর ! সোজা কথা !'

কেব্‌ল্‌চালিত ট্রেনের স্টেশনের কাছে এসে বি. ট্যাক্সি থেকে নেমে পড়ল। বাকি পথটুকু ও হেঁটে যাওয়া মনস্থ করেছে। স্ত্রীর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই সহজে চলাফেরা করায় অভ্যস্ত হয়ে নিতে চায়। ট্যাক্সি-ড্রাইভার বখ্‌শিসের পয়সা নিতে অস্বীকার করল।

'আপনার এখন পয়সার দরকার, বুঝলেন কমরেড,' লোকটি বলল।—'নিজের স্বাস্থ্যের জন্যে ছাড়া আর-কিছুতে পয়সা নষ্ট করবেন না। রোজ বেশ খানিকটা মাংস খাবেন আর আধ-বোতলটাক ভালো মদ। দেখবেন, অল্পদিনেই গায়ে তাকত্ পাবেন।'

'আচ্ছা ভাই, চলি।'

পাশের দিকে তাকিয়ে দেখল বি. রাস্তার উল্‌টোদিকে জামাকাপড়ের দোকানের জানলায় একখানা সরুমত আয়না টাঙানো। অল্প কিছুক্ষণ আয়নাটার সামনে দাঁড়াল ও, তারপর ফের চলতে শুরু করল। পাসারেত্ রোড লোকে গিস্‌গিস করছে দেখে পাহাড়ের গায়ে গায়ে একটা পায়ে-চলা পথ ধরে টেনিস কোর্ট ছাড়িয়ে একেবারে হের্‌মান ওট্টো রোডে এসে উঠল। এ-জায়গাটার আশপাশ আবার বড় বেশি নির্জন, ফাঁকা ; উল্‌টোদিকের পাহাড়-সারির মুখোমুখি বেশ কিছু খালি জমি। মাথাটা ঘুরে ওঠায় বি. তাড়াতাড়ি এসে ঘাসের উপর বসল। স্ত্রীর যখন ওর জন্যে অপেক্ষা করে থাকার কোনো কারণ নেই, তখন আধ-ঘন্টাটাক ঘাসের উপর বসা যেতে পারে, ও ভাবল। সামনেই বেড়ার ওধারে ফুলে-ভরা একটা আপেল-গাছ।

গাছটার দিকে খানিক তাকিয়ে রইল বি., তারপর উঠে বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। ডালে ডালে মোমের মত, চকচকে শাদা ফুলগুলো এত ঘন হয়ে ফুটে উঠেছে যে নিচে থেকে উপরদিকে তাকালে গাছের তুষার-শাদা গম্বুজ ভেদ করে ঝলমলে আকাশের গাঢ় নীল সমতলভূমি প্রায় নজরেই আসে না। প্রতিটি ফুলের বড় বড় গোল গোল পাপড়ির মধ্যিখানে একটুখানি গোলাপির আমেজ—যেন নববধূর সাজসজ্জায় রঙের একটু কোমল ছোঁওয়া। মৌমাছিরা ঝাঁকে ঝাঁকে গুনগুনিয়ে এমনভাবে পাপড়িগুলোর ভিতর-বার করে বেড়াচ্ছে যে মনে হচ্ছে গাছটা মাথায় যেন ওড়না দিয়ে আছে আর ওড়নাখানা হাওয়ায় ফুরফুর করছে। বি. দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গাছের গুন্‌গুনুনি শুনতে লাগল। দুটো ডালের ফাঁকে আচমকা এক-চিলতে আকাশ ওর নজরে এল। দূর আকাশে পাখির পালকের মত একমুঠো নরম শাদা মেঘ। মনে হল, ফুলে-ভরা আর-একটা আপেলগাছই বুঝি। দুটো আপেলগাছের দিকে ফিরে ফিরে তাকাতে লাগল ও, যেন তাকাতে লাগল প্রাপণীয় থেকে অপ্রাপণীয়ের দিকে, সীমা থেকে অসীমে। ক্রমে মেঘের ছায়ায় অন্ধকারে ও ঢেকে গেল।

হাতঘড়িতে দম দিতে ভুলে গিয়েছিল। তাই খেয়াল ছিল না ট্যাক্সি ছেড়ে দেবার পর কতটা সময় কেটে গেছে। আর দেরি না করে এবার ও বাড়ির দিকে রওনা হল। কিন্তু কয়েক পা এগোতেই একটা ঝোপের আড়ালে বমি করে ফেলল। বমি করায় বেশ হালকা বোধ হল। ফুলন্ত ফলের বাগানে ভরা পাহাড়ের গায়ে সরু সরু রৌদ্রোজ্জ্বল গলিপথের কাটাকুটি ডোরা। ওই সব পথ ধরে আরো আধ-ঘণ্টাটাক হাঁটার পর বি. বাড়িতে এসে পৌঁছল। ওদের ফ্ল্যাট ছিল দোতলায়। বাগানে ঢুকে সদর দরজার ডাইনে-বাঁয়ে দুটো শাদা লাইল্যাকের ঝোপ। সামনের সিঁড়ি বেয়ে ও উপরে উঠে গেল।

বেল্ টিপে সাড়া মিলল না। দরজার গায়ে নামলেখা প্লেট'ও নেই। অগত্যা ফের নিচে নেমে তত্ত্বাবধায়কের ফ্ল্যাটে গিয়ে বি. দরজায় টোকা দিল।

যে-স্ত্রীলোকটি দরজা খুলল তাকে সুপ্রভাত জানাল। স্ত্রীলোকটিও আগের চেয়ে বয়স্কা আর রোগা হয়ে গেছে মনে হল।

'কাকে চাই?'

'আমি বি.। আমার স্ত্রী কি এখনো এ-বাড়িতে থাকে?'

'অ্যাঁ। আ আমার কপাল! শেষ পর্যন্ত ফিরলেন তাহলে?' স্ত্রীলোকটি বলল।

'হ্যাঁ, এলুম আর-কি,' বলল বি., 'আমার স্ত্রী কি এখনো এ-বাড়িতে থাকে?' হাতল ছেড়ে দিয়ে এবার দরজায় ভর দিয়ে দাঁড়াল স্ত্রীলোকটি।

'বাড়ি এলেন তাহলে?' ও আবার বলল।—'হা কপাল! ও-হ্যাঁ, ও এখেনেই আচে। আপনি বাড়ি আসচেন, হতভাগী তাও জানত না বুঝি? হা ঈশ্বর! হ্যাঁ, কি বলছিলাম, ও এবাড়িতেই আচে।'

'আর, আমার ছেলে?' বি. শুধলো।

স্ত্রীলোকটি স্মিত মুখে ঘাড় কাত করলে। বললে, 'চমৎকার ছেলে। দেখতেও হয়েচে সোন্দর। যেমন শক্ত-সমথ, তেমনি তার স্বাস্থ্য। আ আমার কপাল।'

বি. এবার জবাব দিলে না।

'আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন,' কাঁপা-কাঁপা গলায় স্ত্রীলোকটি বললে।—'চলে আসুন। জানতাম, আপনি নিদ্দুষী। মন বলত, একদিন না একদিন নিঘ্‌ঘাত ফিরে আসবেন।'

'কিন্তু...তিনবার বেল টিপলুম, কেউ দরজা খুলল না তো?' বি. বলল।

'ভেতরে আসুন, বলচি', স্ত্রীলোকটি বললে, 'বাড়িতে কেউ নেই কিনা এখন। ভাড়াটেরাও সব বাইরে।'

কিছু না-বলে বি. মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।

'আপনার গিন্নী কাজে বেরিয়েচে। তারপর গিয়ে, গিউরিকাও এখন ইস্কুলে', স্ত্রীলোকটি বলল।—'ভেতরে আসবেন না? ওরা সেই বিকেল নাগাদ ফিরবে।'

'ফ্ল্যাটে অন্য লোকও থাকে বুঝি?' বি. জিজ্ঞেস করলে।

'তা বাপু, ভারি ভালো নোক ওরা', স্ত্রীলোকটি জবাব দিলে।—'আপনার গিন্নীর সঙ্গে কিন্তু খুব বনিবনা। আ আমার কপাল, সত্যি-সত্যি বাড়ি এলেন তাহলে?'

বি. চুপ করে রইল।

কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি বলল, 'আপনার ফ্ল্যাটের চাবি আমার কাছে। গিন্নী বাড়ি ফেরার আগে আপনি একটুকু ওপরে গিয়ে জিরিয়ে নিতে চান, কেমন কিনা?'

দেয়ালের গায়ে একটা পেরেকে দুটো চাবি ঝুলছিল। স্ত্রীলোকটি একটা চাবি পেড়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে এগোল। বলল, 'ওপরে গিয়ে একটুকু জিরিয়ে নিতে চান, তাই তো?'

বি. খানিক নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। শেষে শুধলো, 'আপনিও সঙ্গে যাচ্ছেন তো?'

'যাচ্ছি বই-কি। গিন্নী কোন ঘরে থাকে, দেকিয়ে দিতে হবে না?' স্ত্রীলোকটি বলল।

'ও কোন ঘরে থাকে?' বি. জিজ্ঞেস করলে।

স্ত্রীলোকটী বলল, 'তা গিয়ে, আপনার ভাড়াটেরা সবশুদ্ধ চারজন নোক। ওদের দখলে দুটো ঘর। আপনার গিন্নী গিউরিকারে নিয়ে ঝিয়ের ঘরটায় থাকে। তবে রান্নাঘর আর গোসলখানা সবাই ভাগাভাগি করে ব্যাভার করে।'

বি. কোন কথা বলল না।

'তাহলে? ওপরে যাবেন, না কি ওরা বাড়ি না-ফেরাতক আমাদের ঘরেই জিরিয়ে নেবেন?' স্ত্রীলোকটি প্রশ্ন করলে। পরে বলল, 'আসুন না, সে-পর্যন্ত সোফাটায় শুয়ে একটুকু আরাম করবেন। ওরা বাড়ি ফিরুক।'

'রান্নাঘর আর বাথরুম সবাই ভাগাভাগি করে ব্যবহার করে, তাই না?' বি. শুধলো। 'হ্যাঁ, তাই তো। ভাগাভাগি করে ব্যাভার করে।'

এতক্ষণে ঘাড় উঁচু করে বি. স্ত্রীলোকটির দিকে সোজাসুজি তাকাল, 'তাহলে স্নান করতে আমার অসুবিধে নেই, কী বলেন?'

'তা তো বটেই,' বলে মৃদু হেসে যেন ভরসা দেবার জন্যেই স্ত্রীলোকটি বি.-র কনুইয়ের উপর হাত রাখল। বলল, 'ছান করতে কেন পারবেন না, নিশ্চই পারবেন। এ তো আপনারই ফ্ল্যাট, কেমন কিনা। তারপর গিয়ে, ওই-যে বললাম, রান্নাঘর আর গোসলখানা ভাগাভাগি করে ব্যাভার করা চলবে। আপনার জন্যে আগুন জ্বেলে জলও গরম করে দিতে পারতাম; শীতের দরুন কিছু বাড়তি কাঠকুটো ঘরে রয়ে গ্যাচে আর-কি। তবে কিনা, যদ্দুর জানি, ভাড়াটেরা আবার গোসলখানাটা দিনের বেলায় তালাবন্ধ করে রাখে। তা নইলে কি আর...।'

বি. কোন কথা বলল না। ফের মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল।

'তাহলে? ওপরে যাবেন, নাকি আমাদের ঘরেই বসবেন?' স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞেস করলে।—'আমাদের ঘরেই আসুন না। আমি বাপু রান্নায় ব্যস্ত থাকব, আপনারে মোটেই জ্বালাতন করব না। আপনি সোফায় শুয়ে আরাম করতে পারেন। চাই কি, একটুকু ঘুমিয়েও নিতে পারেন।'

'ধন্যবাদ,' বি. বলল, 'তার চেয়ে আমি বরং উপরেই যাই।'

ঝিয়ের ঘরটা আকারে ছোট আর উত্তরমুখো। ঝিয়েদের ঘর সচরাচর যেমন হয়ে থাকে। জানলা দিয়ে বাইরে তাকালে প্রথমেই চোখে পড়ে একটা পাতাবাহারের গাছ আর তার বাঁ-দিকে পাইন-বনে ঢাকা কালো পাহাড়ের চুড়ো। জানলার ঠিক বাইরেই গাছগাছালির ঘন পাতা ঘরটায় ঘোর সবুজ একটা আভা ছড়িয়েছে। বি. যে-মুহূর্তে একা হল আর ওর নিজের শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে এল, স্ত্রীর গায়ের মিষ্টি গন্ধটা ও ঠিক চিনতে পারল। জানলার কাছটিতে বসে একটা গভীর শ্বাস টানল ও। ছোট্ট ঘরটাতে জিনিসপত্র বলতে কেবল একটা জীর্ণ শাদারঙের কাবার্ড, লোহার খাট, একটা টেব্‌ল আর একখানা চেয়ার। বিছানায় উঠতে হলে পথ থেকে চেয়ারটাকে সরিয়ে তবে উঠতে হয়। বি. বিছানায় শুল না। শুধু বসে ঘন ঘন শ্বাস টানতে লাগল। টেব্‌লের উপর বই, জামাকাপড়, খেলনা, আরো নানান জিনিসের স্তূপ। একটা ছোট হাত-আরশি। আয়নাটায় তাকাল ও। দোকানের জানলায় ঝোলানো আয়নাটাতে যে মূর্তি দেখেছিল, হুবহু সেই এক ছবি। মুখটা নিচের দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে আয়নাটাকে ফের টেব্‌লের উপর রেখে দিল। টেব্‌লে-রাখা স্ত্রীর জিনিসপত্রে হাত দিল না। লাল রঙের কৌটা-দেওয়া ছোটদের একটা রবারের বল ছাইদানের উপর বসানো। টেব্‌লের উপরকার হাওয়াতেও স্ত্রীর দেহের সৌরভ।

গুছিয়ে বসতে না-বসতেই প্রচুর দুধমেশানো প্রকাণ্ড এক-জগ কফি আর মোটা দু-স্লাইস শাদা রুটি নিয়ে তত্ত্বাবধায়কের স্ত্রী ঘরে ঢুকল। ও চলে যেতেই বি. খেতে শুরু করল। অল্প কিছুক্ষণ পরে একতলার ভাড়াটের স্ত্রী এসে বেল বাজালেন। ওঁরও হাতে রুটি-মাখন, কফি, সসেজ আর একটা লাল আপেল। ঠিক ওইরকম আপেল রাস্তার ধারের ছোট্ট দোকানটায় বি. দেখেছিল। মহিলাটি টেব্‌লের উপর ট্রে-টা রাখলেন। ওঁর চোখ দুটো কেমন ভিজে-ভিজে ঠেকল। কয়েক মিনিট পর উনি চলে গেলে নিরিবিলিতে বি. ফের খেতে শুরু করল। কতক্ষণ যে জানলার কাছে ঠায় বসে ছিল, ওর নিজেরই খেয়াল ছিল না। হাতঘড়িতে এখনও দম দেওয়া হয় নি। জানলা দিয়ে বাড়ির পেছনের বাগানটা দেখা যাচ্ছিল। বাগানে জনমনিষ্যি নেই। পাতাবাহারের গাছটার শাদা বর্ডার-দেওয়া পাতাগুলোয় ঝুরুঝুরু বাতাসে কাঁপন লেগেছে। ছোট্ট ঘরটার চুনকাম-করা দেয়ালে বিকেলের ঝলমলে আলো।

শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে স্ত্রীর দেহসৌরভ নাকে নিতে নিতে যখন বি. এতদূর অভ্যস্ত হয়ে পড়ল যে গন্ধটার অস্তিত্ব আর ঠাহর পেল না, তখন একসময় নিচে বাগানের গেটের কাছে রাস্তায় নেমে এল। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই চার-পাঁচটি ছোট ছেলে-পরিবৃত অবস্থায় দূরে মোড়ের মাথায় স্ত্রীকে দেখতে পেল। স্ত্রী গেটের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল বটে, কিন্তু চলার গতি হঠাৎ কেমন শ্লথ হয়ে এল। এমনকি ও যেন একমুহূর্ত থামলও, তারপর একসময় দৌড়তে শুরু করল। নিজের অজান্তে বি.-ও দৌড়তে লাগল। দু-জনে কাছাকাছি আসার পর স্ত্রীর দৌড়ের বেগ একটু কমল, যেন একবার একটু দোমনা-ভাব দেখা গেল, কিন্তু সে এক মুহূর্তের জন্যে। পরক্ষণেই ও ফের ছুটতে লাগল। ওর পরনের লম্বা হাতওয়ালা পাঁশুটে রঙের পশমী পুলোভারটা বি. ঠিক চিনতে পারল। গ্রেপ্তার হওয়ার অল্প কিছু আগে শহরতলীর একটা দোকান থেকে ওটা ও স্ত্রীর জন্যে কিনেছিল। স্ত্রীকে দেখে ভারি আশ্চর্য ঠেকল। একেবারে অভিনব। এমনটি ও আগে কাউকে দ্যাখে নি, এমনটি যেন আর শোনে নি। রক্তমাংসের শরীর আর হাল্‌কা হাওয়ার এমন পরমাশ্চর্য মিশ্রণ। সাত বছর জেলখানায় বসে ওর সম্পর্কে যা-কিছু কল্পনা করেছিল বি., স্ত্রী যেন তার সবকিছুকে ছাড়িয়ে গেছে।

দু-জনে দু-জনের আলিঙ্গন থেকে ছাড়া পেলে পর, বি. বেড়ার গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াল।

স্ত্রীর পেছনে কয়েক পা দূরে চার-পাঁচটি বাচ্চা ছেলে উৎসুক অথচ কিছুটা বিভ্রান্ত মুখ নিয়ে দাঁড়িয়ে। ছেলে কটির গড়পড়তা বয়স ছয় থেকে সাতের মধ্যে। আসলে সংখ্যায় ওরা পাঁচ নয়, চারজন। বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে বি. একে একে ওদের খুঁটিয়ে দেখতে লাগল।

'কোন্‌টি আমার?' ও শুধলো।

স্ত্রী হঠাৎ কাঁদতে শুরু করলে। এক ফাঁকে বললে, 'ওপরে চল না।' বি. ওর দুটো কাঁধ হাত দিয়ে জড়িয়ে নিলে।

'ছি, কাঁদে না।'

'ওপরে চল না গো,' খোলাখুলি ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে স্ত্রী বললে।

'কেঁদ না, লক্ষ্মিটি,' বি. বললে, 'কই, বললে না তো এর মধ্যে কোনটি আমার?'

এক-ধাক্কায় বাগানের গেট খুলে দু-সার লাইল্যাক ঝোপের মধ্যে দিয়ে ছুটে বাড়িতে পৌঁছে মেয়েটি দরজার আড়াল হয়ে গেল। সাত বছর আগে ওদের ছাড়াছাড়ির সময় যেমনটি ছিল, স্ত্রীর চেহারা এখনো সেইরকম ছিপছিপে। অল্পবয়সে একবার একটা গরু তাড়া করায় অসম্ভব ভয় পেয়ে দ্রুত লম্বা পা ফেলে যে-ভাবে ছুটে ছিল, আজও ঠিক সেইভাবে ও ছুটে পালাল। কিন্তু দোতলায় পৌঁছে ফ্ল্যাটের দরজায় যখন ওর নাগাল পেল বি., মেয়েটি তখন অনেকটা সামলে গেছে। পাঁশুটে সোয়েটারের নিচে কেবল অল্পবয়সী মেয়েদের মত ওর বুক দুটো তখনও ওঠানামা করছে। ও আর কাঁদছিল না, শুধু মুছে-ফেলা চোখের জলে পাতা দুটো ভিজে ছিল।

'আমার প্রিয়! আমার প্রিয়তম!' ফিসফিস করে মেয়েটি বললে।

সেই ফিসফিসে কথার প্রতিটি শব্দ বাতাসে টসটস করতে লাগল, যেন ইচ্ছে করলেই একটি-একটি করে ওদের মুখে পুরে নেওয়া চলে।

'ভেতরে চল,' বি. বলল।

'ফ্ল্যাটে কিন্তু এখন অন্য লোকও থাকে।'

'তা হোক। ভেতরে চল,' বি. ফের বলল।

'তুমি ভেতরে গেছ?'

'হ্যাঁ,' বি. বলল, 'কিন্তু···আমার ছেলে কোনটি?'

ফ্ল্যাটে ঢোকবার পর মেঝেয় হাঁটু মুড়ে বসে মেয়েটি লোকটির কোলে মাথা রেখে কাঁদলে। ওর হালকা বাদামি চুলে কয়েকটা রুপোলি সুতো অস্বাভাবিক উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল।—'আমার সোনা, আমি যে তোমার জন্যেই পথ চেয়ে বসে ছিলুম। আমার মানিক।'

ওর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বি. শুধলো, 'বড় কষ্টে দিন কেটেছে তোমার, না-গো?'

'আমার মানিক!' মেয়েটি শুধু ফিসফিস করে বললে।

বি. ওর মাথায় হাত বুলোতে লাগল।—'আমি খুব বুড়িয়ে গেছি, তাই না?'

মেয়েটি ওর হাঁটু দুটো জড়িয়ে ধরে কাছে টানল।—'আমার কাছে তুমি যেমন ছিলে ঠিক তেমনটি আছ। বুঝেছ?'

'খুবই বুড়িয়ে গেছি, না গো?' বি. আবার বলল।

'যতদিন বাঁচব, তোমায় খু—ব, খু-উ-ব ভালোবাসব,' মেয়েটি ফিসফিসিয়ে বললে।

'সত্যি বলছ ? তুমি আমায় ভালোবাসবে ?' বি. জিজ্ঞেস করল।

মেয়েটির পিঠ শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। ও কান্না লুকোবার চেষ্টা করল না। বি. ওর মাথা থেকে হাতটা সরিয়ে প্রশ্ন করল, 'তুমি আমায় মেনে নিতে পারবে তো ? বল না গো ? কোনোদিন ? কোনোদিন আবার আমায় মেনে নিতে পারবে ?'

'আমি আর কাউকেই ভালোবাসি নি গো,' স্ত্রী বললে, 'আমি যে তোমাকে ভালোবেসেছি।'

'আমার জন্যে তুমি অপেক্ষা করে ছিলে ? সত্যি বলছ ?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। আমি-যে তোমার সঙ্গেই ছিলুম। প্রত্যেকটা দিন। এমন একটা দিনও যায় নি যেদিন আমি তোমার কথা না-ভেবেছি। জানতুম, তুমি ফিরে আসবেই। আর যদি কোনোদিন না-ও ফিরতে, একা-একা জীবন কাটিয়ে আমি একদিন মরে যেতুম। জানো গো, তোমার ছেলে একেবারে হুবহু তোমার মত।'

'বল, তুমি আমাকে ভালোবাসবে,' বি. বলল।

'তোমাকে ছাড়া আর-কাউকে ভালোই বাসিনি,' মেয়েটি বলল।—'বাসব গো, বাসব। খু—ব ভালোবাসব। তা তুমি যতই বদলাও-না কেন।'

'আমি বদলে গেছি, নয় ? আমি বুড়ো হয়ে গেছি।' বি. বলল।

মেয়েটি আবার কাঁদল। বি.-র পা-দুটো জড়িয়ে কাছে টানল। বি. আবার ওর চুলে হাত বুলোতে লাগল।

'আচ্ছা, আমাদের আবার বাচ্চা হতে পারে ?' মেয়েটি শুধলো।

'কী জানি। পারে হয়তো। যদি তুমি আমায় ভালোবাস।' লোকটি বলল।—'এবার ওঠো, কেমন ?'

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল।—'খোকাকে ডাকি ?'

'এখন থাক,' বি. বললে, 'তোমার সঙ্গে আর-একটু একা থাকতে দাও। খোকা তো এখনো আমার অচেনা।...ও বাগানে আছে, তাই না ?'

'একবারটি নিচে যাই,' মেয়েটি বললে, 'ওকে আরো কিছুক্ষণ নিচে থাকতে বলে আসি, কেমন ?'

মেয়েটি যখন ফিরে এল বি. তখন ঘরের দিকে পেছন করে জানলায় দাঁড়িয়ে। পিঠটা কেমন রোগা আর কুঁজো দেখাচ্ছে। ও মুখ ফেরাল না দেখে মেয়েটি দরজায় দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত ইতস্তত করল। বলল, 'খোকাকে ওর

বাবার জন্যে ফুল তুলতে বলে এলুম,' আবেগে ওর গলাটা ধরা-ধরা শোনাল, 'পাশের বাড়ির বাগানে লাইল্যাক গাছে ফুল ধরেছে। ওকে বললুম, বাবার জন্যে বেশ বড় এক গোছা ফুল তুলে আনতে।'

'বল না গো, তুমি আমাকে ভালোবাস ?' বি. শুধলো।

মেয়েটি ছুটে এসে পেছন থেকে ওর গলা জড়িয়ে ধরলে। পিঠের খুব কাছে ঘেঁসে এসে বললে, 'আমার সোনা! আমার মানিক!'

'আমাকে মেনে নিতে পারবে তো ?' বি. আবার শুধলো।

'আমি আর কাউকে ভালোই বাসিনি,' মেয়েটি জবাব দিলে, দিন-রাত্তির আমিতো তোমার সঙ্গেই ছিলুম গো। জানো, রোজ তোমার ছেলেকে তোমার গল্প বলতুম।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বি. এবার স্ত্রীকে আলিঙ্গন করলে। তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ওর মুখটা দেখতে লাগল। জানালা-দিয়ে-আসা পড়ন্ত সূর্যের আলোয় ও দেখল, স্ত্রীরও ইতিমধ্যে বয়স বেড়েছে। দেখে যেন কিছুটা হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। আহা, তবু কী সুন্দর দেখাচ্ছে ওকে। গত সাত বছর প্রতিদিন স্ত্রীর যে-চেহারা ও মনে মনে কল্পনা করেছে তার চেয়ে আরো কত সুন্দর দেখতে ও। চোখ দুটো বোজা, অল্প ফাঁক হয়ে আছে ঠোঁট দুটো, ওর গরম নিশ্বাস বি.-র গালে এসে লাগছে। ভিজে-ভিজে চোখ দুটির নিচে ফ্যাকাশে জায়গাটা ঢেকে রয়েছে ঘন, লম্বা চোখের পাতায়। মেয়েটি যেন ভীরু নম্রতার প্রতিমূর্তি। ওর দুই চোখে চুমু দিয়ে বি. খুব আস্তে ওকে সরিয়ে দিলে।

'খোকাকেও ভালোবাসবে তো ?' স্ত্রী বলল। ওর চোখ দুটো তখনও বোজা। 'বাসব বইকি,' বি. বলল, 'দাঁড়াও, আগে ওর সঙ্গে আলাপ হোক। ওকে চিনি।'

'জানো গো, ও তোমার ছেলে!'

'আর তোমার নয় বুঝি ?' বি. বলল।

মেয়েটি আবার ওর গলা জড়িয়ে ধরল। বলল, 'এস-না, আমি তোমার গা ধুইয়ে দিই।'

বি. জামাকাপড় খুলে ফেললে। বিছানা করে স্ত্রী স্বামীর নগ্ন দেহটা চাদরের উপর শুইয়ে দিলে। তারপর একখানা সাবান, দুটো তোয়ালে আর টিনের প্যানে করে খানিকটা গরম জল নিয়ে এল। একটা তোয়ালে ভাঁজ

করে জলে ভিজিয়ে তার ওপর সাবানটা রাখলে। পা-পর্যন্ত স্বামীর সারা দেহ ভালো করে ধুইয়ে দিলে ও। প্যানের জল বদলে নিলে দু-বার। হাত দুটো মাঝে মাঝে তখনও কেঁপে কেঁপে উঠলেও বি.-র সারা মুখে একটা শান্ত পরিতৃপ্তির ছাপ।

'সত্যি বল না গো, তুমি আমায় মেনে নিতে পারবে?' ও তবু জিজ্ঞেস করলে।

'আমার সোনা!' মেয়েটি শুধু বলল।

'আজ রাত্রে আমার সঙ্গে শোবেতো?'

'উঁ,' মেয়েটি বলল।

'কিন্তু খোকা? খোকা শোবে কোথায়?'

'মেঝেতে ওর জন্যে বিছানা করে দেব'খন।' মেয়েটি বলল, 'ভয় নেই, ঘুমোলে ও একেবারে কাদা।'

'তুমি সারা রাত আমার কাছে থাকবে?'

'হ্যাঁ গো, হ্যাঁ,' মেয়েটি বলল, 'যদ্দিন আমরা বাঁচব ততদিন একসঙ্গেই শোব। হয়েছে?'

অনুবাদ: মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

VIETNAM : THE LITTLE WOODEN SANDAL *by* THUY THU

কুট্টি খড়ম

থুই থু

●

ভিয়েত্‌নাম

জন্মেছি উত্তর ভিয়েৎনামে। কিন্তু দক্ষিণ-দেশের সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র ১৯৫৪ থেকে, কিছুমাত্র চিন্তা-ভাবনা না করে সেই যেদিন জাহাজের গাদাগাদি ভীড়ে নিজেকে সঁপে দিলাম দক্ষিণে পাচার হব বলে। তারপর একটা জাহাজে কাজ নিলাম, দু-বছর আমাকে মেকং নদীতে ঘোরাফেরা করতে হলো। দেখলাম দক্ষিণ ভিয়েৎনাম জীবনের ঐশ্বর্যে টলমল করছে। ফল—আম, আতা···বেশ পুরুষ্টু আর রসে ভরা; মানুষ-জন ভালোবাসা উদ্রেক করে। তাদের বাঁচার ধরন, জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি—এসব কথা ভাবলে আমার মনে পড়ে আলোয় বাতাসে ভরা আকাশের এই অপরিমেয় নীল, ক্ষেত ও ফল বাগিচার উদার বিস্তৃতি। আর নদী···ও আমার নদী!

কিন্তু এখন, আমি ভাবছি নিজের জীবনের কথা···

কুঁড়েঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম রাত্রির আকাশ জুড়ে লক্ষ শিশুর হাসি। সামনে নদী পাক খাচ্ছে, খরস্রোত ভেঙে পড়ছে তরঙ্গে। মনে হলো 'যদি দেশে শান্তি থাকত, ভাঁটার টানে জাহাজের পাটাতনে শুয়ে ভেসে যেতে, আহা ভেসে যেতে, কি আশ্চর্য লাগত'। ঝোপঝাড় ওপারে দিগন্ত ছুঁয়েছে। এপারে ঘন গুল্মে ভরা এক চিলতে দ্বীপ, তার ধার ঘেঁষে একটা হতশ্রী ছোট্ট গাঁ।

খুপরির বুড়োকর্তা একদমক শুকনো কাশি কাশল। তার নাতি বিছানায় শুয়ে ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল। ডিবরির হলদে আলো দরজার ফাটল দিয়ে ঢুকে এবড়ো খেবড়ো মেঝেয় পড়েছে, যেন কষ্টি পাথরে সোনার দাগ। বুড়ো আর বাচ্চা যেভাবে তাকিয়ে ছিল তা মনে করে আমার অস্বস্তি হতে লাগল। বর্তমান ইউনিট-এ যোগ দেওয়ার আগে আমাকে অবস্থা সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছিল। গেরিলারা অত্যন্ত তৎপর, আর সাধারণ মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না। হয়তো বুড়া তার বাল-বাচ্চাকে শহরে পাঠিয়ে নিজে থেকে গেছে—খুপরি পাহারা দেবে। হয়তো বাচ্চা তার ঠাকুর্দার সঙ্গে থাকতে চেয়েছে। কিংবা, হয়তো ওর বাপ, বুড়োর ব্যাটা, জওয়ানদের হামলায় টেঁসে গেছে বা গেরিলাদের সঙ্গে জুটে পড়েছে। আমি মনে মনে বাচ্চাটার বাবাকে নিয়ে হরেক জল্পনা শুরু করলাম। সে গেরিলাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল—কারণ হয়তো তার কারুর উপর প্রতিশোধ নেওয়ার ছিল, বা কোনো আদর্শকে অনুসরণ করার দায়। সৈন্যবাহিনীর আড়কাঠিপনা; নিদেন ভকি দিয়ে লোক জোটানো আর জোর করে তাকে কাজে জুতে দেওয়ার যে ভূমিকা জওয়ানরা পালন করছে—ফোর্সড লেবার, প্রচণ্ড করভার—সে চায়নি এই আবহাওয়ায় তার সন্তান বেড়ে উঠুক; সে চায়নি তার বাবা ইয়াংকি-দিয়েম বাহিনীর হাতে মারা পড়ুক। বন্ধুরা আমায় বলেছে তারা মানুষ মেরেছে, যেন মশা মাছি মারছে। অন্তত এই নদীটুকু তার নিজের থাকতে পারত। নদীর সঙ্গে আমার পরিচয় মাত্র তুব-ছর। আর তাতেই আমি এর প্রেমে পড়েছি। অথচ শিশুকালে নদী যাকে ঘুম পাড়িয়েছে, নদীর তীরে যে বড় হয়ে উঠল, যার প্রথম ভালোবাসার সাক্ষী এই রঙ্গিনী—সেই মানুষটি সম্পর্কে কি বলা যাবে?

•

হ্যাঁ, বর্শা বা ছুরি হাতে ঝোপে-ঝাড়ে মাথা গোঁজার কারণ ওর প্রচুর। আমার দিক থেকে ব্যাপার হচ্ছে—জীবনটা পচে যাচ্ছিল। ১৯৫৪ সালে শান্তি ফিরে এলো, সৈন্যের সরঞ্জাম ছুঁড়ে ফেলে আমার তখন চুটিয়ে জাতীয় পুনর্গঠনের কাজে লেগে পড়ার কথা। অথচ প্রায় সাত বছর কেটে গেল, আর অর্ডনান্স ম্যাপ ও মিলিটারি বোঁচকায় অভিশপ্ত আমি আজও সেই তিমিরে। যখন তরুণ ছিলাম, ছাত্র—'সরকারী' স্পাইরা আমায় ঘিরে রাখত। এখন ছুটিতে বাড়ি গেলে ফি বার ব্যবসার মন্দা আর চড়া করভার নিয়ে বাবা-মা-র বিলাপ শুনতে হয়। বন্ধু যে পাঁচ-ছজন ছিল, তাদের কেউ গ্রেপ্তার হয়েছে,

কাউকে পাঠানো হয়েছে 'পুনর্শিক্ষা' কেন্দ্রে। যখন রাস্তায় ঘুরতে বেরোই, মাঞ্জা-মারা শার্ট আর সেগুলি যারা পরে তাদের ইতর চালচলন—আমি সইতে পারি না। আমার সহ্য হয় না তাদের 'হ্যাললো' 'সুক্রিয়া' এইসব মাস্তানি। সমুদ্রের গেঁড়ি-গুগলী যেমন জাহাজের খোলায় এঁটে থাকে, তাকে কুরে কুরে খায়, ঠিক তেমনি এই সমস্ত ব্যাপার আমার অস্তিত্বে বিঁধে রইল আর জীবন-ব্যাপারটাই ধীরে আস্তে গ্রাস করতে লাগল। মিলিটারি-খাকি রং আমাকে আর ছাড়ল না। কিন্তু আমি তা হতে দিলাম কেন? মাইনের জন্যে? সেক্ষেত্রে আমাকে একটা ভাড়াটে সৈন্যের বেশি আর কি বলা যায়! আমাদের বলা হয়েছিল কমিউনিজম-এর সঙ্গে লড়ছি, স্বাধীনতা রক্ষা করছি। অথচ সাম্যবাদ ব্যাপারে আমি জানতুমটা কি? কমিউনিস্টরা লোকদের পীড়ন করছে—কখনো এ-দৃশ্য দেখি নি; কিন্তু এখানে আমি দেখেছি, আমাকে দেখতে হয়েছে 'সরকারী' সৈন্যদলের হত্যা, লুঠ আর ধর্ষণ। স্বাধীনতা কোন দিকে? ন্যায় কোন পক্ষে? আমার দিকে যে নয় তা নিশ্চিত। যেখানে ড্যাপ, আমার প্রতিবেশী, বাস করত—স্বাধীনতা, ন্যায় ও ভাই-বেরাদরি যদি সেখানকার বাস্তবতা হবে—তাহলে কেন সে নিজেকে পুড়িয়ে মারল? আমাদের ওরা যা কিছু বলেছে, সব মিথ্যে। আর আমি নিজে? আমায় এরই মধ্যে জীবনের কাঠামো থেকে গেঁড়ি-গুগলী সব চেঁছে ফেলতে হবে। ব্যাপারটা সত্যিই পচে যাচ্ছিল।

ব্রাহ্মমুহূর্তে দেখলাম আমি নারকেল গাছের পাশে দাঁড়িয়ে। একটা প্লেটুন কাছেই পজিশন নিয়েছে। অন্য প্লেটুন-দুটো গাঁয়ে খানাতল্লাসি চালাচ্ছে। আমার সামনে এক গহ্বর—বোমা পড়ে হয়েছে—তারপর একটা উল্টেপড়া কুটির। মেশিন গানের গুলি নারকেল গাছের গুঁড়িতে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে। চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য বলতে বনবাদাড়—আমি আর সৈন্যদল বাদে জনমনিষ্যির চিহ্নমাত্র নেই।

মুহূর্তেক পরে কম্পানি কমাণ্ডার ট্র্যাচ এলো; পা এবং উরু কাদায় মাখা। বলল "এখানে থাকলে হয় না? বাকি দুটো প্লেটুন গাঁ সার্চ করছে। আমরা এই ছোট গ্রামটাতেই থেকে যাই।" তারপর: "শয়তানগুলোর জন্যে আমাকে বেশ কটা খাল হাঁটকে আসতে হলো।"

ওর আঙুলের নিশানা ধরে তাকাতে জনা কুড়ি লোক চোখে পড়ল—

স্ত্রী-পুরুষ, যুবক-বৃদ্ধ, এমনকি এগারো বা বারো বছরের দুটো বাচ্চা। ভয়ে পাণ্ডুর মুখ। ওদের কালো রঙের সুতী পোষাকে শুকনো কাদার ছোপ সাদা দেখাচ্ছে। আবার একজন, এক বুড়ো, যে-পোষাকটি পরে আছে তা আগে ছিল সাদা, এখন খালের কাদা-জলে ময়লা বাদামী হয়ে গেছে।

কম্পানি কমাণ্ডারের পেছু পেছু কুঁড়েঘরের দিকে এগোলাম। যেখানে গোলা পড়ে গহ্বর হয়েছে, তার পাশ দিয়ে যেতে এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো। গোলা পড়েছিল কুটিরের সামনে, আঙ্গিনায়। পৌঁছবার পথে মাঠে ইতস্তত ছড়ানো কটা ত্যানা চোখে পড়ল। ভিতরে একমাত্র ফার্নিচার হচ্ছে পুঁয়ে পাওয়া দুটো বাঁশের মাচা। গাছের ছাল, কাদার রঙ, জল আর ঘামে কথা একটা পুরনো মাছ-মারা-জাল ছিটেবেড়ায় ঝুলছে। পুজোর থান পড়ে গেছে, ভাঙ্গা ধূপদানি গড়াচ্ছে খুঁটির পায়ে। আর নোংরা শতচ্ছিন্ন মশারির অবশেষ ঝুলছে বাঁশের ভারায়।

খুপরিটার এক কোণে সিগন্যালম্যান তার সরঞ্জাম রাখল। বাকি জওয়ানেরা সব গোছগাছ করতে লাগল। হামলা শুরু হওয়ার আগে যারা এখানে থাকত—সেই সমস্ত মানুষ-জনা কেমন ছিল—আমি ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে নিজের মনে তার একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করলাম। ছিটেবেড়ায় কুঁড়েটা তিন ঘরে বিভক্ত। সম্ভবত একটা ঘর লাগত মাছ বানাবার কাজে। সম্ভবত ওদের একটা সাম্পান ছিল, মাছের শস্ রাখার জন্য মাটির বয়ম, আর কালো-সুতী-পোষাক; সম্ভবত পরিবারে ছিল একটি পিতা, একটি মাতা, একটি···

একটা বেড়ার গোড়ায় একখানা পুঁচকে খড়ম চোখে পড়ল, তোলবার জন্য নীচু হলাম। খড়মটা কোনো বাচ্চা মেয়ের। সাদা প্লাস্টিকের স্ট্র্যাপ, নিতান্ত হালকা কাঠ। ছোট্ট খড়ম, আমার হাতের তালুর চেয়ে বড় নয়; এক ধরনের সুন্দর গোলাপী রঙ—চিংড়ির খোলা বা বেগুনের গায়ের মত। আমি আবার রঙ-টঙের ব্যাপারে সমঝদার নই। খড়মটার উপর নানা রঙের ফুল আঁকা। গাঁয়ের হাটে-টাটে এ ধরনের খড়ম হামেশা বিক্রি হতে দেখেছি। বাচ্চা মেয়েটি কেমন ছিল—আমি নিজের মনে তার একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করলাম। হয়তো ওর বয়েস ছিল পাঁচ কি ছ-বছর, গোলাপী গোড়ালী আর কুচকুচে কালো চুল এবং একটা হাসিখুশী জ্যাকেট। খড়মটা প্রায় নতুন। টেট উৎসবে পরবার জন্যে হয়তো সে খড়ম-জোড়া তুলে

রেখেছিল। তারপর শুরু হলো গোলাগুলি। গাছপালা পড়ল। ঘরবাড়িতে আগুন লাগল। আর পিছু পিছু এসে জওয়ানরা ঢুকল। গুলি ছুটল বন্দুকের, মানুষ মরল। সন্ত্রস্ত, সে তার মাকে জড়িয়ে বাঁশের মাচার নীচে গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়ল। আর তারপর···তারপর···ওহ্, আমার সমস্ত অন্তর দিয়ে কামনা করি---দক্ষিণের ছোট্ট মেয়ে! —কোনো ক্ষতি তোমার হয় নি। খড়মটা ফেলে যেতে কেন বাধ্য হলে? হাতে পেলে এইসব রাক্ষস না-তোমাকে না-তোমার মাকে ছেড়ে কথা কইত। বন্দুকের শব্দে তুমি এতই ভয় পেয়ে গেছিলে যে তোমার নতুন খড়মজোড়া পর্যন্ত মুঠোয় ধরে রাখতে পারো নি, তাইতো একপাটি ঝরে পড়ল। তোমার যে-চোখে পল্লবের সৌন্দর্য প্রতিবিম্বিত হতো—তার ব্যগ্র আলোটুকু বন্দুকের গুলির শব্দ কেড়ে নিয়েছিল, হত্যা করেছিল তোমার অন্তরের যা কিছু আশাকে। কুন্তি বোন! জওয়ানদের সেই দলে আমিও ছিলাম। আহ্‌রে যন্ত্রণা!

বাড়িটার পেছনে যে জমির টুকরো, সেদিকপানে গেলাম। নালার দু-পাশে নারকেল গাছ, নালাটা দীর্ঘকাল পরিষ্কার করা হয় নি, তথাপি জলে উপচে পড়ছে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো বিচিত্র নক্‌সার আকারে মাটিতে পড়েছে, যেন এক টুকরো ছাপা কাপড়। গতকাল যারা ধরা পড়েছিল—তারা মাঠে লাইনবেঁধে বসে আছে, পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা, ভয়ে বিহ্বল। ওরা ছিল সতেরজন। বন্দীদের পাহারা দিচ্ছে—কমাণ্ডো সেকশানের এমন এক জওয়ানকে আমি জিজ্ঞেস করলাম "লেফটেন্যান্ট কোথায়?"

"ঐ যে স্যার।" দূরে বাগিচার গাছপালায় আধা ঢাকা একটা কুঁড়ের দিকে সে তার আঙুল নির্দেশ করল।

"কি করছে?"

"জী, জানি না।"

"বোধহয় খবর খুঁজছে···।"

লাফিয়ে নালার পর নালা টপকে খুপরিটার কাছে গেলাম। যে দু-জন জওয়ান পাহারা দিচ্ছিল---পাশে সরে দাঁড়িয়ে স্যালুট করল। খুপরিটার ভিতর থেকে অশ্লীল খিস্তি শোনা গেল। কম্পানি কমাণ্ডারের স্বর। আমি ভিতরে প্রবেশ করলাম।

"কি ব্যাপার?" চোখ তুলে তাকাল, মুখে রাগ।

এক বুড়ী, যারা কাল ধরা পড়েছে তাদের একজন, মাটিতে পড়ে আছে—অজ্ঞান, পা-হাত বাঁধা, ভেজা চুল মেঝেয় সেঁটে গেছে, কাছেই একটা বড় বালতি—চারদিকে জল চলকে পড়েছে। কুঁড়েঘরটার কোণে এক যুবতী বসেছিল, একটা ডাকসাইটে পাথরে তার পা-জোড়া কষে বাঁধা, দুটো হাত পিঠমোড়া, হাঁটু মুখের কাছে ঠেলে উঠেছে।

"কিছু না, এই জানতে এলুম ব্যাটেলিয়নের কাছে রিপোর্ট করা হয় নি এমন কোনো খবর আছে কিনা।"

"এখন পর্যন্ত নেই। তবে মিনিটখানেক অপেক্ষা করো। এই ডাইনী আছে ব্ল্যাকলিস্টে। আমার ইনফর্মার-এর রিপোর্ট বলছে মাগী বিপ্লবী ক্যাডারদের আশ্রয় দিত, আর ডাইনী তা বেমালুম অস্বীকার করছে। একেবারে খচ্চরের মত গোঁয়ার।" তারপর সে হাঁক পাড়ল "সউ!"

"জী।" এক পাহারাদার দৌড়ে এলো। যারা স্বীকারোক্তি আদায় করে সে তাদের একজন।

কম্পানি কমাণ্ডার আদেশ দিলো "ঠ্যাং ধরে তুলে নিয়ে এসো। জ্ঞান ফেরাও।" গোড়ালী দুটো ধরে সউ বুড়ীকে তুলে আনল, মাথাটা নীচের দিকে ঝুলছে, মুখ দিয়ে নাল গড়াচ্ছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের কিছু কৃত্রিম প্রণালী প্রয়োগ করল। আস্তে আস্তে তার চেতনা ফিরল। জ্ঞান হতে সউ-র মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বৃদ্ধা স্পষ্ট করে বলল "শয়তান, আমার বয়েসকেও তোর সমীহ নেই?"

"লুক কোথায়?" কম্পানি কমাণ্ডার খেঁকিয়ে উঠল। "মাত্র কাল সে তোর বাড়িতে ছিল।"

"লুক কে? ও নামের কাউকে আমি চিনি না।" বৃদ্ধা রমণী উত্তর দিলেন।

"সউ।" কম্পানি কমাণ্ডার গর্জে উঠল।

"জী।"

"চালাও। তোর ডাইনীর নিকুচি, কী গোঁয়াতুর্মি মাইরি—আস্ত খচ্চর একটি।"

দানবটা বৃদ্ধার উদরে চড়ে বসল, দু-হাতের দশ আঙুল দিয়ে খামচে ধরল রমণীর বুকের পাঁজর। যন্ত্রণায় মুচড়ে উঠলেন তিনি, হিক্কা শুরু হলো, তারপর মূর্ছা।

"খালি ভাণ। চালাও পানসি—।"

কম্পানি কমাণ্ডারের উন্মত্ত হুঙ্কার যেন আমার বুকে পর পর ঘুষি মারল। মুখ লাল হয়ে গেছে লোকটার আর রাগে গলা কাঁপছে।

সউ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়াল। আমাদের দিকে তাকিয়ে তোৎলাতে লাগল "জী···মানে···ফৌৎ।"

"কেয়া ?" কম্পানি কমাণ্ডার লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, চড় মারল সউ-র গালে আর তাকে সমানে খিস্তি করতে লাগল "তোর মায়ের নিকুচি করেছে। কে বলেছিল এতটা বাড়াবাড়ি করতে। দে, ওটা একপাশে সরিয়ে দে। আচ্ছা, এখন বাইরে যাও আর শান্ত্রীদের বলো যেন কাউকে ভিতরে আসতে না দেয়। এর ব্যবস্থা বিকেলে হবে। আমি নিজে করব।"

সউ ঠ্যাং ধরে ছেঁচড়ে বৃদ্ধার শরীরটা খুপরির এক কোণে ফেলে বেরিয়ে চলে গেল। কম্পানি কমাণ্ডার আমার দিকে এক ঝলক তাকাল, মুহূর্তেক চিন্তা করল, মাথা নীচের দিকে ঝুলে পড়েছে।

তারপর সে বলল "সিগারেট হবে ?"

নীরবে দেশলাই ও সিগারেটের প্যাকেট এগিয়ে দিলাম। সে একটা সিগারেট ধরাল আর ধোঁয়া ছাড়তে লাগল।

"এখনও এই বাঁদরীটা আছে" যুবতীকে দেখিয়ে সে বলল। "ছেনাল আবার লুক-এর ইস্ত্রি। মাগী একটু জিরিয়ে নিক। একে যা দেবার তা আমিই দোবো, সন্ধে হোক না !"

আমি ওকে অনুসরণ করে কুঁড়েবাড়ির বাইরে এলাম। যে-সমস্ত শান্ত্রী এ্যাটেনশনের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল তাদের সে আবার হুকুম করল "খবরদার. কাউকে ভেতরে ঢুকতে দেবে না।"

দুপুরে খেতে বসে দেখি গলা দিয়ে কিছু নাবছে না। বৃদ্ধা রমণীর মৃত্যু বুকে পাথরের মত চেপে বসেছে। বেরিয়ে পড়লাম। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম সেই গাঁয়ের মুখ পর্যন্ত। দেখলাম জওয়ান যে-কজন সেখানে পোস্টেড ছিল, তারা একটা হাঁস ছাড়াচ্ছে—দুপুরে ভোজ হবে। প্লেটুনের মাতব্বর উঠে এলো আমাকে অভিবাদন জানাতে। জিজ্ঞেস করলাম "কুঁড়েগুলো সব ফাঁকা নাকি হে ?"

"জী"।

ওকে ছেড়ে দিয়ে মাঠের কিনারায় যে নারকেল গাছগুলো, সেদিক পানে হাঁটতে হাঁটতে অবাক হয়ে ভাবলাম জওয়ানরা হাঁসটা পেলে কোথায়।

নীল আকাশে অমল মেঘ। ফসলকাটা মাঠে নাড়াটুকু রয়ে গেছে। মানুষজনা আগুন ধরিয়ে দেবে আর হাল দেওয়ার সময় ছাইটা লাগবে সারের কাজে। আমি অবাক হয়ে ভাবলাম, সুন্দর এই দিনে মানুষ-মারা কিভাবে সম্ভব। আর মৃত্যু এমনই এক যুক্তিহীন ব্যাপার। কম্পানি কমাণ্ডারের কটূক্তি তখনও কানে বাজছে। আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হলো। বৃদ্ধার মুখমণ্ডল এত বিবর্ণ ছিল! "জী···ইয়ে···ফৌত।" মাটির ঢিবিটার ওপর পায়ে ভর দিয়ে বসে বমি করে ফেললাম। দূরে আরও একটি গাঁ আবছা দেখা যাচ্ছে, একটা তল্লাসী বিমান তার মাথার ওপর চক্রাকারে ঘুরছে। তারপর কামানের বজ্রপাত। 'দূরের ঐ গাঁ, পুঁচকে খড়মের আর-একটা পাটি কি ঐখানে?' নিজেকে প্রশ্ন করলাম আর দেখলাম গোলা পড়ছে। আর জ্বলন্ত ঘরবাড়ি ধোঁয়া বমি করছে, স্তম্ভের আকারে। জওয়ানরা এদিক-ওদিক দৌড়চ্ছে, ক্যামোফ্লাজ-পোষাকের জন্য সবুজে গাছপালার মধ্যে ওদের চিনতে কষ্ট হয়।

মুহূর্তেক পরে কামানের শব্দ বন্ধ হলো। উঠে হাঁটা দিলাম। কমাণ্ডারের কুটিরের কাছে একটা খাল, সেটি পেরিয়ে খালের অন্য পাড়ে বসে শান্ত্রীদুজন গল্প করছে। কুঁড়েঘরটার ভিতরে ঢুকলাম। কম্পানি কমাণ্ডারের মুখ লাল, ঘরভরে তার নিঃশ্বাস, নিঃশ্বাসে গন্ধ, গন্ধে মদ। আমার দিকে ফিরেও তাকাল না, রমণীটিকে শাসাতে লাগল "তা হলে, কথা তুমি বলবে না, অ্যাঁ? ডাইনী বুড়ীকে ত দেখেচ, অ্যাঁ? কথা বলতে না চাওয়ায় তার দশাটা কি হয়েছে জানো বোধহয়, অ্যাঁ?"

যুবতী মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, হাত-পা পিঠমোড়া করে বাঁধা। চোখে বন্য ভয়।

"বলো।" কমাণ্ডার গর্জে উঠল, যেন ষাঁড়।

তারপর একটা হিংস্র হাসিতে তার মুখ ভরে গেল, রমণীর তালি-মারা ব্লাউজটা খামচি দিয়ে ধরে ফালি ফালি করে ছিঁড়ল। রমণী মুখ পাশের দিকে ফিরিয়ে হিসিয়ে উঠে বলল "শয়তান।" কমাণ্ডার ঘোড়ার মত হাসতে লাগল। 'হায় রমণী!' আমি ভাবলাম 'ওর কি একটা বাচ্চা আছে—যার জন্য কখনো কোনো সময় একজোড়া খড়ম কিনেছিল?' বৃদ্ধার শবের দিকে তাকালাম, খুপরিটার এক কোণে তখনও পড়ে আছে। কম্পানি কমাণ্ডারের দিকে তাকালাম—যুবতীর পোশাক টেনে ছিঁড়ছে; আর

শুনলাম কাপড় ছেঁড়ার শব্দের সঙ্গে তার চাপা-হাসির নারকীয় শব্দ মিশে গেল। শিকার গিলতে যাচ্ছে—আমার চোখে সে তখন এক এমনই হিংস্র জন্তু। গোটা দৃশ্য আমাকে পাগল করে দিলো। ঝট্ করে পিস্তল বের করলাম। নলটা মুঠোয় ধরে মাথার পেছনে পিস্তলের কুঁদো দিয়ে এক বাড়ি মারলাম—মাটিতে লুটিয়ে পড়ল কমাণ্ডার, বিবস্ত্র রমণীর পাশে—ভয়ে আর বিস্ময়ে বিহ্বল যে-স্ত্রীলোকটি আমার চোখে স্থির তাকিয়ে আছে।

খাপে পিস্তলটা ভরে ধীরে বাইরে বেরোলাম। গাঁয়ের প্রবেশমুখ পর্যন্ত হেঁটে যে-বাহিনী সেখানে পাহারা দিচ্ছিল তাদের পাশ কাটিয়ে গেলাম। জওয়ানদের সাহস ছিল না আমাকে কোনো প্রশ্ন করে। এইমাত্র যেখানে বোমা পড়েছে—সেই গ্রামের দিকে চললাম। মৃত্যুর মত স্তব্ধতা। ফসল-কাটা ক্ষেতে কয়েকটা চড় ই কিচমিচ করছে। ঐ দূরের গাঁ, নিশ্চয়ই ওখানে সেই শিশুরা আছে, যারা তাদের চটি হারিয়ে ফেলেছে—কাঠের খুদে খড়ম, 'শলা চিংড়ি'র বা 'বেগুনের গায়ের' ঈষৎ গোলাপী আভা, শরীরে হরেক রঙের ফুল ফোটানো—তাদের মায়ের উপহার।

অবশেষে, ধানক্ষেতের এলাকা পেরিয়ে গেলাম। আমার পেছনে মেশিন গানের বিস্ফোরণ শোনা যায়। ছুটতে শুরু করলাম। বাঁচতে হবে। কারণ, গোলা পড়ে যে-গহ্বরগুলি সৃষ্টি হয়েছে—তার গায়ে ছোটো ছোটো কুটিরে খুদে খড়মের পাটি নিঃসঙ্গ পড়ে আছে—যা ছিল তোমাদের, ও আমার দক্ষিণ দেশের প্রিয় শিশুর দল।

অনুবাদ : দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

U. A. R. : ONE WORD *by* SALEH MORSI

একটি কথা

সালে মরসি

রেডিয়ো থেকে একটানা শব্দ আসছে : গান, নাচের বাজনা, বক্তৃতা, আছর আর মগরেবের নামাজের ঘোষণা, কোরান-পাঠ। কাফের ওয়েটার হাসান হাজার বার ওপর-নিচ করছে। ঘণ্টাং করে দরজা বন্ধ হচ্ছে, আবার খুলছে; চেয়ার টানার শব্দ, চেয়ার উল্টে-পড়ার আওয়াজ; খদ্দেরের চিৎকার; খনখনে স্বরে হাসানের হাঁকডাক। এইভাবে সকাল থেকে মাঝ-রাত তক 'নবযুগ কাফে'তে এই চলছে, আর লাল নীল সবুজ প্লাষ্টিকের 'টোকেন' ঝনাৎ করে গিয়ে পড়ছে মার্বেল কাউণ্টারে, যার পিছনে বসে আছে মালিক মাস্টার আব্দুল লতিফ।

আরব

স্টোভ থেকে হিসহিস আওয়াজ আসছে, কেটলির জল টগবগ করে ফুটছে, কফির পেয়ালা আসছে আর যাচ্ছে, আর ফুড়ুৎ-ফুড়ুৎ করছে হুঁকো। আব্দুল লতিফ সেখানে সমাসীন, কোনো গোলমাল সেখানে তার কানে ঢুকছে না, সে অন্য কিছুর মধ্যে ডুবে আছে।

খদ্দেররা, বয়-বেয়ারা যদি টের পেত মাস্টার আব্দুল লতিফ কোন চিন্তায় মগ্ন, হেসে তারা কূল পেত না। আব্দুল লতিফ তা ভালো করেই জানে, আর তাই খদ্দেরদের উৎসুক দৃষ্টি থেকে দূরত্ব রাখার জন্যে মুখখানা সে হাঁড়ির মত করে রেখেছে। এই মুখোশই ক্রমে তার

মুখের ভাব হয়ে দাঁড়াল। সে শূন্যদৃষ্টিতে খবরের কাগজের দিকে তাকিয়ে থাকলেও শুনতে পাচ্ছে ওয়েটার হাসান এক খদ্দেরকে বলছে—মালিকের আজ মেজাজ খারাপ, মালিক তার ছোট ছেলে জাকিকে কাফে থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে, কেন তা কেউ জানে না। এ-কথা শুনে খদ্দের বলল, ছোট ছেলেরা দুষ্টুমি করেই, সেজন্য রাগারাগি করা সাজে না। আব্দুল লতিফ খবরের কাগজে মন দিল। শুধু কথা, কথা আর কথা, লক্ষ লক্ষ কথা, মস্ত পৃষ্ঠা জুড়ে যেন পিঁপড়ের সার। তার অর্থ উদ্ধারে আব্দুল লতিফ উঠে পড়ে লাগল।

খানিক পরেই সে মস্ত একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। চায়ের অর্ডার দিল। কার বিরুদ্ধে যেন কী বিড়বিড় করে বলল। তারপর সে অসহায়ভাবে কাশতে লাগল। ব্ল্যাক কফির অর্ডার দিল। দিয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল একটুকরো কাগজের দিকে। কাগজটা সবার উৎসুক দৃষ্টি থেকে ঢেকে রেখেছে একটা খবরের কাগজের আড়ালে। আত্মবিস্মৃত হয়ে সে তার ঠোঁট দুটো নাড়তে লাগল ধীরে ধীরে। এক কঠিন সংকল্পভরা চোখ দুটি তার কাগজের টুকরোটি ভেদ করে কী যেন দেখতে চাইছে। হঠাৎ সে নিজেকে সংযত করল, চোখ মেলে তাকাল, চারপাশে চেয়ে দেখল, তারপর ঝাপসা এবং উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে মনঃসংযোগ করল কাগজের টুকরোটির প্রতি—সেখানে শুধু লেখা আছে একটি কথা।

কথাটা যদি না-থাকত কী খুশিই যে সে হত।

আব্দুল লতিফ গালাগালি দিল নিরক্ষরতাকে, নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযানকে এবং সেই দিনটিকে যেদিন সে বোকামি করে···এই রকম একটা তুচ্ছ বিষয় সত্যি সে স্মরণ করতে চায় নি ; এটা ছেলেখেলা বইতো কিছু নয়। ব্যঙ্গভরে সে নিজেকে বলতে লাগল : "পাকলে পরে কেশ, শিয়াল-শকুন খাবে কিন্তু বেশ..."

না, ব্যাপারটা সে আদৌ ভাবতে চায় না। মোটেই মনে করতে চায় না সেই প্রথম দিনটির কথা যেদিন সে স্কুলে গিয়েছিল, সেখানে তার মতই আরো অনেক বয়স্ক লোক ছিল, তাদের অনেকেই সম্রান্ত ব্যবসায়ী। সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখছিল ব্ল্যাকবোর্ডে এফেন্দি কী লিখছে। তাদের গলা উঁচুতে উঠল, সে-স্বর যেমন ভাঙা-ভাঙা তেমনি কর্কশ, তাদের ঘন আধপাকা গোঁফ কুঞ্চিত হতে লাগল যখন তারা এফেন্দির সঙ্গে গলা মিলিয়ে ছোট-ছোট

ছেলেদের মত পুনরাবৃত্তি করল—ক-খ-গ-ঘ—কিছুটা সুর করে, কিছুটা থেমে-থেমে, কিছুটা মজা করে টেনে-টেনে।

প্রথমদিন এইসব লোকের বড় বড় এবং বুড়ো বুড়ো মুখ দেখে এবং তাতে দারুণ আগ্রহের ভাব লক্ষ করে এবং অল্পবয়সী এফেন্দির গলার সঙ্গে গলা মিলিয়ে কর্কশ সুরে অক্ষরগুলো পুনরাবৃত্তি করতে দেখে আব্দুল লতিফ এমন হেসেছিল যে তার চোখে জল এসে গিয়েছিল। হেসেছিল বটে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা অদ্ভুত আনন্দের হিল্লোলও তার মনে বয়ে গিয়েছিল। সে আনন্দ কিছুক্ষণের মধ্যেই উল্লাস এবং আগ্রহে পরিণত হয়েছিল। তার গলা সবার গলাকে ছাপিয়ে উঠল, ব্ল্যাকবোর্ডের উপর নিবদ্ধ হল তার দৃষ্টি।

সেদিন থেকে একটা ক্লাশেও সে অনুপস্থিত থাকে নি। এমনকি একদিন সে এফেন্দিকে নেমন্তন্ন করেছিল, গুরুর প্রতি শ্রদ্ধাও জানিয়েছিল—নিজের হাতে চা বানিয়েছিল এবং গ্লাসের বদলে একটা পেয়ালায় তা পরিবেশন করেছিল। সেই সঙ্গে মনে মনে আওড়েছিল :

যে আমাকে দেয় অক্ষরের জ্ঞান
আমি তার কাছে দাসের সমান।

কী সব বাজে চিন্তা। এখন এর জন্য সে নিজেকে দোষী বলতে বাধ্য। কী কাণ্ড, সে কিনা লেখাপড়া শিখতে গিয়েছিল! সত্যি, নিজেকেই দোষ দিতে হয়। বন্ধুরা তাকে বলেছিল: "নিরক্ষরতা দূর করার অভিযানে যোগ দাও মাস্টার আব্দুল লতিফ, তাতে তোমার লাভ বই ক্ষতি হবে না।" তাই শুনে সে গিয়েছিল লেখাপড়া শিখতে। সে তার জুতো এমন পালিশ করেছিল যে আয়নার মত চকচকে হয়ে ওঠে। মুখে বাঁকা হাসি নিয়ে ঢুকেছিল, বেরিয়ে এল অন্য মানুষ হয়ে।

ছোট ছেলে জাকি লিখতে-পড়তে জানে। দু-বছর ধরে সে স্কুলে যাচ্ছে, প্রতিদিন একগাদা বই হাতে করে ফেরে। তার স্কুলের রিপোর্ট খুবই সন্তোষজনক, মেধাবী ছেলে—যাকে বলে "বাপকা বেটা।"

কিন্তু এ-সব কথা অবান্তর। আসল ব্যাপার হল আজকের ঘটনা এবং আগে যা ঘটেছে। আব্দুল লতিফ এখনো মনে মনে ক্রুদ্ধ। সে হলফ করে বলতে পারে অমন ছেলেকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে দেবে, কাফেতে এসে কাজ করে ব্যাটা জীবনের পথ করে নিক—গাধার মত খাটুক যেমন সে নিজে খেটেছে।

সে আবার আওড়াতে লাগল : পাকলে পরে কেশ, শিয়াল-কুকুর খাবে কিন্তু বেশ।

সে-ই এর জন্য দায়ী। আর এ নিয়ে সে ভাবতে চায় না। সবকিছু ভুলতে চায় এমনকি ঐ ক-খ-গ-ঘ, যা তাকে এত কষ্ট দিয়েছে এবং যা কিনা শেষ অব্দি মুখস্থ করেছে। সে ছুঁড়ে ফেলে দেবে তার পড়ার বই যা কিনা সে কয়েক মাস আগে কিনে এনেছিল এবং যা থেকে সে এখন এক স্বরযুক্ত বড় বড় হরফের কথাগুলো পড়তে পারে।

আব্দুল লতিফ আরো এক কাপ চায়ের অর্ডার দিল। এবং হাসানকে অবাক করে (কারণ তার মালিক কখনো ধূমপান করে না) এক প্যাকেট সিগারেট আনতে বলল। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম দিল হাসান যেন এ নিয়ে বাক্যব্যয় না করে তৎক্ষণাৎ তার আদেশ পালন করে। তার দৃষ্টি আবার ফিরে গেল কাগজের টুকরোর দিকে, যেটা কিনা তার সব মনোবেদনার কারণ। তার চোখে পড়ল সংবাদপত্রখানা যার পৃষ্ঠার উপর দিয়ে অক্ষরগুলো লাইন বেঁধে চলেছে অফুরন্ত পিঁপড়ের সারির মত।

একটি কথা, মাত্র একটি হতচ্ছাড়া কথা কী করে তাকে এত যন্ত্রণা দিতে পারে? আর যন্ত্রণা দিচ্ছে তাকেই যে কিনা প্রথম স্থান দখল করেছে তার ক্লাসে যেখানে চল্লিশটা তাগড়া তাগড়া লোক লেখাপড়া শিখছে, যাদের মধ্যে সবচেয়ে কমবয়সীর বয়স ত্রিশ বছর? এই রকম একটি কথা কী নাজেহাল করতে পারে তাকে যাকে এফেন্দি বলেছিল : "বুদ্ধিমান মাস্টার আব্দুল লতিফ!" সেদিন সে কী খুশিই না হয়েছিল! ছেলেমানুষের মত। সেইদিনই জীবনে সর্বপ্রথম সে তার ছেলের বইয়ের দিকে তাকিয়েছিল গোপনে। তারপর পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে বসেছিল, দেমাকে ফুলে উঠেছিল, উদ্ধত স্বরে প্রশ্ন করেছিল : "স্কুলে কেমন লেখাপড়া শিখছিস?"

বেয়াদপ হারামজাদা ছেলে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করে : "তোমার লেখাপড়া কেমন হচ্ছে, বাবা?"

আব্দুল লতিফের মনে হল তার সমস্ত রক্ত মাথায় উঠে এসেছে। অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে ঠাণ্ডা নিস্পৃহ গলায় জবাব দিয়েছিল : "ক্লাসে ফার্স্ট হয়েছি।"

"আমিও।" আরো ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দেয় হারামজাদা ছেলে।

এই অবস্থা সহ্য করার জন্য সে শুধু নিজেকেই দায়ী করতে পারে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, স্কুলে যেতে তার খুব ভালো লাগত। প্রত্যেকবার যখন একটা নতুন কথা শিখত, তার মন আনন্দ এবং গর্বে ভরে যেত। কঠিন কাজ সে পছন্দ করত এবং ক্লাশে যে-কোনো উত্তর দেওয়ার জন্য সে সবচেয়ে আগে হাত উঁচু করত।

এ-সব ছেলেখেলা ছাড়া কী! আর কক্ষনো সে স্কুলের পথ মাড়াবে না। কক্ষনো নিজেকে বোকা সাজাতে পারবে না, নিজের ছেলের বিদ্রূপের পাত্রও হবে না। বরং ঐ হারামজাদাটাকেও স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনবে, তারপর বাড়ি থেকে খেদিয়ে দেবে—রাস্তায় যাতে ব্যাটা মানুষ হতে পারে, নিজের খাওয়া-পরার যোগাড় নিজে করতে পারে।

ঘটনাটা খুব সরল। ছেলেটা সেদিন বিকালে কাফেতে এসেছিল, আর থেকে থেকে খবরের কাগজখানার দিকে তাকাচ্ছিল—এটা আব্দুল লতিফ ক্লাশে ফার্স্ট হাওয়ার পর থেকে রোজ কিনতে শুরু করেছিল। এটাই হয়েছিল মস্ত একটা বোকামি। আব্দুল লতিফ কাগজখানা বগলদাবা করে পাইচারি করত, আর মাঝে মাঝে খুলে পড়তে চেষ্টা করত। সে কী প্রচণ্ড চেষ্টা!

লালকালির বড় বড় হরফে লেখা কথাগুলো তার বেশ পছন্দ, কিন্তু ক্ষুদে ক্ষুদে হরফের কথাগুলোই তার বিরক্তি উৎপাদন করে। তা সত্ত্বেও সে পড়ে যেতে লাগল,—অবশ্য প্রতি দ্বিতীয় শব্দ সে এড়িয়ে গেল। তার ধারণা এতে ব্যাপারটা রপ্ত করতে সুবিধে হয়। কোনো কোনো খদ্দের চোখ টিপে তাকে হয়তো প্রশ্ন করে: "আজকের খবর কী?" কিন্তু সে জানে এর কী উত্তর! সে রেডিয়ো দেখিয়ে বলে: "তুমি যে মুখ্যু তা জানি, কিন্তু এখনো তো কালা হও নি, বাবা। নাকি কানদুটোও গেছে?"

খদ্দেরদের ব্যঙ্গ না হয় সহ্য করতে হয়, তাই ছেলের অপমানও বরদাস্ত করতে হবে? কিছুতেই না।

...আব্দুল লতিফ ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিল, তারা আরবীতে কতটা এগিয়েছে। ক্ষুদে শয়তানটা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে কী যেন বলল আব্দুল লতিফ বুঝতে পারল না। তবু সে ভারিক্কি চালে বলল: "মাত্র?"

ছেলেটা তখন ড্রয়ার থেকে একটুকরো কাগজ আর পেন্সিল বের করল, বাঁকা হাসি হাসতে হাসতে কী যেন তাতে লিখল, তারপর তার বাবার দিকে সেটা এগিয়ে দিয়ে বলল: "এটা পড়তে পার, বাবা?"

আব্দুল লতিফ লেখাটার দিকে তাকাল। যেভাবে গলিতে ছেলেরা হাত-ধরাধরি করে খেলা করে সেইভাবে একদল অক্ষর সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। প্রথম অক্ষরটা উচ্চারণ করল, তারপর দ্বিতীয়টা, তারপর দুটোকে একত্র করার জন্য থামল, শেষে দুটো ভুলে যাওয়ার আগেই তৃতীয়টার দিকে ঝুঁকে পড়ল। সমস্যাটা সমাধানের জন্য প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছে—এমন সময় তার কানে এল চাপা হাসির শব্দ। ওরে শয়তান! মাথাটা দপ করে উঠল। রাগে সে গরগর করতে লাগল। কটমট করে তাকাল। দুই ঠোঁট থর থর করে কাঁপতে লাগল।

"আমাকে পরীক্ষা করা হচ্ছে? এত আস্পর্দ্ধা!" ছেলেটা ভয়ে দৌড় দিল।

আর মাস্টার আব্দুল লতিফ সেখানে বসে আগুন চোখে তাকিয়ে রইল ঠিক ট্রেনের মত লম্বা একটা হতচ্ছাড়া কথার দিকে।

রাত হয়ে এল, রেডিয়ো তখনো শব্দ করেই চলেছে; কাফের গোলমাল খানিকটা কমেছে, হাসান একটানা ক্লান্ত স্বরে খদ্দেরদের অর্ডার হাঁকছে। সবকিছু মন্থর হয়ে এল। এমনকি রেডিয়োটা পর্যন্ত নির্ধারিত সময়ের আগেই যেন হুঁশ হারিয়ে ফেলছে, কেননা কারা যেন একসঙ্গে একগাদা গান ওটার মধ্যে গুঁজে দিয়েছে, আর তাতে শ্রোতাদের পাগল হতে শুধু বাকী আছে।

ঘড়িতে বারোটা বাজল। ওয়েটার হাসান দোকান বন্ধ করার কথা বলল। আব্দুল লতিফ মুহূর্তের তরে তাকাল, ঘাড় ঝাঁকাল। তারপর সে আবার হতচ্ছাড়া শব্দটার উপর ঝুঁকে পড়ল। সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। সে প্রথম অক্ষরটা পড়ল, ঠিক এমন সময় তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ড্রয়ার থেকে সে তার এক্সারসাইজ খাতাখানা টেনে বের করল, তারপর সেটা খুলে ধরল, জিহ্বার ডগা দিয়ে পেন্সিলটা ভেজাল, বাঁ দিকে মাথাটা তার ঝুঁকে পড়ল, তারপর পাতার উপরে প্রথম অক্ষরটা লিখল। লিখে মনে মনে পুনরাবৃত্তি করল, তারপর প্রথম শব্দ উচ্চারণ করল: (ক)। রাস্তার আলো নিভে গেছে এবং কাফে জনশূন্য। টেবিলের উপর চেয়ারগুলো তুলে সাজানো হয়ে গেছে, কেটলিটা আর শব্দ করছে না, রেডিয়ো চুপচাপ—আব্দুল লতিফের কানে তখনো সারাদিনের একটানা শব্দ ধ্বনিত হচ্ছিল, হঠাৎ সেখানে নিস্তব্ধতা নেমে এল।

মাস্টার আব্দুল লতিফ এক্সারসাইজ বুকটা হাতে করে এবং কাগজের টুকরোটা আর খবরের কাগজখানা বগলের তলায় চেপে কাফে থেকে বাড়ি রওয়ানা হল। মাথাটা তখন প্রায় বুকের উপর নেমে এসেছে। সে রাস্তার একটা আলোর নিচে দাঁড়াল, কাগজের টুকরোটি চোখের সামনে মেলে ধরল, তারপর ঠোঁটে ঠোঁট চেপে টুকরোটি ভাঁজ করে আবার হাঁটতে শুরু করল।

যখন বাড়ি এসে পৌছল, মাঝরাত পার হয়ে গেছে। সে মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করল।

তার স্ত্রী জড়সড় হয়ে বসেছিল। বেচারী ফিসফিস করে তাকে কী বলে যেন অভ্যর্থনা জানাল, কিন্তু তাতে তার দিক থেকে কোনো সাড়া এল না। সে তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গিয়ে বিছানার ঠিক পাশেই একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল। স্ত্রী ছোট্ট একটি আলো হাতে তার পাশে এসে দাঁড়াল। আলোটি টেবিলের উপর রেখে জিজ্ঞেস করল, "তোমার খাবার এখানে নিয়ে আসব ?"

আব্দুল লতিফ তার অভিষ্ট সিদ্ধির কথা ভাবছিল। সে একবার কাশল, তারপর স্ত্রীর প্রশ্নকে এড়িয়ে গিয়ে তীব্র ঝাঁঝালো গলায় প্রশ্ন করল, "ছেলেরা ঘুমিয়েছে ?"

"হ্যাঁ ! জাকি কেঁদে কেঁদে সারা। সে মোটেই চায় নি যে…"

মাস্টার আব্দুল লতিফ স্ত্রীর দিকে কটমট করে তাকিয়ে কথার মাঝখানে তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, "গোল টেবিলটা আনো, আর আমাকে একা থাকতে দাও। আমি হিসেব কষতে চাই।"

স্ত্রী ঘুরে দাঁড়াল। খানিক পরে থেমে ঘর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। মাস্টার আব্দুল লতিফ এবার লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হল। পকেট থেকে তার মানিব্যাগ বের করল, মেঝের উপর বিছানো মাদুরের উপর এসে বসল, তার তলায় সে গুঁজে রাখল এক্সারসাইজ বুক এবং কাগজের টুকরোটি। তারপর সে তার টুপি নামিয়ে রাখল, জুতোজোড়া খুলে খাটের তলায় ঠেলে দিল, জামার আস্তিন গুটাল।

তার স্ত্রী ঘরে ঢুকল এবং নিচু টেবিলখানা তার সামনে পেতে দিল। সে তখন টেবিলের উপর মানিব্যাগটা রাখল এবং কয়েকটা টাকা বের করল।

স্ত্রী জিজ্ঞাসা করল, "চা করব ?"

"না !"

এমন রুক্ষ স্বরে সে কথাটা বলল যে, তার স্ত্রী বেগতিক দেখে সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

নিজেকে একা পেয়ে মাস্টার আব্দুল লতিফ মানিব্যাগটা পাশে ছুঁড়ে ফেলল, মাদুরের তলা থেকে এক্সারসাইজ বুক এবং কাগজের টুকরোটি বের করল। আলোটাকে আরো কাছে টেনে নিল। তারপর চোখের পাতা ঈষৎ কুঁচকে সে ড্যাবড্যাব করে কথাটির দিকে তাকাল—মস্ত বড় সাপ যেন একটা। বুক ধুকপুক করতে লাগল। যেটুকু অক্ষর সে নিজের হাতে লিখেছিল, তার প্রতি সে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল। তার হস্তাক্ষর তার ছেলের চেয়ে অনেক সুন্দর। সে কথাটার দিকে মন দিল এবং তৃতীয় অক্ষরটি কাগজের উপর লিখল, তারপর সে আগের দুটো অক্ষরের সঙ্গে মিলিয়ে উচ্চারণ করল, কনষ্ট !

হতচ্ছাড়া অক্ষরগুলো উচ্চারণ করা মাত্র মাস্টার আব্দুল লতিফের মনে হল, নিশ্চয়ই সে কিছু বাদ দিয়েছে। সে আরো ঝুঁকে পড়ে কাগজের টুকরোটি পরীক্ষা করতে লাগল। তার মনে হল কথাটা তাকে জিব দেখিয়ে ব্যঙ্গের হাসি হাসছে। সে আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল। সিগারেট ধরিয়ে অনর্গল ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে আবার কথাটার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

তাকের উপর থেকে তার স্কুল-বুক নামিয়ে আনল, এতদিন যা শিখেছিল মন দিয়ে পড়ে গেল। যদি একটা হদিস মেলে। স্কুলে বইয়ের যে-পাতাগুলো পড়েছিল সেগুলো কেমন সহজে ধরা দেয়, পড়তেও ভারি আরাম। কিন্তু এখন যতই বইয়ের পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগল ব্যাপারটা ততই জটিল মনে হল। এখন কথাগুলো দেখতে ছোট ছোট, আর পৃষ্ঠাগুলোও পরিষ্কার, এবং কড়কড়ে। হঠাৎ সে তার কপালে হাত ছোঁয়াল, হেসে ফেলল।

এই আবিষ্কারের একটু পরেই মাস্টার আব্দুল লতিফ নতুন করে অক্ষরগুলো উচ্চারণ করছিল : কা, কি, কো, ছা, ছি, ছো, তা, তো, তি।

সময় বয়ে যায়। বাতিটা নিবু নিবু হয়ে আসে। সিগারেটের প্যাকেট শূন্য। ভোরের আলো ফুটে উঠছে, আব্দুল লতিফ তখনো তন্ময়। তার দুই চোখ বিস্ফারিত, তার মন যেন চকচকে ধাতুর মত জলজল করছে। শরীর ক্লান্ত অথচ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। আর তার মনের মধ্যে এমন

সব জটিল প্রক্রিয়া চলেছে যা সে ভুলেও কখনো কল্পনা করে নি। সে সমস্ত স্বরবর্ণের ধ্বনিগুলো লিখল, তারপর শুরু করল যাকে বলে পরীক্ষানিরীক্ষা—কখনো মুখ দিয়ে উচ্চারণ করছে, কখনো লিখছে, কখনো ভেবে ভেবে সারা হচ্ছে। ভিতরের একটা অদ্ভুত অনুভূতি এবং কথাগুলোর শব্দ তাকে মোহাচ্ছন্ন করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মানসিক পরিশ্রমের ফলে ক্রমে স্বরগুলো ভেঙে ভেঙে সে উচ্চারণ করতে পারছে এবং পরিশেষে তার মুখ দিয়ে বের হল: "কনস্ট্যান্টিনোপোল"।

আব্দুল লতিফ ঠোঁটে ঠোঁট চেপে খুশিতে দিশেহারা হয়ে শিশুর মত হাততালি দিতে লাগল। দরজার ফাঁকে তার স্ত্রীর মুখ দেখা গেল।

"কিছু চাইছ?"

"হ্যাঁ, একটু চা করে আনো।" বলে পিছনে হেলান দিয়ে হাসতে লাগল। বুক ভরে নিশ্বাস নিল। তারপর সে তার কাফের গায়ে-লাগা গ্যারেজের মালিক মিঃ কনষ্ট্যান্টিনকে গালি দিতে লাগল। যতই সে মহাজ্ঞানী ঋষির মত অক্ষরগুলোর দিকে তাকায় ততই উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বাতিটা থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছে এবং তার খালি মাথাটা তখনো গভীর চিন্তায় ঝুঁকে রইল। তাকে এবার আর বেশি লড়াই করতে হল না। সে হঠাৎ চিৎকার করে উঠল যেন কোনো গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছে: কনস্ট্যান্টিনোপল!

মাস্টার আব্দুল লতিফ মনে করতে পারল না কখন কোথায় এই নামটা সে শুনেছে, কিন্তু এ-রকম জায়গা যে কোথাও আছে-ই সে-সম্পর্কে কোনও ভুল নেই। তবে সে এখন এ-সব কেয়ারও করে না। সে ঘাড় ঝাঁকি দিল—কনস্ট্যান্টিনোপল শহরটা গোল্লায় গেলেও তার কিছু আসে যায় না। তারপর সে উঠে দাঁড়াল, দুই হাত তুলে মোড়ামুড়ি ভাঙল, হাড়গুলো মড়মড় করছে শুনে সে বাস্তবিক কী একটা আনন্দ বোধ করল। দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

তার স্ত্রী চায়ের সরঞ্জামের সামনে একটা সোফার উপর কাৎ হয়ে শুয়ে ছিল, স্বামীকে দেখে জিজ্ঞেস করল, "তোমাকে খেতে দেব?'

"ওরে মাগী, কনস্ট্যান্টিনোপল।"

বেশ দ্রুততালে কথাটা সে উচ্চারণ করল—গান গাওয়ার মত। আর এইভাবে উচ্চারণ করতে করতে সে গিয়ে ঢুকল ছেলেদের ঘরে—হাতে তার তখনো বাতিটা ধরাই আছে। আলো গিয়ে পড়ল ছোট ছোট শায়িত

দেহগুলোর উপর। তার চোখ নিবদ্ধ হল একটা ছোট টেবিলের উপর যেখানে জাকির বইগুলো স্তূপীকৃত।

হঠাৎ তার প্রতিজ্ঞা ভেঙে গেল। ঘরের উষ্ণতা এবং শিশুদের নিশ্বাসের সঙ্গে গলার স্বর মিশিয়ে সে ফিসফিস করে বলল, "আল্লার কসম, তোদের সব্বাইকে আমি স্কুলে পাঠাব।" বলে জাকির দিকে ঝুঁকে পড়ল, পরম স্নেহে তার গায়ে হাত দিল। জাকি চোখ মেলল—সে চোখ তখনো ঘুমে জড়ানো।

বাবাকে চিনতে পেরেই জাকি নিজেকে গুটিয়ে নিল, ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কী যেন বলতে লাগল।

আব্দুল লতিফ তার সামনে সোজা দাঁড়িয়ে রইল, তার চোখমুখ গর্বে ঝলমল করছে। কাগজের টুকরোটি ছেলের দিকে তাচ্ছিল্যভরে ছুঁড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে ঘুরে দাঁড়াল : কনস্ট্যান্টিনোপল, বুঝেছিস···

এমনভাবে কথাটা বলল যেন ওতে তার কিছুই আসে যায় না।

অনুবাদ : গোলাম কুদ্দুস

UNITED STATES : THE NOTE BOOK *by* NORMAN MAILER

নোটবুক

নর্মান মেলার

লেখকের সঙ্গে তাঁর তরুণী বান্ধবীর ঝগড়া বেধেছে। লেখক চলেছেন, মেয়েটিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে। তর্ক যতই চলে, দুজনে ততই পরস্পরের কাছ থেকে সরে আসেন, নিজেদের মধ্যে দূরত্ব রেখে চলতে থাকেন।

বোঝা যায় মেয়েটির দিক থেকেই উত্তাপটা কিছু বেশি। থেকে থেকে গলা চড়ায়, সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় বেঁকিয়ে লেখকের দিকে তাকায়—যেন শুধু কথায় আর কুলোচ্ছে না। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয়। জুতোর শক্ত হীলের খট্‌খটানিতেও রাগটা ধরা পড়ে।

● আমেরিকা ●

লেখক সইছেন, বেশ মর্যাদার সঙ্গেই : একটি পায়ের সামনে অন্য পা'টি ফেলে, সোজা সম্মুখের দিকে তাকিয়ে বিষণ্ন মুখে মৃদু হাসছেন, মেয়েটির কথায় ঘাড় নেড়ে নেড়ে সায়ও দিচ্ছেন।

মেয়েটি চেঁচিয়ে ওঠে, "আমি তোমাকে সহ্য করতে পারি না। তুমি যেন মস্ত বড় একটা কেউকেটা তোমার ঐ ভাবটাই আমার সহ্য হয় না। আচ্ছা, বল তো তোমার মধ্যে কী এমন আছে যে তুমি নিজেকে এত বড় বলে ভাব ?"

"কিচ্ছু না।" কথাটা লেখক এমন শান্তস্বরে মোলায়েম করে বললেন যে মনে হল যেন বলতে

চাইলেন, "আমার এই নির্লিপ্ত প্রশান্তির গুণেই তো আমি সবার চেয়ে বড়।"

মেয়েটি প্রশ্ন করল, "আমায় কখনও কিছু দিয়েছ, বল? আমি জীবনে তোমার মত একটা হৃদয়হীন লোক আর দেখি নি।"

লেখক মৃদুস্বরে আপত্তি করলেন, "সেটা ঠিক নয়।"

"ঠিক নয়! সবাই ভাবে তুমি কী ভদ্র, তুমি সকলের বন্ধু; সবাই ভাবে, শুধু যারা তোমাকে এতটুকু চেনে তারা বাদে। যে তোমাকে চেনে, সে-ই জানে, তুমি কী!"

লেখক কিন্তু সত্যিই অতটা হৃদয়হীন নন। এই মেয়েটিকে তিনি সত্যিই অত্যন্ত ভালোবাসেন। মেয়েটি কষ্ট পেলে তিনিও কষ্ট পান। মনের একটা অংশে যদিও তিনি লক্ষ করছেন, মেয়েটি কেমন করে কথাগুলো সাজাচ্ছে, একটা বাক্যাংশের শেষ শব্দ থেকে কেমন করে একটা নতুন শব্দ উঠছে; তবুও তিনি মেয়েটির প্রতিটি কথাই মন দিয়েই শুনছেন।

"আচ্ছা, তুমি কি আমার প্রতি সুবিচার করছ?" লেখক প্রশ্ন করলেন।

"থামো থামো! আমি তোমায় বুঝে গেছি। তুমি ভালোবাসতে চাও না। যেসব কথা প্রেমে পড়লে বলতে হয়, সেই কথাকটা তুমি বলতে চাও। প্রেমে পড়লে যেসব অনুভূতি আসে বলে শোনা যায়, সেইগুলো তুমি যাচাই করে দেখে নিতে চাও।"

লেখক বললেন, "আমি তোমায় ভালোবাসি। জানি তুমি আমার কথা বিশ্বাস কর না, তবু বলছি—"

"তুমি একটা—তুমি একটা মিশরী মমি। মমি মমি মমি!"

লেখক ভাবছেন, মেয়েটি চটে উঠলে ওর উপমা-অলংকারগুলো কেমন যেন মরা-মরা লাগে। নরম গলায় বললেন, "বেশ, আমি একটা মমিই। হয়েছে তো!"

রাস্তার ধারে ওঁদের দাঁড়াতে হল—ট্র্যাফিকের আলো বদলাবার অপেক্ষায়।

লেখক একেবারে ধারে দাঁড়িয়ে, মুখে বিষণ্ণ-মৃদু হাসি—সেই বিষাদ এমন পরিপূর্ণ, এমন প্রশান্ত, এমনই অকৃত্রিম যে মেয়েটি তা সহ্য করতে পারে না, হঠাৎ একটা ক্ষীণ কান্নায় মুচড়ে উঠে সে রাস্তায় নেমে পড়ে, উঁচু হীলে খটাখট্ শব্দ তুলে রাস্তা পার হয়ে যায়।

লেখককে প্রায় একটু ছুটে গিয়েই তার নাগাল ধরতে হয়।

মেয়েটি বলে "তোমার মনটা এখন বদলে গেছে। তুমি আমার কথা আর ভাবোই না। আগে হয়ত ভাবতে, কিন্তু আর ভাবো না। আমার দিকে তাকাও শুধু, ভালো করে চেয়েও দেখ না। তোমার কাছে আমার কোনও অস্তিত্ব নেই।"

'আছে, তুমি জানো, আছে।"

"আছে! এই মুহূর্তেই ভাবছো, এখন অন্য কোথাও থাকলে বেশ হত। আমি যখন ঝগড়া করি, আমাকে তোমার ভালো লাগে না। তুমি ভাবো, আমি কী নোংরা। হ্যাঁ, আমি তো নোংরাই। তুমি জ্ঞানীগুণী লেখকমানুষ, তোমার কাছে আমি তো নোংরাই। বড্ড আপসোস হয় আমার জন্যে, না? আচ্ছা, তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর যে এই সমস্ত পৃথিবীটার আদি-অন্ত তোমাতেই?"

"না।"

"না!" মেয়েটি চিৎকার করে ওঠে।

"আচ্ছা, তুমি এত রেগেছ কেন বল তো? তোমার মনে হয়েছে, আজ আমি তোমার কথায় তেমন মন দিই নি, তাই না? যদি না দিয়ে থাকি, আমি দুঃখিত। আমি সত্যিই বুঝতে পারিনি যে আমার মনটা অন্যদিকে গেছে। বিশ্বাস কর, আমি তোমায় ভালোবাসি।"

"ভালোবাসো, নিশ্চয়ই ভালোবাসো।" মেয়েটির গলায় ব্যঙ্গের তিক্ততা এমন ভারি হয়ে আসে যে মনে হয় সে যেন আর কান্না সামলাতে পারবে না। "আমারও তা-ই ভাবতে ভালো লাগে, কিন্তু আমি যে সত্যি কথাটা জেনে গেছি।" হাঁটতে হাঁটতে মেয়েটি লেখকের দিকে ঝুঁকে পড়ে। তিক্ত স্বরে সে বলে, "মানুষকে তুমি এমন আঘাত দাও যে পৃথিবীর নিষ্ঠুরতম মানুষটাও তা পারবে না। কেন জানো? কারণ তুমি কখনও কিছুই অনুভব কর না, অথচ ভান কর যেন সবই অনুভব কর।"

মেয়েটি বুঝতে পারে, লেখক শুনছেন না। মেয়েটি ফেটে পড়ে: "কী ভাবছ, শুনি?" হঠাৎ।

"কিছু না। তোমার কথাই শুনছি। তুমি অমন বিচলিত হয়ে না পড়লেই আমি খুশী হতাম।"

আসলে কিন্তু লেখক একটু অস্বস্তির মধ্যেই পড়েছেন। হঠাৎ মাথায়

একটা 'আইডিয়া' এসেছে, নোটবুকে এখনই লিখে ফেলতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। ভয় হচ্ছে, এখনই বুক-পকেট থেকে নোটবুকটা বার করে লিখে ফেলতে না পারলে, ভুলে যেতে পারেন। লেখক মনে মনে বারবার আইডিয়াটা আউড়ে মুখস্থ করে ফেলবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু ওতে বিশেষ ভরসা পাচ্ছেন না।

মেয়েটি বলে, "আমি বিচলিত হয়েছি? হ্যাঁ, হয়েছি বইকি। হব না? মমিই শুধু কখনও বিচলিত হয় না, কখনও কোনো কিছু অনুভব করে না বলেই সবসময়েই মমি অবিচল থাকতে পারে।" দাঁড়িয়ে থাকলে মেয়েটি হয়ত সজোরে মাটিতে পা ঠুকত। "কী কথা বলছ না যে?"

"কী আর বলব।" লেখক ভাবছেন, পকেট থেকে নোটবুকটা বার করে হাতের চেটোয় ধরে হাঁটতে হাঁটতেই হয়ত লিখে ফেলতে পারবেন। হয়ত মেয়েটি টের পাবে না। কিন্তু দেখা গেল ব্যাপারটা অত সহজ নয়। রাস্তার আলোর নিচে লেখককে দাঁড়াতে হল। পাশেই মেয়েটির উপস্থিতি তাঁকে পীড়িত করে, তাই পেন্‌সিল চলে মৃগী রোগীর আতঙ্কিত ক্ষিপ্রতায়। লেখক লেখেন: নোটবুকের উপস্থিতিতে ভাবগত পরিস্থিতির জটিলতাবৃদ্ধি। তরুণ লেখক ও বান্ধবী। বান্ধবীর অভিযোগ, লেখক পর্যবেক্ষকমাত্র, জীবনের অংশভাক্ নয় মাথায় আইডিয়া আসে, নোটবুকে লিখে রাখতে হবে। লিখে রাখতে যায় ঝগড়া চরমে ওঠে। এই ছুতোয় মেয়েটি সম্পর্ক ভেঙে দেয়।

মেয়েটি বলে, "এবার তাহলে একটা আইডিয়া পেলে।"

"হ্‌ম্!"

"ঐ নোটবুকটা। আমি জানতাম, তুমি ঐটে বার করবে।" মেয়ে কেঁদে ফেলে। আর্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, "জানি জানি, তুমি একটা জ্যান্ত নোটবুক ছাড়া আর কিছু নয় জানি!" বলেই ছুটতে শুরু করে।

লেখকের কাছ থেকে পালিয়ে যায়, রাস্তায় তার শক্ত হীলের দাপট যে তার বেদনাকে বিদ্রূপ করতে করতে চলে। "এই, দাঁড়াও দাঁড়াও। আমা কথাটা বুঝিয়ে বলতে দাও।'

লেখকের মনে হল, এই বিষয় নিয়ে একটা গল্প দাঁড় করাতে গেলে খাঁজখোঁজগুলো একটু বদলে দেওয়া দরকার। গল্পটার পয়েন্টটা আসলে অন্যভাবে—ছেলেটি নোটবুক বের করবে, সম্পর্কের যেটুকু অবশিষ্ট আছে

সেটুকু ভেঙে চুরমার করে দেবার প্রকৃষ্ট পন্থা হিসেবেই। আইডিয়াটা বেশ।

হঠাৎ লেখকের মনে হল, নিজেও কি তা-ই করলেন? তিনিও কি চেয়েছিলেন, তরুণী বান্ধবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা অমনি করে ভেঙে ফেলতে?

কথাটা লেখক বিচার করে দেখবার চেষ্টা করলেন। তাঁর একটা বিষয়ে গর্ব আছে, ভাবের ঘরে চুরি করেন না—নিজের কোনো চিন্তা, যতই অপ্রীতিকর হোক, নিজের কাছে স্বীকারে তাঁর সংকোচ নেই।

কিন্তু কথাটা সত্যি ঠেকল না। তিনি সত্যিই মেয়েটিকে ভালোবাসেন, খুউব ভালোবাসেন এবং তাঁদের সম্পর্ক এখনই শেষ হয়ে যাক, এ তাঁর অভিপ্রেত নয়।

হঠাৎ চমকে দেখলেন, মেয়েটি অনেকদূর এগিয়ে গেছে। লেখক তাকে ধরবেন বলে ছুটতে শুরু করলেন। "এই, দাঁড়াও দাঁড়াও। আমি তোমায় বুঝিয়ে বলব। আমি তোমায় বোঝাতে পারব। দোহাই তোমার, দাঁড়াও দাঁড়াও।"

লেখক ছুটছেন, পকেটে নোটবুকটা আছাড় খাচ্ছে—চিরসঙ্গী খেলার সাথী পোষা কুকুর একটা, অতি অনুগত, অতি স্নেহপরায়ণ।

অনুবাদ: শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়

GHANA : JUST TO BUY CORN *by* GEORGE AWOONOR WILLIAMS

খোরাকি

জর্জ আয়েয়োনর উইলিয়ামস

খোকা ফের কাশতে শুরু করে। শুকনো, একটানা কাশি। বারেক কেঁদে ওঠে। কিন্তু কাশির দমকে কাঁদার দম পায় না।

খোকন! খোকন সেরে উঠবে তো! মা ঘুরে বসে খোকার দিকে তাকাল। তারপর খোকার শিয়রে উঠে গিয়ে লাউয়ের ছোট বসটা খুলে নীল ন্যাকড়ার পুঁটলিটা বের করে আনল। পুঁটলিতে আছে কিছু শেকড়বাকড় আর একটি গিরগিটির চোয়ালের হাড়।

● ঘানা ●

পুঁটলিটা আস্তে আস্তে খোকার বুকে বুলোল। সাতবার।

পেচ্ছাপ করে কাঁথা ভিজিয়ে ফেলেছে। কাঁথা বদলে শোয়াল।

দেখতে দেখতে খোকা ঘুমিয়ে পড়ল। ঘড় ঘড় করে শ্বাস টানতে লাগল।

মার চোখে কিন্তু ঘুম এল না।

কেরোসিনের দাম চড়ে গেছে। ফুঁ দিয়ে মা কুপিটা নিভিয়ে দিল। ঘরের চালের দিকে তাকাল। ভোর হয়ে আসছে। অন্ধকার আকাশে তারার মত ফুটোফাটা চালে ভোরের আলো। তৃতীয়বার মোরগ ডেকেছে। শোম বুড়ির মোরগটাই রোজ তৃতীয় ডাক ডাকে। সোফ গাঁয়ের

মোরগগুলোর ডাক শোনার পর ডাকে। কেন? রোজই ওই বুড়ির মোরগটা তৃতীয় ডাক ডাকে কেন? বুড়ি ডাইনি বলে? লোকে তো তাই বলে।

মা উঠে গিয়ে ঘরের ঝাঁপ খুলল। পুবের আকাশে রঙ ধরেছে। খোকা ঘুমোচ্ছে, ঘুমোক। দাওয়ায় লাউয়ের বস থেকে জল নিয়ে মা চোখমুখ ধুল।

আজ কেটার হাট। ভুট্টা প্রায় বাড়ন্ত। মাদুর নিয়ে হাটে যেতেই হবে। 'খোকার অসুখ, উপায় কি! সাবানওলার কাছে ধার আছে, মাছের জন্যে আগবোদা বুড়িও কিছু পায়। আমারও ভুট্টা দরকার।'

খুদকুড়ো যা ভুট্টা ছিল তাই দিয়ে মা খোকার পথ্যি বানাল। খোকাকে আলগোছে বাইরে তুলে নিয়ে এল। আস্তে আস্তে তার মুখ ধুইয়ে দিল।

মাথায় জল দিতেই খোকার ঘুম ভেঙে গেল। খুদে খুদে দুই চোখ মেলে খোকা তাকাল। ভারি ক্লান্ত বড় করুণ সেই চাউনি। ফিক করে একবার হাসলও। হাসি নিভে গেল সঙ্গে সঙ্গে। নিষ্ঠুর এই পৃথিবীতে হাসি বেমানান। মার শুকনো মাইয়ে চটপট খোকা মুখ গুঁজে দিল।

'ও মানিক! সারাটা রাত তুই বড্ড কষ্ট পেয়েছিস রে! কী কাশি! কী কাশি!' খোকার গালে মা হাত বুলিয়ে দিল। 'আমি আজও হাটে যাব। তুই যাবি সোনা? যাবি খোকন আমার সাথে?'

আটমাসের খোকন জবাব দিল না।

'যাবি বাপ? আচ্ছা! হাটে তোকে জুতো কিনে দেব—নতু-ন জুতো—কেমন? আর সেই ঘোড়াটা—সেই যে বড় দোকানে আমরা দেখেছিলুম—অ্যাঁ? আমার খোকাবাবা সেই ঘোড়ায় চেপে টগবগ টগবগ করে—'

খোকার বাঁ গালে টোকা দিয়ে মা আদর করল। চোখে চোখ রাখল।

'তোর জন্যে কাল একটা জামা বানিয়েছি, মনে আছে? সেটা এখন পরিয়ে দি, কেমন?'

হাবিজাবি জিনিসপত্রের মধ্যে কাল একটুকরো ছিট পেয়ে গিয়েছিল। দিনভর মাদুর বোনার পর সেই ছিট কেটে সুচসুতো দিয়ে নিজেই সেলাই করে জামাটা বানিয়েছে।

জামা পরাল। পেছনের ফিতে বাঁধার জন্যে খোকাকে খানিক তুলতেই শুরু হল কাশি। সেই শুকনো, একটানা কাশি। দমকে দমকে খোকা কাশে,

মার বুকে পড়ে হাতুড়ির ঘা। দু-চোখ খোকার জলে ভরে আসে, হু হু করে ওঠে মার মন।

কোবরেজ বলেছে তার ওষুধে খোকা ভালো হয়ে যাবে। কোবরেজকে দিতে হয়েছে সাত শিলিং সাত পেনি। আট হাটের রোজগার। আর একটা শাদা মোরগ। তার দাম এখনও বাকি।

তিনমাস ধরে খোকা কাশছে। একনাগাড়ে তিনমাস!

কাশির সঙ্গে বমি।

খোকাকে নিয়ে সিয়ামেতে মার কাছে গিয়েছিল। ওখানে সবাই বলল, ছেলের উপর সোয়ামির ভর হয়েছে, তার আত্মা মানত চাইছে। ভুতমাথা গাঁয়ের বাইরে যে সাতআঁখি দেবতার থান আছে সেখানে গিয়ে কিছু মানত করতে হবে। মা তাই করেছে। তবু বাছার কাশি থামল কই!

অথচ হাটে না গিয়ে আজ উপায় নেই।

খোকাকে কোলে নিয়ে মা কুঁড়ের মধ্যে ঢুকল। খোকাকে কাঁথায় শুইয়ে দিয়ে মাদুর গুণল। মোট আঠারোটা। দড়ি দিয়ে ভালো করে মাদুরগুলি বাঁধল।

খোকা আর কাশছে না। শক্ত একটুকরো কাপড়ে তাকে পিঠের সঙ্গে বেঁধে নিল। মাথায় মাদুরের বোঝা।

ঘরের ঝাঁপ বন্ধ করল। হাঁসের গামলায় জল রাখল। 'ফিরতে ফিরতে সেই সন্ধে। ততক্ষণ বেচারিদের উপোস করে থাকতে হবে!

'আঠারোটা মাদুর—একেকটা চার পেনি। সব যদি বেচতে পারি তাহলে তোমার হবে গিয়ে···তিনটে মাদুরে এক শিলিং, আরও তিনটেয় এক শিলিং—ছটায় দু শিলিং। আরও ছটায় দু শিলিং—ছয়ে ছয়ে বারো। বাকি রইল একটা দুটো তিনটে, একটা দুটো তিনটে—তিনে তিনে ছয়। আরও দু শিলিং। মোট তাহলে তোমার দাঁড়াল গিয়ে দুইয়ে দুইয়ে চার, চার আর দুইয়ে ছয়—আঠারোটা মাদুরে ছ শিলিং।

'যাতায়াতের নৌকোভাড়া বাবদ এক শিলিং। আতসু মাঝি বড় ভালো লোক। খোকনের ভাড়া নেয় না। ছ পেনি দিয়ে খাবার কিনব। খোকন খাবে, আমার পোড়া পেটেও চাই, সামনের হাটবার অব্দি হাঁসেদের খাওয়াতে হবে।'

খেয়াঘাটে এসে দেখল চেনাজানা সবাই হাজির।

'হ্যাঁরে, আজ এত দেরি ?'

'খোকনের তরে—'

'কী হয়েছে ? অসুখ ?'

'না না, অসুখ না। কিন্তু একেক সময় এমন বায়না ধরে ! কিচ্ছু খেতে চায় না। কত বুঝিয়েসুঝিয়ে—'

'ভারি দুষ্টু তো।'

'না না, দুষ্টু না।'

'ঘুমোচ্ছে ?'

'ঘুমোচ্ছে।' প্রার্থনার সুরে মা বলল, 'ভগবান করুন, হাট যেন আজ ভালো যায় !'

'হে ভগবান, হাট যেন আজ ভালো যায় !' সায় দিয়ে উঠল সবাই।

মাঝি এল। নৌকো ছাড়ার আগে গ্রামের দিকে আঁতিপাতি করে তাকাল। 'চলল ! চলল ! ময়ূরপঙ্খী উড়ে চলল। কে যাবে দৌড়ে এস, ছুটে এস।' আরও খানিকক্ষণ দেখে নিয়ে মাঝি নোঙর তুলে নৌকো ছেড়ে দিল।

হাত চল্লিশেক গেছে, ছোট মাঝি পাল টাঙানোর তোড়জোড় করছে—শোনা গেল এক চিৎকার, 'ও আতসু মাঝি, দাঁড়াও গো, দাঁড়াও দাঁড়াও।'

সবাই তীরের দিকে তাকাল। আদজোয়া। রোজ ও দেরি করে আসে।

'ছুঁড়িটা রোজ দেরি করে কেন বল তো ? সময়মত ঘুম থেকে উঠলে—'

'ভাতার নাকি ছাড়ে না।'

সবাই হেসে উঠল।

নিজের সোয়ামির কথা মনে পড়ে যেতে মা শুধু চুপ করে রইল।

আতসু মাঝি নৌকোর মুখ ঘোরাল। নইলে ছ পেনি লোকসান। তাছাড়া আদজোয়া মেয়েটাও বেশ আমুদে। মজার মজার গল্প বলে জমিয়ে রাখে।

আদজোয়াকে তুলে নিয়ে নৌকো ফের রওনা হল। পাল খুলল, সওয়ারীদের মুখের আগলও। হাসিতে-মস্করায় আসর সরগরম। ছোটরাও থেকে থেকে মুখ চেপে হাসতে লাগল। বড়দের দলে পড়ে তারাও হঠাৎ বড় বনে গেল।

ভোরের হাওয়ায় শীত শীত করছে। খোকাকে মা পিঠ থেকে সরিয়ে কোলে আনল। ঘুমন্ত খোকার মুখে মাই গুঁজে দিল। খোকা মাই টানতে লাগল। শুকনো মাই। চুক চুক শব্দ ওঠে, বোজা দুই চোখের পাতা তির-তির করে কাঁপে।

'এখনও মাই খায়? অত বড় ছেলে—?'

'বড় কোথায়! সবে তো আট মাসে পড়ল।'

'আট মাস! আমার ছোটকা আটে পড়তেই ছেড়ে দেয়।'

'কেউ কেউ আবার তিন বছর অব্দি খায় বাপু।'

'মা বলে আমি নাকি দু-বছর অব্দি—'

'বলিস কি লা!'

'ভালো কথা, কাল তোদের বাড়ি ছোকরাপানা বাবুটি কে এয়েছিল রে?'

'আগবোভিয়া। আমার ছোট সোয়ামি। তাকোবাদিতে থাকে।'

'বেশ দেখতে কিন্তুক! জাতু ওকে সাঁঝবেলা নৌকো থেকে নামতে দেখেছিল—আমাকে বলল।'

'ওইটুকুন মেয়ে—এমন ছোঁকছোঁকে স্বভাব। ব্যাটাছেলে দেখলে—'

'ওইটুকুন মেয়ে! সতের বছরের সোমথ মাগী ওইটুকুন মেয়ে!'

'তা তোর ছোট সোয়ামি থাকবে কদ্দিন?'

'কী জানি ভাই! লেখাপড়াজানা মনিষ্যি—গাঁয়ে ওদের মন টেকে না। বলে, এটা এক্কেবারে অজ পাড়াগাঁ। সন্ধে হতে না হতেই কেন যে লোকে হাঁস-মুরগির মত খুপরিতে গিয়ে ঢোকে—'

'শুনিছি বড় বড় শহরে কেউ নাকি রাত্তিরেও ঘুমোয় না।'

'কেন ঘুমোবে? ওরা বলে, রাত্তিরে ওদের দিন শুরু হয়। ইলেকট্রিক জ্বাললেই রাত্তিরটা দিন হয়ে যায় যে।'

'আচ্ছা!'

খোকা কাশতে শুরু করল।

'তোর ছেলের এই কাশিটা কিন্তু খারাপ।'

'বুকে একটু ঠাণ্ডা বসেছে।'

'হুম! কাশির আওয়াজটা বাপু সুবিধের নয়।'

'কাউকে দেখিয়েছিস?'

'ভুদজি বুড়োর কাছে নিয়ে গেছলুম।'

'ভালো কোবরেজ।'

'কোবরেজে কিচ্ছু করতে পারবে না। তুই বরং ওঝাকে দেখা।'

'দেখাব।'

'এ কাশি পুষে রাখা ঠিক না।'

'না না, কালই একে ওঝার কাছে নিয়ে যাব।'

কিছুক্ষণ কেশে খোকা থামল। মেয়েরা খোকার দিকে তাকাল। তারপর মার দিকে। মুখে কেউ কিছু বলল না।

কাশিটা কিন্তু খারাপ!

কাশির আওয়াজটা বাপু সুবিধের নয়!

মনের কথা মুখ ফুটে কেউ বলল না বটে, মা তবু বুঝল। বুকটা ধক করে উঠল। খোকার মুখখানা দেখল। মেয়েদের মুখের দিকে চাইল। ওরা ততক্ষণে এক ছাগল-চোরকে নিয়ে পড়েছে। আবলোমিতে টিচার্স বয় স্কাউটের ছেলেরা কীভাবে এক ছাগল-চোরকে পাকড়াও করেছিল, আর সেই ছাগল-চোর যে লাগোসের এক বুড়ির ছটা লাউয়ের বস চুরির দায়ে কেটার জেল-ফেরতা আটোবা ছাড়া কেউ নয়—তারই মুখরোচক কাহিনীতে মশগুল হয়ে উঠেছে।

ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। পালে হাওয়া পেয়ে তরতর করে নৌকো এগিয়ে চলেছে। চারপাশে জেলেডিঙি। কাঁকড়ার মরশুম। জেলেদের ছেলেরা তীরে কাঁকড়া খুঁজে খুঁজে ফিরছে।

ছোট মাঝির বয়েস বছর ষোল। চালাক চতুর ছোকরা। হঠাৎ তার গানের শখ চাড়া দিয়ে উঠল। গলা চিরে গাইতে শুরু করে দিল। দুঃখের গান। আতসু মাঝি ধমক দিল: ওর মা বেঁচে আছে না! মা থাকতে এ-গান গায়!

ছোকরা আচমকা থেমে গেল। দূরের দিকে তাকিয়ে রইল।

কেটার নারকেলের সার দেখা যাচ্ছে। বড় বড় বাড়িগুলি নজরে পড়ছে। হাটের হট্টগোল ভেসে আসছে।

হে ভগবান, হাট যেন আজ ভালো যায়! হাট যেন আজ ভালো যায়! ভালো যায়!

মায়ের কোলে খোকা ঘুমোচ্ছে।

'ভালো করে ঢেকেঢুকে নে। এই হাওয়াটা ওর পক্ষে ভালো নয়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ—ভালো করে ঢাকা দে।'

গায়ের চাদরটা খুলে খোকাকে মা ভালো করে ঢেকে নিল। এই হাওয়াটা ওর পক্ষে ভালো নয়! ভালো নয়!

ছ মাস হল সোয়ামি মারা গেছে। একদিন ক্ষেত থেকে ফিরে মানুষটা বলল মাথায় বড্ড যন্ত্রণা। টোটকা ওষুধ তৈরি করে দিল। নিমপাতা ফুটিয়ে গরম জল দিল। ওষুধ খেয়ে, সেই জলে চান করেও কোন ফল হল না। রাতভর সে কী কাতরানি! কী ছটফটানি মানুষটার!

মার বুক দুরদুর করে উঠল। তাড়াতাড়ি ছুটল তুদজির কাছে। কোবরেজ বুড়োকে ডেকে আনল। কুপি জ্বালাল। দেখল, মানুষটা তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। অকাতরে ঘুমোচ্ছে।

খোকা ওদিকে কাঁদতে শুরু করায় মা গেল ছেলে সামলাতে, কোবরেজ বসে রইল রোগীর পাশে।

ও যদি মরে যায়? না না, হে ভগবান! না না না! ও চলে গেলে আমার কী গতি হবে!

চুপিসাড়ে কোবরেজ মার কাছে উঠে এল; বলল, সোয়ামি তার চলে গেছে!

শ্রাদ্ধশান্তি চুকল। গোলায় যা-কিছু ছিল আত্মীয়কুটুমের পেটে গেল। মা অশৌচের কাপড় পরল। এখনও তাই পরনে।

তারপর খোকার অসুখ। খোকাকে নিয়ে সিয়ামেতে মার কাছে গেল। গণৎকাররা বলল, ভুতমাথা গাঁয়ের শেষে যে সাতআঁখি দেবতার থান আছে সেখানে গিয়ে কিছু মানত করতে হবে।

হে ভগবান, হাট যেন আজ ভালো যায়! হাট যেন আজ ভালো যায়! ভালো যায়!

আত্মীয়স্বজন বিয়েতে আপত্তি করেছিল। বলেছিল, মানুষটা ওর মায়ের একমাত্র ছেলে। দেবতার থানে অনেক হত্যে দিয়ে মা ওকে পেয়েছে। ও দেবতার ধন। বেশিদিন বাঁচবে না। দেবতা ওকে নির্ঘাত ফিরিয়ে নেবে। এমন অনেক ঘটনার উদাহরণও তারা দিয়েছিল।

সিয়ামে থেকে কিন্তু কেউ আপত্তি করে নি। কেন করবে! অমন তাগড়াই যোয়ান। গোলা তার সবসময় ভরা থাকে। এমন পাত্র হয়!

মানুষটাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবেসেছিল। ওলেকের গাইয়ে-বাজিয়ে দলে দুজনের দেখাসাক্ষাৎ। মানুষটা ভালো নাচতে পারত। তারও তখন ভরা

বয়েস, ছোট ছোট নিটোল দুই স্তন, মুখে ভারি সুন্দর একটা উল্কির ছাপ। সবাই বলত সুন্দরী।

বীজ বোনার মরশুম শেষে তারা গাঁয়ে গাঁয়ে যেত। আনলোগা অব্দি গেছে। সেখানকার সবচেয়ে বড় সর্দার তগবুই-শ্রীর সামনে নাচ-গান করেছে। আগবোতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সর্দার নাচ-গানের ব্যবস্থা করেছিল। আগবোতা ছিল সর্দারের ডানহাত। আগবোতার মার বাড়িও ভুতমাথা গাঁয়ে।

সেই বছরই সুর্য্যিকে চাঁদ গিলে ফেলে। সবাই বলাবলি করছিল, এবার না-জানি কী কাণ্ড ঘটে! দিনটা আচমকা করে রাত হয়ে গেল। মুরগিগুলো ঝটাপটি করতে করতে খুপরিতে গিয়ে ঢুকে পড়ল। বুড়োরা বলল, ঠিক এমনি ব্যাপার আগেও একবার ঘটেছিল, কাসাভা লড়াইয়ের আগে। কেটার ছিল গোরাদের কেল্লা। কাতারে কাতারে লোক সেই কেল্লার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের নেতা জেন্সি জোকোতো হল কেল্লার রাজা। পরে অবিশ্যি গোরারা তাকে ভুলিয়েভালিয়ে ষ্টিমারে করে আক্রায় নিয়ে গিয়ে তার মাথা কেটে ফেলেছিল।

আজব কাণ্ডকারখানা আরও ঘটেছিল। আবলোমিতে একটা ছাগল ছ-পেয়ে এক বাচ্চা বিয়োল। রাত্তিরে ঢাকঢোল বাজিয়ে বনের মধ্যে বাচ্চাটাকে বলি দেওয়া হল। আদকপো সর্দার সেই মাসেই তার ক্ষেতে মুখে গ্যাঁজলা তুলে মরে পড়ে রইল। সেই মাসেই যোয়ান যোয়ান কয়েকটা ছেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে আক্রায় গিয়ে ফৌজে ভরতি হল। এ-তল্লাটের সেরা ঢাকী কোফিজাও ছিল তাদের মধ্যে।

আত্মীয়স্বজন তাই বিয়েতে মানা করে। বলে, বিয়ে-শাদীর বছর এটা না। তাছাড়া মানুষটাও দেবতার ধন। বেশিদিন বাঁচবে না। দেবতা ওকে নির্ঘাত ফিরিয়ে নেবে।

কারো কথায় কান দেয় নি।

হে ভগবান, হাট যেন আজ ভালো যায়! হাট যেন আজ ভালো যায়! ভালো যায়!

নৌকো খেয়াঘাটে ভিড়তে নামবার জন্যে মেয়েরা হুড়োহুড়ি শুরু করে দিল। আতসু মাঝি ছ পেনি করে ভাড়া আদায় করতে লাগল। বুড়িদের কয়েকজনকে

পাঁজাকোলা করে ঘাটে পৌঁছে দিতে হল। মাদুরের বাণ্ডিল, মাটির জিনিসপত্র, আখের বোঝা খালাস করা হল।

খোকাকে মা পিঠে নিল, মাথায় মাদুরের বাণ্ডিল। তারপর তিন পেনি দিয়ে টিকিট কিনে খেয়াঘাটের ফটক দিয়ে হাটে ঢুকল।

বেলা নটা। এরই মধ্যে হাট গমগম করছে। বহু নৌকো এসে গেছে। আশপাশের শহর ও গাঁ থেকে অনেকে এসেছে লরি করে। হো, হোয়ই, কাদজোবির মতো দূর দূর অঞ্চল থেকেও লোকজন এসেছে। ক্রমেই ভিড় বাড়ছে। বেচাকেনা শুরু হয়ে গেছে। সরবে দরাদরি চলছে। একজন চায় যত বেশি দামে পারে বেচতে, আরেকজন যত কমে পারে কিনতে। এ ওর উপর টেক্কা দিতে উঠে পড়ে লেগেছে।

হাটো! হাটো! হাটো! একটা লোক মা-ছেলেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিল আর কি! লোকটার পিঠে পেল্লাই এক ভুট্টার বস্তা।

হে ভগবান, ওই বস্তাটা যদি পেতাম!

আস্তে আস্তে মা এগিয়ে চলল। তার জায়গায় এল। খোলামেলা জায়গা। আরও অনেকের মতো স্টল ভাড়া নেওয়ার সাধ্যি মার নেই। যারা কাপড়চোপড় বা লালমুখোদের জিনিসপত্র বেচে, কেরানি ও মালগুদোমের বাবুদের মোটাসোটা গিন্নি আর পাদরিসাহেবরা যাদের বাঁধা খদ্দের স্টলগুলি তাদের জন্যে বরাদ্দ।

মা তার বোঝা নামাল। মাদুরের বাণ্ডিল খুলল। নিজের আর খোকার জন্যে একটি মাদুর বিছিয়ে নিল।

ঘণ্টাখানেক কেটে গেল, একটিও বেচতে পারল না।

খোকা অঘোরে ঘুমোচ্ছে। একরত্তি তার বুক থেকে ঘড় ঘড় শব্দ উঠছে। খোকার দিকে চাইল। হে ভগবান, হাট যেন আজ ভালো যায়। হাট যেন আজ ভালো যায়! ভালো যায়! খোকন খাবে। আমাকেও কিছু পেটে দিতে হবে। আঁচলে তিন পেনি বাঁধা আছে। তাই দিয়ে মানিকের পথ্যি কিনব। একটা মাদুর না বেচা অব্দি দাঁতে কুটোটিও কাটব না।

গায়ের চাদর দিয়ে খোকাকে ভালো করে ঢেকে দিল। পাশের দোকানিকে বলল, 'এদিকে একটু দেখ তো গা। ওর পথ্যিটা কিনে আনি।'

যখন ফিরে এল, খোকা জেগেছে। একটি মেয়েছেলে মাদুরগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে।

'এটা কত ?'

'ছ পেনি।'

'কী বলছ ! কিছু কমসম কর !'

'আপনি বলুন কত হলে—'

'দু পেনি।'

'দু পেনি ! জিনিসটা কেমন একবার দেখুন ভালো করে। সেরা রাফিয়া দিয়ে তৈরি। খুব টেকসই। বাচ্চাদের গু-মুতেও কিচ্ছু হবে না। যাক গে, এক পেনি কমিয়ে দিলুম। পাঁচ দিন।'

'উঁহু, চার। দাও যদি বল।'

চার ! মা দোটানায় পড়ে যায়। চার যে বড্ড কম। কিন্তু এই বউনি। তাছাড়া ভুট্টা না কিনলে চলবে না। খোকনকে কাল ওঝার কাছে নিয়ে যেতেই হবে।

'দিন, তাই দিন।'

খদ্দের একটা শিলিং দিল। মার কাছে ভাঙানি নেই।

'একটু দাঁড়ান'মা, ভাঙিয়ে নিয়ে আসি। যাব আর আসব।'

শিলিং ভাঙাতে মিনিট দশেক লাগল। ফিরে এসে দেখল খোকা কাঁদছিল বলে খদ্দের তাকে কোলে করে দাঁড়িয়ে আছে।

'এত দেরি করলে—!'

'ভাঙানি পাচ্ছিলুম না, মা।'

'বাচ্চাটার দেখছি অসুখ হয়েছে। কাশিটা খারাপ। ওকে হাসপাতালে নিয়ে যেও।'

'হাসপাতাল ! ওতে যে মেলা খরচ, মা। কাল ওকে ওঝার কাছে নিয়ে যাব।'

'যাই করো—বাচ্চাটার কিন্তু খুব অসুখ।'

'জানি মা। কাল ওকে ওঝার কাছে নিয়ে যাব।'

খদ্দেরের কোল থেকে ছেলেকে নিয়ে খাওয়াতে বসল। খোকা খেল নামমাত্র।

'ও খোকন, আরেকটু খা সোনা। মানিক আমার, আরেকটু খাও ধন। দেখি দেখি, হাঁ কর তো যাদু—আর একবার অন্তত খা বাবা। খাবি না? না খেলে কিন্তু ঘোড়া কিনে দেব না—হাঁ! আর একটুখানি— ! তুই যদি না খাস

বাবা আমি তাহলে কী করে—এ হে হে হে! এ কী করলি রে! যেটুকু খেয়েছিলি তাও বমি করে ভাসিয়ে দিলি বাবা!'

খোকা কাঁদতে শুরু করল। মা তার মুখে মাই গুঁজে দিল।

নিঃশব্দে খোকা শুকনো মাই টানতে লাগল। পিট পিট করে মার মুখের দিকে তাকাল। কিছু বুঝি বলতে চায়।

দুজন খদ্দের এল। একটা করে মাদুর কিনল। মা খুশী হয়ে উঠল।

সুয্যিঠাকুর যখন তাঁর ঘোড়ার পিঠে চেপে বসেছেন, অর্থাৎ বেলা একটা নাগাদ, চারটে মাদুর বিক্রি হয়ে গেল।

'ও মানিক, দেখছিস হাট কেমন ভালো! আমার পেট জলছে রে! দেখ না, এবার আমি আমার খাবারও কিনে আনব।'

হাটের কেনাবেচায় ভাটার টান শুরু হয়। মাদুরের বাণ্ডিল সামনে। ছেলে-কোলে মা চুপচাপ বসে। এদিক-ওদিক তাকায়।

তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খদ্দের ডাকতে শুরু করে দেয়।

'সেরা মাদুর! সেরা মাদুর! জলের দরে সেরা মাদুর! ও বাবু, একবার দেখুন চেয়ে। অ গিন্নিমা, মাদুর কিনবেন না? না কিনুন, পরখ করে দেখতে দোষ কি। ও কর্তাবাবু—দেখুন দেখুন কেমন মাদুর। সুন্দর মাদুর! টেকসই মাদুর! নিন না কয়েকটা—নিন বাবু নিন—দাম কমিয়ে দিচ্ছি। দু পেনি করে—দু পেনি—দু পেনি—জলের দরে সেরা মাদুর! জলের দরে—জলের দরে—জলের দরে—'

সুয্যিঠাকুর পাটে বসার আগে আরও তিনটি মাদুর বিক্রি হল। এই দিয়ে বড় জোর দেড় বারকোশ ভুট্টা কেনা যাবে। কিন্তু কী হবে দেড় বারকোশ ভুট্টায়! এদিকে শরীরও আর বইছে না। তেষ্টায় বুক ফেটে যাচ্ছে।

খোকা এখনও ঘুমোচ্ছে দেখে মা তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে জলওলার কাছে গেল। এক বস জল কিনে ফিরে দেখল খোকা জেগেছে। ওদিকে আতসু মাঝির হাঁকডাকও শোনা যাচ্ছে। এবার বাঁধাছাঁদা করা দরকার।

খোকাকে কোলে নিয়ে জল খাওয়াতে গেল। মাথা ঝাঁকিয়ে খোকা মুখ ঘুরিয়ে নিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠল প্রচণ্ড কাশির দমক। শুকনো, একটানা কাশি। কাশতে কাশতে দম বন্ধ হয়ে এল।

ধীরে ধীরে খোকাকে মা দোলাতে লাগল। নাক-মুখ দিয়ে গলগল করে বেরিয়ে এল একরাশ কফ। আঁচল দিয়ে মা মুছিয়ে দিল।

হঠাৎ খোকার ছোট্ট শরীরটা ভয়ানকভাবে মোচড় দিয়ে উঠে দুমড়ে গেল, শুধু চোখের তারা ঠিকরে বেরল। তারপরেই নিথর, নিস্পন্দ।

সব শেষ! মা বুঝল। খোকন চলে গেল!

কাঁদবে? ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠবে? ওগো, কে কোথায় আছো বলে গলা চিরে ডাক ছাড়বে? কী করব! আমি কী করব! আমি এখন কী করব!

মরা ছেলে কোলে নিয়ে মা চারপাশে তাকাল। আর্ত কান্নায় বুক গুঁড়িয়ে যাচ্ছে অথচ কী করবে কী করা উচিত ভেবে কোন দিশে পাচ্ছে না।

একটা লোক মাদুরের দাম জানতে চাইল।

'চার পেনি। ভালো মাদুর, টেকসই মাদুর, বাচ্চাদের গু-মুতেও কিছু হবে না। নিয়ে যান।'

'কিছু কমাও।'

'তিন দিন। আপনার পায়ে পড়ি তিন দিন। মস্ত মাদুর। দুজন শুতে পারবেন—'

তিন পেনি দিয়ে মাদুরটা নিয়ে খদ্দের চলে গেল।

খোকনের মুখের দিকে মা তাকাল। সমস্ত প্রাণ চাইল, চিৎকার করে একবার কেঁদে ওঠে। একবার! একবার শুধু!

কাঁদল না। সযতনে খোকনের চোখের পাতা বুজিয়ে দিল। আরও ভালো করে তাকে চাদর দিয়ে জড়াল। হাওয়াটা যে ওর পক্ষে ভালো নয়!

খোকাকে মাটিতে শুইয়ে রেখে বারকোশটা তুলে নিল।

'খোকন, আমি যাই বাবা, ভুট্টা কিনে আনি। মাদুরগুলোর দিকে তুই নজর রাখিস সোনা, কেমন?'

জন্মের মতো খোকন তার চলে গেল। মা জানে। খোকন তাকে মুক্তি দিয়ে গেল।

মুক্তি? না না! মা ডুকরে উঠল। এই জানাটা তার মিথ্যে! মিথ্যে! বাছা আমার বেঁচে আছে। মানিক আমার ঘুমিয়ে পড়েছে। ফিরে এসে দেখব সোনা আমার জেগে উঠেছে। আবার খোকন আমার দিকে তাকাবে, আবার খোকন খেতে চাইবে।

কিন্তু ফিরে যখন এল খোকন আর তাকাল না। আর খেতে চাইল না। আর কাশল না।

নিঃশব্দে মা বাকি মাদুরগুলি এক-এক করে গুছিয়ে নিয়ে বেঁধে ফেলল। ছেলেকে পিঠে নিয়ে শক্ত করে চাদর দিয়ে জড়াল। হাওয়াটা যে ওর পক্ষে ভালো নয়!

খেয়াঘাটে পৌঁছে দেখল সবাই এসে গেছে।

‘এত দেরি?’

‘ভুট্টা কিনতে গিয়ে—’

‘ছেলে কেমন আছে?’

‘ঘুমোচ্ছে। কী লক্ষ্মী হয়ে ছিল! একটুও বায়না করে নি। ঘুমের চোখেই খেয়েছে—’

‘খুব ভালো। তবু কাল ওকে একবার ওঝার কাছে নিয়ে যাস বাপু।’

‘যাব!’

সুয্যিঠাকুর অস্তাচলে। সারা দিনমান সমুদ্রে শিকারশেষে গাংচিলের দল বাসায় ফিরছে। ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে। পাল ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। দাঁড় বাইবার দরকার নেই, তর তর করে নৌকো এগিয়ে চলল।

‘বেচাকেনা কেমন হল?’

‘হল! খোরাকিটা কিনতে পেরেছি।’

‘বাঃ!’

অনুবাদ: শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

JUGOSLAVIA : GRANDFATHER AND THE BIRDS *by* JARA RIBNIKAR

ঠাকুরদা ও পাখিরা

জারা রিবনিকার

যুগোস্লাভিয়া

আমরা সকলে পাখি ভালোবাসতাম। আমার মা সোয়ালো পাখিদের আসা নিয়ে গান গাইত। শীতকালে সে-গানে কী আকুলতা! শরতে তার কণ্ঠে অশ্রুভার। আর বসন্তে তার গলায় সুর বেজে উঠত যেন জলের মসৃণ ভরাট শব্দ। আমাদের ঠাকুরমা এক পড়শীর উপর একদিন তো রেগে আগুন। আমাদেরও তাতে পুরোপুরি সায় ছিল। সেই পড়শী ফাঁদ পেতে কয়েকটি চড়ুই ধরেছিল, সেগুলো রেঁধে খেয়েছিল। তাই নিয়ে সে আবার বড়াই করছিল। সেই বেচারাদের ছোট ছোট ডানা ও পা খেতে কত সুস্বাদু তারিয়ে তারিয়ে বলছিল। কিন্তু আমরা শুনতে চাই নি। বাগানে বসে গল্পটা আমাদের একবারই সে ফাঁকতালে শোনাতে পেরেছিল।

ঠাকুরদা দেখতে অনেকটা পাখির মতই ছিলেন। লম্বা আর রোগা, দুদিকের চোখের মাঝখানে ঈগল-নাক, হাত কাঁধ আর বুকের হাড় কেমন যেন বাঁকানো, মনে হয় ওসবের ভিতর থেকে উদ্ভট একটা শিকারী পাখির ডানা বেরিয়ে আসতে পারে। হ্যাঁ, ঠাকুরদাই আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পাখি ভালোবাসতেন। তাঁর ঘরে বাসিন্দা পাখির সংখ্যা ছিল প্রায় পঞ্চাশ। তাদের কেউ ছাড়া, কেউ-বা খাঁচায় বন্দী। আজ পর্যন্ত আমি বুঝে উঠতে

পারি নি জলজ্যান্ত এতগুলো প্রাণী যখন তাঁর মুখ চেয়ে ছিল তখন তিনি কী করে মরে যেতে পারলেন! তাঁর ঘরে পঞ্চাশটি পাখির প্রাণ তাঁর জন্ত স্পন্দিত হচ্ছিল। এবং যখন তাঁর মৃতদেহ ভিতরে আনা হল তখনো। ঝোপের চড়ুই আর ব্ল্যাকবার্ডেরা আনন্দে গান গাইছিল। ক্যানারির গলায় অবিশ্রাম স্বরধ্বনি; সে গান যেন পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে-পড়া জলের শব্দ। থ্রাশ চুপ করেই ছিল। ওর চোখে আর চঞ্চলতায় সব সময় আনন্দ। ওর শান্ত শিসে তা নয়।

আমি আমার মায়ের মৃত্যুর ব্যাপারটা কখনো মেলাতে পারব না। সোয়ালোরা এসেছে বলে ঠিক যে-সময়ে ভরা গলায় আর খুশিমনে তার গান গাওয়ার কথা ঠিক সেই সময়ে, সেই বসন্তে মা মারা গেল। তার গানের সূক্ষ্ম সুরের আকুলতা, দুঃখ আর আনন্দ আবাল্য আমার সঙ্গী। হঠাৎ-ই সে-বন্ধন ছিঁড়ে যেতে পারে না। মা যখন আমাকে ছেড়ে চলে গেল আমি খুবই ছোট—মাত্র এগার বছর বয়েস। তাই বোধহয় এখনো আমি বুঝে উঠতে পারি না যে মা নেই। ঠিক সে সময়ে কেউ মরতে পারে ভাবাই যায় না।

আমার ভাই আমার বোন আর আমি, আমাদের সারাটা দিন আর সন্ধে ঠাকুরদার ঘরে কাটত, তাঁর কাছ থেকেই আমরা বিচারবুদ্ধি ও দক্ষতার প্রথম পাঠ নিয়েছিলাম। কেননা তিনি চেয়েছিলেন আমরা ন্যায়পরায়ণ হই। তিনি সেইসব মহিলার কথা বলতেন যারা ভালোবেসেছিল, সেইসব মানুষের কথা বলতেন যারা কঠিন অবস্থার ভিতর দিয়ে সুখের মুখ দেখেছিল তিনি বলতেন বীর হাইড্রুকদের গল্প। তারা গরীবদের রক্ষা করত। রাজকন্যাদের তারা জিতে নিয়েছিল। তিনি সেইসব নাইটের গল্পও করতেন যারা দারিদ্র্যপীড়িত সুন্দরী বন্দিনীদের মুক্ত করেছিল।

ঠাকুরদা ছিলেন থিয়েটার-পাগল মানুষ। বয়সকালে একবার মঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সেই গল্প কী আবেগ দিয়ে যে বলতেন কোনদিন ভুলব না। রঙ্গমঞ্চের পিছনে মোহময় পরিবেশে দুজনের দেখা। আমরা সে-ছবি তাঁর মত করেই আঁকতাম। যে নাইটের ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছিলেন আসলে তিনি তাতেই রূপান্তরিত হয়ে গেলেন। বললেন, 'আমাকে তোমার বিয়ে করতে হবে।' (কী জোর দিয়ে তিনি এসব কথা আমাদের সামনে বলতেন!) সেই পরিবেশে ঠাকুরদার সাজপোশাক, নকল

গোঁফজোড়া দেখে সেই মহিলাও অভিভূত। ঠাকুরদা বললেন যে মহিলা দারুণ ঘাবড়ে গেলেন এবং বিয়ে করলেন। রঙ্গমঞ্চের পিছনের সেই পাণ্ডুর মুখ আর আমাদের ঠাকুরমার ক্লান্ত বলি-অঙ্কিত মুখ আমরা মেলাতে পারি না। অবশ্য তারপর আমরা ভেবে দেখেছি যে এরকম একটা অভিজ্ঞতা তার জীবনে ঘটেও থাকতে পারে।

ক্যানারি বা নীল টিয়ার মত ভালো পাখিরা খাঁচায় এবং বাদবাকি নানা রকমের চড়ুই, রবিন, থ্রাস আর কালো কুচকুচে ব্ল্যাকবার্ড ছাড়া থাকত। ব্ল্যাকবার্ডেরা একটু উদ্ধত। প্রায়ই একেবারে ঠোঁট বুজে থাকত। যেন ওরা ভয়ানক অভিজাত। ঠাকুরদা রাত্তিরের খাওয়াটা থ্রাশের সঙ্গেই সারতেন। খুব ফুর্তিবাজ বলে থ্রাশই ঠাকুরদার সবচেয়ে প্রিয় ছিল। তিনি যা-কিছু দিতেন তাই খুঁটে খুঁটে খেত। মুখ দিয়ে একটা হাল্কা শিস্ বেরোত। কৃতজ্ঞতা। তারা বেকন খেত, অন্য কোন মাংস নয়। ঠাকুরদা পাখির মাংস খাওয়াটা অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। খুব রেগে বলতেন, 'পাখির মাংস মানুষকে আরো বেশি চঞ্চল করে।' সেজন্য শরৎকালে যখন সোয়ালো, সারস আর বুনো হাঁসের দল দক্ষিণের দিকে চলে যায় তখন আমাদের খুব মন খারাপ হয়।

মেয়েরা ঘর সাফ করতে চাইত না। পাখির গায়ের তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধে ঘরটাকে মনে হত চিড়িয়াখানা। সাবান আর বেগনি ফুলের গন্ধ-অলা লজেন্স ঠাকুরদার পকেটে থাকত। তিনি সেসব আমাদের দিতেন। আমার মনে হত তার সবটাই যেন আঠালো স্বচ্ছ মিষ্টি গন্ধে ভরা। একসময় ঠাকুরদা জুতোতৈরি শিখেছিলেন। আমাদের জ্ঞান হওয়া অবধি তাঁকে ও-কাজ করতে দেখি নি। তিনি তাঁর বাগান নিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন। বছরে একবার একটা শূয়োর মারতেন, তার মাংস বিক্রি করতেন, মশলাদার সসেজ বানাতেন। তাছাড়া তিনি তাঁর পাশে অন্য বাচ্চাদেরও জুটিয়ে নিতেন। তাঁর চারপাশে সর্বক্ষণই দশ-বারোজনের ভিড় লেগে থাকত। তিনি সব বাচ্চাকে সমান চোখে দেখতেন। আমার বোন গার্কার কথা অবশ্য আলাদা। গার্কাই ছিল তাঁর সবচেয়ে প্রিয়। তিনি ওকে এমন করে আদর করতেন যে দেখে আমার হিংসে হত। কিন্তু তাতে কিছু আসত যেত না। আমরা ধরে নিয়েছিলাম ও আমাদের চেয়ে উপরে। ওর প্রতি ঠাকুরদার অপার স্নেহই আমাদের মনে এ-বিশ্বাস তৈরি করেছিল।

পিট পিট করে চড়ুই ডাকত। ক্যানারি ডাকত, 'কালি, কালি, কালি, লীন, কালি, কালি, কালি, লীন'। ঘরের মধ্যে সবচেয়ে বিজ্ঞ টিয়া। কচিৎ কখনো সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ডেকে উঠত। আর সব পাখি তখন চুপ। কিন্তু সে ফিরে ডাকত না। এটাই তার বিজ্ঞতার প্রমাণ। ব্ল্যাকবার্ডই হাজারবার একই পুরনো গান গাইতে পারত। রাস্তায় খেলা করতে করতে ছেলেরা নকল করে অবিকল ওর মত গান গাইত। ফলে মনে হত ব্ল্যাকবার্ডই ছেলেদের কাছ থেকে গানটা শিখেছে। চড়ুইগুলো সব জায়গায়ই কিচিরমিচির করত। ওরা যেন সর্বক্ষণ খুশি, সর্বক্ষণ ক্ষুধার্ত এবং সর্বক্ষণই অন্যের খাবার থেকে এককণা চুরি করতে প্রস্তুত। কী রকম পাখি রে বাবা! মেয়েরা রেগে বলত—তোমরা হয়তো এমনও ভাবতে পার আমরা ওদের খাই। আসলে চড়ুই রাখার কোনো মানে হয় না। বাগানে তো এন্তার চড়ুই!

আমার ছেলেবেলায় গরমকালে কোনদিন অসহ্য গরম পড়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। আমরা মোরাভা নদীতে স্নান করতাম। জল ছিল গার্কার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ। ঠাকুরদা ওকেই প্রথম সাঁতার শিখিয়েছিলেন। সেটা এক রহস্য, অথবা বলা যেতে পারে ষড়যন্ত্র। যে-জায়গায় গিয়ে সাঁতার কাটতে হত ততদূর যাওয়াটা আমার মা-বাবা পছন্দ করতেন না। কিন্তু ঠাকুরদা ঠিক করেছেন সাঁতার আমাদের শেখাবেনই। কী করে ঘূর্ণিস্রোত কাটাতে হয় তাও শিখিয়ে দেবেন। যে সাঁতার জানে ঘূর্ণিস্রোতে তার ভয় কি? তিনি বলতেন, 'স্রোতের টানে যদি গিয়ে পড়, চিৎসাঁতার দাও তাহলেই পাক খেতে খেতে একসময় ছিটকে পড়বে।' সাঁতার কাটা আমার কাছে ভারি শক্ত মনে হত। যখনই বুঝতাম আমার পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে, ভীষণ ভয় করত। আজও সাঁতার কাটার সময় আমার ভয় করে। যখন ভাবি যে আমার পা আর তলার মাটির মধ্যে ব্যবধান কয়েক ফিটের, ভয় আমাকে জাপটে ধরে আর আমি রুদ্ধশ্বাসে সাঁতার কেটে কেটে তীরের দিকে ফিরে যাই। এরকম ভাবটা আমার প্লেনে চাপলেও হয়। সেজন্য প্লেনে চাপাটা আমি রাত্তিরেই পছন্দ করি। তখন মনে হয় আমি কোন বাসেই চেপেছি। প্লেনের শব্দ ও কাঁপুনি বাসের মতই। রাত্রিকালে কোন্‌দিকে ভেসে যাচ্ছি বোঝা যায় না। মনে হবে ঠিক যেন বাসে চেপে চলেছি।

আমাদের মধ্যে ছিল গার্কাই সবচেয়ে সাহসী। ঠাকুরদার সঙ্গে ও

ঘূর্ণিস্রোতে যেত। ছেলেরাও যেত। কিন্তু সবচেয়ে বেশিক্ষণ জলে থাকত গার্কা। কথনো কথনো ক্লান্ত কুকুরের মত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা জল থেকে উঠে আসত কেননা জল তাদের সমস্ত শক্তি চুষে নিয়েছে। তারপর তারা গরম মাটির উপর আড়াআড়িভাবে শুয়ে পড়ত। গার্কা ঠাকুরদার সঙ্গে জলে থাকত কারণ সে বেশ মোটাসোটা ছিল, জল তার হাড়ে সহজে শীত ঢোকাতে পারত না। অন্যদিকে নদীটাই ঠাকুরদার এত পোষা ছিল যে তাকে কিছুই করতে হত না। যখন তিনি দলের সবার শেষে তখনও মনে হত শুধু আমাদের জন্য তিনি জল থেকে উঠে এসেছেন।

আমরা ক্রমশ সহজ হয়ে উঠলাম। ছেলেরা ঝাঁপ দিতে লাগল। ঠাকুরদা আর গার্কা ডুবে যাওয়ার ভাণ করতে লাগল। তারা একে অপরকে জলের নিচে ঠেলত, তাতে যার গায়ে জোর কম সে নদীতে তলিয়ে যেত, তারপর জলের নিচে তার আঙুলগুলি মেলে ধরত—ডুবন্ত মানুষ যেন তৃণ আঁকড়ে ধরেছে।

সেই বিকেলে এ-ঘটনাই ঘটল। সূর্য অস্ত গেছে। আমার শীত লাগছিল। আমি যখন কাপড়-জামা পরছিলাম, ছেলেরা মাঠের মধ্যে ছুটোছুটি করছিল। ঠাকুরদা ও গার্কা তখনও জলে। ছোট ঘূর্ণিস্রোত আর ছোট ভাঙা ঢেউ তাদের চারপাশে। ওরা পাগলের মত খেলছিল। যেন দুজনে লড়াই করছে। জলের নিচে যখন ওরা হাত দিয়ে ঠেলাঠেলি করছিল, মনে হচ্ছিল অনেকটা জল গিলে ফেলেছে। আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। যখন ঠাকুরদার মস্ত হাত ওকে ধরে নদীর গভীর জায়গায় ছুঁড়ে দিল, গার্কার জিভ বেরিয়ে গিয়েছিল। এ খেলা চলল। গার্কা তখন ভীষণ চটে গেছে (আমি ওর হাবভাব ভালোরকম জানি)। সে উপরের দিকে এল, তার চোখের পাশে গোল নীল দাগ। আমার মনে হল গার্কার খেলা এবার শেষ। ছেলেরা লুকোচুরি খেলছিল আর আমি একা দাঁড়িয়েছিলাম, মুখে কোন কথা নেই, জলের এই খেলা দেখে যেন মোহাচ্ছন্ন, আমার মনে হচ্ছিল যে ওদের গায়ের জোর কমে আসছে, এবার ওরা জল থেকে উঠে আসবে। ওদের খুব সংযত মনে হল। ওদের মাথা পালা করে অদৃশ্য হতে লাগল, যেন ঢেঁকিকলে ওঠানামা খেলছে। একসময় তা বন্ধ হল। আমি জলের স্থির বৃত্তের দিকে, মোরাভার মসৃণ পিচ্ছল দেহের দিকে তাকালাম। আমি দেখলাম গার্কা হাত দিয়ে যেন জল খুঁড়ছে। তারপর সে মাথা নিচু করে কী যেন দেখল। ঠাকুরদা ওখানে নেই। ব্যাপারটা এমন হঠাৎ ঘটে গেল!

আমি 'গার্কা' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। ছেলেরা নদীর কাছে গিয়ে 'গার্কা' 'গার্কা' বলে ডাকতে লাগল। তারা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ল। গার্কা তখন পারের দিকে আসছে। সে শুধু তার জীবন নিয়ে পালিয়ে বাঁচল।

কিছুক্ষণ বাদে সেই জায়গা দিয়ে যাচ্ছিল এমন একজন লোকের সাহায্যে সেই বৃদ্ধের দেহ তোলা হল। সেই লোকটি জল বার করে ঠাকুরদার বুকের চাপ কমাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করল। কিন্তু ঠাকুরদা আমাদের মধ্যে নীল নিষ্প্রাণ হয়ে পড়ে রইলেন, লোকটিকে গার্কা বলতে চাইল, 'আমি ওঁর চুল ধরতে চেষ্টা করেছিলাম, সত্যি চেষ্টা করেছিলাম'। লোকটি হাত দিয়ে ওর ঠোঁট দুটো চেপে ধরল। সে বলল, 'কথা না বলে এখন বাড়ি চল।'

ছেলেরা কিছু জানতে পারল না, সেই লোকটিও না। কেউই না। আমি আর গার্কা, আমাদের মধ্যে যেন চুক্তি হয়েছে—সেই খেলা নিয়ে আর কোন কথাই আমরা বললাম না।

'এ-সর্বনাশ কী করে হল?' মা চেঁচিয়ে উঠল। মা তখনো বেঁচে।

না, ছেলেরা কিছুই জানতে পারে নি। ওরা আমাদের কাছে জানতে কিছু চায়ও নি।

'তুমি আগে কেন ডাক নি?'

'আমরা ডেকেছিলাম।'

বিছানায় শোয়ানো মৃতদেহের উপর পাখিরা বসেছিল।

ঠাকুরদা কী করে মারা গেলেন সেকথা কাউকে আমি বলি নি। ঠাকুরদার পরে, মা যদি অত শিগ্‌গির না মারা যেত তাহলে হয়তো সমস্ত গল্পটা তাকে একদিন আমি বলতাম।

অনুবাদ : চিত্ত ঘোষ

মেয়েটা

প্যাভেল ভেঝিনভ

দুপুরে খেতে এসে দেখলাম আমার ভাইঝি রোজা আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। কেন জানি না এই অখাদ্য মেয়েটা সম্পর্কে আমার একটু দুর্বলতাই আছে, যদিও ও-কথা বলারও যুগ্যি নয়। অতিশয় উদ্ধত, তার উপর পোশাক-আশাক এমন করে যা আর কহতব্য নয়।

এখন ওর পরনে কালো ব্লাউজ আর হলদে স্কার্ট। স্কার্টটা কোনোরকমে হাঁটুর উপর অব্দি নেমেছে। আর পায়ের মোজা জোড়া হচ্ছে সেই ধরনের, যা টেনেটুনে ইজেরের কাজও চালিয়ে দেওয়া যায়।

ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই গোটাদশেক সিগারেট সাবাড় করেছে। আমার পড়বার ঘরটা ধোঁয়ায় অন্ধকার। ঘরে ঢুকতেই বিশ্রি একটা গন্ধ নাকে এসে লাগল। জানালার কাছে পৌঁছবার আগে আমি প্রায় কেসেই ফেললাম। উল্টো দিকের বাড়ির ছাতে টেলিভিশনের এরিয়েল হাতে এক ছোকরা রাস্তার উপর ঝুলছিল ঠিক বাঁদরের মতো। দেখে ভয়ে আমার পেটের মধ্যে গুলিয়ে উঠল। মুখ ফেরাতেই দেখি আমার ইজিচেয়ারে ˋগ্যাট হয়ে বসে রোজা আর একটা সিগারেট ধরিয়েছে। বাঁ পাটা কুঁচকি পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। মেয়েটার বেহায়াপনায় আমি চিরকালই বিব্রত বোধ করি। বিনা কারণে

মেয়েটা আসে নি নিশ্চয়ই। চোখদুটো লাল, হলদে স্কার্টটা দোমড়ান-কোঁচকান।

"স্কার্ট টেনে ঠিক হয়ে বোস।" আমি ধমক লাগালাম। "কী সিগারেট ওটা ?"

"ফরাসী", হেলাভরে উত্তর দিল ও।

"তাই অমন দুর্গন্ধ।"

কোনো উত্তর নেই। শুনতেই পেয়েছে কিনা কে জানে। মুখটা ফ্যাকাশে মতো, বাঁকানো ঠোঁটদুটো একটু নীলচে। হার্টের অসুখ জানি, কিন্তু মনটা এমন খিঁচড়ে আছে কেন ? আমার ঘাড়ের পাশ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছিল, সম্ভবত ছাদের উপর ঝুলন্ত ঐ গাধাটার দিকেই নজর। মুখ ভাবলেশহীন, চোখদুটো শুধু জ্বরো রোগীর মতো জ্বলছিল। তবু মানতেই হয় এই ভয়ংকর মেয়েটা সুন্দরী। তবে কোন দিক দিয়ে বলতে পারব না। ঠিক এই সময় আমার চোখে পড়ল, ওর গালে লম্বা একটা দাগ। কেউ যেন চাবুক দিয়ে মেরেছে।

ওর উল্টো দিকে বসে জিজ্ঞাসা করলাম, "এবারে আবার কী লংকাকাণ্ড ঘটালি ?"

"ওরকমভাবে ঝুলতে হলে আমি কিন্তু ধরে থাকতে পারতাম না, ছেড়ে দিতাম।"

ওর গলার স্বর শান্ত। আমার পেটের মধ্যে আবার গুলিয়ে উঠল, বমি বমি ভাব হল।

"ঝুলুকগে, ওদিকে তাকাতে হবে না," বাধা দিয়ে বললাম। "বলি, আমার কথাটা কি কানে গিয়েছে ?"

"ছাগলটা আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে কাকু," শান্তভাবে বলল ও।

"ছাগলটা ?"

"মিট্‌কো।"

এমন ঘটনা ওর সম্বন্ধে অবশ্য প্রত্যাশিত। রোজার আগের স্বামীও ওকে তাড়িয়ে দিয়েছিল, যদিও ছেলেটা খুবই শ্রদ্ধা করত ওর বাপকে। যাসব কাণ্ড করে, চব্বিশ বছরের একটা মেয়ের পক্ষে তা আজব ব্যাপারই বটে।

"তাড়িয়ে দিল কেন ? কি করেছিলি ?" রুষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

"কিচ্ছু না।"

"কিচ্ছু না মানে? তুমি কিচ্ছু কর নি আর এমনি এমনি তোমায় তাড়িয়ে দিলে?"

"দিল তো। বলল, আমি নাকি ইয়ে করছিলাম, বলে সবার সামনে আমায় চড় মারল।"

এই বলে মেয়েটা তার গাল দেখাল। চড়ের দাগ আমি আরও দেখেছি, এ-দাগ অন্য ধরনের।

"চড়ে কখনও ওরকম দাগ হয় না।"

"হয়েছে, এটা ওর আঙটির দাগ—ওর বুদ্ধ্ মা ওটা দিয়েছিল আমাদের বিয়ের সময়।"

"ব্যাপারটা ঘটল কোথায়?"

"নাইট ক্লাবে।"

"নাইট ক্লাবে? কতবার তোকে বলেছি না ওসব জায়গায় যাস নি?" আমি রেগে গেলাম। "কি করেছিলি ওখানে?"

"কিচ্ছু না···আমি শুধু লোকটার সঙ্গে নেচেছিলাম···সিরিয়ানটার সঙ্গে। পরে একটু বেরিয়েছিলাম ওর সঙ্গে। তারপর ওকে বলেছিলাম মেয়েদের ঘরে পৌঁছে দিতে। ছোট্ট সিঁড়িটার সামনে মিট্‌কো এসে আমাদের ধরে ফেলল—"

"কী?"

"বললাম তো!" গলা চড়িয়ে জবাব দিল।

"লজ্জা করে না তোমার, এভাবে লোক হাসাতে!"

"দোষ তো ওর," একগুঁয়ের মতো বলল। "ওই সিরিয়ানটার আমি থোড়াই কেয়ার করি।"

"থোড়াই কেয়ার কর, কিন্তু তবু এই সিগারেট তো নিয়েছ তার কাছ থেকে!"

"ভারি তো সম্পত্তি!" ভ্রূকুটি করে রোজা।

"তোমার বাবার স্মৃতিকে অপমান—ভেবেছ কী! দাদা যদি না ফাঁসিতে ঝুলত—তুমি হতে মস্ত বড় একটা গোল্লা—বুঝলে?"

"তুমিও তাই হতে—মস্ত বড় একটা গোল্লাই হতে।" তিক্তস্বরে বলল। মিও বাবার নাম ভাঙিয়েই খাও।"

বেশ বুঝতে পারি কেন লোকে ওকে চড় মারে, আর কেনই বা স্বামীরা করে ছুঁড়িকে। যাক্ গে, যা হয় হোক ওর! আমি উঠে জানালায়

কাছে যাই। ও-ছাদের সেই ছোকরার এরিয়েল টাঙানো সারা। ছাদের চিমনি দুটোর মাঝখানে ছোকরা তখন পাইচারি করছে, যেন ওটা ওর ঘর।

আজকালকার এই ছেলেমেয়েদের মতিগতি বোঝা ভার। মগজে ওদের বিন্দুমাত্র বুদ্ধি আছে বলে মনে হয় না। যদি ছিঁটেফোঁটাও থাকত তাহলে আমার এই অকর্মার ধাড়ি ভাইঝিটা কী এত হাল্কাভাবে এসব কথা বলত! মরুক গে ছাই, আমার কি! রাস্তায় খাবারের দোকানটার সামনে একটা লরি এসে থামল। দুটো লোক লরি থেকে কাঠের বাক্সগুলো নামাচ্ছে। রাস্তার উপর দিয়ে ঘস্‌টে নেবার সময় বাক্সের লেমনেডের শিশিগুলো ঝমঝম করে উঠল। মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হলে ওর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলাম :

"মাকে বলেছ?"

"না..."

"কেন না?"

"মা তো একটা বুদ্ধু!"

"আমার সম্পর্কেও তুমি নিশ্চয়ই ওরকম কথা বলে থাক।"

"আর যাই হোক, মানুষটা তুমি ভালো কাকু।"

"আমি যদি ভালোমানুষই হই, তো আমার কাছে তুই এসেছিস কেন?"

ওর বাঁকা ঠোঁট সোজা হল, থমথমে চোখে হাসির ঝিলিক দেখা দিল একটু।

"শোনো কাকু, পেটিয়োর ঘরটাতে আমাকে থাকতে দিতে হবে। মানে ও যতদিন না আসে...এর মধ্যে আমি একটা ঘর খুঁজে নেব।"

ঘরটা ফাঁকা পড়ে আছে। আমার ছেলে আপিসের কাজে তিনমাসের জন্যে বাইরে গেছে। কিন্তু সেটা কোনো সমস্যা নয়।

"ব্যাপারটা কি এতই গুরুতর? মিটিয়ে নেওয়া যায় না?"

"যায়ও যদি, ততদিন তো কোথাও আমাকে ঘুমোতে হবে, না কি?"

"মায়ের কাছে যা না। আমি তোকে থাকতে দিলে তোর মা রাগ করবে না?"

"ওই বিচ্ছুটাকে দুচোখে দেখতে পারি না আমি।"

হেসে ফেললাম। কথাটা মিথ্যে বলে নি। আমার ভাজ রুচি না হোক, স্বামীর প্রতি আর একটু শ্রদ্ধা অন্তত দেখাতে পারত। কী জবাব দেব ভাবছি, টেলিফোন বেজে উঠল। ও-পাশের গলাটা চেনাচেনা।

"কথা বলছি। আপনি কে?"

"ডিমিটার।"

"কোন ডিমিটার?"

হঠাৎ চোখে পড়ল রোজা হাত নেড়ে প্রাণপণে বোঝাবার চেষ্টা করছে, সে এখানে নেই।

"কে মিট্‌কো নাকি?"

এবারে বোধগম্য হয় আমার।

"হ্যাঁ আমি, রোজা আছে নাকি ওখানে?"

"না তো।" মিথ্যে কথাই বললাম। "কিন্তু ব্যাপারটা আমি সব শুনেছি··· একবার আসতে পার এখানে। এখুনি আসছ?···সেই ভালো। আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করব।"

ফোন রাখতেই দেখি ভাইঝির মুখ ব্যাজার।

"অপরের ব্যাপারে নাক না গলালেই ভালো করতে কাকু। আমি কী করছি, আমি তা জানি। ও এখানে এসে মাপ চাইবে আর আমি সুড়সুড় করে ওর সঙ্গে যাব—অত সহজ নয়। কিছুদিন তো ঘোরাঘুরি করুক—"

"যদি না করে?"

"চুলোয় যাক তাহলে।"

"ঘটে তোমার একরত্তিও বুদ্ধি নেই।" ধমক দিয়ে বললাম। "চল এখন, খেয়ে নেওয়া যাক, পরে কথা হবে।"

রান্নাঘরে টেবিলে ততক্ষণে খাবার সাজিয়ে ফেলেছেন আমার স্ত্রী। আমাদের দেখে একটু হাসলেন। আমাদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে তা আঁচ করতে পেরেছেন। আমার ড্রাইভার বার্লিন রেস্তরাঁ থেকে যে দু-বোতল বিয়ার এনেছে, ঠাণ্ডা হবার জন্য তা সিংকের মধ্যে ভেজানো। স্টু বা রোস্টের সঙ্গে আমার স্ত্রীর বিয়ার পছন্দ। এতসব ঝুট-ঝামেলার পর বেশ ভালো একটা লাঞ্চ নিশ্চয়ই উপাদেয়। কিন্তু হাত-মুখ ধুই কোথায়? মুখ ফেরাতেই দেখি স্ত্রী উড়নচণ্ডী ভাইঝির হাতে খেলাচ্ছলে চিম্‌টি কাটলেন, মুখে একগাল হাসি। রোজাও হাসছে ধূর্ত সাগরেদের মতো। দুজনে মিলে কোন ষড় করছে নাকি? তা অবশ্য সম্পূর্ণ অভাবনীয়। এই চুলে পাক-ধরা মহিলা কখনও কোনো সিরিয়ান বা বুলগেরিয়ানের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করেন নি, চোখের পাতায় কোনোদিন

নকল পিছি লাগান নি, দুর্গন্ধ বিদেশী সিগারেটও উপহার দেন নি সেজন্য তাঁকে চড়ও কখনো খেতে হয় নি।

"হাত মুখ ধুই কোথায় ?"

স্ত্রী বোতলগুলি সরিয়ে নিলেন, তারপর প্লেটে সুপ ঢালতে লাগলেন হাতা দিয়ে। আমার ধারণা আমার গিন্নির থেকে ভালো চিকেন সুপ আর কেউ রাঁধতে পারে না। ওর চিকেন সুপে অন্তত দু-টুকরো পাকস্থলী আর তিন-টুকরো মেটে থাকবেই। পরিবেশনেও ওস্তাদ, যদিও তার নিজের ভাগে সর্বদাই কম পড়ে। নিমেষের জন্য বিবেকের দংশন অনুভব করলাম। পরের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি না তো ? সে হতভাগা ছোকরা অবশ্য জীবনে এরকম সুপ খেতে পাবে না। চিরকালই ওর মেজাজ খারাপ থাকবে, চিরকালই পেটাতে হবে আমার ভাইঝিকে, যদিও তাতে কোনো ফল হবে না। এই ছাখ, খেতে বসতে না বসতেই বিয়ারের গেলাসে চুমুক লাগিয়ে এক চুমুকেই গেলাস সাফ করে দিয়েছে পুরুষমানুষের মতো। কোন দেশী মেয়ে রে বাবা!

"খাবার আগেই বিয়ার দিয়ে পেট ভর্তি করো না।" স্ত্রী ওকে বকুনি দিলেন।

"আমার গলাটা কী রকম করছে যদি জানতেন!" বোতলে চোখ রেখে রোজা জবাব দিল।

"কী ছাইপাশ গিলেছিলে কাল রাত্তিরে ?" স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন।

"কী করে জানব। সিরিয়ানটা মনে হয় একবার স্কচের অর্ডার দিয়েছিল।"

"এই না বললে, তোমরা এক টেবিলে ছিলে না ?" স্ত্রী সন্দেহভরা চোখে তাকালেন।

কিন্তু জবাব দিতে দায় পড়েছে রোজার। সে তখন রাক্ষসের মতো সুপ গিলছে।

হাঁড়ি কাবাবটাও হয়েছে খাসা: বাছুরের মাংস মাখন, রসুন আর নানান মশলা দিয়ে রাঁধা। মিষ্টান্ন খাবার সময় পাওয়া গেল না—কে যেন দরজায় ঘণ্টা বাজাচ্ছে ব্যস্তভাবে। রোজা দরজার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুটি করল।

"আমি কিন্তু নেই, কাকু।"

আমাকেই উঠতে হল, যদিও মন পড়ে রইল টেবিলেই।

রোজার বর দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে। পরনে হাল্‌কা রঙের খাটো বর্ষাতি, হাতদুটো পকেটের মধ্যে। চোখে-মুখে ক্লান্তি আর বিপর্যয়ের ছাপ। কিন্তু

তা সত্ত্বেও তার জামা-কাপড় রোজার মতো দোমড়ান-কোঁচকান নয়, চমৎকার ইস্তিরি করা ট্রাউজার্সে একটিমাত্র ক্রিজের দাগ। বলা বাহুল্য, আমি ওকে সোজা নিয়ে গেলাম আমার পড়বার ঘরে। ও ধপাস করে ইজিচেয়ারটার উপর বসে পড়ল, কিছুক্ষণ আগেই যেখানে ওর সহধর্মিণী অধিষ্ঠান করেছিলেন।

"রোজা আমাকে সব বলেছে," আমিই শুরু করলাম, "কিন্তু তোমার কথাটাও আমি শুনতে চাই।"

"রোজা কী বলেছে? ক্লান্ত স্বরে জিজ্ঞাসা করল।

"মানে···তুমি তাকে সবার সামনে মেরেছ!"

"শুধু এই?"

"না, মানে···সিরিয়ানটার কথাও বলেছে, ওর সঙ্গে একটু ফষ্টিনষ্টি করেছিল সে-কথাও।"

ছেলেটা অপলক আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

"ফষ্টিনষ্টি?" তিক্তস্বরে বলল, "নাচের ফ্লোরে চুমু খাচ্ছিল ওরা। একে ফষ্টিনষ্টি বলবেন?"

"খুব খারাপ। খুব খারাপ। আমি—"

"লোকটা তারপর ওকে বাইরে নিয়ে যায়। আমি গিয়ে ওদের ধরি, ওকে ফিরে আসতে বলি। কিন্তু ও শুধু হাসে। আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে ও পালিয়ে যায়···কোটটা নেওয়ার জন্যেও থামে না··· বাড়ি এল সকালবেলা···রাতভর কোথায় ছিল কে জানে! লোকে যাতা ভাবতে পারে···"

খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল। কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল। মুখটা ওর ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে একেবারে।

"খুব খারাপ।" আমি আবার বললাম।

ও যা বলল তা যে সত্যি তাতে সন্দেহ নেই। ব্যাপারটা ওকে নাড়া দিয়েছে। হঠাৎ ওর জন্য আমার কষ্ট হল। অনেকদিন কারো জন্যে যা হয় নি।

"এখন আমি কী করি কাকাবাবু?" অসহায়ের মতো জিজ্ঞাসা করল। "আপনিই বলুন, আমার অবস্থায় পড়লে আপনি কী করতেন?"

এই প্রথম ডিমিটার আমাকে 'কাকাবাবু' বলে সম্বোধন করল। কী কর্তব্য সত্যিই ও জানে না, বুঝতে পারলাম। কিন্তু আমি ওকে কী বলব? এতবড় একটা দায়িত্ব নেবার কোনো অধিকার আমার আছে? আমি চেয়ার

ছেড়ে ঘরের অপর প্রান্তে জানালাটার ব　উঠে গেলাম। দুটো কবুতর বসেছিল জানালায়। ডানা ঝটপট করে উড়ে গেল।

"জিজ্ঞেস করছ আমি কী করতাম···বিশ্বাস কর, তুমি যা করতে তার চেয়ে শতগুণে খারাপ কিছুই হয়তো করতাম! কিন্তু সেটা তো প্রশ্ন নয়—"

"প্রশ্নটা তবে কি?"

"কী করে বলব। আমাকে জিজ্ঞেস করাই হয়তো তোমার উচিত হয় নি। আমি বুড়ো, সেকেলে মানুষ, আমাদের কি মাথার ঠিক আছে। কিন্তু তোমরা হচ্ছ এ-যুগের ছেলে; তোমাদের অন্যভাবে বাঁচতে হবে।"

এইবার ও মাথা তুলল, চোখে দেখলাম মনোযোগ।

"কথাটা হচ্ছে মানুষকে বাঁচতে হবে, যেমন করে হোক। আমরা অ্যাটম বোমা দিয়ে খুনোখুনি করতে পারি না। মানুষকে পরস্পরের মধ্যে সেতু নির্মাণের চেষ্টা করে যেতে হবে। আর যদি কিছু নাও হয় তারা যেন পরস্পরকে বুঝতে পারে। আমার কি মনে হয় জান—রোজাকে তুমি ঠিকমতো বুঝতে পার নি, তোমাদের ভুল বোঝাবুঝির সেইটেই কারণ।"

"ওকে ঠিকমতো বুঝতে পারি নি!"

"সবকিছু সত্ত্বেও আমি জানি, আসলে মেয়েটা সত্যিই খারাপ নয়। কিন্তু ওর চরিত্রটা একটু অদ্ভুত, একটু খাপছাড়া গোছের। মর্বিডই হয়তো বলা যায়। ভেবে দেখ···এছাড়া আর কিইবা হতে পারে! ভেবে দেখ··· এমন একজনের মেয়ে ও যার ফাঁসি হয়েছে। এটা ওর পক্ষে যেমন একটা নিদারুণ ব্যাপার, যাদের সঙ্গে ওকে বাস করতে হয় তাদের পক্ষেও তাই। এইজন্যেই ওর চরিত্রটা জটিল হয়ে গেছে। সব সময় ও ধাক্কা খাচ্ছে, সরে যাচ্ছে, বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। অনেক কিছুর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে ওকে। তাই বলছি, আমার মনে হয়, ওর সম্পর্কে আর একটু ধৈর্যশীল হতে হবে তোমাকে।"

এইভাবে আরও প্রায় মিনিট দশেক লেকচার দিলাম। ওর মুখের মেঘ কিছুটা যেন কেটে যাচ্ছিল কিন্তু যেই আমি চুপ করলাম ওর চোখের আলোও যেন নিভে গেল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নরমভাবে বলল:

"বাড়ি ফিরে আসুক। ওকে বলুন—"

"বলব, নিশ্চয় বলব।" সোৎসাহে বললাম। "কী বলব তাও ঠিক করে ফেলেছি।"

"বাড়ি ফিরে আসুক।" পুনরুক্তি করল।

কিছুক্ষণ পরে ওকে বিদায় দিয়ে সোজা চলে এলাম রান্নাঘরে। হলুদে স্কার্টটা খুলে নিয়ে রোজা একান্ত মনোযোগের সঙ্গে সেটা ইস্তিরি করছে, জিভটা দুই ঠোঁটের মধ্যে চাপা। ওর লালচে সেমিজটা এমন বিতিকিচ্ছি রকমের পাতলা যে কোন দিকে দিকে তাকাব বুঝে উঠতে পারি না। ওকে দেখে মনে হল দিনদুনিয়া সম্পর্কে নির্বিকার। আর এদিকে আমি কিনা ওর জন্যে এতক্ষণ পাশের ঘরে ঘেমে নেয়ে সারা হচ্ছিলাম।

"তুমি আমার কাছে মিছে কথা বললে কেন," আমি রাগতভাবে বললাম। "তুই তো ঐ লোকটাকে ইয়ে খাচ্ছিলি···"

"হতে পারে," মুখ ছুঁচলো করে বলল, "আমার নেশা হয়ে গিয়েছিল—"

"নেশা হয়ে গিয়েছিল! আমি কোনো কথা শুনতে চাই না, তুমি এখুনি বাড়ি ফিরে যাও। এখুনি।"

"যদি না যাই।" ও শান্তভাবে হাসতে চাইল।

"যেতেই হবে," চিৎকার করে বললাম, "নইলে আমার সঙ্গেই তোমার একহাত হয়ে যাবে।"

ও মুখ বেকিয়ে হাসল; "তুমি কি মনে কর ও একটা পুরুষমানুষ?"

"নিশ্চয়ই। কিন্তু তুমি—তুমি—তুমি একটা গাধা!"

এই ধরনের অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ আলোচনার পর রাগে কাঁপতে কাঁপতে রান্নাঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে যাওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর রইল না। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে আমি আবার ডিমিটরের জন্য দুঃখ বোধ করলাম। আমি ওকে কথা দিয়েছিলাম শান্তভাবে রোজাকে বিষয়টা বুঝিয়ে বলব, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না।

ভাগ্যক্রমে ডোবরি আমার জন্য গাড়ি নিয়েই অপেক্ষা করছিল। উল্টো দিকের দোকানের মেয়েটাকে অলসভাবে দেখছিল ও। আমার ধারণা ওতে কোনো ফল হবে না। ওর ঘাড়ের বিশ্রী গোটাগুলি কেউ সারাতে পারবে বলে মনে হয় না। বিশেষ করে এই সময়ে যখন প্রকৃতিতে নতুন জীবনের সঞ্চার হয়, গোটাগুলি আরও বেড়ে গেছে। সুতরাং ওর পেছনে বাসাটা খুব একটা প্রীতিকর নয়, বিশেষ করে মেজাজ যদি খারাপ থাকে। আমি ডানদিকে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এতদিনে ডোবরি মনস্থির করেছে বিয়ে করবে। ভালোই করেছে বলতে হবে।

"তবে রবিবারেই হচ্ছে শুভকাজ?" গাড়ি চলতে শুরু করলে আমি বললাম।

"এখন আর পেছোবার উপায় নেই।" ও দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

আমি বললাম, "একটা মজা দেখেছ, মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেবার পর থেকে তাদের মধ্যে বিয়ে করার আগ্রহ বেড়ে গেছে।"

"হুম!"

"বলতে পার এর কারণ কি?"

"জানি না কমরেড ডিরেকটর—হয়তো কাজ করতে চায় না বলে।"

"আলসেমির কথা তুমি অন্তত বল না।" আমি ওকে থামিয়ে দেই।

আপিসে পৌছতে রোজকার থেকে আধঘণ্টা দেরি হল। তবে ভরসার কথা, এইদিন কাজ বেশি থাকে না, মন্ত্রিদপ্তর থেকে ডাক নিশ্চয়ই পড়ে নি। একটি তরুণী, চেনা-চেনা মনে হল, আমার সেক্রেটারির ঘরে অপেক্ষা করছিল আমারই জন্যে। তার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। এক কোণে সে বসেছিল। চুলগুলো পেছনের দিকে টেনে আঁচড়ানো। হাতে দলা-করা রুমাল। রুমালটা দেখে আমি ভয় পেলাম। এই রুমাল হাতে করে অনেকবারই অনেক মহিলা আমার আপিসে এসেছেন আর প্রত্যেকবারই সাক্ষাৎকার শেষের আগে রুমালের কিছু অপ্রীতিকর ব্যবহার হয়েছে। আমার সেক্রেটারি আমেলিয়ার কালো একমাথা চুলেও কেমন একটা উদ্বেগের হাওয়া। যখন দূরে কোনো বিড়াল বেড়ার উপর দিয়ে ঝাঁপ দেয় তখন হয়তো কুকুর এইভাবেই তাকায়।

"কেউ আমার খোঁজ করেছিল?" জিজ্ঞেস করলাম।

"কেউ না," সে বলল। "তবে কমরেড মিহাইলোভা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছে।"

মিহাইলোভা? কে যেন মিহাইলোভা? আমেলিয়ার কথা শুনে মনে হচ্ছে নিশ্চয়ই এমন কেউ যাকে আমি চিনি। না, ইদানীং দেখছি আমার স্মৃতিভ্রংশ ঘটছে। কিংবা হয়তো কালকের সন্ধের পার্টিতে দু-এক পাত্র বেশি হয়ে গিয়েছিল।

"ভিতরে পাঠিয়ে দাও।"

আপিসের মধ্যে ঢুকতে ঢুকতে সব ব্যাপারটা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম এর চেয়ে অপ্রীতিকর আর কোনো সাক্ষাৎকার হতে পারে না। এ নিশ্চয়ই সেই মিহাইলোভাই। ও যখন ঢুকল তার আগেই আমি টেবিলে গিয়ে বসেছি। আমার মুখের অবস্থা নিশ্চয়ই খুব ভয়াবহ দেখাচ্ছিল, কেননা ঘরে ঢুকে মাত্র দুপা এগিয়ে আমার থেকে সবচেয়ে দূরে

অবস্থিত চেয়ারটাতে ধপ করে বসে পড়ল। দূরত্ব কমাবার আগ্রহ আমার দিক থেকে ছিল না। ঐখানেই বসে থাক ও।

মনে হল মহিলা যেন বড় বেশি ব্যাকুল। সেকেণ্ড কয়েকের মধ্যেই তার উদ্বেগের ভাবটার স্থান নিল চরম হতাশা। ঠিক এই সময়ই আমার চোখে পড়ল ও সুন্দর চোখদুটিতে একই সঙ্গে ভীরুতার এবং দৃঢ়তার ছাপ। নাকটা ছোট এবং সুন্দর, নাসারন্ধ্র যেন সূক্ষ্ম বাটালির কাজ। উত্তেজনায় কাঁপছে। মন্ত্রিদপ্তরে দীর্ঘ একঘেয়ে অধিবেশনের চেয়েও এই ধরনের সাক্ষাৎকার অনেক বেশি ধৈর্যচ্যুতিকর। কিন্তু এর থেকে পার পাবারও উপায় নেই।···

"তোমার জন্যে কী করতে পারি ?" আমিই নিস্তব্ধতা ভাঙলাম।

হঠাৎ জবাব দিতে পারল না মেয়েটি। ওর মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

"কমরেড ডিরেক্টর," খানিক পরে বলল, "আপনি আমার বরখাস্তের আদেশ সই করেছেন। দয়া করে অন্তত বলুন, আমি কী দোষ করলাম।"

"আদেশে তা স্পষ্টই লেখা আছে," আমি শুষ্ককণ্ঠে বললাম, "আপিসের স্বার্থে।"

"ওটা কোনো কারণ নয় কমরেড ডিরেকটর," নিচু গলায় বলল মেয়েটি, "আপনি ভালো করেই জানেন আপিসের কাজ আমার ত্রুটিহীন।"

"আপিসের কাজ সম্পর্কে সে-কথা সত্য হতে পারে কিন্তু আপিসের বাইরের কাজ সম্পর্কে তা বলা যায় না।" আমি রাগতভাবে বললাম। "আর এ-নিয়ে কথা বাড়াবার আর কী আছে। তোমার বিরুদ্ধে আমার কোনো ব্যক্তিগত অভিযোগ নেই, কিন্তু তুমি সারা আপিসের মনোবল নষ্ট করবে তাতো আমি হতে দিতে পারি না। এমনকি এখনও তুমি তোমার এক সহকর্মীর ঘর ভাঙবার চেষ্টা করছ। সত্যি নয় কি ?"

"না, বরং সেই আমার ঘর ভেঙেছে।" আটকে-আসা গলায় মেয়েটি বলল। "আমাকে দিয়ে ডিভোর্সের দরখাস্ত করাল। ডিভোর্স আমি পেলামও। কিন্তু যখন ওর পালা এল···ও ভয় পেয়ে গেল·· কিংবা···"

"কিংবা কি ?" আমি দুর্বলভাবে বাধা দিলাম, "কিংবা হয়তো ওর বিবেক এবং দায়িত্ববোধ জেগে উঠল···ওর স্ত্রী, দুই সন্তানের প্রতি দায়িত্ববোধ। আগে হয়তো তাদের কথা ওর মনে হয় নি। নাগরিক হিসাবে সমাজের

নৈতিক বনিয়াদ সম্পর্কে ওর অনুভূতি হয়তো মুখর হয়ে উঠল। এই কথাটা বোঝবার চেষ্টা না করে তুমি তাকে আকড়ে ধরে থাকতে চাইছ। আর সারা আপিস তোমাদের এই ব্যাপার নিয়ে মুখর হয়ে উঠেছে—কাজকর্ম সব উঠেছে ডকে। কথাটা এমনকি মন্ত্রিদপ্তরের লোকেদের কানেও উঠেছে। তারা আমাকে ডেকে বলেছে। তুমি কি মনে কর আমি অনন্তকাল ধরে এ-সব সহ্য করব? তোমাকে তো বলা হয়েছিল, নিজে থেকে তুমি কাজে ইস্তফা দিলে না কেন?"

"কারণ আমি নির্দোষ।" সে বলল।

"নির্দোষ," আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, "যা বলছ নিজে তুমি তা বিশ্বাস কর?"

"করি। কারণ আমার মনে কোনো পাপ নেই, আমি তার ইচ্ছায় ছাড়া কোনো কাজ করি নি।"

"সে তো আরও খারাপ," আমি বললাম। "কারণ বিবেকের উচিত ইচ্ছার উপর নজর রাখা। আর তোমার সে-বিবেক না থাকতে পারে, অন্যের আছে। বুঝতে পারছ না, এইরকম একটা মুখরোচক কেচ্ছাকে আমি জীইয়ে রাখতে পারি না? তোমরা খুব খারাপ একটা দৃষ্টান্ত। তোমাদের একজনকে যেতেই হবে। এটা অনিবার্য।·· নাকি তুমি চাও তোমার বন্ধুটিকে আমরা বরখাস্ত করি?"

"না না না।" কান্নায় ভেঙে পড়ল মেয়েটি।

"তাহলে দেখতেই পাচ্ছ, বিষয়টা আমরা খুঁটিয়ে বিবেচনা করে দেখেছি।··· প্রথমত ওর দোষ তোমার চেয়ে কম। একেবারে শেষমুহূর্তে হলেও ও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছে এবং সংশোধন করতে চেয়েছে।···তার চেয়েও বড় কথা হল ওর দুটি সন্তান প্রতিপালন করতে হবে···তোমার সন্তান নেই, তোমার ভাবনা শুধু নিজের।"

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর নরম গলায় ও বলল, "হয়তো, আমারও সন্তান হবে।"

অ্যাঁ! আমি হতবুদ্ধির মতো ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। গোদের উপর বিষফোঁড়া! আমার সহকারীদের মধ্যে অবৈধ সন্তান! আর তারা কিনা এখনও আমাদের মধ্যে থেকে কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করে চলেছে।

"সত্যি বলছ?"

"হ্যাঁ সত্যি," ডুবন্ত মানুষের মতো জবাব দিল ও।

"একেই আমি বলি সত্যিকারের হঠকারিতা, দায়িত্ববোধের অভাব," আমি বলে উঠলাম। "তবু কিনা তুমি বলছ তুমি নির্দোষ!"

ও চুপ করে থাকল। এবং যা প্রত্যাশিত ছিল, সুন্দর টুকটুকে রুমালখানা দিয়ে মুখ চাপা দিল। কাঁদতে থাকল নীরবে। আর যতই কাঁদছিল মেয়েটা আমার গলার মধ্যে ততই কী যেন একটা উঠে আসছিল।

"এখন বলে দিন, কী আমি করব," অসহায়ের মতো ফুঁপিয়ে উঠল মেয়েটি।

"কী করবে তা আমি কি করে বলব!" নরম গলায় বললাম। "পার্টি ব্যুরোর কাছে একটা দরখাস্ত করে দেখ···আর দয়া করে বুঝবার চেষ্টা কর যে আমি নরম হতে পারি না। আমার সে অধিকার নেই! বিশেষ করে এইরকম একটা ক্ষেত্রে।"

মেয়েটি চোখের জল মুছে নীরবে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। আমি ওকে পিছু ডাকলাম না, যদিও আমার মনে হচ্ছিল অন্তত আমার নিজের তরফ থেকে কয়েকটা সান্ত্বনার কথা ওকে বলা উচিত ছিল। এই চপলমতি মেয়েগুলো দিলে আমার মেজাজটা একেবারে খারাপ করে।

আমেলিয়া কখন ঘরে ঢুকেছিল দেখতে পাই নি। আমার টেবিলে কয়েকটা ফাইল যখন সে সাজিয়ে রাখছিল তখন তার দিকে চোখ পড়ল। শুকনো মুখে তৃপ্তির ছাপ। কিছুক্ষণ আগে এখানে কী হয়ে গেছে তা সম্ভবত বুঝতে পেরেছে, অন্তত অনুমান করতে পেরেছে।···

"কমরেড ডিরেকটর···"

"আমাকে একটু একা থাকতে দাও।"

আমেলিয়া বিস্মিতভাবে আমার দিকে তাকাল, ওর বিশাল পাদুটো ওকে নিয়ে গেল দরজার দিকে। ওকে কেন বকলাম জানি না। ওতো আমারই দিকে, ঐ মেয়েটার পক্ষে নয়। মিহাইলোভা যদি রোজা হত, আমার সেই অকর্মার ধাড়ি ভাইঝিটা, তাহলে নিশ্চয়ই ফুলদানিগুলির একটা আমার মাথায় ভাঙত।

এই মুহূর্তে আমি বলতে পারব না, এর মধ্যে কোনটাতে আমি বেশি অপমানিত হতাম।

অনুবাদ : প্রদ্যোৎ গুহ

FRANCE: PLUME TAKES A TRIP *by* HENRI MICHAUX

প্ল্যুম-চরিত

অঁরি মিশো

একটি অতি শান্তিপ্রিয় মানুষ

খাট থেকে হাত বাড়িয়ে প্ল্যুম অবাক হয়ে গেল। কই, দেয়ালটা হাতে ঠেকল না তো! ভাবল, 'বেশ হয়েছে, নিশ্চয়ই পিঁপড়েগুলো খেয়ে ফেলেছে।' ভেবে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

কিছুক্ষণ পরে তার স্ত্রী তাকে ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'কুঁড়ের বাদশা! তুমি তো ঘুমে বেহুঁশ, আর ওদিকে যে সেই ফাঁকে কে এসে আমাদের বাড়িটা চুরি করে নিয়ে গেছে।'

ফ্রান্স

তাইত! প্ল্যুম চেয়ে দেখে তাদের চারদিকে শুধু আকাশ আর আকাশ। 'বাঃ! এর মধ্যেই কাজ খতম!' প্ল্যুম অবাক।

খানিক পরে একটা আওয়াজ প্ল্যুমের কানে এল। জোরে ছুটতে ছুটতে একটা ট্রেন আচমকা তাদের উপর এসে পড়ছে।

'কী তাড়া! ও যেখানে যাচ্ছে সেখানে নিশ্চয়ই আমাদের আগেই পৌঁছবে।' সে ভাবল, ভেবে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

খানিক পরে ঠাণ্ডায় তার ঘুম ভেঙে গেল। তার সারা শরীর রক্তে ভিজে গেছে। কাছেই পড়ে তার

স্ত্রীর খণ্ডবিখণ্ড দেহ। সে ভাবল, 'রক্তের সঙ্গে অনেক অস্বস্তিও বয়ে চলে সব সময়। ট্রেনটা যদি না চলে যেত আমি খুবই খুশি হতাম। কিন্তু চলে যখন গেছেই...'

আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

বিচারক বললেন, 'দেখ, তোমার স্ত্রী এমনভাবে আহত হলেন, আট খণ্ডে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন, আর তুমি তাঁর পাশে থেকেও কিছু করতে পারলে না। এমনকি খেয়ালই করলে না? এর কী কৈফিয়ত দেবে তুমি? এইখানেই আসল রহস্য। কেসটা এর উপরেই নির্ভর করছে।'

'যা হবার তাতো হয়েই গেছে।' ভাবল প্ল্যুম, 'এ অবস্থায় আর এখন তাকে সাহায্য করা সম্ভব নয়।' আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

'কাল তোমার ফাঁসি হবে। আসামী, কিছু বলার আছে?'

সে বলল, 'মাপ করবেন। আমি আপনাদের কথা শুনছিলাম না।' বলে সে ঘুমিয়ে পড়ল।

দেশভ্রমণ

বেড়াতে গেলে সবাই যে তার খুব দেখাশোনা করে, এমন কথা প্ল্যুম বলতে পারে না। কিছু লোক তো বিনা বাক্যব্যয়ে তাকে মাড়িয়ে চলে যায়। কেউ আবার নিশ্চিন্ত মনে তারই কোটে হাত মোছে।

এসবে প্ল্যুম অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সে বিনয়াবনত মনে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে। আর যতদিন সম্ভব ততদিন ঘুরেই বেড়াবে।

যদি তারা খারাপ মেজাজে তার প্লেটে একটা শেকড় দেয়—একটা মস্ত শেকড়:

'নাও নাও, খেয়ে ফেল। হাঁ করে বসে থেকে লাভ কি?'

'তা তো বটেই! তা তো বটেই। খাচ্ছি।'

অকারণে নিজেকে গোলমালে জড়াতে প্ল্যুম ভালোবাসে না।

যদি কেউ রাজি না হয় তাকে রাত্তিরে শুতে দিতে: 'তুমি শুধু ঘুমোবার জন্যে অ্যাদ্দুর আস নি নিশ্চয়ই! শিগগীর তোমার জিনিসপত্তর সব সরিয়ে ফেল। এ-ই তো হাঁটবার সময়।'

'তা তো বটেই! তা তো বটেই। একটু মজা করছিলাম আর কি। মানে ঠাট্টা করছিলাম।' বলে সে ফিরে যায় রাত্রির অন্ধকারে।

যদি লোকে ওকে ট্রেন থেকে ফেলে দেয়: 'বলি ভেবেছ কি? আমরা ...ই এঞ্জিনটাকে গরম করেছি, আটটা কামরা জুড়েছি, শুধু তোমার বয়সী একটা জোয়ান সোমত্থ ছোঁড়াকে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য? যে এখানেই বেশ কাজে ...গতে পারে, যার কোথাও যাবারই কোনো দরকার নেই—ভেবেছ তারই ...ন্যে আমরা সুড়ঙ্গ খুঁড়েছি, ডিনামাইট ফাটিয়ে পাথরের চাঁই উড়িয়ে ...য়েছি, হাজার মাইল ধরে রেলের লাইন পেতেছি, ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করে। ...র লাইন পেতেও কি নিস্তার আছে: সব সময় তক্কে তক্কে থাক, কখন ...বোটাজ হয়;—আর সবকিছু কিনা—'

'বটেই তো! বটেই তো। আরে, আমি উঠেছিলাম শুধু একটু ঘুরে ...খার জন্যে। আর কিছু না। স্রেফ কৌতূহল। চলি।' বলেই জিনিসপত্তর ...য়ে রাস্তায় ফিরে আসে সে।

রোমে গিয়ে যদি তার 'কলিজিয়াম' দেখার সখ হয়: 'না হে। ...মনিতেই তো অবস্থা খারাপ। তারপর ধর তুমি গিয়ে ছুঁতে চাইলে, ঠেস ...য়ে দাঁড়াতে চাইলে, বসতে চাইলে ওর উপর···ওই করে করেই তো এই ...বস্থা—ধ্বংসাবশেষ আর কিছুই নেই কোথাও। অনেক শিক্ষা হয়েছে ...মাদের। কঠিন শিক্ষা। কিন্তু এখন থেকে আর নয়, ব্যস্।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! এ হল গিয়ে···মানে আমি শুধু আপনার কাছে একটা ...াস্টকার্ড চাইতে যাচ্ছিলাম, কিংবা একটা ছবি···যদি সম্ভব হয়···'

আর, কোথাও কিছু না-দেখেই শহর ছেড়ে চলে যায়।

প্ল্যুম স্টীমারে চড়তেই, খালাসীদের মাইনে দেয় যে-লোকটা, সে হঠাৎ তারই ...কে আঙুল উঁচিয়ে বলে:

'ওই লোকটা এখানে কি করছে? ডিসিপ্লিন বলে কিছু রইল না। এখুনি ...কে কয়লাঘরে ফেরত পাঠাও। দ্বিতীয় ঘন্টি তো সবে পড়ল।' বলে সে ...স্ দিতে দিতে চলে যায়।

আর সারাটা পথ প্ল্যুম কয়লাঘরে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে।

কিন্তু একটা কথাও বলে না। কোনো নালিশ করে না। সে শুধু সেই ...ভাগাদের কথা ভাবে যারা একেবারেই কোথাও যেতে পারে না। কিন্তু সে তো ...ে বেড়ায়! সবসময়েই বেড়াচ্ছে।

কী ভাগ্যবান!

অনুবাদ: রাত্রি সেন

MEXICO: THEY GAVE US THE LAND *by* JUAN RULF

যে জমি আমরা পেলাম

যুয়ান রালফো

সেই যে হাঁটতে আরম্ভ করেছি, এখনও হেঁটেই চলেছি। পথে গাছের ছায়া দেখি নি, কোথাও বীজ থেকে গাছ গজিয়ে উঠতে দেখি নি; পচা কাঠকুটোও নজরে আসে নি। কুকুরের ডাক কানে এসেছে। বৈশিষ্ট্যহীন এই পথের প্রায় অর্ধেকটা এসেছি আমরা। মাঝে মাঝে মনে হয়েছে সামনে আর কিছুই নেই, কিছুই খুঁজে পাব না অবশেষে এই সংক্ষিপ্ত ও শুকনো নদী আর খাড়িতে ছিন্নভিন্ন সমতল প্রান্তরের সীমারেখায়। কিন্তু নিশ্চয়ই কিছু আছে। আছে একটা গ্রাম। কুকুরের ডাক আমাদের কানে আসছে। বাতাসে ধোঁয়ার গন্ধ; নিঃশ্বাস নিলে টের পাই। ভেসে আসছে মানুষের অঙ্গের সুগন্ধি।— এই সব আমাদের আশা দেয় যেন। কিন্তু সেই গ্রাম এখনও অনেক, অনেক দূরে। বাতাস সেই গ্রামের কলরব আমাদের কাছে বয়ে নিয়ে আসছে।

● মেক্সিকো ●

সেই ভোরবেলা থেকে আমাদের যাত্রা হয়েছে। এখন বেলা গড়িয়ে গেছে। প্রায় চারটে বাজে। আমাদের মধ্যে কে একজন আকাশের দিকে তাকাল। দিগন্তে যেখানে নিশ্চল সূর্য ঝুলছে, সেদিকে চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে বলে উঠল, "এখন প্রায় চারটে বাজে।"

যে এই কথাগুলো বলল তার নাম মেলিতন। তার

সঙ্গে আছে ফাউর্স্টি নো, এসটিবান, আর আমি। এই আমরা চারজন আছি। আমি আমাদের সংখ্যা গুনি ;—সামনের সারিতে দুজন, আর দুজন আছে পিছনে। আমি পিছনের দিকে তাকালাম ; পিছনে আর কেউ নেই। তাই আমি নিজের মনেই বললাম, "আমরা এখন চারজন।" কিছুক্ষণ আগেও, বেলা এগারোটা নাগাদ, আমরা ছিলাম একুশজন। কিন্তু তারপর থেকে ওরা কয়েকজন করে একসঙ্গে দল থেকে কেটে পড়েছে। এখন দলের মধ্যে আছি আমরা মাত্র চারজন।

ফাউর্স্টি নো বললে, "হয়তো বৃষ্টি হবে।"

আমরা সবাই মাথা তুলে আকাশের দিকে তাকালাম। ভারি কালো মেঘ আকাশে ভেসে যাচ্ছে। আমরা দেখলাম। এবং আমরা ভাবলাম, "হয়তো বৃষ্টি হবে।" কিন্তু আমরা যা ভাবছি তা কাউকে বলি না। কিছুক্ষণ আগে অবধি আমরা কথা বলেছি পরস্পর। এখন কথা বলার আগ্রহও নেই আমাদের। গরমের জন্য আমরা এই আগ্রহ হারিয়েছি। অন্য কোথাও প্রাণভরে খোস গল্প করা যায় ; কিন্তু এখানে তা করা যায় না। এখানে আমরা কঠোর পরিশ্রম করার জন্যে এসেছি। এখানে, কথা বললেই, শব্দগুলো বাইরের গরমের সঙ্গে মিশে আরও তেতে ওঠে ; জিভ শুকিয়ে নেয়। তাই শেষকালে হাঁফাতে হয়। এই হল এখানকার অবস্থা। তাই কথা বলার আগ্রহ নেই কারো।

বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ল। ধুলোর উপর গর্ত হয়ে গেল। মাটিতে থুথু ফেললে যেমন অল্প কাদা-কাদা ভাব হয়, এখন বৃষ্টির ফোঁটা পড়ার পর সেইরকম দেখাচ্ছে। কিন্তু মাত্র কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি। আমরা আশা করছিলাম আরও বেশি বৃষ্টি পড়বে। আমরা যেন তার সন্ধান করছিলাম। কিন্তু আর কোনো ফোঁটা পড়ল না। বৃষ্টি হচ্ছে না। অবশ্য আকাশের দিকে যদি আমরা তাকাই তবে দেখতে পাব বৃষ্টির মেঘ তীব্রগতিতে পাল্লা দিয়ে ছুটে চলেছে। গ্রামের বাতাস যেন সেই মেঘের গতির সামনে রুখে দাঁড়াচ্ছে। গ্রামের বাতাস সেই মেঘপুঞ্জ তাড়িয়ে দিচ্ছে পাহাড়ের নীলাভ ছায়ার দিকে। ভুলক্রমে যে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়েছিল তা শুষে নিল এই মাটি ; এই মাটির তৃষ্ণায় নিঃশেষিত হল জলবিন্দু।

কে সৃষ্টি করেছে এই বিরাট সমতল প্রান্তর ? কি প্রয়োজন ছিল এই প্রান্তরের ?

বৃষ্টির ফোঁটা দেখার জন্তে আমারা কিছুক্ষণ থেমেছিলাম। এখন আবার চলতে আরম্ভ করেছি। বৃষ্টি হল না। আমরা আবার হাঁটছি। অকস্মাৎ আমার মনে হল এতক্ষণ আমরা যত পথ হেঁটে এসেছি তার চেয়ে অনেক বেশি পথ আমরা অতিক্রম করেছি বৃষ্টির পর। এই কথা হঠাৎ আমার মনে এসে গেল। আরও বৃষ্টি পড়ত যদি, তবে হয়তো আরও অনেক কথা আমার মনে আসত। তবু আমি বলতে পারি, আমার সেই শৈশব থেকে আজ অবধি স্মৃতি তোলপাড় করে আমি বলতে পারি,—প্রান্তরের বর্ষা আমি কখনও দেখি নি। ঠিক যাকে বর্ষা বলে তা আমি কখনও দেখি নি।

না, সমতল প্রান্তর বড় বাজে, বিশ্রী। এখানে খরগোস নেই, পা খ নেই। কিছু নেই। থাকার মধ্যে আছে মাঝে মাঝে কাঁটা ঝোপ, মাঝে মাঝে দেখা যায় মরকুটে ঘাসের চাপড়া ; তার ডগাগুলো আবার পুড়ে ঝামরে আছে। থাকার মধ্যে আছে এই। এ ছাড়া আর কিছু নেই।

এই হচ্ছি আমরা, আমরা চারজন। হেঁটে চলেছি। আগে আমরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে, কাঁধে রাইফেল ঝুলিয়ে যাচ্ছিলাম। এখন আমাদের রাইফেল অবধি নেই।

বরাবরই আমার মনে হয়েছে যে ওরা আমাদের কাছ থেকে রাইফেলগুলো নিয়ে ভালো কাজই করেছে। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এই অঞ্চলে যাতায়াত করা খুব বিপজ্জনক। স্ট্রাপে বাঁধা ত্রিশ বোরের রাইফেল দেখামাত্রই ওরা কোনো হুঁশিয়ারি না দিয়েই খুন করতে পারে। কিন্তু ঘোড়ার কথা আলাদা। আমরা যদি ঘোড়ায় চড়ে আসতাম তবে এতক্ষণ আমরা নিশ্চয়ই ওই নদীর সবুজ জলে মুখ নামাতাম। এতক্ষণ নিশ্চয়ই গ্রামের বাড়ি বাড়ি ঘুরতাম পেটভরে খেয়ে যাওয়ার নিমন্ত্রণের আশায়। যদি ঘোড়ায় চড়ে আসতাম, তবে, এতক্ষণ আমরা ঠিক ওইসব করতাম। ওরা কিন্তু আমাদের রাইফেলের সঙ্গে আমাদের ঘোড়াগুলোও নিয়ে নিল।

মাথা ঘুরিয়ে আবার আমি সমতলের দিকে তাকাই। কত বিরাট বিস্তীর্ণ জমি নিষ্ফলা পড়ে আছে! যতদূর তাকাতে চাও, তাকিয়ে থাক। দৃষ্টি বাধা পাবে না। কোনো কিছু নেই। কেবল হয়তো দেখা যাবে কতকগুলো গিরগিটি মাঠে তাদের গর্ত থেকে মাথা তুলে চেয়ে আছে। কিন্তু সূর্যের তাত গায়ে লাগতেই তারাও পাথরের অপরিসর ছায়ার নিচে পালিয়ে যায়। তবু আমাদের তো এখানেই কাজ করতে হবে। আমাদের কী হবে? সূর্যের

এই প্রচণ্ড তেজ থেকে আমরা আশ্রয় নেব কোথায় ? কেন ওরা আমাদের রুক্ষ খটখটে নিষ্ফলা প্রান্তর দিল আবাদ করার জন্যে ?

ওরা বলেছিল, "এখান থেকে ওই গ্রামের সীমানা পর্যন্ত তোমাদের।"

আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এই সমতল ?"

"হ্যাঁ, ওই সমতল ; ওই সমস্ত সমতল প্রান্তর।"

ওই সমতল প্রান্তরের জমি আমরা চাই নি—এই কথা আমাদের প্রায় জিভের গোড়ায় এসেছিল। আমরা চাইছিলাম নদীর ধারের জমি। নদীর অন্য পাড়ে, বাগানের ধার ঘেঁষে আছে কত গাছ। আমরা ওই গাছগুলোকে বলে থাকি কাসুয়ারিনা। ওখানে আছে ঘাস। নদীর ওপারের জমিটা সত্যিই ভালো।

ওরা আমাদের কোনো কথা বলতেই দিল না। ডেলিগেট তো আর আমাদের সঙ্গে গল্প করতে আসে নি! তাই সে আমাদের হাতের উপর জমির কাগজপত্র তুলে দিয়ে বললে, "এত বিরাট জমির মালিক হলে বলে ঘাবড়ে যেও না।"

"কিন্তু সিনর…ওই সমতল—"

"হাজার হাজার একর জমি তোমাদের এখন।"

"কিন্তু জল নেই। ওখানে জল নেই। এক আঁজলা জলও যে ওখানে নেই।"

"কি যে বল! বলি ঝড়-বৃষ্টির সময় জল হবে না? সে জল যাবে কোথায় ? কেউ তো তোমাদের সেচের জমি দেবে বলে মাথার দিব্যি দেয় নি। বৃষ্টি হওয়ার পরই দেখবে শস্যের অঙ্কুর গজিয়ে উঠবে। যেন ওরা তৈরি হয়েছিল। তোমাদের কিছুই করতে হবে না।"

"কিন্তু সিনর, ও-জমি হল শুকনো, পাথুরে। ও-জমি ক্ষয় হতে আরম্ভ করেছে। কী জানেন সিনর, সমতলের ওই জমিতে শুধুই পাথর। ওখানে লাঙল বসবে না। কী করতে হবে জানেন সিনর? ওই জমিতে বিঁধে কাঠি দিয়ে ছোট ছোট গর্ত করে বীজ দিতে হবে। তাতেও কি ফসল হবে ?—কেউ বলতে পারে না। ওই জমিতে শস্যের আবাদ দূরে থাক, একটা গাছও গজাবে না।"

"বেশ, তোমাদের এইসব অভিযোগ লিখে দাও তাহলে। ওসব বাজে কথা রাখ। বিরাট জমির মালিক হয়েছ এখন। সেই জমি চাষ করগে। সরকারই

তো তোমাদের জমি দিয়েছে আর তোমরা কিনা সেই সরকারকেই দোষ পাড়ছ ?”

“না, না, সিনর। আমরা সরকারকে দোষারোপ করি নি। আমাদের আক্ষেপ ওই সমতলের বিরুদ্ধে। যেখানে কোনো কিছুই সম্ভব নয় সেখানে গতর ভাঙিয়ে কি লাভ !—এই হল আমাদের কথা। এইটুকুই আমরা বলতে চাই। শুনুন, আমাদের কথা একটু শুনুন। বুঝিয়ে বলতে দিন। বেশ আবার গোড়া থেকে শুরু করি…”

কিন্তু সে আমাদের কোনো কথা কানেই তুলল না।

তাই এই জমি আমরা পেলাম। এই আমাদের জমি! জমি না তো মাটির সরা। ওরা চায় আমরা এই সরার উপর বীজ বুনি। এই সরার উপর কোনো ফলন হয় কিনা, এখানে বীজ থেকে অঙ্কুর হয় কিনা—তাই ওরা দেখতে চায়। এখানে কোনো ফসল হবে না। এ এক নিষ্ফলা মাটি। বাজপাখির মত পাখিও এখানে নেই। তাকিয়ে থাকলে কখন-সখন ওই বাজপাখি দেখা যায়। আকাশের অনেক উপর দিয়ে সাঁই সাঁই করে উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে। এই সাদা পাথুরে কঠিন প্রান্তর ছেড়ে তাড়াতাড়ি পালাতে পারলে বাঁচে যেন! এই সমতলে যতই সামনের দিকে যাওয়া যাক, মনে হবে আমরা কেবলই পিছিয়ে যাচ্ছি।

মেলিতন বললে, “ছোঃ, এই জমি ওরা দিয়েছে !”

ফাউস্টি নো বললে, “কি বললে ?”

আমি নির্বাক। আমি ভাবলাম: মেলিতন সুস্থ মাথায় কথা বলছে না। গরমের চোটে ও এইসব বাজে কথা বকে যাচ্ছে। ওর টুপির ভিতর দিয়ে গরম তাতিয়ে দিয়েছে ওর মাথাটাও। নিশ্চয়ই তাই। তা ভিন্ন এখন যে কথা ও বলল তা মুখ থেকে বার হল কী করে! মেলিতন, কোন জমি ওরা আমাদের দিয়েছে ? ঘূর্ণিবাতাস যদি ওঠে তবে সেই বাতাস ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার মত কিছুই খুঁজে পাবে না এখানে।

মেলিতন আবার বললে, “এই জমিতে তবু কোনো-না-কোনো কাজ হবে। যেমন, মাদী ঘোড়ার ব্যায়াম করান যেতে পারে এখানে।”

এসটেবান তাকে জিজ্ঞাসা করলে, “কি বললে ? মাদী ঘোড়া ?”

এতক্ষণ এসটেবানকে আমি ভালো করে নজর দিয়ে দেখি নি। কথা বলতেই আমি ওকে ভালো করে লক্ষ করলাম। সে একটা জ্যাকেট পরেছে।

জ্যাকেটটা এসেছে পেট অবধি। জ্যাকেটের নিচে কি একটা দেখা গেল। মুরগীর মাথা বলে মনে হল।

"ওই খেবান, ওই মুরগী আবার কোথায় ধরলি?"

"ওটা আমার," সে উত্তর দিল।

"আগে তো এটাকে তোর সঙ্গে দেখি নি বাপু। কোত্থেকে কিনলি? বল না।"

"কেনা মুরগী নয়। দস্তুরমত আমার বাড়ির পোষা মুরগী।"

"তাহলে ও আমাদের পেটে যাবে। সেইজন্যে তুমি ওই মুরগীটাকে এনেছ। তাই না খেবান?"

"না। খাবারের জন্যে আনি নি। পালব বলে এনেছি। শুধু ঘরদোর ফেলে এসেছি। ওকে দেখাশোনা করবে এমন মানুষ নেই সেখানে। তাই দূরের পথে যাবার সময় আমি একে সঙ্গে নি।"

"ওই জামার ভিতর থেকে ও যে দম আটকে মারা যাবে। আরে, ওটাকে ফাঁকা বাতাসে থাকতে দাও।"

সে ওই মুরগীটার পিঠে কয়েকটা থাবড়া মেরে তার মুখে গরম বাতাসের ফুঁ দিল। তারপর বললে, "আমরা প্রায় নদীর কাছে এসে গেছি।"

এসটেবানের আর-একটা কথাও আমার কানে গেল না। নদীতে নামার জন্যে আমরা সবাই একজনের পর একজন দাঁড়িয়ে গেছি। সকলের আগে এসটেবান। সে মুরগীর পা দুটো একসঙ্গে করে এধারে-ওধারে দোলাতে দোলাতে নদীতে নামছে। পথের পাথরে মুরগীটা যেন মাথায় ঠোক্কর না খায় তাই তার এত সতর্কতা।

যতই নিচের দিকে নামছি ততই ভালো জমি দেখতে পাচ্ছি। আমরা যেন একপাল খচ্চর। নিচে নামছি আর আমাদের খুরে ধুলো উড়ছে। ধুলোয় ধুলোয় মাথামাখি হতে আমাদের ভালো লাগছিল। এগারো ঘণ্টার একটানা যাত্রার পর, সমতলের কঠিনের উপর দিয়ে এতক্ষণ হেঁটে আসার পর, ধুলোয় ধুলোয় আবিল হয়ে উঠে আমরা যেন আমাদের সত্তা খুঁজে পেলাম। আমাদের সামনে এখন মাটি যেন লাফিয়ে উঠছে। আমরা মৃত্তিকার স্বাদ নিলাম।

নদীর উপর দিয়ে, কাসুয়ারিনার সবুজ মাথার উপর দিয়ে, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে যাচ্ছে চাচালাচাস।* ওই দিকে তাকিয়ে আমাদের খুব ভালো লাগল।

* ম্যাক্সিকোর বনমোরগ।

এখন আমরা, আমাদের খুব কাছে, কুকুরের ডাক শুনতে পাচ্ছি। মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আমরা যেখানে আছি, ঠিক সেখানেই কুকুর ডাকছে। কিন্তু তা নয়। গ্রাম থেকে বাতাস জোরে এসে এই ছোট্ট নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে বলে কুকুরের ডাকের আওয়াজে আমাদের চারপাশ পূর্ণ হয়ে আছে।

গ্রামের যে-বাড়িটা আমাদের প্রথমে নজরে পড়ল আমরা সেই বাড়ির দিকে যাচ্ছি। এসটিবান আবার তার মুরগীটা হাতে ঝুলিয়ে নিল। মুরগীর পা থেকে ঝিমধরা ভাব কাটাবার জন্যে এসটেবান ওর পা দুটো জোড়া করে উড়িয়ে দিল। তারপর সে আর তার মুরগী মিলিয়ে গেল মেজি কোয়াইট গাছের পিছনে।

এসটেবান আমাদের বলে, "অবশেষে আসা গেল।"

আমরা গ্রামের মাঝখানে এলাম।

ওরা আমাদের যে জমি দিয়েছে তার রঙ কালো।

অনুবাদ : রাম বসু

INDONESIA: CAGED *by* PRAMUDYA ANANTA TUR

স্বাধীনতাহীনতায়

প্রমুদ্য অনন্ত তুর

বুকিৎ দুরি! নামটা আমি এই প্রথম শুনলাম, রিপাব্লিকের বিরুদ্ধে ডাচ সামরিক অভিযান শুরু হবার কয়েক মাস আগে। আগে কখনো শুনি নি, যদিও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানীরা যখন আমাদের দেশ দখল করেছিল তখনো আমি ছিলাম জাকার্তাতেই। কিংবা হয়তো শুনে থাকব, মনে দাগ কাটে নি। কথাটা এক কান দিয়ে ঢুকেছে, অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেছে।

একদিন একজন বন্ধু এসেছিল আমার সঙ্গে দেখা করতে। গ্লোদোক কারাগার[১] থেকে সবে সে মুক্তি পেয়েছিল। জাকার্তার কারাগারগুলোর কথা তার মুখেই আমি প্রথম শুনলাম। এমনি একটি কারাগার বুকিৎ দুরি, যে-নামটা সকলের পরিচিত। বন্ধুটির মুখে আরো শুনলাম যে ১৯৫১ সালের আগে বুকিৎ দুরি কারাগার থেকে কোনো বন্দীর মুক্তি পাবার সম্ভাবনা নেই। কথাটা আমার মনকে নাড়া দিল। তারপর থেকেই বুকিৎ দুরি নামটা আমার স্মৃতিতে গাঁথা। কিছুতেই ভুলতে পারি না। সৈন্যদল থেকে ছাড়া পেয়ে আমি সবে অভ্যন্তর[২] থেকে বেরিয়ে এসেছি। আর এ তো জানা কথা যে ইন্দোনেশিয়ার ডাচ শাসনব্যবস্থাকে নিশানা করে যে একবার বন্দুক উঁচিয়েছে তাকে সব সময়েই ভয়ে ভয়ে

থাকতে হয় যে কোনো-না-কোনো ধরনের কারাবাস তার কপালে আছেই।

ইতিমধ্যে বুকিৎ তুরি কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়া আরেকজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। ফলে, ১৯৫১ সালের আগে বুকিৎ তুরি কারাগার থেকে কোনো বন্দীর ছাড়া পাবার সম্ভাবনা নেই, এ-ধারণা আমার আর থাকল না। এই বন্ধুটির মুখেই শুনলাম যে বুকিৎ তুরি কারাগারে বন্দীদের শুয়ে থাকতে হয় খালি কংক্রিটের বেঞ্চির উপরে। কারাগারে যে-ধরনের ব্যবহার পেতে হয় তা একমাস সহ্য করার মত ক্ষমতা যদি কারও থাকে তাহতে বুঝতে হবে যে সে টিকে গেল। সে-ক্ষমতা না থাকলে বাত বা বেরিবেরি হওয়াটা অবধারিত। তার মুখে আরও শুনলাম (এটা তার নিজের অভিজ্ঞতা) কারাগারে পুরবার আগে বন্দীকে আটচল্লিশ ঘণ্টা হাত বেঁধে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখা হয়। কখনো কখনো ইলেকট্রিক শক্ দেওয়া হয় সমস্ত দোষ স্বীকার না করা পর্যন্ত।

ডাচদের সামরিক অভিযান শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়েছিল। ধরপাকড়ের খবর শুনতাম আর চোখের সামনে ভেসে উঠত কারাগারের সব ছবি। কিন্তু আমি কোনো সময়েই ভাবি নি যে আমাকেও কোনো সময়ে কারাগারে যেতে হতে পারে। কারাগারের জীবনটা কেমন, তা আমি চেষ্টা করেও ভাবতে পারতাম না। কারাগারের জীবন নিয়ে গল্প অবশ্য অনেক লেখা হয়েছে, কিন্তু তা পড়েও খুব যে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারতাম তা নয়।

আমার এক মেয়েবন্ধু বুকিৎ তুরি কারাগারে ছিল। সে আমাকে বলল যে ঘুটঘুটে অন্ধকার রাত্তিরে বুকিৎ তুরি কারাগারে ভূতের দৌরাত্ম্য শুরু হয়। এই ভূতরা আর কেউ নয়, বুকিৎ তুরি কারাগারে যে-সব বন্দী আত্মহত্যা করেছে তাদের অশান্ত আত্মা। তার মুখে আরও শুনলাম যে বুকিৎ তুরি হচ্ছে একটি বিশেষ ধরনের কারাগার। যুদ্ধের আগে এখানে শুধু আজীবন দণ্ডিতদেরই রাখা হত।

যে-গ্রামে বুকিৎ তুরি কারাগার, সাইকেলে চেপে একদিন হাজির হলাম সেখানে। দেখলাম কারাগারের দেওয়াল কংক্রিটের, তার রং সবুজ, মধ্যে মধ্যে কালো আলকাতরার ছোপ। এই রং দেখে আমার মনে পড়ে গেল জাপানী দখলের সময়ের কথা। দৃশ্যটা ভয়ংকর, আমার বুকের ভিতরটা দলা

প্যাকিয়ে গলার কাছে উঠে আসতে চাইছিল যেন। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত এই কারাগারের মধ্যে কাটানো—এ যেন ভাবাই যায় না! তবে এ-নিয়ে আমি আর দ্বিতীয়বার ভাবতে যাই নি। কেননা, আমি যতই কল্পনা করি না কেন যে আমি এই কারাগারে আছি—তা নিতান্তই কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই কল্পনার ব্যাপারটাই বাস্তবে ঘটে গেল। এই পাঁশুটে সবুজ দালানের সারি, যার নাম বুকিং তুরি, সেখানে আমাকেও যেতে হল ও আড়াই বছর থাকতে হল।

আমার এখনো মনে পড়ছে, কারাগারের চৌহদ্দির মধ্যে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে আমার হাঁটুদুটো ঠক-ঠক করে কাঁপছিল। আর যতবার আমি চকচকে কালো সৈন্যগুলোর (চকচকে কেন তার কারণটা আমি ধরতে পারি নি) সামনাসামনি পড়ছিলাম, আমার শরীরের রক্ত হিম হয়ে যাচ্ছিল। আমার এখনো মনে পড়ছে, লোহার গরাদ, লোহার দরজা, আর দেওয়ালের বেষ্টনীর মধ্যে যে দালানগুলো তাদের লাল ছাদ—এসব থেকে আমি চোখ ফেরাতে পারছিলাম না। নতুন বন্দী কে এল তা দেখবার জন্যে অন্য বন্দীরা লোহার গরাদের পিছন থেকে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। সেই বন্দীদের মুখগুলো এখনো আমি ভুলি নি।

সত্যি কথা বলতে কি, আমি একবারও ভাবি নি যে আমার শোনা গল্পগুলো আমার জীবনে সত্যি হয়ে উঠবে। ডাচ সশস্ত্র বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ আমার পরোয়ানার উপরে লিখে দিয়েছিল 'বুকিং তুরি'। দেখেই আঁতকে উঠেছিলাম, সেই আমার প্রথম আতঙ্ক। তার মানে, আমাকে পাঠানো হচ্ছে বুকিং তুরি কারাগারে, গত কয়েকদিন ধরেই যে-কারাগার আমার ভাবনা জুড়ে আছে। আমাকে কতদিন সেখানে থাকতে হবে তার কোনো উল্লেখ পরোয়ানায় ছিল না। শুধু এটুকু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলাম যে আমার স্বাধীনতা হারাতে বসেছি। *কিন্তু কতদিনের জন্যে?* চিন্তাটা আমার মনের মধ্যে ভার হয়ে চেপে রইল।

ভ্যান থেকে নামিয়ে আমাকে নিয়ে যাওয়া হল প্রকাণ্ড একটা দরজার সামনে। দেওয়ালের মত দরজার রঙও পাঁশুটে সবুজ। সেখানে এমন কতকগুলো মুখের চেহারা আমি দেখলাম যা আগে কখনো দেখি নি। মুখগুলো একদল ভাড়াটে সৈন্যের, বন্দীদের খুন করা ও পাহারা দেওয়া যাদের পেশা। কারাগারের ভিতরদিকার উঠোনে পৌছতে সবসুদ্ধ তিনটি দরজা

পার হতে হল। সেখানে দেখলাম উর্দি-পরা কয়েক-শো লোক খাবারের জন্যে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে। অনুমান করলাম এরা সব পি-আর-পি[৩] সৈন্য। এই অনুমানের খানিকটা ভিত্তিও ছিল, কেননা সম্প্রতি এই পি-আর-পি নামটা সকলের মুখে মুখে। এটুকুও অনুমান করতে পারলাম যে এই সৈন্যগুলোই আমার উপরে অত্যাচার চালাবে।

সৈন্যগুলোকে বেশিক্ষণ দেখতে হল না, কেননা আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ব্লকের ভিতরে। সরু একটা গলি, মিটার দেড়েক চওড়া, দু-দিকে সারি সারি কালো-নম্বর-যুক্ত দরজা। এই গলি দিয়ে যখন যাচ্ছিলাম, আমার পক্ষে বিন্দুমাত্র ধারণা করা সম্ভব হয় নি এই দরজাগুলোর পিছনে কী থাকতে পারে। গলিটা একজায়গায় ঘুরে গিয়েছে, সেখানে আমাকে থামতে বলা হল। সামনে কালো দরজা। একটা সৈন্য এসে শক্ত হাতে সেই দরজা খুলল। সামনে একটি কামরা, তার মধ্যে একটি কংক্রিটের বেঞ্চি। মাত্র তখনই আমি বুঝতে পারলাম এই হচ্ছে কারাগারের সেল। হুকুম হল ভিতরে ঢোকার। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। তখন আমি ছাড়া আর কেউ নেই। আর তখন, তখনই, বুঝতে পারলাম যে আমি বন্দী।

চারদিকে তাকালাম। কংক্রিট, শুধু কংক্রিট। কেবল সিলিংটা কাঠের, জানলার গরাদ ও দরজা লোহার। আলো আসবার জন্যে যে-ফুটো রয়েছে তার মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে ছোট, খুব ছোট, একটুকরো আকাশ। আমি মেঝের উপরে বসে পড়লাম। হা ঈশ্বর! এই বন্ধ দরজায় আমার স্বাধীনতার পথ রুদ্ধ!

খাঁচায় পোরা পশু, যে-পশুর জীবন ছিল মুক্ত ও স্বাধীন, খাঁচার গরাদে সে মাথা কোটে যতক্ষণ না তার মাথা ক্ষতবিক্ষত হয়, যতক্ষণ না সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। শেষপর্যন্ত যখন আর কোনো আশা থাকে না তখন বিমর্ষ। আর পশু না হয়ে মানুষ হলে, যে-মানুষকে স্বাধীনতা হারিয়ে এই প্রথমবার কারাগারে আসতে হয়েছে, তার মাথার ঠিক থাকে না, কী করবে বুঝতে না পেরে নির্বাক হয়ে যায়।

মেঝে থেকে উঠে হামাগুড়ি দিয়ে আমি এগিয়ে গেলাম কংক্রিটের বেঞ্চিটার দিকে, ঘুমোবার জন্যে। আমার মাথার ভিতরে আলোড়িত হতে লাগল চিন্তা, নানা বিচিত্র চিন্তা। চিন্তাগুলো কী নিয়ে তা এখন আর

আমার মনে নেই। শুধু মনে পড়ছে, আমি যে বন্দী এই বোধটা জাগ্রত ছিল আর তা থেকেই এই চেতনা যে আমি ইন্দোনেশীয়। অন্য সমস্ত চিন্তা আড়ালে চলে গিয়েছিল।

একঘণ্টা আমি শুয়ে রইলাম বেঞ্চির উপরে। শুয়ে শুয়ে কল্পনা করতে লাগলাম, রিপাব্লিকান বাহিনী জাকার্তায় প্রবেশ করেছে, ডাচ বাহিনী পরাজিত। হায় আমার কল্পনা, বাস্তব অবস্থা এই যে ডাচ সশস্ত্র বাহিনী রিপাব্লিকান বাহিনীকে ভেদ করে কীলকের মতো অগ্রসর।

প্রত্যেকটি শব্দ এখন আমি কান পেতে শুনছি। পাশের রেলওয়ে কারখানায় বিরামসূচক সাইরেন বেজে উঠল। আশা করার কিছু ছিল না—তবুও আমার আশা, রিপাব্লিকের বিমানবাহিনী আক্রমণ করতে আসছে। এই কারাগারটা ধুলোয় মিশে যাক, কারাগারের দেওয়ালের ধ্বংসস্তূপের নিচে আমার মৃত্যু হোক—তবুও আসুক, রিপাব্লিকের বিমানবাহিনী আক্রমণ করতে আসুক! একটু পরেই সাইরেনের শব্দ মিলিয়ে গেল। মাথার উপরে বিমানের গর্জন। আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেল। সত্যিই কি রিপাব্লিকের বিমানবাহিনীর বিমান? নিঃশ্বাস বন্ধ করে আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম। আরো পরে আমি জেনেছিলাম যে সাইরেনটা রেলওয়ে কারখানার আর মাথার উপর দিয়ে উড়ে-যাওয়া বিমানগুলো ডাচ। মাথার মধ্যে নানা এলোমেলো চিন্তা পাক খেতে লাগল। ভাবলাম, আমি কি কারাগারে? তা কেন হবে! এ তো ভাবাই যায় না! আমি কেন বন্দী হব! এ অসম্ভব!

একটু পরে অনেকগুলো গলার স্বরের একটা আভাস আমার কানে এল। অনেকে মিলে একটা যুদ্ধসংগীত গাইছে। আমি লাফিয়ে উঠে বসলাম। যদি যুদ্ধসংগীতই হয় তবে এটা নিশ্চয়ই কারাগার নয়। গানের আওয়াজটা বাড়ছে, বাড়তে বাড়তে গাইয়েরা যখন আমার সেলের দরজার সামনে তখন সবচেয়ে উঁচুতে। ভাবলাম, ওরা কি পি-আর-পি সৈন্য? এবার আমাকে কি ওদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে? ভাবতেই কেমন একটা জ্বালা বোধ হতে লাগল। তবুও নিজেকে শান্ত করলাম। যে অবস্থাতেই পড়ি না কেন আমি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মোকাবিলা করব, মনে মনে নিজেকে বললাম।

আবার আমি শুয়ে পড়লাম কংক্রিটের বেঞ্চির উপরে। চোখ দরজার দিকে। তখন আমার চোখে পড়ল, দেওয়ালে একটি চোরা-ফুটো আছে,

প্রায় চার বর্গডেসিমিটারের। আমি চোখ বুজলাম। ঘুমোতে চেষ্টা করলাম। আমার খিদে পেয়েছে। পেটের মধ্যে যন্ত্রণা। কিছুতেই ঘুম আসছে না।

আচমকা এক ঝলক হাসি। আমি উঠে বসলাম। চোরা-ফুটোটা সশব্দে খুলে গেল। লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালাম, যেন একটা বাঁশের বর্শার ফলক আমাকে বিদ্ধ করেছে। মনে হতে লাগল জানলার কাছে সরে গিয়ে দাঁড়াই। আমি কি স্বপ্ন দেখছি? চোরা-ফুটোয় যার মুখ ভেসে উঠেছে সে আর আমি একসময়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে লড়াই করেছি।

'তুমি এখানে?' চাপা স্বরে সে জিজ্ঞেস করল।

গলার স্বর শুনে বোঝা গেল সে একটুও অবাক হয় নি।

'রুস্‌লি, তুমি?' আমিও পালটা প্রশ্ন করি।

'দু-মাস হয়ে গেল আমি এখানে এসেছি।' সে বলে।

'দু-মাস? তা অনেকদিনই বলতে হবে। তোমার ঘর কোন্‌টা?'

'ঘর নয়, সেল!'

'সেল?'

তখন আমার মনে পড়ে গেল যে আমি আছি কারাগারে। কী সব পাগলের মতো ভাবছিলাম এতক্ষণ!

কিন্তু রুসলির ব্যাপারটা কী? ও কি পাসুন্দান বাহিনীতে যোগ দিয়েছে নাকি? অন্তত ওর পরনে নীল পোশাক দেখা যাচ্ছে। আমি যখন ওকে চিনতাম তখন ও ছিল একজন আদর্শ সৈনিক। তারপরে রিপাব্লিকের র‍্যাশন্যালাইজেশন পরিকল্পনায়[৪] সৈন্যদল থেকে ছাড়া পেয়ে গেল। খিদে থেকে বাঁচবার জন্যে চলে এল জাকার্তায়। তারপরেই ওর এই অধঃপতন।

সৈন্যদল থেকে ও যখন ছাড়া পেল, সে-সময়ের কথা এখনো আমার মনে আছে। নিজের যথাসর্বস্ব বিক্রি করে দিয়েছিল। বাকি ছিল শুধু পরনের পাজামা আর ফতুয়া। সেই পোশাকেই গিয়েছিল জাকার্তায়। স্টেশনে যাবার গলিটা ছিল কাদাভর্তি, সেই গলি দিয়ে ক্লান্ত পায়ে ও হাঁটছিল, দৃশ্যটা আমার মনে পড়ছে। তখন ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাস। সামনেই নতুন বছর। ওর বাঁ বগলে মাদুরে মোড়া একটা পোঁটলা। পোঁটলার ভিতরে কী আমি জানতাম না, সম্ভবত জাকার্তায় ওর বাবা-মার জন্যে দু-এক কেজি চাল। রেললাইনের ধারে বসে আমরা কিছুক্ষণ কথা

বলেছিলাম। ও বলেছিল, অনেকগুলো মানুষ ওর উপরে নির্ভর করে আছে—ওর ভাইয়েরা আর বোনেরা, জাকার্তায় যাদের জীবিকা বলতে বিশেষ কিছু নেই। বলেছিল ওর বাবার কথা, যিনি জুতো-সেলাইয়ের কাজ করেন কিন্তু ব্যবসার প্রয়োজনেও বাড়ির বাইরে বেরোতে বিশেষ ভরসা পান না, কেননা বাইরে কথায় কথায় দাঙ্গাহাঙ্গামা কথায় কথায় গুলিগোলা। কথা বলতে বলতে হঠাৎ অন্য বিষয়ে চলে গিয়েছিল। পকেট থেকে একটা দোমড়ানো কাগজ বার করে আমাকে দেখিয়ে বলেছিল, 'ছাখ, দেড়বছর ছিলাম সৈন্যদলে, তার বদলে কী পেয়েছি!'

কাগজটা সমান করে মেলে ধরেছিলাম। ওকে সৈন্যদল থেকে ছেড়ে দেওয়া হল—এই মর্মে একটি ঘোষণা, মাত্র কয়েক লাইনের। ঘোষণার অংশবিশেষে লেখা: "সামরিক কর্ম থেকে খালাস দেওয়া হল। সামরিক জীবনে থাকাকালীন কৃতকর্তব্যের জন্যে ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিকের সশস্ত্র বাহিনীর ধন্যবাদ।" তারপরেই চটকদার একটি সই! পড়া শেষ হতে না হতেই আবার বলেছিল, 'সৈন্য হয়ে লড়াই করলাম, এত যন্ত্রণা সহ্য করলাম, এই তার পুরস্কার!' বলতে বলতে পা বাড়িয়ে দিয়েছিল আমার দিকে। মস্ত লম্বা লম্বা কাটা দাগ। ও বলেছিল, 'বুলেটের দাগ।' তারপরে কাগজটা আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। চোখদুটো জ্বলছিল ওর। কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে পায়ের কাছে মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েছিল।

তারপরে ও কি পি-আর-পি সৈন্য হয়েছে?

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তুমি কি পি-আর-পি সৈন্য হয়েছ?'

'পি-আর-পি সৈন্য? তা কেন হতে যাব?'

'তোমার পোশাক…'

ও হেসে উঠল, কিন্তু সরাসরি কোনো জবাব দিল না। এই বলে ব্যাখ্যা করল: 'এটা হচ্ছে জেলখানা, সৈন্যদের ব্যারাক নয়। এখানে যারা আছে তারা কয়েদী, পুরোপুরি কয়েদী।'

'কিন্তু রুসলি, তোমাকে কেন কয়েদ করা হয়েছে?'

'কেন কয়েদ করা হয়েছে?' আমার প্রশ্নটাই ওর মুখে আবার শোনা গেল কিন্তু কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লক্ষ করলাম, ওর চোখে মুখে দারুণ একটা উত্তেজনার ছাপ।

তখন আমার মনে পড়ে গেল। আমার প্রশ্নের জবাব আমি নিজে থেকেই পেয়ে গেলাম।

ডাচ সৈন্যে জাকার্তা ছেয়ে গিয়েছিল। তারই মধ্যে দিয়ে কোনোরকমে ঢুকে পড়েছিল রুসলি। রাস্তার ধারে একটা সাইকেল মেরামতীর দোকান খুলেছিল। দৃশ্যটা যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তাহলে ও নিশ্চয়ই ধরা পড়েছে। একবার আমি ওর দোকানে আমার সাইকেল সারিয়েছিলাম। সাইকেল সারাতে সারাতে আমাকে বলেছিল, 'শুধু টায়ার সারিয়ে লাভটা কী! এখন যা সময়, আমি যদি সৈন্য হয়ে লড়াই করতে পারতাম তাহলে অনেক বেশি কাজ হত!' ওর চোখের দৃষ্টিতে ছিল হতাশা। এ বিষয়ে কথা চালিয়ে যাবার সাহস আমার ছিল না। তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'রুস্‌লি, বিয়ে করেছ?' হাতের কাজ থামিয়ে আমার দিকে তাকিয়েছিল, চোখদুটো পাক খাচ্ছিল, তারপরে আবার মাথা নিচু করে কাজে মন দিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নের জবাব দেয় নি।

'কী ধরনের লোককে এখানে আটক রাখা হয়েছে?'

'সব ধরনের। ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতার জন্যে যারা লড়াই করছে তারা, চোর, ডাকাত—সবাই।'

'তোমার ব্যাপারটা কী?'

'জানি না। আমাকে আটক করার পর থেকে কোনোরকম জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। রিপাব্লিকের সৈন্য ছিলাম, সেজন্যেই বোধহয় আমাকে আটক করা হয়েছে। সঠিক কারণ আমি জানি না।'

'দু মাস!' আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি।

ও নির্বাক।

'তুমি কি বিয়ে করেছ?'

ও চুপ। ওর মুখের চেহারা কঠোর। তাই দেখে প্রশ্নটা দ্বিতীয়বার করতে গিয়েও আমি থেমে যাই। আমরা কেউ-ই আর কোনো কথা বলি না।

খালি বেঞ্চিটার দিকে আমি তাকাই। এই বেঞ্চিটার উপরে শুয়ে দুটি মাস আমি কাটাতে পারব কি? আমি বুঝতে পারি, আমার বন্ধুর মত আমাকেও অনেক কিছু সহ্য করতে হবে। তখন মনটা শান্ত হয়। যাই ঘটুক আমি মেনে নেব। আমার মনে আর কোনো তিক্ততা নেই।

'আচ্ছা রুসলি, আমাকে যেমন সেলে আটক করা হয়েছে তোমাকে তা করা হয় নি কেন ?

'যারা নতুন আসে তাদের সাধারণত আধ বা পুরো সপ্তাহের জন্যে আটক রাখা হয়। কিন্তু এখন আর সে-নিয়ম নেই। ডাচদের সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকে আমাদের সবাইকেই সেলে আটক করা হচ্ছে।'

'তাহলে বাইরে এত লোক কেন ?'

'আমরা আমাদের বরাদ্দ খাবার নিচ্ছি।'

এবারে বোঝা গেল। আস্তে আস্তে বেঞ্চিতে ফিরে এসে আমি শুয়ে পড়লাম। চোরা-ফুটো বন্ধ করে রুসলি চলে গেল···

একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। ঘুম ভেঙে গেল চোরা-ফুটো খোলার শব্দে। এবারে একটা রাগত মুখ। ফুটোর মধ্যে দিয়ে বাড়িয়ে দেওয়া খাড়া একটা নাক। আর তীক্ষ্ণ গলার স্বর: 'এই বেটাচ্ছেলে, তুই তো স্পাই, না ?'

'না, আমি স্পাই নই।' আমি থতমত।

'তাহলে তোকে এখানে আনা হয়েছে কেন ?'

'আমি তার ছাই কী জানি !'

'মুখ সামলে! মিথ্যে বলবি নে খবরদার! যদি বুঝি যে তুই বেটা স্পাই তাহলে সকালেই তোকে গুলি করে মারব।'

আমি আর নিজেকে সামলাতে পারলাম না। যা ঘটে ঘটুক, চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'দেরি কেন তাহলে, গুলি কর না দেখি!'

লোকটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বন্দুক তুলল না। চোরা-ফুটোটা বন্ধ করে দিল। দরজার পেছন থেকে শোনা গেল তার শাসানি: 'মুখ সামলে!'

তারপরে সব চুপচাপ। আমি আবার শুয়ে পড়লাম। আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে, জগৎসংসার সম্পর্কে আমার তখন একটা ঘৃণা এসে গিয়েছিল। মনে মনে বলেছিলাম, 'এরা মানুষ!' ওর মতো লোক কয়েক-শো রুপিয়ার[৫] বদলে মানুষ খুন করতে পারে। মাত্র কয়েক-শো রুপিয়ার বদলে একজন মানুষ খুন করা! ব্যাপারটা আমি কিছুতেই ভাবতে পারি না। মনে হয়, মিস্ত্রী যেমন মনের আনন্দে ইঞ্জিন সারায়, মনের আনন্দে নিজের উপার্জন

ব্যয় করে পরিবারের ভরণপোষণের জন্যে—তেমনি এই লোকগুলোও মনের আনন্দে মানুষ খুন করে, যারা তাদেরই মত মানুষ, তাদেরই মত খায়দায় ও সুখী পরিবারের স্বপ্ন ছ্যাখে। কেন? কেন? এ-প্রশ্নের কোনো তৈরি জবাব নেই। তবুও প্রশ্নটা আমার মনে জাগছে।

তারপরে বহুক্ষণ আমি চেষ্টা করি এ-প্রশ্নের জবাব পেতে। কিন্তু ভেবে ভেবে কোনো জবাবই পাই না। দেওয়ালে ঘুষি মারতে থাকি। হাতে ব্যথা পাই, তবুও জবাবটা আমাকে এড়িয়ে চলে। আমি ভাবতে চাই না, তবুও ভেবে চলি। জবাবটা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়, সামনে এসেও ধরা দেয় না। পুরু দেওয়ালে আবারও ঘুষি মারতে থাকি। ব্যথা পাই ব্যথা থেকে শেষপর্যন্ত এমন একটা যন্ত্রণা যে আমার চিন্তাশক্তি লোপ পায়

বাইরে আবার সোরগোল। অন্য কয়েদীরা জেলে ঢুকছে। জেলের দরজায় তালা বন্ধ হবার শব্দ। গলার স্বরগুলো এখন একটা গুঞ্জনের মত, তারপরে একেবারেই থেমে গেল। মাঝে মাঝে দু-একটি কথা, দু-এক টুকরো হাসি, দু-এক কলি গান। তার মধ্যে কোনো বিষণ্ণতা নেই, কোনো বিভ্রান্ত ভাবও নয়। মনে হয়, জগৎসংসারের সঙ্গে তাদের একটা বোঝাপড়া হয়েছে। যা ঘটবেই তা ঘটুক।

আবার সেই চোরা-ফুটো খোলার আওয়াজ। একটা মুখ, কুষ্ঠরোগীর মত বীভৎস। মোটা কর্কশ একটা গলার স্বর: 'ধোঁয়া-টোয়া চলে নাকি?'

'চলে,' নিজের অজান্তেই আমি জবাব দিয়ে ফেলি, তারপরে উঠে বসি।

চোরা-ফুটোর মধ্যে দিয়ে আমার হাতে এসে পড়ল দু প্যাকেট সিগারেট, একটা দেশলাই, একটুকরো সাবান। বোঝা গেল, বন্দীদের আজ বরাদ্দ জিনিস পাবার দিন। আমি সিগারেট ধরাই। আমার ভিতরের জটগুলো ছাড়তে শুরু করে। আর হঠাৎ বেকুবের মত গান গাইতে শুরু করে দিই। এখন আর কোনো অস্বস্তি নেই। আমার মন এখন শান্ত। আমি বুঝতে পারি, আমি যতই ছটফট করি না কেন তাতে আমার কোনো সমস্যার সমাধান হবে না। এতক্ষণে ঘুম আসে, নিশ্চিন্ত একটি ঘুম।

সেদিন বিকেলে অন্য কয়েদীদের মত আমাকেও সেলের বাইরে আনা হল। দু ঘণ্টার মেয়াদ। এই সময়ের মধ্যেই স্নানাদি ও খাওয়াদাওয়া সারতে

হল। তোয়ালে ও টুথব্রাশ ছাড়া স্নানঘরে যেতে, এতগুলো লোকের সামনে একেবারে উলঙ্গ হয়ে স্নান করতে এখনো আমার ঠিক বরদাস্ত হয় না। তারপরে খাবার নিতে গিয়ে আরো অসুবিধের মধ্যে পড়তে হল। আমার আলাদা থালি নেই, অন্য একজনের খাওয়া শেষ হবার পরে তার থালিটা আমাকে ধার করতে হল।

তারপরে বিকেলবেলার রোলকলের জন্যে সার বেঁধে দাঁড়ানো। টুঁ শব্দটি করার সাহসও কারও নেই। জেলের শাসনকর্তা এল পরিদর্শন করতে। লোকটা নিগ্রো, লম্বাচওড়া জোয়ান চেহারা, মুখটা উগ্র। একটা মস্ত পাইপ মুখের সঙ্গে সাঁটা, দমকে দমকে অবিশ্রান্ত ধোঁয়া বেরোচ্ছে। হাতে একটা ঘূর্ণ্যমান বেত। এই বেতটা দেখলে আমরা কেমন অবশ হয়ে যাই। (জোয়ান নিগ্রোটার হাতটা একপাক ঘুরে গিয়ে) বেতটা যদি কারও মাথায় পড়ে তাহলে বেতটা তো দু-টুকরো হবেই, সঙ্গে সঙ্গে মাথাটারও কোনো বোধশক্তি থাকবে না।

নিগ্রোটার পেছনে পেছনে একদল রক্ষীসৈন্য, পুরোপুরি সশস্ত্র। এই লোকগুলো ইন্দোনেশীয়, রিপাব্লিকের সৈন্যদের মতই এদের অস্ত্রসজ্জা। এমনিতে চেহারার দিক থেকে কোনো তফাৎ নেই, তবুও এরা ডাচদের হাতের পুতুল, যে-ডাচরা রিপাব্লিককে ধ্বংস করতে চায়। নিজেদের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ ওদের লেগেই আছে, ফলে অনেককেই বুলেটে মরতে হয়। যে-বুলেট বিদেশে তৈরি। যে-বুলেটে রক্ত ঝরছে ইন্দোনেশীয়দের, মরছে ইন্দোনেশীয়রা।

পরিদর্শনের কাজ শেষ হতে নিগ্রোটা চলে গেল। আজ আর তার হাতের বেত কারও মাথায় ভাঙল না। পেছনে পেছনে রক্ষীরা, যেন মা-মুরগির পেছনে পেছনে একদল ছানা।

তারপরে আবার সেল। দরজায় তালাবন্ধ হওয়া। কংক্রিটের বেঞ্চিতে শুয়ে থাকা। আর শুধু ভাবনা, অদ্ভুত অসংলগ্ন সব ভাবনা।

তারই মধ্যে কখনো কখনো ভবিষ্যতের চিন্তা। কখনো কি মুক্তিলাভের সম্ভাবনা আছে? এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই। শুধু একটু আশা, যত ক্ষীণই হোক একটুখানি আশা—তাকে অবলম্বন করেই ভেসে থাকা।

মাঝে মাঝে মনে হয় শরীরটা বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে। না, জেল ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার কোনো চিন্তাই এখন করা চলে না। অতএব বেঞ্চির

উপরে টান হয়ে শুয়ে থাকা। বিশ্বের সমস্ত চিন্তার ভারে মস্তিষ্ককে ক্লান্ত করা। এখন শুধু দীর্ঘশ্বাস, কান্না আর গান।

কারাগারের নিস্তব্ধতায় একটু একটু করে তলিয়ে যাই। অনেক ইচ্ছা, অনেক বাসনা। স্বপ্নের জগতে বিচরণ। কিন্তু ঝাঁকে ঝাঁকে মশার কামড় খেয়ে আবার বাস্তব জগতে ফিরে আসতে হয়। রাত্রি যেন শেষ হতেই চায় না। ক্লান্ত চোখে ঘুম নামে যখন ভোর হতে আর বিশেষ দেরি নেই।

অনুবাদ : অমল দাশগুপ্ত

১। জাকর্তার একটি কারাগার।

২। ইন্দোনেশীয় রিপাব্লিকের নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রামাঞ্চলকে বোঝাবার জন্যে সাধারণত এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়।

৩। পি-আর-পি হচ্ছে পাসুন্দান রেপুব্লিক পাসুন্দান, পশ্চিম জাভার ডাচ প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী।

৪। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল রিপাব্লিকের বাহিনীকে দক্ষতার ভিত্তিতে দাঁড় করানো।

৫। ইন্দোনেশিয়ার মুদ্রা।

CZECHOSLOVAKIA : A BREATH OF FRESH AIR

by BOHUMYL HRABAL

এক ঝলক খোলা হাওয়া

বোহুমিল হ্রাবাল

চেকোস্লোভাকিয়া

সিমেণ্ট কারখানার ধারে একটা বেঞ্চিতে জনাকয় বুড়ো বসে আছে। তারা পরস্পরের কোটের কলার টেনে ধরে কানের কাছে মুখ নিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে চলেছে।

সিমেণ্টের ধুলো ঝির ঝির করে ঝরে পড়ছে। ঘরবাড়ি বাগান সবকিছু চুনো মাটির গুড়িতে ছেয়ে গেছে।

এমতাবস্থায় আমি ধুলোছাওয়া মাঠের দিকে অগ্রসর হলাম।

নিঃসঙ্গ একটা নেসপাতি গাছের তলায় ছোটখাটো একটি মানুষ কাস্তে দিয়ে ঘাস কাটছে।

"আচ্ছা, গেটের ওধারে ওই যে বুড়ো লোকগুলো চেঁচামেচি করছে, ওরা কারা?"

"ওইখানে, মেন গেটের ধারে? ওরা এখানকার পেনশনভোগী," এই বলে ছোটখাটো লোকটি ঘাস কেটে চলল।

"ও, কয়েকটা নিষ্কর্মা বুড়ো!" আমি বললাম।

"যা বলেন।" লোকটি জবাবে বলল, "কয়েকবছরের মধ্যে আমাকেও পাততাড়ি গুটিয়ে ওদের দলে গিয়ে ভিড়তে হবে।"

"পেনসন ভোগ করা পর্যন্ত টিকে থাকবেন তো?"

"থাকবো না বলে তো মনে হয় না। এই জায়গাটা দারুণ স্বাস্থ্যকর। এখানে সত্তরের আগে বড় একটা কেউ মরে না," এক হাত দিয়ে দুরন্তভাবে ঘাস কাটতে কাটতে ছোটখাটো লোকটি বলল। কাটা ঘাস থেকে সিমেণ্টের ধুলো উড়ে গেল, যেন ভিজে জ্বালানির আঁচের ধোঁয়া।

"কিছু মনে করবেন না", আমি বললাম, "বলতে পারেন, ওই বুড়োরা কি নিয়ে অত তর্কাতর্কি করছে? এ ওকে এত তাড়ছে কেন?"

"ওরা কারখানা নিয়ে কথা কইতে ভালোবাসে। ওরা ভাবে, ওরা এটাকে আরো ভালোভাবে চালাতে পারত। এই নিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে করতে যখন হাঁফিয়ে পড়ে, রাতের ক্ষিধেটা তখন জমে। হাজার হোক, সারা জীবন এইখানেই কাজ করেছে, এই জায়গাটার সঙ্গে ওদের নাড়ীর যোগ, এ জায়গা ছাড়া ওরা থাকতে পারে না।"

"কোথাও গিয়ে চাষআবাদ করলে তো এর চেয়ে ভালোভাবে থাকতে পারতে। বনের কাছাকাছি কোথাও গিয়ে থাকে না কেন? আর, সীমান্ত অঞ্চলে যেতে চাইলে তো একটা করে কুঁড়ে, তার সঙ্গে বাগান, এমনিই পাবে," এই বলে হাতের পিছন দিয়ে নাকটা মুছলাম, হাতের উপরে সিমেণ্টের কালো একটা রেখা পড়ে গেল।

"মরে গেলেও যাবে না," ছোটখাটো মানুষটি নিশ্বাস নেবার জন্যে একটু থেমে বলল। "মারেচেক নামে এক পেন্সনভোগী ক্লাটোভির ওধারে কোনো এক বনে বাস করতে যায়।...দু হপ্তা যেতে না যেতে তাকে অ্যাম্বুলেন্সে করে ফিরিয়ে আনতে হল। খোলা হাওয়ায় থাকার ফলে লোকটার হাঁপানি ধরে গিয়েছিল। কিন্তু এখানে ফিরে আসার দু দিনের মধ্যে তার রোগবালাই একেবারে উধাও। ওই গেটের ধারে যে-লোকটা সবচেয়ে জোর গলায় চেঁচাচ্ছে, ও সেই। যাই বলুন, এখানকার হাওয়া সত্যিই উপাদেয়, ঠিক যেন কলাই-এর ঝোল।"

"কলাই-এর ঝোল আমার ভালো লাগে না", বলে আমি নেসপাতি গাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

ধুলোভরা মাঠের উপর দিয়ে একটা জুড়ি টগবগিয়ে এগিয়ে এল, ঘোড়ার পায়ের ঝাপটায় উড়ে আসা সিমেণ্টের মেঘে গাড়িটা অদৃশ্য হল। এই মেঘের আড়ালে থেকেই গাড়োয়ান কিন্তু মহাআনন্দে গান গেয়ে চলেছে। এ পাশের ঘোড়াটা নেশপাতি গাছের ঝুলে-পড়া একটা ঝুরি টেনে ছিঁড়তেই গাছের

ডালপালা থেকে মনখানেক সিমেণ্ট ঝড়ে পড়ল। দু-হাতে হাতড়াতে হাতড়াতে সেই ধুলোর কুয়াশা থেকে টলতে টলতে আমি বেরিয়ে এলাম।

হঠাৎ আমার নজরে পড়ল, বেরোবার সময় আমি যে কালো পোশাকটা পরেছিলাম, সেটা ধোঁয়াটে হয়ে গেছে।

বললাম : "দয়া করে বলবেন এখানে জিরকা বুরগান কোথায় থাকে ?"

ছোটখাটো মানুষটি তখনও ঘাস কেটে চলেছে এবং অন্য হাতটা দিয়ে তার দোলায়িত দেহের টাল সামলাচ্ছে।

কাস্তেটা এবারে একটা ঢিপিতে গিয়ে পড়ল ; লোকটা সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে মাঠের দিকে এমন দৌড় দিল যেন তাকে ভূতে তাড়া করেছে।

"বোলতা ! বোলতা !" বলে চিৎকার করে কাস্তেটাকে সে মাথার উপর ঘোরাতে লাগল।

আমি তাড়াতাড়ি তার কাছে এগিয়ে গেলাম।

"মশাই, জানেন, জিরকা বুরগান কোথায় থাকে ?"

ছোটখাটো লোকটি তার কাস্তে দিয়ে তখন বোলতা ঠেকাতে ব্যস্ত। সেইভাবে দৌড়তে দৌড়তে চিৎকার করে বলল "আমিই জিরকার বাবা।"

"বড় আনন্দ হল আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে। আমি জিরকার বন্ধু।" আমি নিজের পরিচয় দিলাম।

"সেও খুব খুশী হবে, সে আপনাকে আশা করছে।" মিস্টার বুরগান হাঁক দিয়ে বলে আরও বেগে ছুটতে লাগলেন।

কিন্তু বোলতা ঠেকাবার জন্যে কাস্তেটা চালাতে চালাতে ভদ্রলোক দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের মাথাতেই সেটা বসিয়ে দিলেন।

তারপর স্বচ্ছন্দে তিনি আমার কাছে এগিয়ে এলেন, কাস্তেটা তাঁর মাথায় টুপীতে পালকের মত আটকে রইল।

আমরা বাড়ির দরজায় এসে হাজির হলাম।

মিস্টার বুরগানের চোখের পাতাটুকুও কুঞ্চিত হল না। রক্তের ধারা তাঁর কানের পাশ দিয়ে ধুলোর পরত ভেদ করে গড়িয়ে এসে চিবুকের নিচে বড় বড় ফোঁটায় পরিণত হল।

"কাস্তেটা না হয় আমিই তুলে দিচ্ছি", আমি বললাম।

"পরে হবে। হয়ত আমার ছেলে আমাকে আঁকতে চাইবে। এই— ইনিই আমার স্ত্রী !"

গেট পার হয়ে গোলগাল একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এলেন। তাঁর জামার আস্তিনটা গোটানো, হাত দুটো তেল জবজব করছে, মনে হচ্ছে এই একটা হাস ছাড়িয়ে এলেন। একটা চোখের পাতা আরেকটা থেকে নিচু এবং নিচের ঠোঁটটা ঝুলছে।

"আপনাকে আমি আসতে দেখেছি," মহিলা আমার হাতটা মর্দন করতে করতে বললেন, "আসুন, ভেতরে আসুন।"

গেট দিয়ে ছুটে বেরিয়ে এল জিরকা। টুকটুকে গাল একটি তরুণ; এসেই এক হাত দিয়ে আমার হাতটা ধরে নাড়া দিয়ে অন্য হাতে চারদিক দেখিয়ে বলে উঠল: "কি চমৎকার? কেমন আমি মিথ্যে বলেছি, না, বলি নি? কি রঙের বাহার! কি সুন্দর প্রকৃতি! কি অপরূপ দৃশ্য!"

"সত্যিই অপরূপ, কিন্তু আগে দেখ তোমার বাবার কি হয়েছে," আমি বললাম।

"কি হয়েছে?" জিরকা ফিরে তাকিয়ে বলল!

মিস্টার বুরগানের মাথা থেকে প্রকাণ্ড একটা ঠোঁটের মত যে-কাস্তেটা বেরিয়ে ছিল সেটাকে একটু নাড়া দিয়ে বললাম, "কি? এই দেখ!"

"উঃ!" মিস্টার বুরগান চেঁচিয়ে উঠলেন।

"ও, এই," বলে আমার বন্ধুবর হাত নেড়ে এমন ভাব করল যেন কিছুই হয় নি। "আমি ভাবলাম কি না কি হয়েছে। মা, দেখেছ, বাবা নিশ্চয় আবার বোলতা মারতে গিয়েছিল। বাবা, নাঃ তোমাকে নিয়ে আর পারা যায় না!" জিরকা বাবাকে ধমক দিয়ে হাসতে হাসতে বলে চলল: "আমাদের এইরকম একটা না একটা মজা লেগেই আছে। একবার আমাদের কতকগুলো খরগোসের বাচ্চা চুরি হয়ে যায়। বাবার মাথায় সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি খেলে গেল। খরগোসের খাঁচার সঙ্গে এমন কায়দা করে একটা তক্তা লাগিয়ে দিলেন যে রাত্রে সেই তক্তায় কেউ পা ছোঁয়ালেই নিচে ময়লার গাদায় গিয়ে পড়বে। ওই দেখুন না, খরগোসের বাসাগুলো ঠিক ময়লার গাদার পাশেই। তারপরে যা হবার তাই হল, বাবা তার কথা বেমালুম ভুলে গেলেন এবং সকালে দেখা গেল তিনি নিজেই তার মধ্যে পড়ে রয়েছেন।"

"খাদটা তেমন নিচু নয়," মিস্টার বুরগান বললেন।

"তবুও কতটা, বলত?" জিরকা জিজ্ঞাসা করল।

"এই পর্যন্ত হবে" মিস্টার বুরগান নিজের গলাটা দেখালেন।

"একদম ঠিক!" জিরকা হো হো করে হাসতে হাসতে বলে চলল, "আরেকবার বাবার সেনিটারি ইন্‌স্‌পেক্টর সাজতে সাধ হয়েছিল। এক বালতি কারবাইড এনে পায়খানার মধ্যে ঢেলে দেন। পরক্ষণেই সেইখানে তাঁর পাইপের আগুনটাও ঝেড়ে ফেললেন। অমনি কামানের মত বিরাট একটা আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে আমি ছুটে গিয়ে দেখি কি, মণ পাঁচেক বিষ্ঠা শূন্যে ছিটকে পড়েছে, আর বাবা কুড়ি ফুট উঁচুতে সেই বিষ্ঠাবর্ষণের মধ্যে পাক খাচ্ছেন। ভাগ্যি ভালো, বাবা পাক খেয়ে এসে পড়লেন গোবরের গাদায়!"

"হাঃ হাঃ হাঃ", শ্রীমতি বুরগানের ভুঁড়িটা আনন্দে নাচতে লাগল।

"উঁহু, ঠিক হল না, গোবরের গাদা থেকে কুড়ি ফুট উঁচুতে নয়," মিস্টার বুরগান মৃদু প্রতিবাদ জানালেন। তাঁর কানের পাশের রক্তের ধারা জমে গিয়ে এনামেলের মত চকচক করছে।

"তাহলে কত ফুট উঁচু?" জিরকা জিজ্ঞাসা করল।

"খুব বেশি হলে পনেরো ফুট···আর বিষ্ঠাও মনে হয় চার মণের কাছাকাছি ছিল," এই বলে মিস্টার বুরগান মন্তব্য করলেন, "জানেন তো, আমাদের ছেলে শিল্পী, তাই সব কিছুই ও একটু বাড়িয়ে বলে।"

"তা বটে," আমি বললাম, "কিন্তু, কিছু মনে করবেন না, আপনার মাথার ওই কাস্তেটার জন্যে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছি।"

"ও কিছু না, ওর জন্যে ভাববেন না," শ্রীমতি বুরগান এই বলে কাস্তের হাতলটা ধরে জোরে একটা টান দিতেই ক্ষত জায়গা থেকে সেটা বেরিয়ে এল।

"এর দরুণ মিস্টার বুরগানের রক্ত বিষিয়ে যাবে নাতো?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"না না, এখানকার খোলা হাওয়ায় সব কিছু সেরে যায়," মহিলা বললেন। হাতটা গুটিয়ে নিয়ে মিস্টার বুরগানের কপালে সাদরে টোকা মেরে তিনি বললেন, "সবচেয়ে ভালো হয় যদি রোজ সকালে উঠে বুড়োর কপালের ঠিক মাঝখানটায় এক ঘা করে দেওয়া যায়। কেন বলছি জানেন? বুড়ো মহা জ্বালাতনে ছেলে।" মহিলা চুলের মুঠি ধরে তাঁর স্বামীকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নলকূপের তলায় নিয়ে এসে একহাতে কলের তলায় রক্তাক্ত মাথাটা ঠেলে দিয়ে অন্য হাতে পাম্পের হাতল চালাতে শুরু করে দিলেন।

"জানেন," জিরকা বলল, "বাবা মূর্তিমান একটি আতঙ্ক। এ বছর ছুটিতে বাবার খেয়াল হল ছাদের জলনালীগুলো মেরামত করতে হবে।

যেই খেয়াল সেই কাজ। ছাদের ধারের আলসের উপর দিয়ে হাসতে হাসতে বাবা হেঁটে চললেন। নিচে সিমেণ্টের চত্বরে মাকেও চরকির মত পাক খেতে হল, যদি উলটিয়ে পড়েন, মা চট করে অ্যাম্বুলেন্সে তাহলে খবরটা দিয়ে আসতে পারবেন। চোদ্দ দিনের দিন, বাবা শেষপর্যন্ত সাবধান হলেন, একটা দড়ির সঙ্গে নিজেকে বাঁধলেন। সেইদিনই বাবা পড়লেন এবং পায়ে দড়ি বাঁধা অবস্থায় ঝুলতে লাগলেন। জানলা দিয়ে বাবার তেষ্টা মেটালাম। মা এদিকে নিচের চত্বরে আমাদের যত লেপতোষক ছিল সব জড় করতে লাগলেন। যখন বাবার পায়ের দড়িটা কেটে দিলাম, সর্বনাশ, মাথা নিচু অবস্থায় বাবা গিয়ে পড়লেন লেপতোষকগুলোর বাইরে একেবারে সিমেণ্টের উপর।"

"হাঃ হাঃ হাঃ", শ্রীমতী বুরগানের হাসি আর থামে না। "একেবারে সিমেণ্টের উপর, কিন্তু তাতে কি, সন্ধ্যেবেলায় আড্ডাখানায় ঠিক হাজির!" বলে তিনি পাম্পটা চালিয়ে চললেন।

"বাবা মোটর-বাইকও চালান," যাতে তার বাবার কানে যায় জিরকা গলা চড়িয়ে বলল। "চেনা ড্রাইভাররা আমাদের প্রায়ই বলে: 'কিছু মনে করো না, তোমার ওই বাবাটি গাড়ি চালানোর নিয়মকানুনে এমন দুরন্ত যে একদিন তাকে ঝুড়িতে করে বাড়িতে বয়ে আনতে হবে।' হাঃ হাঃ হাঃ। একদিন সত্যিই বাবা বাড়ি ফিরলেন না আমরা একটা ঝুড়ি নিয়ে বাবার খোঁজে বেরুলাম। যখন আমরা একটা মোড় পার হচ্ছি হঠাৎ মনে হল পাশের কাঁটা ঝোপের ভেতর থেকে কি যেন ব্যা ব্যা করছে। তাকিয়ে দেখি… ..সর্বনাশ…কি বলুন তো?"

"হাঃ হাঃ হা?" শ্রীমতি বুরগান তাঁর স্বামীর মাথাটা পাম্পের তলায় চেপে ধরলেন।

"বাবা আর তাঁর বাইক কাঁটাঝোপে আটকে রয়েছে!" হাসতে হাসতে জিরকার দম বন্ধ হয় আর কি। "বাঁকটা তিনি দেখতে পান নি, ফলে সরাসরি একেবারে ঝোপের ভেতরে গিয়ে পড়েছেন।……সেইখানে হ্যাণ্ডেলে হাত রেখে বাইকের ওপর পুরো দু ঘণ্টা বসে আছেন……একটু নড়াচড়ার জো নেই, কারণ সর্বাঙ্গে কাঁটা বিঁধে রয়েছে এবং লতায় ঝাড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা।"

"একটা কাঁটা আমার নাকের ভেতরে চলে গিয়েছিল, আরেকটা আমার চোখের পাতা খোঁচা দিয়ে তুলে ধরেছিল……সেইসঙ্গে আমার কি হাঁচি

পাচ্ছিল!" মিস্টার বুরগান মাথাটা তুলে চেঁচিয়ে বললেন, শ্রীমতি বুরগান সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চুলের মুঠিটা ধরে মাথাটাকে আবার পাম্পের তলায় ঠেসে ধরলেন।

"বাবাকে কাঁটা থেকে কি করে উদ্ধার করে আনলে?" আমি উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করলাম।

"প্রথমে আমরা ভেড়ার লোম কাটা কাতানী নিয়ে এলাম, তারপরে মালীদের কাঁচি আনলাম, তারপর ঝোপঝাড়গুলোর ওপরে খুব একটা জটিল ধরণের অপারেশন চালান হল, এইসব করে ঘণ্টাখানেক পরে বাবাকে বার করা গেল," জিরকা বলল। মিস্টার বুরগানের কিছু একটা বলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি মাথা তোলার চেষ্টা করতেই কলের নলটায় কাঁধে একটা ধাক্কা খেলেন।

কাছাকাছি একটা পাহাড় থেকে একটা আলোর ঝলকানি দেখা গেল, সঙ্গে সঙ্গে বিরাট আওয়াজ।

"দশটা বাজল," জিরকা বলল।

"হতচ্ছাড়ারা", জিরকার মা সস্নেহে বলে পাহাড়টার দিকে তাকালেন। পাহাড়ের খানিকটা খোলা জায়গা থেকে একটা সাদা মেঘ ছড়িয়ে পড়ছে।

পাহাড়টার উপরে ধূলো-মাখা পাইনগাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে কয়েকজন সৈনিককে দেখা গেল। তাদের মধ্যে একজন খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল। একটা পতাকার নিশানা পেয়ে সে একটা হাতবোমার মুখ খুলে ফেলল, তারপর খোলা জায়গায় সেটা ছুঁড়ে দিয়ে মাটিতে সটান শুয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণের শব্দ, তারপরে সাদা ধোঁয়ার মেঘ। সূর্যমুখী ও হেজেলের ঝোপে জমে থাকা সিমেন্টের গুঁড়ি ঝরাতে ঝরাতে ঝাপটাটা নিচে নেমে এল।

"হতচ্ছাড়ারা", শ্রীমতি বুরগান মৃদুস্বরে বললেন।

অতঃপর তাঁর স্বামীকে চুলের মুঠি ধরে পাম্প থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে তাঁর চুলগুলো পিছনে সরিয়ে সযত্নে ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা করলেন।

"খোলা হাওয়ায় আপনিই শুকিয়ে যাবে," বলে মহিলা আমাকে ভিতরে আসবার জন্যে সাদর ইশারা করলেন।

রান্নাঘরে কয়েক ডজন ধুলোমাখা ছবি ঝুলছে।

শ্রীমতি বুরগান প্রতিটি ছবির নিচে একটা চেয়ার টেনে এনে অনেক কষ্টে

উপরে উঠে একটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে যেই কানভাসটাকে মুছে দিচ্ছেন অমনি রঙের জৌলুস রান্নাঘরময় ছড়িয়ে পড়ছে।

প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর সামরিক শিক্ষাশিবির থেকে বোমা ফাটার ঝাপটায় বাড়িটা কেঁপে উঠছে এবং রান্নাঘরের তাকে কাপপ্লেটগুলো ঝনঝন করে উঠছে। যতবার হাতবোমা ছোঁড়া হচ্ছে ততবার চাকালাগানো পিতলের পালংটা গড়িয়ে যাচ্ছে এবং প্রতিবারই শ্রীমতি বুরগান বিস্ফোরণের দিকে তাকাচ্ছেন এবং সস্নেহে বলছেন "হতচ্ছাড়ারা"…। মিস্টার বুরগান তাঁর কাস্তে দিয়ে ছবিগুলো দেখিয়ে বললেন।

"ভাবতে পারেন, আমাদের ছেলে যখন ওই 'দক্ষিণ বোহিমীয় হ্রদে সূর্যাস্ত' ছবিটা আঁকে, তখন সে যে জুতো পরেছিল তা তার মাপের থেকে অনেক ছোট, যখন সে " 'কার্ল্‌স্‌টেইন'এর বিশেষত্ব" ছবিটা আঁকে, তখন সে জুতো ফুটো করে সোয়া ইঞ্চি পেরেক নিজের গোড়ালিতে বিঁধিয়ে দেয়।…… এই ছবিটা, আমাদের ছেলে যখন এই " 'লিটোমিস্‌ল্‌'এর কাছে বাঁচবন" ছবিটা আঁকে, সারাদিন সে পেচ্ছাপ বন্ধ করে ছিল,—আর এইটে, চেয়ে দেখুন,…এই 'প্রিবিস্লাভে বিচরণরত ঘোড়া' এই ছবিটা নিয়ে যখন সে কাজ করছিল, সে নর্দমার নোংরায় কোমর পর্যন্ত নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিল।… যখন সে 'পাহাড়ের চূড়ায়' ছবিটা আঁকে, তার আগে তিনদিন সে কিছু মুখে দেয় নি।"…

মিস্টার বুরগান কথা বলে চলেছেন আর শ্রীমতি বুরগান প্রতিটি ছবির নিচে একটা চেয়ার টেনে এনে অনেক কষ্টে উপরে উঠে ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে ছবিগুলো মুছে দিচ্ছেন এবং প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে বিস্ফোরণের দিকে তাকাচ্ছেন এবং প্রতিবারই সস্নেহে বলছেন: "হতচ্ছাড়ারা।"

দুপুর গড়িয়ে গেল এবং পিতলের পালংটা চাকায় চড়ে উল্টোদিকের দেওয়ালে এসে ঠেকল।

মিস্টার বুরগান শেষ ছবিটির দিকে নির্দেশ করে বললেন।

"আমাদের ছেলে এই ছবিটির নামকরণ করেছে 'শীতের দৃশ্য,'। পায়ের জুতো খুলে, ট্রাউজারের পায়াদুটো হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে পুরো একঘণ্টা ধরে বরফজলের মধ্যে দাঁড়িয়ে এইরকম দৃশ্য দেখতে দেখতে এই ছবিটা তার মনে দানা বাঁধে…"

"হতচ্ছাড়ারা," বলে শ্রীমতি বুরগান চেয়ার থেকে নেমে এলেন।

অতঃপর অস্বস্তিকর এক নিস্তব্ধতা।

শ্রীমতি বুরগান পিতলের পালংটাকে রান্নাঘরের ওধার থেকে এধারে আবার ঠেলে আনলেন।

"ছবিগুলি চমৎকার, গভীর আবেগ দিয়ে আঁকা," আমি বললাম, "কিন্তু জিরকা ছোট জুতো পরে কেন, কেনই বা আঁকবার সময় গোড়ালিতে পেরেক ফোটায়, কেনই বা খালিপায়ে বরফজলে পা ডুবিয়ে থাকে, এটা কিন্তু বুঝলাম না।"

জিরকা লজ্জায় রাঙা হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

"আসল কথা কি জানেন," মিস্টার বুরগান আমাকে বুঝিয়ে বললেন, "আমাদের ছেলে আর্ট ইস্কুলে আঁকা শেখে নি কিনা, তাই তার শিক্ষার অভাব জোরালো অভিজ্ঞতা দিয়ে পুরিয়ে নেয়···সত্যি কথা বলতে কি, আপনাকে এইজন্যেই আমরা আনিয়েছি··আমরা জানতে চাই আমাদের ছেলে প্রাগে গিয়ে তার শিল্পচর্চা বজায় রাখতে পারবে কিনা।"

"জিরকা," আমি বললাম, "তুমি কি বলতে চাও, তুমি এই ছবিগুলো খোলা জায়গায় এঁকেছ? এইসব আশ্চর্য রঙ তুমি কোথায় দেখলে? নীলের পাশে ওইভাবে লাল কি করে দিতে পারলে? ইম্‌প্রেসনিস্ট গোষ্ঠীর যে-কোনো শিল্পী ওই রকম রঙ লাগাতে পারলে গর্ব বোধ করত। কোথা থেকে তুমি এ সবের সন্ধান পেলে?"

মিস্টার বুরগান তাঁর কাস্তে দিয়ে পর্দাটা নামাতে গিয়ে এক ঝুড়ি ধুলো উড়িয়ে দিলেন।

"ওই দেখুন," তিনি গলা চড়িয়ে বললেন, "কত রঙ দেখেছেন? এই রান্নাঘরের প্রায় সব ছবিই এইসব অঞ্চল থেকে এঁকেছে। রঙের কি ঘটা একবার তাকিয়ে দেখুন!"

মিস্টার বুরগান পর্দাটা ফাঁক করে ধরলেন, তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি বাইরের দিকে তাকালাম। প্রকৃতি এমন ধূমল যেন একপাল বুড়ো হাতি। সামান্য আন্দোলনে সেখানে সিমেণ্টধুলোর বিলম্বিত পতাকা উড়ছে; দেখলাম, একটা ট্রাক্টর ধোঁয়াটে জমির মধ্যে দিয়ে একটা ঘাসকাটা যন্ত্র টেনে চলেছে এবং তার ফলে এমন ধোঁয়ার মেঘ উঠছে যে, মনে হচ্ছে, ধুলোভর্তি রাস্তা দিয়ে একটা ছ্যাকড়া গাড়ি চলেছে। তিন চারটে খেত

দূরে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশে দাঁড়িয়ে একটি লোক খড়ের আঁটি গাড়িতে বোঝাই করছে। প্রতিবার সে একটা করে আঁটি তুলছে, আর সেই আঁটিটা থেকে এমন ধুলোর ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে যে মনে হচ্ছে আঁটিটায় বুঝি আগুন লেগেছে।

"দেখছেন, কী রঙের ঘটা!" মিস্টার বুরগান তাঁর হাতের কাস্তেটা নাড়া দিয়ে বললেন।

খোলা জায়গায় একজন সৈনিক বেরিয়ে এল, তার হাতবোমাটা ঠিক করে নিয়ে দূরে সেটাকে ছুঁড়ে দিল।

পিতলের পালংটা আবার সরে গেল।

শ্রীমতি বুরগান এই প্রথম দেখলাম চুপ করে রইলেন।

"হতচ্ছাড়ারা!" আমি বললাম।

শ্রীমতি আমার জামার আস্তিন ধরে একটা চোখের পাতা চাপাটির মত ঝুলিয়ে মা মা গলায় আমাকে ধমকে দিলেন: "উঁহু, তাই বলে আপনি নয়, আপনার বলা সাজে না। আপত্তি জানাতে পারি শুধু মাত্র আমরাই আমরা আপত্তিও জানাই না। শুধু একটু গজরাই। এও এক ধরনের খেলা ওরা তো আমাদেরই সৈনিক। ঘরের লোকদের নিয়ে এরকমটা চলে এক বাড়ির মধ্যে যা খুশী তাই করা চলে, একে ওকে মুখ করুন, বা কাউকে বললেন বের হয়ে যেতে, তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু এক পরিবারের লোকের মধ্যেই তা শুধু চলে। তারা ছাড়া আর কেউ তা বলতে পারে না, কখনো না। শুধু জিরকা আর আমিই কর্তাকে নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করতে পারি···কিন্তু আর কেউ করতে আসুক দেখি···যাক, আপনার কি মনে হয়? আমাদের ছেলেটা কি প্রাগে যাবে? আপনি কি মনে করেন ওখানে গিয়ে ও চেক ছবিতে নতুন কিছু কি দিতে পারবে?"

শ্রীমতি বুরগান প্রশ্ন করে এমন প্রজ্ঞাচোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন যে, সেই চাউনি থেকে আমার মনের কোণের সূক্ষ্মতম ভাবনার এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

"প্রাগ তো প্রসব করানোর ফোরসেপ," সাহস করে বলে আমি চোখ নামিয়ে নিলাম, "ওই ছবিগুলো তো শুধু মাংসপিণ্ড নয়, ওগুলো পুরোপুরি ছবি। আমার মতে ওর যাওয়া উচিত সুনামের জন্যে···"

"দেখি কী করা যায়," শ্রীমতি বুরগান বললেন।

মিস্টার বুরগান পাশের ঘরের দরজা খুলে কাস্তে দিয়ে সেদিকে দেখিয়ে বললেন :

"দেখছেন, ও মূর্তিও গড়ে," বড় গলায় বলে তিনি বিরাট বিরাট পেশী সমন্বিত প্লাস্টারের একটা মূর্তিতে কাস্তে দিয়ে টোকা দিলেন, "এই মূর্তিটা 'বরাহবিহীন বিভোজ'এর।"

"কী ভীষণ! দেখুন, দেখুন, হাতের পেশীগুলো দেখুন! জিরকা, কে তোমার মডেল হয়েছিল? কোনো পালোয়ান, না, কুস্তিগীর?"

জিরকা লজ্জায় লাল হয়ে মুখ নিচু করে রইল।

"পালোয়ানও না, কুস্তিগীরও না," মিস্টার বুরগান বুঝিয়ে বললেন, "আমি মডেল হয়েছিলাম!" এই বলে কাস্তে দিয়ে নিজেকে দেখালেন।

"আপনি?"

"হ্যাঁ, আমি।" ক্ষুদ্রকায় মিস্টার বুরগান হাসতে হাসতে আমার সন্দেহ নিরসন করলেন। "ছোঁড়াটা নিজের মনেই সব ভেবে ঠিক করে নেয়। কলের জল পড়ার টপ টপ শব্দ শুনে ও পেন্সিল তুলে নিয়ে নায়গারা জলপ্রপাত মক্স করে। আঙুলে একটু খোঁচা লাগলে কত কম খরচে অন্ত্যেষ্টি হতে পারে তাই জানতে ছোটে। স্বল্পতম উদ্দীপনার বৃহত্তম ফল," তিনি একটু চোখ টিপে যোগ করলেন।

"এই সব ব্যাপার আপনি এত ভালো করে কী করে বুঝলেন, মিস্টার বুরগান?" আমি বললাম।

"কেন বুঝব না, আমি যে শহুরে মানুষ।" কাস্তে দিয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে সবিস্ময়ে তিনি বললেন। "আপনি শেক্সপীয়রের ট্রয়লাস ক্রেসিডা দেখেছেন? বছর পঁচিশেক আগে ভিনোরাডি থিয়েটারে যখন এই নাটকটির অভিনয় চলে, তাতে আমার একজন পথচারীর পার্ট ছিল। পঞ্চম দৃশ্যে অধিকারী মশায়ের দরকার হল দুটি উলঙ্গ মূর্তির। মূর্তি দুটো থাকবে কার্নিশের ওপর বসানো। ব্রোঞ্জের রং মেখে আমি একটা মূর্তি সাজলাম, অপর মূর্তি সেজেছিল একটি মেয়ে। এইভাবে যতদিন অভিনয় চলেছে উলঙ্গ অবস্থায় একেবারে নিশ্চল হয়ে জলজলে আলোর সামনে আমাদের কার্নিশে বসে থাকতে হত, আর সিনশিফটাররা ওপর থেকে আমাদের, বিশেষ করে সুন্দরী মেয়েটির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত।...তারপর, ট্রয়লাস ক্রেসিডার অভিনয় যখন বন্ধ হয়ে গেল আমি সেই উলঙ্গ ব্রোঞ্জ

মেয়েটির কাছে বিয়ের কথা পাড়লাম। মেয়েটিও রাজি হয়ে গেল…তারপর থেকে আমরা দুজনে পঁচিশ বছর ধরে ঘর করছি…”

“উনিই সেই ব্রোঞ্জ মূর্তি?” আমি বললাম।

মিস্টার বুরগান হেসে মাথা নাড়লেন।

“পঞ্চম দৃশ্যে যে মেয়েটি কার্নিশে বসে থাকত?”

মিস্টার বুরগান হেসে মাথা নাড়লেন।

“একটু খোলা হাওয়া আসুক, কী বলেন?” শ্রীমতি বুরগান জিজ্ঞাসা করলেন।

সিমেণ্টধুলোয় কারপেটটা ভরে গেল।

“কখনো যদি শরীর জুড়োতে চান,” শ্রীমতি বুরগান বললেন, “আমাদের এখানে এসে হপ্তাখানেক থেকে যাবেন।”

“ওরা কি সব সময় হাতবোমা ছোঁড়ে?” আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

“না, না,” বলে মহিলা তাক থেকে ধুলো সাফ করার যন্ত্রটা তুলে নিলেন, “কেবল সোমবার থেকে শনিবার অবধি, তাও দশটা থেকে তিনটে পর্যন্ত। কিন্তু রবিবারগুলোয় এত মন খারাপ হয়ে যায়। এমন চুপচাপ নিস্তব্ধ, কানে তালা ধরে যায়। অত চুপচাপ অসহ্য। আমরা তাই রেডিও খুলে দিই। জিরকা সারাদিন ধরে হারমোনিয়াম পোঁ পোঁ করে। তখন ভাবতে ভালো লাগে আরেকটা রাত পোহালেই আমাদের ছেলেদের আবার দেখতে পাওয়া যাবে…” শ্রীমতি বুরগান বুঝিয়ে বললেন।

“কিন্তু সত্যি বলছেন, আপনারা দুজনে ব্রোঞ্জ রং মেখে কার্নিশে উলঙ্গ হয়ে বসে থাকতেন? ঠাট্টা করছেন না?” আমি বললাম।

“না, না, ঠাট্টা নয়,” শ্রীমতি বুরগান এই বলে তাঁর স্বামীকে ধুলো সাফ করা যন্ত্রটা দিতে থপ থপ করে এগিয়ে গেলেন।

“যাও”, মহিলা বললেন, “দেওয়ালের ধারের ফুলগাছের তলাগুলো সাফ করে এসো, পরে আমি যাচ্ছি। ভদ্রলোকের জন্যে চমৎকার একটা অ্যাস্টার ফুলের তোড়া তৈরি করে দিই। হতচ্ছাড়ারা…” মহিলা সস্নেহে জানলার বাইরে পাহাড়টার দিকে চাইলেন। খোলা জায়গাটা থেকে একটা সাদা মেঘ ফুলভর্তি একটা কার্পাস গাছের মত উপরদিকে উঠে যাচ্ছে।…

অনুবাদ : সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

CHINA : A HEART-WARMING SNOWY NIGHT *by* LIU PAI-YU

তুষার-ঝড়ের রাতে

লিউ পাই-ইউ

গোড়ায় রাত্রিটা ছিল এত অন্ধকার যে নিজের আঙুল পর্যন্ত দেখা যায় না। তারপর একটা তুষার-ঝড় এসে যেন সব কিছুকে একেবারে মুছে দিল। আমরা পথ হারিয়ে ফেললাম এবং জনহীন পোড়ো জায়গায় ঘুরতে লাগলাম। আমাদের চারটে ঘোড়া চেঁচাচ্ছিল ও খুবই কষ্ট করে গাড়িটাকে টানছিল। আর উদ্বিগ্ন বুড়ো গাড়োয়ানটা জোরালোভাবে চাবুক হাঁকড়াচ্ছিল। হাড়-কাঁপানো সেই রাতে এমনভাবে কতটা পথ যে চলেছিলাম তা ঠিক জানি না। ঠিক কোন্ জায়গাটাতে যে আছি তারও কোনো ধারণা ছিল না আমাদের।

চীন

একটা ছোট পাহাড়ের চূড়ায় ওঠা মাত্র দূরে অগণ্য ইলেকট্রিক-আলো আমাদের নজরে পড়ল। আঃ, এই তো! দুমড়ে-মুচড়ে আমরা শেষ পর্যন্ত একটা জনবসতিতে মুখ থুবড়ে পড়েছি। তুষার-ঝড় সত্ত্বেও আমরা বেশ খুশি হয়ে উঠলাম। একজন গানও গেয়ে উঠল। এমনকি ঘোড়াগুলোরও তাকত বেড়ে গেল—উজ্জ্বল আলোর দিকে গাড়িটা উড়ে চলল।

কাছে এসে গাড়োয়ান বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠল: 'ও! এ তো বড় বাঁধের জায়গাটা!'

নিশ্চিত আমরা মুঙ্গারি নদীর তীরে এসে পৌঁছেছি।

এইখানে বাঁধের অন্ধকার অংশটা আলোকিত অংশটাকে অনেকটা ঢেকে রেখেছে। এক সার বাড়ির জানলায় আলো দেখে আমরা নিজেদের একটু গরম করে নেবার চেষ্টায় সেই দিকে এগোলাম। সব কিছুর আগে একটু উত্তাপ দরকার। তারপর রাস্তার হদিশ নেওয়া যাবে।

ভারী কাঠের দরজা ঠেলে ঢুকতেই উষ্ণ বাতাস আমাদের মুখে লাগল। লাল ইটের কোটরে অগ্নি-উত্তাপ—তার পাশে কয়েক মিনিট দাঁড়াতেই আমার চোখের পাতায় আটকে-থাকা বরফের কুচিগুলো গলে অশ্রু হয়ে ঝরল।

বাড়িটা স্থুল গোছের একটা অস্থায়ী ব্যাপার মাত্র। রান্নাঘরের লাগোয়া বলে এ ঘরটা অবশ্য বেশ গরম। রান্নাঘর থেকে আলু ও টক বাঁধাকপির ঝোলের লোভনীয় গন্ধ ভেসে আসছিল। এ ঘরটা সাদাসিধে একটা অফিস-ঘর। তুষারের মত সাদা কাচের ঘেরাটোপ-পরানো একটা বালবের তলায় টেবিলে মাথা নিচু করে কিছু লোক কর্মরত। বেত দিয়ে মোড়া দেওয়ালে একটা বই ঝুলছে—'পরিকল্পনা—দৈনিক কাজের খতিয়ান।' এর পাশে অনেকগুলো ম্যাপ ও চার্ট সেঁটে রাখা আছে।

পেছনের দেওয়ালের গায়ে একটা বড় ইঁটের তৈরি প্লাটফর্ম ; তার উপরে বহু-রঙা কতকগুলো লেপ। তাছাড়া রয়েছে জরিপ করবার তেপায়া স্ট্যাণ্ড, লাল ও সাদা চিহ্ন দেওয়ার সরঞ্জাম, এবং যন্ত্রপাতি রাখবার কালো একটা চামড়ার ব্যাগ। এই জরিপী সরঞ্জামের স্তূপ ও অত্যন্ত কর্মব্যস্ত আবহাওয়ার মধ্যে একটা বেহালার বাক্স দেখে বেশ আগ্রহ বোধ করলাম।

দরজার চৌকাঠের পশুলোমজ আবরণের জন্যে, অথবা কাজে অত্যন্ত নিবিষ্ট ছিল বলে, ঘরের লোকেরা কেউ আমাদের আসবার কোনো শব্দ শুনতে পায় নি। তারা খুব মনোযোগ দিয়ে কাজ করে যাচ্ছিল। একটি মেয়ে তার নিচের ঠোঁট কামড়ে ধরে রুলার দিয়ে কিছু আঁকছিল। এই মেয়েটি মাথা তুলে চুলের গোছাটা পেছন দিকে সরিয়ে দেবার সময় আমাদের দেখতে পেল, এবং বিস্ময়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল: 'আ! এত দেরী হোলো কেন? কালকেও পরিদর্শক-দল অন্ধকার হয়ে যাবার পরে এসেছে।'

স্থির পুকুরের জলে যেন একটা ঢিল পড়ল। শান্ত অফিস তরঙ্গিত হয়ে উঠল। মেয়েটি দ্রুত বাইরে গেল এবং ফিরে এল। বেঞ্চি আনল, গরম চা আনল। সারাক্ষণ সে নানা প্রশ্ন বর্ষণ করতে লাগল, আর বহু খবর সে নিজেও আমাদের দিল। কয়েকবার আমি কিছু বলার জন্য মুখ খুলতে চেষ্টা করলাম।

কিন্তু বলবার কোনো সামান্য সুযোগও না দিয়ে সে দ্রুত পায়ে ঘর থেকে অন্তর্হিত হলো। আবার একটু বাদেই ফিরে এসে সে তার দিনের কাজের খতিয়ান দিতে লাগল।

এই প্রোজেক্টের ভারপ্রাপ্ত মানুষটির কথা সে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে আমাদের কাছে বলল, মানুষটি তখন বাইরে—প্রোজেক্টে। আমাদের একটু বিশ্রাম হয়ে গেলে মেয়েটি তার কাছে আমাদের নিয়ে যাবে। ছোট্ট একটি ঘূর্ণির মত, সে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই 'পরিদর্শকদের' জন্য সবকিছু ব্যবস্থা করে ফেলল। আমি আমার সঙ্গীদের চোখ টিপে দিলাম। সে আমাদের যে-ভূমিকায় বসিয়েছে, আমরা সেই ভূমিকাতেই অভিনয় করব বলে ঠিক করলাম। এখানে একটু গরম পেয়ে গাড়োয়ান দাঁত বার করে হেসে বাইরে গেল তার ঘোড়াগুলোকে খাওয়াতে।

গর্জনমুখর বাতাসের ঝাপটায় তুষারকণাগুলো আলোকিত জানলার উপর এসে পড়ছিল।

আধ গ্লাস গরম চা শেষ করবার আগেই মেয়েটি একটি লাল স্কার্ফ মাথায় জড়িয়ে নিয়ে বলল, 'ওঠা যাক। চলুন, আমাদের কাজের জায়গাটা দেখবেন।' নক্‌সা আঁকবার টেবিলের ওধারে একটি যুবক দাঁড়িয়ে উঠে মেয়েটিকে বলল, 'খুদে কুয়ান্‌, বাইরে বেয়াড়া রকমের তুষার পড়ছে। আমি ওঁদের নিয়ে যাচ্ছি।'

খুদে কুয়ান নামে সম্বোধিত মেয়েটি বলল, 'না, না, খুদে চ্যাং, আমি যাব।' সে যেন ধাক্কা দিয়েই আমাদের দরজার বাইরে আনল।

তুষারের মধ্য দিয়ে কোনোক্রমে পথ চলে আমরা বাঁধটির উপরে এলাম। আঃ! কী দৃশ্য! আলোর প্লাবনে জায়গাটা দিনের মত। তখন আমার মনে হো'লো—এ নিশ্চয়ই ওয়ান্‌চিন্‌ কৃষি-সমবায়ের পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের জায়গাটা। জলাধার তৈরি প্রায় সম্পূর্ণ। কালো পাইথনের মতো একটা মোটা টিউব এর থেকে জল টানছে, এবং খড়ের ছাউনির নিচে একটা পাম্প্‌-এঞ্জিন পুট্‌-পুট্‌ শব্দ করছে।

বুট জুতো আর রবারের প্যাণ্ট পরে লোকেরা বরফের মত ঠাণ্ডা জলের মধ্যে কাজ করছে। লম্বা তারে বাঁধা কপিকলে ঝুলছে আটার-মাফিক-জমানো কংক্রিট-প্রস্তর, পাম্প্‌-ঘরের ভিত্‌ আধখানা পাতা হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা জায়গা খোঁড়া হয়েছে—তার গা বেয়ে নেমেছে ধাপে ধাপে সরু পথ। সিমেণ্ট ও মাটি নিয়ে লোকের অবিরাম প্রবাহ এই পথে উঠছে-নামছে। বাতাসে

ইলেকট্রিক বাল্‌ব্‌গুলি দুলছে। তুষার ঝরছে ও হাওয়ায় এলোমেলোভাবে নাচছে—পাতলা সাদা কাপড় যেন হাওয়ায় পাকিয়ে-মুচড়ে উড়ছে।

একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা লোক হাত নেড়ে চেঁচাচ্ছিল। এই লোকটির কাছে মেয়েটি আমাদের নিয়ে এল। বিস্ময়ের সঙ্গে ভাবলাম—এই কি প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার! কাছে এসে দেখলাম—যুবকটি একটু যেন আলাদা রকমের। বয়স বেশ কম, এবং অত্যন্ত বেঁটে। খুব ঠাণ্ডা সত্ত্বেও সে টুপি পরে নি। তার শক্ত কর্কশ চুল একদম খাড়া হয়ে আছে—কালো শিখার মত। তার চালচলনটা গুরুগম্ভীর—সেটা মোটেই অল্প বয়সের মত নয়। সাগ্রহে চেঁচিয়ে মেয়েটি তার দিকে ছুটে গেল, কিন্তু তার কাছে এসে হঠাৎ কোনো কারণে যেন একটু ভীত হয়ে থমকে এক পা পিছিয়ে দাঁড়াল।

তার বেয়ে কংক্রীট প্রস্তরের নামা লক্ষ করছিল সে।

মেয়েটি আহত গলায় চেঁচিয়ে বলল, 'এই কমরেডরা দেখতে এসেছেন। আমি এঁদের এখানে নিয়ে এসেছি'। সজীব বাগ্‌বাহুল্য কমে একটা অস্বস্তি দেখা দিয়েছে মেয়েটির মধ্যে।

লোকটি তার ঠাণ্ডা হাত বাড়িয়ে আমাদের করমর্দন করল। বলল, 'আমার নাম খুদে লিন্‌। লিন্‌ লি-কো। টেকনিসিয়ান। কমরেডরা, দয়া করে এদিকে আসুন।'

সে আমাদের নদীর ধারে নিয়ে গেল। প্রায় মুঙ্গারির শুভ্র শীতল প্রবাহ পর্যন্ত ইলেকট্রিক আলো ঝোলানো। তার তলায় লোকেরা জমে-যাওয়া মাটিতে একটা খাল কাটছে।

খুদে লিন্‌ বলল, 'আজ বড় রকমের ঝড়—কিন্তু আমাদের হিম্মৎ ঝড়ের থেকে বেশি। এদের দিকে দেখুন। এরা সবাই কৃষি-সমবায়ের সদস্য। আর এদিকে দেখুন।' সে ঘুরে হাত তুলল—তাকে দেখাতে লাগল উড়ন্ত ঈগলের মত। এই ঘাস-জমি খুবই উর্বর—মুঙ্গারির জলে মারালো। হাজার হাজার বছর ধরে এ জমি ঘাসেই ঢাকা রয়েছে। কেউ চাষ করার কথা ভাবে নি—সাহস পায় নি।'

তার হাত লক্ষ করে অন্ধকার ছাড়া অবশ্য আর বিশেষ কিছু আমি দেখতে পেলাম না। যুবকটির ভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সুন্দর ও সাবলীল। মেয়েটির চোখে সপ্রশংস আনন্দের আলো ঝিকমিক করছিল।

'পয়লা মে-র আগেই আমরা এটা শেষ করতে চাই। এটাই হবে আমাদের

যে-দিবসের উপহার। যে-রাস্তা দিয়ে আপনারা এলেন, পাম্প্ চালু হলে ও রাস্তা আর থাকবে না, ওখানেও সবুজ ধান ক্ষেত হয়ে যাবে।'

রাত একটায় আমরা অফিসে ফিরলাম। টেকনিসিয়ান, ড্রাফট্সম্যান ও শ্রমিকরা—যাদের তখন ছুটি—গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ইঁটের তৈরি প্লাটফর্মের উপর তাদের শয্যা। বাড়ির দেওয়াল ও ছাদে তুষার-ঝড় নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করে চলেছে।

ঘরে ঢোকামাত্রই লিন্ মেয়েটিকে শুতে পাঠাল: 'যাও, খুদে কুয়ান। তোমার এখানে এখন কিছুই করবার নেই। ঘুমোতে যাও।'

ঝুলন্ত বাল্বের তলায় তাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম; সে বয়সে মেয়েটির চেয়ে বেশি বড় নয়।

মেয়েটির ঠাণ্ডা লাল ঠোঁট একটু ফুলে উঠল। লিন্ তার দিকে কোমল চোখে একটু তাকালো, কুয়ান তার অসমাপ্ত আঁকার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে মাথা নিচু করে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

লিন্ তার ওভারকোটটি পরেই জ্বলন্ত রান্নার-স্টোভের পাশে বসল। কোটটির অনেক জায়গায় ছিঁড়ে গেছে ও রং জ্বলে গেছে। তুষার ও কাদায় কোটটা কাঠের মত শক্ত। বিদায়ী মেয়েটির গতিপথের দিকে তাকিয়ে সপ্রশংস ভাবে লিন্ বলল, 'ক্লান্তি কাকে বলে মেয়েটি তা একদমই জানে না,' গলা নিচু করে দুষ্টুমির সুরে এরপর যা সে বলল তাতে বোঝা গেল তার বয়সটা কত কম: 'ও আসলে এখন ঘুমোতে যাবে না।'

তারপর সে কেশে নিয়ে যেন এই মাত্র মনে পড়েছে এমনভাবে বলল, 'আপনারা মাঝ রাতে এসেছেন কেন? আপনারাও কি সেচের কোনো কাজ খুব শীগগির আরম্ভ করতে চান?'

'ঝড়ে আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম, আলো দেখে এখানে এসে পড়েছি।'

দীর্ঘ যাত্রার ক্লান্তি ও শৈত্যের পর ঘরের উত্তাপ আমাদের নিদ্রাতুর করে তুলল। উষ্ণ দেওয়ালের পাশের বেঞ্চিতে আমার সঙ্গীরা খুব শীগগিরই ঘুমিয়ে পড়ল।

এই তরুণটির প্রতি আমার অত্যন্ত আগ্রহ জেগেছিল। সে তার কর্ম-সাথীদেরই বয়সী, কিন্তু কাজের ব্যাপারে অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং তার চরিত্রে একটা গুরুত্ব আছে। একজন প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ারের কাজ চালালেও আসলে সে একজন সাধারণ টেকনিসিয়ান।

মনে হচ্ছিল যেন আলোগুলি উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে, আর ঘরের উষ্ণতাও বাড়ছে। প্লাটফর্মের শয্যা ও উষ্ণ দেওয়ালের পাশ থেকে ঘুমন্ত মানুষদের ছন্দোময় নিশ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আসছিল। লিনের পাতলা মুখে লালচে আভা, এবং তার হাসি-হাসি চোখ উজ্জ্বল।

বাঁধ তৈরির জায়গাটার প্রচণ্ড শব্দের পরে এখন গভীর রাতের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে বসে কথা শুরু করা সহজ।

জিজ্ঞেস করলাম, 'আচ্ছা, কী রকম লাগছে? আপনার কাজ তো মনে হয় রীতিমত ক্লান্তিকর।'

'তা কী? কাজেই আমি খুশি থাকি। আমি ছেলেবেলায় খামার-বাড়িতে কাজ করেছি। ছোট বয়স থেকেই ঠিক করেছিলাম, অফিসের মধ্যে বদ্ধ থাকব না। খোলা জায়গা, প্রচুর রোদ, টাটকা বাতাস—এইসব আমার ভালো লাগে। তাই কৃষি-বিদ্যালয়ে আমি সেচ-বিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করি। স্নাতক হবার বছরে, কাজের দরখাস্তের ফর্ম ভর্তি করবার সময় আমি জরীপের কাজ চাইলাম, যাতে আমি সারাটা দেশ ঘুরে বেড়াতে পারি। একজন শিক্ষক বললেন,—বাইরে সরেজমিন কাজ করা কত কষ্টকর তা তোমার ধারণা আছে? আমি জানতাম—প্রচণ্ড গরম, ভীষণ শীত, বাতাস-বৃষ্টি, খোলা মাঠে ক্যাম্প্ করে থাকা, ক্ষুধা, মশা, মাছি,…কিন্তু এই জীবনই আমি চেয়েছিলাম।'

সে এখন প্রাণবন্ত একটি তরুণ। তার চোখের দৃষ্টিতে আশা ও আনন্দ জ্বলজ্বল করছিল। কিছুক্ষণ কথা বলবার পর জামার হাতা দিয়ে জানলাটা মুছে সে বাইরের দিকে তাকালো। বিড়বিড় করে বলল, 'মেশিনগুলো ভালভাবেই চলছে।'

তারপর সে আবার তার নিজের কথার সূত্র ধরল: 'আমার ইচ্ছা সফল হয়েছে। একটা ক্যানভাসের ব্যাগ, একটা টুথব্রাশ, সেচ সম্পর্কে খান কয়েক বই এবং দু' প্রস্থ পোশাক—এই নিয়ে আমি গত দু বছর ঘুরেছি। হেইলাংকিয়াং-এর নদী ও পাহাড়ের প্রায় সব জায়গায়ই আমি গিয়েছি। নানা বাঁধ ও পাম্পিং স্টেশনে কাজ করেছি। খালি পায়ে একটা ছোট শার্ট পরে কাজ করি আমি, লোকদের সিমেণ্ট মেশাতে সাহায্য করি। আশ্চর্য ভালো লাগে। গরমে ঘেমে উঠলে নদীর ঠাণ্ডা জলে ঝাঁপ দিয়ে নিজেকে তাজা করে নিই। এই কাজে যারা আছে, তারা সবাই সাঁতার জানে।… একবার এক আচমকা বানের মধ্যে পড়েছিলাম আমি। দারুণ ভয়ঙ্কর সে

বান—মৃত্যুর স্রোত! যেন পাহাড় ফেটে বানটা নামল, আর দু' মিনিটের মধ্যেই নদী গ্রাম রাস্তা সব জলের ঢেউয়ের নিচে তলিয়ে গেল। আমাদের বাঁধের কাজ ভেঙে-চুড়ে একদম নিশ্চিহ্ন। কী করা যায়? আমি আমার ড্রইং ও যন্ত্রপাতি নিয়ে সাঁতরে বেরোলাম সেখান থেকে।'

লিন নিজের অসুবিধেগুলি ছোট করে বলে। সেগুলি নিয়ে পরিহাস করে। কিন্তু প্রোজেক্টের কথা বলার সময় মনঃসংযোগের জন্য তার ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে।

'আমি যখন এইখানে—এই ওয়ান্‌চিন্ কো-অলে—এলাম, তখন ভীষণ অসুবিধে চলছে। সবাই বলেছিল—খুব গুরুত্বপূর্ণ এই প্রোজেক্ট। আমি কাজ করার জন্যে তৈরি হয়ে এলাম। এসে দেখি, একটা কিছু নেই। ডিরেক্টর নেই। প্রোজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার নেই, মেশিনারী নেই, মালমশলা নেই। আমি এবং আর দু জন টেকনিসিয়ান—ঐ মেয়েটি খুদে কুয়ান ও খুদে চ্যাং—গোটা জায়গাটা জরীপ করলাম। ম্যাপও তৈরি করে ফেললাম। কিন্তু মালমশলা ও কাজের লোক পাই কোথায়? প্রথম মাসটির পরে সমবায় সমিতি খানিকটা এগিয়ে এসে সাহায্য করেছিল। আমাদের দরকার অনুযায়ী লোক তারা দিয়েছিল। ঝড় বা তুষার যাই হোক, সবাই তারা আসত, ঠাণ্ডা মাটি কাটত।...তাদের কাজে ছিল খুব উৎসাহ, বাঁধ-গাঁথনিতে হাত দেবার জন্য আমরাও অধীর হয়েছিলাম, কিন্তু তবু আমরা পিছিয়েই রইলাম। জেলা সেচ বিভাগের বড় কর্তা একদিন এলেন। আমি তাঁকে বললাম যে এখনও আমরা মেশিনারি ও মালমশলার অপেক্ষায় বসে আছি। তিনি বললেন—'হ্যাঁ, এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্ট, ঐ পর্যন্তই। তিনি চলে গেলেন।...এই গ্রামের বাসিন্দারা এই প্রোজেক্ট সম্পর্কে খুব উৎসাহী। তারা দিনে কয়েকবার আমায় জিজ্ঞেস করত—আমাদের মেশিন কখন আসছে! পয়লা মে-র আগেই এটা শেষ করা দরকার! সেচ না হলে ফসল ভালো হয় না!...আমি আর কী জবাব দেব। আমার নিজের দুটো হাত দিয়ে রাতারাতি পাম্পিং স্টেশন তৈরি করে দিতে পারলে জবাব দিতে পারতাম আমি। এর জন্যে আমি আমার যা কিছু সব দিতে পারতাম। রোজই রাস্তার দিকে চোখ রেখে বসে থাকি, কিন্তু কোনো ট্রাকের ছায়াটি পর্যন্ত দেখা যায় না—মালমশলা তো দূরের কথা। রোজ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি দেখতুম—তাতে কোনোই উপকার হতো না।...একদিন বসে এইসব ভাবছি।

খুব রাগ হচ্ছে। এই কালো মাটিগুলো—একেবারে খাঁটি সার—চাষীর সোনার খনি। খুব দরকারের জিনিস। কিন্তু একে আমরা একেবারেই কাজে লাগাতে পারি নি। বিশ্রী অধীরতায় আমার কান্না আসছিল। এইরকম সময় কে একজন আমার পাশে এসে বসল।'

'কে সে?'

'খুদে কুয়ান। মানে কমরেড কুয়ান ইং।' তার গলা সশ্রদ্ধ। 'সে এটা বলে, ওটা বলে। কথা বলেই যাচ্ছে। গানও গাইল। শেষে আমার অসহ্য লাগছিল। আমি অনুরোধ করলাম—দয়া করে এখান থেকে চলে যাও; দেখতে পাচ্ছ না আমি কী খারাপ রয়েছি।…সে বলল—কী জন্যে! এই সমতল মাটির দিকে তাকাও। প্রাচুর্য রয়েছে এখানে, কোনো-এক দিন এখানে ফুল ফুটবে, ট্রাক্টর চলবে, ধান হবে।… তার সারা গায়ে কাদা; সে নিশ্চয়ই গাঁয়ের লোকদের নালি কাটতে সাহায্য করছিল। বিরক্তিতে আমি বললাম—হ্যাঁ, সে সব তো ভবিষ্যতে, আমার চিন্তা বর্তমান নিয়ে। আমার সব ক্ষোভ গলগল করে বলে গেলাম। সে চুপ করে শুনে গেল। তারপর সে খুব গুরুত্বের সঙ্গে বলল,—আমরা কমিউনিস্ট যুব লীগের সদস্য। পার্টি আমাদের কোথায় পাঠাবে বলে মনে কর? সেইখানে, যেখানে সব খুব ভালভাবে চলছে? এখানকার লোকদের ছাখো। কী আগ্রহ নিয়ে ওরা কথা বলে শোনো, তোমার মেজাজ খারাপ করার কথা নয়। আনন্দ করবার কথা। প্রোজেক্ট ডিরেক্টর বা ইঞ্জিনিয়ার না এলেই বা কী? আমরা নিজেরাই কাজগুলো করতে পারি। পাম্পিং স্টেশন তো তৈরি করতেই হবে। কীসের জন্যে তুমি অপেক্ষা করছ?…আমার মুখে কথা সরল না। সে ঠিকই বলেছে। ঐ কথাটা আমার ভাবা উচিত ছিল—আমরা কমিউনিস্ট যুব লীগের সদস্য! সেই রাতে আমি একটা সুদীর্ঘ চিঠি লিখলাম। পরদিন সেটা লোক দিয়ে জেলা পার্টি কমিটির সেক্রেটারিকে পাঠিয়ে দিলাম। সেইদিন সন্ধ্যেবেলায় খুদে কুয়ান ও খুদে চ্যাং-কে নিয়ে যখন তেলের আলোর নিচে বসে আমরা আমাদের খসড়া পরিকল্পনার কাজ করছি, তখন কে একজন দরজায় টোকা দিয়ে জানাল যে জেলা পার্টি কমিটি দেখা করবার জন্য লিন্-কে আহ্বান জানিয়েছে।…খুব জলদি করে—সারাটা রাস্তা প্রায় ছুটে চলে গেলাম। দরজায় ঢুকতেই থমকে দাঁড়াতে হলো। এদিক-ওদিক পায়চারি করছেন যে-লোকটি তিনি জেলা পার্টি কমিটির মুখ্য সম্পাদক। লোকটি খুবই পাতলা

গড়নের এবং চিন্তায় যেন আবৃত। টেবিলের উপর আমার চিঠিটা। পার্টির ও শাসনবিভাগের কয়েকজন কমরেড টেবিলের চারদিকে বসে।...আমি তাদের বললাম—আমি এমন লোক যে কাজটা ঠিকমত করে, আর নয়তো কাজটা একদম বাদ দিয়ে দেয়। এই প্রোজেক্ট যে কত গুরুত্বপূর্ণ, এ সম্পর্কে আমি এক গাদা কথা শুনেছি। কিন্তু কাজ কিছু দেখি নি। মালমশলা ও যন্ত্রপাতি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। যখন বরফ গলতে আরম্ভ করবে, তখন সমস্ত রাস্তায় কাদা হয়ে যাবে। ট্রাক তার মধ্যে দিয়ে যেতে পারবে না। সরবরাহ বন্ধ হয়ে আমরা একটা চমৎকার জগাখিচুড়ির মধ্যে পড়ে যাব।'...আর কিছু বলবার আগেই পার্টি সেক্রেটারি কাছে এগিয়ে এসে আমার করমর্দন করলেন। বললেন—কমরেড লিন্, আপনার মত লোকই আমি চাই; আমিও সাহস ও স্থির সংকল্প নিয়ে কাজ করার পক্ষপাতী। তার কথাগুলো সূর্যালোকের মত আমার হৃদয়ে প্রবেশ করল। কমরেড, সেই রাত্তিরটাই হলো প্রকৃত পালা-বদলের মুহূর্ত। নতুন পদ্ধতির আবিষ্কারে ও কঠোর পরিশ্রমে আমাদের উদ্দীপ্ত ও উদ্বুদ্ধ করে তুলল ঐ মুহূর্তটি।.. খুব তাড়াতাড়িই আমরা ইলেকট্রিক লাইট্, ইস্পাত, সিমেণ্ট, পাথর ও পাম্প পেয়ে গেলাম। ট্রাক, মোটর ও লোকজনের কোলাহলে জায়গাটা গমগম করে উঠল। আমি খুশি হয়ে বাড়িতে চিঠি লিখব ভাবলাম।...'

পাশের ঘরের দরজাটা খুলে খুদে কুয়ান তার মাথাটা এই ঘরে ঢোকালো। সে মনে করিয়ে দিল: 'তুমি চান্দ্র বৎসরের শেষ দিনটির কথা বলতে ভুলে গেছ। সেই ভিত্তিস্থাপনের দিনে জেলার শাসক-প্রধান এবং পার্টি সেক্রেটারি আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। সে রাতে কী আনন্দই হয়েছিল। একেবারে জনসমুদ্র—পুরুষ, মেয়ে, বুড়ো, যোয়ান। ঢাক বাজছে, করতাল বাজছে।' নবোদিত সূর্যের আলোয় মেঘগুলোকে যেমন অগ্নিময় দেখায়, ঠিক তেমনি ভাবে জ্বলজ্বল করতে লাগল মেয়েটির চোখ: 'ট্রাক ড্রাইভারেরাও তাদের হাতা গুটিয়ে বেলচা তুলে নিয়েছিল। তারা আঘাতকারী সৈন্যদলের মত কাজ করছিল।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আর তুমি?'

তার মুখে লাল আভা দেখা দিল। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সে তার চুলের বেণী দুটো সুন্দরভাবে নাড়ালো: 'আমি নেচেছিলাম। গাঁয়ের মেয়েদের সঙ্গে ঢোল পেটালাম আর নাচলাম।'

লিন জামার হাতা দিয়ে আবার জানলাটা মুছে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

যেন এটা একটা ইঙ্গিত,—এবং খুদে কুয়ান বিদায় নিল।

লিনের ব্যবহারের তরুণসুলভ আবহাওয়াটা সরে গেল। একটা অদৃশ্য ভার যেন তার কাঁধে চেপে আছে। চিন্তিতভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করে এবং পা দুটো ফাঁক করে সে দাঁড়াল। তার হাত দুটো পকেটে ঢোকানো। তার চোখ টেবিলের উপর স্থিরনিবদ্ধ।

আমি আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি বাড়ির কথা বলছিলেন—আপনি কি বিবাহিত?'

'না, না।' সে হেসে কুয়ানের বন্ধ দরজাটার দিকে তাকালো। বেহালাটার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, 'আমার থাকার মধ্যে আছে ঐ বেহালাটা।'

জানলাগুলোতে আলোর আভা পড়ছে। স্টোভটা চেরীফলের মত লাল। ওকে এখন একটু ঘুমোতে দেওয়া উচিত আমার। সকালে উঠেই হয়তো এই ঠাণ্ডা ঝড়ের মধ্যে তাকে কাজে বেরোতে হবে। সে এখন কী চিন্তা করছে কে জানে। লিন্ আমার দিকে তাকিয়ে নিতান্ত কাজের কথা বলার মত সুরে বলল, 'আপনার এখন একটু ঘুমোনো দরকার, কমরেড।' সে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

অন্য ঘর থেকে খুদে কুয়ান এসে ঢুকল আমার ঘরে। ঘরের গরমে তার গালে একটু বাড়তি লাল যুক্ত হয়েছে। সে অভিযোগ করল, 'লিন্ বরাবরই এইরকম। কখনও ঠিকমত বিশ্রাম পায় না। নিজের সম্পর্কে কোনো দৃষ্টি নেই। এ অভ্যেসটা বদলানো দরকার।' সে লিনের ফেলে-যাওয়া গায়ের চাদরটা তুলে নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে গেল।

আমি জানলাটা মুছে বাইরে না তাকিয়ে পারলাম না। ভোর হয়ে এসেছে। রুপোলি তুষারকণাগুলো পড়েই চলেছে। বিদ্যুৎ-বাতিগুলো যেন আলোর দানা বেঁধে রেখেছে। মেশিনগুলো এখনও জোরালোভাবে স্পন্দিত হচ্ছে। বড় বড় পা ফেলে লিন্ বাঁধের উপরদিকে যাচ্ছে। চাদর হাতে কুয়ান্ তাকে অনুসরণ করছে। তার চুল হাওয়ায় উড়ছে। তরুণ টেকনিশিয়ানের দিকে ছোটবার সময় খারাপ আবহাওয়া দ্বারা সে বিচলিত নয় মনে হলো।

আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ঘরে লোকেরা ঘুমোচ্ছে। তাদের ভারী নিঃশ্বাসের একটা ছন্দ আছে।

অনুবাদ : চিত্তরঞ্জন ঘোষ

GERMANY : A SPOT ON THE EYEBALL *by* ARNOLD ZWEIG

চোখের মণির দাগ

আর্নল্ড ৎসোয়াইগ

জার্মানি

ভদ্রলোক যদি সম্পন্ন বুর্জোয়া হন, মাথায় যদি তাঁর টাক গজিয়ে থাকে, কাঁচা গোস্তের মত যদি তাঁর বদনমণ্ডল ঈষৎ রক্তাভ হয়, তা হলে আটত্রিশ থেকে চল্লিশ বছর বয়সের মধ্যে এ-হেন ব্যক্তির অভ্যস্ত স্বভাবে একটা আমূল পরিবর্তন ঘটতে সচরাচর দেখা যায় না। ঘটেছিল কিন্তু মদের দোকানের মালিক ইঙ্গবের্ট মাউকনার-এর বেলা। পাইপের তামাক ও দামী মদের গন্ধে হোক না দোকান সরগরম, নিতান্ত বন্ধুজনের মতো যেসব নিয়মিত খদ্দের তাঁর ছিল, তারা পর্যন্ত হেয় মাউকনার-এর স্বভাববৈগুণ্যে ঘাবড়ে গেল। অবশ্য তয়খানায় সযত্নরক্ষিত ও সুনির্বাচিত মদের কাটতি যে তাতে কিছু কমে গেল, তা নয়। কিন্তু পূর্বে যে গাঢ় বন্ধুতা ছিল তার কিছুটা উবে গেল বাষ্পের মত, কিছুটা ফিকে হয়ে গেল যেন জল মিশে। চোখের মণিতে একটা দাগের আবির্ভাব বিষয়ে হঠাৎ সচকিত হয়ে ওঠা—সে তো যে-কোনো লোকের বেলা ঘটতে পারে। সুতরাং এই ব্যাপারটার কথা সাধারণ্যে বলে রাখা ভালো।

ব্যাপারটা ঘটেছিল আটুই সেপ্টেম্বর তারিখে ভেণ্ডিনার-এর বাড়িতে। উনিশশো এগারো সালের আঙুর থেকে চোলাই করে যে শাঁবর্টা মদ পাওয়া গিয়েছিল—সে হলো ডাকসাইটে মদ। একটা পুরনো

ধরনের ছিপি-খোলা যন্ত্রের সাহায্যে এই মদের বোতল খুলতে লেগেছিলেন মাউকনার। ভেণ্ডি্নার ইতিপূর্বে দু-চারটে বাক্যবাণ ছেড়েছে। এতগুলো লোকের কাছে তিনি অপদস্থ হতে রাজি নন। বেঁটেমোটা শরীরের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মাউকনার দুরন্ত ছিপিটাকে টেনে বের করার জন্য কৃতসংকল্প। অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে মাথায় যেন রক্ত চড়ল। কিন্তু ছেড়ে দেবার পাত্র তিনি নন। অগত্যা স্পাণিশ ওক কাঠের ছাল থেকে তৈরি ছিপিটি টুং করে বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হল। এ-যাত্রা তো বাজি তিনি জিতলেন। কিন্তু পরদিন সকালবেলা খবর কাগজে চোখ বুলোতে গিয়ে তিনি ঘাবড়ে গেলেন। হয়তো চশমার পরকলার কোথায় একটা হলুদ রঙের ছোপ লেগে থাকবে, কারণ অভ্যস্ত টাইপের ছাপা একটা অংশ যেন বৃত্তের আকারে উপরে নিচে কিঞ্চিৎ চাপা হয়ে কাগজের উপর ছড়িয়ে পড়েছে বলে মনে হল। অক্ষরগুলো আকারে বড় ও বিকৃত মনে হল, তা ছাড়া কাগজের রঙ দেখে মনে হল অসাবধানে এককোঁটা কফি হয়তো ওই অংশে পড়ে গিয়ে থাকবে।

যন্ত্রচালিতের মতো একবার হাতটা বুলিয়ে নিলেন কাগজের গায়ে। কিন্তু কই, দাগটা তো রয়ে গেল। বাঁ চোখটা বন্ধ করে শুধু ডান চোখ দিয়ে দেখে তো বোধ হল অক্ষরগুলো ঠিকই আছে। কিন্তু বাঁ চোখে দেখতে গিয়ে আবার ঠিক সেই আগের মতো একটা অংশ বিকৃত বলে মনে হল। মাউকনার দূরের জিনিস ভালো দেখতে পান না। এবার তিনি চশমাটা খুলে আলোতে ধরলেন—সচরাচর পরকলায় যেমন ধুলো জমে থাকে তার বেশি তো কিছু নয়। ন্যাপকিন দিয়ে চশমাটা মুছে পরিষ্কার করার পর ভাবলেন এবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। চশমাটা নাকে লাগাবার পর দেখলেন আবার যেকে সেই, অক্ষর ও লাইনগুলো টেরাবাঁকা হয়ে যেন তাঁকে ব্যঙ্গ করতে লেগেছে। বাঁ চোখের একটা কিছু গণ্ডগোল ঘটেছে এই কথা বুঝতে পেরে হের মাউকনার-এর মনটা দমে গেল, ভয়ে উদ্‌বেগে তাঁর সকালবেলাটাই যেন মাটি হয়ে গেল। মানুষের দুটো বই চোখ নেই আর দুটোর একটাকেও বাদ দিয়ে লোকের চলেনা, মাউকনার-এর মতো ক্ষীণদৃষ্টি লোকের তো নয়ই।

সে দিনটা ছিল সপ্তাহের আর পাঁচটা দিনের-ই মতো, বৈলক্ষণ্য দেখা গেল কেবল মাউকনার-এর আচরণে। তাঁর কাছে সে দিনটা কেমন যেন মেঘে-ঢাকা দিনের মতো। দোকানের কেরাণী ও খদ্দেররা লক্ষ করল হের মাউকনার ক্রমাগত ডানচোখটা বন্ধ করে খালি বাঁ চোখে সব কিছু যেন

বার বার নিরীক্ষণ করে দেখছেন। দৃশ্যটা হাস্যকর, কারণ দেখে মনে হচ্ছিল তিনি যেন ভুল চোখ দিয়ে একটা কিছু তাগ করছেন। কিন্তু আমরা তো জানি মাউকনার কোনো কিছু যে তাগ করছেন এমন নয়, তাঁর লক্ষ্য আশেপাশের পরিচিত জিনিসগুলো বিকৃত দেখাচ্ছে কি না। হায় রে কপাল, সেইরকমই তো দেখাচ্ছে। খালি বাঁ চোখে দেখতে গেলেই তো সবকিছুর ওপর হলুদরঙের একটা ছোপমতন দেখা যাচ্ছে। নাঃ, একজন চোখের ডাক্তারকে দিয়ে না দেখালেই নয়। আগামীকাল সকালবেলাতেই যেতে হয়। দিনগত পাপক্ষয় করার পর, রাত্রে বিছানায় শুয়ে মনে হলো বাঁ চোখে সামান্য একটু ব্যথা আছে, মিটমিট করা কিংবা জলপড়া বন্ধ হয়ে গেছে। তা হোক, ডাক্তারকে দেখাতেই হবে। চিকিৎসা শাস্ত্রে আবার মাউকনার-এর অগাধ বিশ্বাস।

ডাক্তার ক্রোণ-এর চক্ষুপরীক্ষার চেম্বার শাদা এনামেল, কাচ ও ঝকঝকে যন্ত্রপাতি দিয়ে সুসজ্জিত। দেওয়ালে টাঙানো অক্ষরের চার্ট আয়তনে যতটা না বড় তার চেয়ে অনেক বেশি অর্থহীন। চালশের চশমা নেবার আগে মাউকনার এইসব অক্ষর ঘুরে ফিরে বারবার পড়েছেন, সুতরাং এই চার্ট তাঁর কাছে পূর্বপরিচিত বন্ধুর মতো। ডাক্তার ক্রোণও মানুষটা ভালো, মায়াদয়া আছে। সান্ত্বনার সুরে দুচার কথা বলবার পর হঠাৎ মাউকনার-এর বাঁ চোখটাতে একটা রূপোর চাকতি গুঁজে দিলেন। ভীষণ জ্বালা করতে লাগল, চোখের মণিটাকে প্রসারিত করার এই নাকি আধুনিকতম কৌশল। চোখের জলের বন্যা নেমে গেলে পর, একটা তীব্র আলো ফেলা হল চোখের ভিতরটাতে। জ্বালাযন্ত্রণা সহ্য করে মাউকনার ডাক্তারের নির্দেশমতো কখনো ডাক্তারের কানের দিকে কখনো বা উপরে নিচে ডাইনে বাঁয়ে তাকালেন। এবার মাউকনার-এর থুৎনিটা একটা তাকের উপর বসিয়ে দেওয়া হল। কেন্দ্রাকার একটা কাঠামোর মধ্যে ডাক্তার একটি কালোরঙের চাকতি রাখলেন, এই চাকতির একটা ফুটোর মধ্যে ছোট রঙিন একটি বল রেখে ক্রোণ এপাশে ওপাশে ওপরে নীচে সেই চাকতিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দিতে লাগলেন। সেই রঙিন বলটার গতিপথ অনুসরণ করতে গিয়ে মাউকনার হিমশিম খেলেন। এ যেন টেলিস্কোপ-এর মধ্যে দিয়ে দ্রুতবেগ উল্কার দিকে দৃষ্টি রাখা। বলটার রঙ কেমন, কোথায় তার সংস্থান—মাউকনার এসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব দিতে পারলেন না।

পরীক্ষা শেষ হবার পর ডাক্তার রায় দিলেন যে ব্যাপারটা এমন কিছু

গুরুতর যে তা নয়। উত্তেজনাবশত কিংবা অত্যধিক বলপ্রয়োগ করতে গিয়ে অক্ষিপটের একটি শিরা ছিঁড়ে গেছে। চোখের মণির যে হলুদ-রঙা অংশ, যার সাহায্যে আমরা সব কিছু জিনিস পরিষ্কার দেখি, জখমটা ঘটেছে সেই অংশে। মাউকনার আপন মনে বিড়বিড় করে বললেন 'শালার বোতলটাই এই সমস্তর মূলে।' ডাক্তার বলে চললেন যে এর কারণ এই নয় যে মাউকনার-এর বয়স হয়েছে কিংবা হাড় নরম হয়েছে। দাগটা কালে মিলিয়ে যাবে। চামড়ায় যেমন তিল দেখা দেয়, এ-দাগটাও তেমনি। তবে হ্যাঁ, দুচার মাসে সব যে শুধরে যাবে এমন নয়, সময় একটু নেবে। তা ছাড়া রোগী ডাক্তারের বিধান ঠিকমতো মেনে চলেন কিনা কিংবা ওষুধের যথাযথ প্রতিক্রিয়া হয় কিনা—এ সমস্তর ওপরেও অনেক কিছু নির্ভর করছে।

শুরুতেই বলে রাখা ভালো মাউকনার কখনো বা ডাক্তারের বিধানমাফিক চলতেন, কখনো চলতেন না। ওষুধের বড়ি তিনি খেতেন। রাত্রে স্ত্রী তাঁর চোখের পাতার তলায় একটা মলম লাগিয়ে দিতেন, তার জ্বলুনিটাও তিনি মুখ বুজে সহ্য করতেন। একটা কাচের দণ্ডের মাথাটা মারবেলের মতো গোল, সেই গোল অংশটার সাহায্যে মলমের প্রলেপ দেওয়া হত। মলমের ছোঁওয়া লাগলেই চোখটা যেন জ্বলে পুড়ে যেত। যতক্ষণ না ঘুমে চোখ বুজে আসত, মাউকনার সারা ইওরোপের তামাম ছিপিখোলা যন্ত্রের উদ্দেশে বাপান্ত করতেন। কিন্তু তা হলে কি হয়, মাউকনার একজন আইন মেনে চলা নাগরিক। সুতরাং যথাদিনে যথাসময়ে তিনি সুবাধ্য শিশুর মত ডাক্তারের চেম্বারে গিয়ে নিয়মিত হাজিরা দিতেন। অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা মাপজোক করার জন্য জাহাজের কাপ্তেনরা কি যেন এক যন্ত্র ব্যবহার করেন, সেইরকম একটা যন্ত্রের সাহায্যে ক্রোণ রোগীর চোখের সেই দাগটুকু মেপেজুকে দেখে নিতেন।

দাগটা ইতিমধ্যে আর একটু বিস্তৃত হল। মানচিত্রে নরওয়ে দেশের যেমন চেহারা, আকারটা অনেকখানি সেইরকম হয়ে এল। গোড়ায় দাগটা ছিল চোখের মণির দক্ষিণ কোনায়, ঈষৎ উঁচুতে। ক্রমে সেটা নেমে ছড়িয়ে পড়ল চোখের মণির মাঝামাঝি একটা জায়গায়। দাগটা যেমন কালো তেমনি স্পষ্ট—সীমারেখার বাইরে একটা ধোঁয়াটে রঙের বর্ণালী যেন দাগটাকে বেড় দিয়ে আছে। প্রথম প্রথম দাগটা ছড়িয়ে গেল যদিচ, কালে তার বিস্তৃতি কমে আসবে। চশমা খুলে নিলে লক্ষ্যবস্তু ও চোখের মধ্যে যেন একটা ঘন

ছায়ার যবনিকা নেমে আসত। অথচ ডান চোখটা ভালো থাকায় বিনা চশমাতে সমস্ত জিনিস আবছা দেখালেও, তাদের মোটামুটি রঙ ও চেহারা বেশ যেন ধরা পড়ত। নিতান্ত সাধারণ এই লোকটা যখন দিনকৃত্য করে যেত, একটা অস্পষ্ট অনির্দিষ্ট ছায়া ভেসে বেড়াত এর চোখের সামনে। নজরে যা কিছু পড়ত তার মধ্যে কি যেন একটা বস্তু প্রক্ষিপ্ত হয়ে থাকত। এক চোখে নজরে পড়ে কাছের জিনিস, অপর চোখে দূরের জিনিস। মাউকনার-এর দৃষ্টি যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলতে লেগেছে। ভারি মজার ব্যাপার এটা।

সেইসঙ্গে তার জীবনে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল—মোদ্দা ঘটনার একটা অনুষঙ্গের মতো। পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, এরকম তো ঘটতেই পারে, আর ঘটলে মানুষ সে-অবস্থা মেনেও নেয়। কিন্তু মাউকনার-এর মাথায় একটা জেদ চেপে বসল যে পৃথিবীর সমস্ত কিছু তাকে তার বাঁ চোখ দিয়ে দেখতে হবে। তার শিশুপুত্র গোয়েৎস যেন বসে আছে তার সুন্দর গাড়িটাতে, চোখ মুখ বুদ্ধিতে স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল। দু-চোখে তাকে যখন দেখল মাউকনার, ভাবল ছেলেটা তার ছবির মতো সুন্দর। পরক্ষণেই যখন বাঁ চোখ দিয়ে দেখা, সে সব শ্রীসৌন্দর্য কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। ফোলা ফোলা গোবদা বোকাটে মতন মুখ, নোঙরা তামাটে মতন গায়ের চামড়া, কপালটা ফুলে উঠেছে যেন ঢিবি হয়ে, বাঁ চোখটা স্বাভাবিক কিন্তু ডান চোখ যেমন বড় তেমনি কালো, থুৎনি কোথায় যেন শুকিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে, অথচ শরীর ঠিক আগের মতোই নরমসরম ছোটখাটো রয়ে গেছে। দৃশ্য বস্তুর একটা কোনো অংশ, চোখের সেই দাগটা থাকার ফলে কেমন যেন বিকৃত দেখাত। কিন্তু ওই সামান্য দোষের জন্য লাল টুকটুকে জামাটার রঙ বদলে হত নোংরা নারাঙী, আসমানী নীল কাঁথাটাকে দেখাত যেন ময়লা সবুজ একটা কানির মত, আর গোয়েৎস-এর ধবধবে বালিসটাকে দেখাত কালিঝুলিমাখা হলুদরঙা একটা কিছুর যেন পুঁটলি। মাউকনার মনে মনে বলত ছেলেটার এরকম কদাকার চেহারা হলে হয়েছে আর কি! এরকম সংশয়ের মুহূর্তে ডানচোখটা মেললেই যেন জাদুর কাঠির ছোঁয়া লেগে সব ফুসমন্তরে ঠিকঠাক হয়ে যেত, নাক মুখ চোখ গায়ের জামার রঙ যেমন যেমন হওয়া উচিত ঠিক যেন তেমনটা হয়ে যেত। গোয়েৎস আবার তার কমনীয় শিশুসুলভ সৌন্দর্য ফিরে পেত।

ইচ্ছা করলেই যখন মাউকনার চোখের পলকমাত্র না ফেলে সোজা সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারত, চোখ-ধাঁধানো আলো নিভিয়ে দিতে পারত:

এক নিমেষে। আবার তেমনি ইচ্ছাসুখে গৃহিণীর ধবধবে টেবিল-ঢাকা কালিঝুলিতে কলংকিত করতে পারত। বাঁ চোখ দিয়ে আর একটা যে মজার খেলা খেলতে পারত মাউকনার—সে হল আশেপাশের দোকানঘরগুলোর সাইনবোর্ড-এর অক্ষর নিয়ে। জুতোর দোকানের নাম কপ্পেঙ হুনেল, এই নামের ছোটবড় অক্ষরগুলি সে যদৃচ্ছা গুলিয়ে দিয়ে হাস্যকৌতুকের অনেক মজার মজার ছড়া বানাতে পারত!

আশেপাশে চতুর্দিকে সে দেখত বিশৃংখলা। সকাল সন্ধ্যা তার কাছে যেন ধূসর কুয়াশায় ঢাকা। বই বা কাগজ পড়তে পড়তে হঠাৎ পাতার উপর নরওয়ের ছায়া পড়ত ঘন হয়ে। সাতটা রঙের মধ্যে লাল আর লাল রইলনা, সবুজ হয়ে গেল বহুরূপী, আর আসমানী হল সবুজ। নতুন রঙ নতুন ঢঙের অনেক ফুল দেখা দিল মাউকনার-এর জগতে, ফুলে ফেঁপে ওঠা ছাই রঙের ব্যাঙের ছাতার মতন তাদের চেহারা—অথচ তাদের ডাঁটিগুলি নিতান্তই স্বাভাবিক। থিয়েটারে বসে চোখে অপেরা গ্লাস লাগিয়ে সে যখন নায়িকার দিকে তাকাত, ভয়ে আঁতকে উঠত তার বুক। কী বীভৎস চেহারা, বাঁ চোখটা যেন নেবে এসেছে নিচের দিকে আর গলার কাছে একটা বিদঘুঁটে কালো গহ্বর থেকে যেন গমকে গমকে বাক্যস্রোত নিঃসৃত হচ্ছে। দোকানে সারি সারি সব মদের বোতলের লেবেল দেখতে দেখতে যেন নোংরা হলুদরঙে পরিণত হলো। এই সব বিবর্ণ লেবেল দেখে কোন মদের যে কি মার্কা— সে সম্বন্ধে তার মনে রীতিমত সংশয় জন্মাতে লাগল।

একটা সময় ছিল যখন পৃথিবীটা ছিল বাইবেল-এর মুখস্ত করা অংশের মতো। এখন মনে হতে লাগল সেই পৃথিবীর কোথাও যেন একটা প্রকাণ্ড ভাঙচুর ঘটে গেছে। এক পলকের দৃষ্টিতে লাল রঙ যদি বাদামিতে পরিণত হয়, তা হলে কে নিশ্চয় করে বলতে পারবে লাল রঙটা আদৌ লাল কিনা। এক কালে এই পৃথিবীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে নিঃসন্দেহ ছিল। তার যেমন পেট আছে, বেড়াতে বেরবার জন্য ছড়ি আছে, তেমনি পৃথিবীটাও জলজ্যান্ত বর্তমান রয়েছে—এইরকম একটা বিশ্বাস তার মনে ছিল। এখন তার সে বিশ্বাসটুকুও টলটলায়মান হয়ে পড়ল। কবে কোথায় যেন সে পড়েছিল যে কোনো কোনো দার্শনিকের মতে আমাদের এই দৃশ্য জগৎ নাকি মিথ্যা। এইসব দার্শনিক চিন্তার ফলে অনেক জ্ঞানীলোকের মনে জগতের অস্তিত্ব নিয়ে কিছু কিছু সংশয়েরও উদয় হয়েছিল। কথনও কথনও কোনো সম্পাদকীয়

মন্তব্য পড়ে কিংবা ভেণ্ডিনার-এর কোনো কোনো উক্তিতে কান্টিয় দর্শনের 'এতদ্ বৈ সৎ' মতবাদের একটা সমর্থন পাওয়া যেত। কিন্তু যে-লোক বাপের ব্যবসাটুকুর সুনাম রাখতে তৎপর, থাকে অসিভিয়ান স্কোয়ারের মত অঞ্চলে, একটা সাতকামরাওয়ালা ফ্ল্যাট ভাড়া করে বসবাস করতে হয়, সে তো রাতারাতি বিদ্যাদিগ্‌গজ হবার সাধনা করতে পারে না। অবশ্য মাউকনার-এর বুদ্ধিসুদ্ধি যতটা ছিল তাতে করে সে সরাসরি সোপনহাওয়ার-এর বই পড়ে বুঝতে না পারলেও, সোপনহাওয়ার বিষয়ক বই অনায়াসেই পড়ে বুঝতে পারত।

দিবানিদ্রার সময় কিম্বা রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে, বিছানায় গা এলিয়ে দেবার সময় তার মনে নানারকম অদ্ভুত অদ্ভুত ভাব জাগত। চোখের মণিতে সামান্য একটা দাগ, রক্তজমে যাওয়া সূক্ষ্ম একটি শিরা, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একটা আঘাতের ফলে লাল রঙ যদি লাল বলে মনে না হয়—তবে তো সমূহ বিপদ। কে বলবে ডান চোখের সাক্ষ্য বাঁ চোখের তুলনায় অধিকতর নির্ভরযোগ্য। ভগবান না করুন, কিন্তু ডান চোখটাও যদি জখম হয়, তা হলে ভেবে দেখুন তো পৃথিবীর চেহারাটা কেমন বেবাক পালটে যাবে। ইন্দ্রিয়ের স্বাস্থ্য যদি অটুট থাকে তা হলে নিঃসন্দেহে তারা কাজ দেয়। কিন্তু তারা যে সব সময় খাঁটি সত্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করছে, একথা কে হলপ করে বলতে পারে? সুন্দর ও অসুন্দর যে সবসময় নিত্য সত্য সে কথাই বা নিশ্চিত বলবে কে—বিশেষত গোয়েৎস-এর বেলাতেই যখন এই দুইভাবের মধ্যে ব্যতিক্রম দেখা দিচ্ছে? এই পৃথিবীর নিয়মতন্ত্রে অনেক ফাঁক, অনেক ফাঁকি। পৃথিবী তার ভারসাম্য হারিয়েছে, তার খামখেয়ালির, ছলাকলার ও বহ্বাড়ম্বরের অন্ত নেই…।

ওদিকে, ওই যে বেশ কিছু দূরে দু চারজন লোক হেঁটে চলেছে, এক পলকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে—কেবল একটা ধোঁয়াটে লম্বমান ছায়া দাঁড়িয়ে থাকলে সেই সব লোকেদের প্রেতরূপে। এইরকম অভিজ্ঞতা থেকে আরও সব নূতন নূতন ভাবনাচিন্তার উদয় হতে লাগল। দৈনন্দিন জীবনের নিরাপত্তা বিষয়ে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা মনকে অধিকার করে বসল। যেসব জিনিস সে নিজে প্রত্যক্ষ দেখেনি, যার বিষয়ে সে কেবল বই পড়ে কিংবা লোকমুখে শুনে জেনেছে ও সত্য বলে মেনে নিয়েছে, সেগুলি যে অবিসম্বাদিত সত্য হবে—তার কি কোনো নিশ্চয়তা আছে? রাজনীতির ক্ষেত্রে অপরপক্ষের যুক্তিতর্ক যে তাহা মিথ্যা না হতেও পারে—এরকম একটা ধারণার বিষয়ে সে

নিজের সাঙ্গোপাঙ্গদের মধ্যে প্রচার করে বেড়াতে লাগল। এই অবিমৃষ্যকবিতার ফলে মাউকনার-এর প্রায় একঘরে হবার যোগাড়। কে জানে ওই কমিউনিস্টরা হয়তো নিজেদের জ্ঞানবুদ্ধি মতে ঠিক পথে চলেছে। উগ্র জাতীয়তাবাদীরাই কেবল দেশ উদ্ধার করতে পারবে—তার নিশ্চয়তা কি? হয়তো লেনিন ও লুডেনডর্ফ্—দু জনাই মহামানব; হয়তো তাঁর সেই চোদ্দদফা শর্তের সাহায্যে উইল্‌সন কেবল যে আমাদের সর্বনাশ সাধন করতে চেয়েছেন—এমন নয়। হয়তো এরৎসবার্গার এবং লিবক্নেখট্ ও সেই লুক্সামবার্গ্-এর মেয়েটাকে গুলি করে না মারলেই ভালো ছিল। অন্যান্য শক্তির বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমরা যে পরাজিত হয়েছি এ কথাই বা নিশ্চিত বলা যায় কি করে? সে যাই হোক, কিছু যে ধরে আঁকড়ে থাকা যাবে এমন আর কিছু রইল না, সুখ শান্তি নিরাপত্তা সব কিছু ভেঙে ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। দেশের মুদ্রামান হয় তো অনেক আগেই বেঁধে দেওয়া যেত, হয় তো অল্প মূলধনের কারবারী যারা, তাদের যৎসামান্য সঞ্চয় ফেলাছড়া করে উড়িয়ে না দিলেও চলত!

একদিন তাসখেলার টেবিলে বসে ভেণ্ডি্নার তার ইয়ারবক্সিদের বললেন: "দেখেছো কি, মাউকনার-এর চোখটা কেমন যেন ট্যারা হবায় ফলে ওর দৃষ্টিভঙ্গিটাও বদলে গেছে? ওর ওই সারাক্ষণ 'হয় তো' 'হয় তো' শুনে আমি তো তিতোবিরক্ত হয়ে উঠেছি। মানুষটা খুব সম্ভব ছিটগ্রস্ত হয়েছে।"

মাউকনার সত্যিই ট্যারা হয়ে গেছে আজকাল। সেই দাগের ছায়াটা চোখের মণিকে যাতে প্রতিহত না করতে পারে, সেজন্য তার দৃষ্টিকোণ একটু বদলাতে হয়েছে। গোড়াতে স্বামী স্ত্রী কেউ-ই এই পরিবর্তনটা লক্ষ করেনি, তা ছাড়া শ্রীমতী মাউকনার আজকাল স্বামীর দিকে বড় একটা দৃষ্টিপাত করেন না। আজকাল এক নরসুন্দরের সঙ্গে তাঁর দোস্তি বেশ জমে উঠেছে, লোকটা খুব যত্ন নিয়ে চুল ছাঁটে, চুলে পাতা কেটে দেয় এবং অন্য নানাভাবে এই মহিলাটিকে খুশি করতে চেষ্টা করে।

মাউকনার এরকম একটা কিছু ঘটেছে বলে অনুমান করেছিল। কিন্তু পুরানো অভ্যেসমতন টেবিলে প্রচণ্ড ঘুঁষি মেরে আপত্তি সে জানাল না। বাঁ চোখ দিয়ে এক পলক দেখে নিতেই মনে হল এ-সমস্যা সমস্যাই নয়। ওর বড় আদরের শিশুপুত্রটিই হল পরিবার-জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ—সে বেচারা যখন মাকে ছাড়া থাকতে পারেনা, তখন স্ত্রীর স্বভাবচরিত্রের ব্যাপারে খুঁটিয়ে দেখার কোনো মানে হয় না। তা ছাড়া মেয়ে এলজে-এর বয়স হল এখন

পাঁচ বছর,—সে যদি বুঝতে পারে তার মা বাপের সুনিয়ন্ত্রিত জীবনে ফাটল দেখা দিয়েছে, এবং তার ফলে এই পাঁচ বছরের চেনা জানা ঘরসংসার হঠাৎ ভেঙে যেতে পারে—সে কি এলজে-এর পক্ষে সুখকর হবে ? সংসার জীবনের আরম্ভে সুখ ছিল অনাবিল, প্রতিদিনের বর্তমানটাও অভ্যস্ত আরামের। এই সুখ ও স্বস্তির জীবনে যে ঘুণ ধরেছে, বিবাহবিচ্ছেদের মামলা আনলে সেই কথাটাই সর্বজনের সমক্ষে প্রচার করা হবে। অথচ বাঁ চোখ দিয়ে এক পলক দেখলেই কোথাও কোনো ভাঙচুর নজরে আসবে না। আর সত্যি বলতে কি, বিবাহিত জীবনের এইসব ছোটখাটো ত্রুটি বিচ্যুতি এখন যেন অনেকখানি নিরর্থক হয়ে পড়েছে। আজকাল একা একা অথবা এলজে-এর হাত ধরে প্রায়ই মাউকনার পার্ক-এ লেক-এর ধারে বেড়াতে যান। তখন তার ভ্রূভঙ্গে আর ট্যারা চোখের ফ্যালফ্যালে চাউনিতে একটা কেমন বিভ্রান্তিকর অসহায় ভাব লক্ষিত হয়।

এই ভাবটা ক্রমে ক্রমে যেন বিস্তার লাভ করতে লাগল, এ-যেন তার অহং-ভাবের বাগানে ডালপালা মেলে-দেওয়া একটা নতুন চারা! চোখের মণির দাগটা ক্রমে ছোট হয়ে আসল, তার স্বচ্ছতাও কমে এল। ফলে দৃষ্টি পথের কেন্দ্রে এমন একটা বাধার সৃষ্টি হল যে ডানচোখের কাজটুকু সারবার জন্য নির্ভর করতে হলো বাঁ চোখের ওপর। পরে দৃশ্য বস্তু আবার যখন পরিষ্কার নজরে আসতে লাগল, মাউকনার নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বুঝতে পারল ইলবের্ট মাউকনার-এর চোখে তার নিজের চেহারাটা ক্রমেই যেন অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

একদিন মাউকনার লেক্-এর ধারে একটা বেঞ্চিতে বসে আছেন, এলজে জলের মধ্যে রুটির টুকরো ছুঁড়ে ফেলছে, দেখা গেল একটা কোলাব্যাঙ ভেসে উঠেছে। কেবল বাঁ চোখ দিয়ে তাকাতেই ব্যাঙটাকে আর দেখা গেল না। একেবারে নিশ্চিহ্ন, অন্তর্হিত—অথচ ওটা ওখানেই আছে এবং ওটা যে একটা কোলাব্যাঙ নিঃসন্দেহে বলা যায়। ধরা যাক ওই ব্যাঙটার কাছে আমি যেমন প্রকাণ্ড, তেমনি আমার তুলনায় অতিকায় কোনো এক জীব আমায় যেন দেখছে তার বাঁ চোখ দিয়ে, ধরা যাক তার বাঁ চোখের মণিতে আমারই মতন একটা দাগ। সেই একটি দাগী চোখে আমায় যদি সে দেখে, তবে তো আমায় দেখতেই পাবে না। তার সেই চোখে আমি যেন নেই—অথচ আমি তো রয়েছি। আচ্ছা, মৃত্যুর কথা একবার ভেবে দেখা যাক। মৃত্যুর কথা যখন

ভাবি অজ্ঞাত পরলোক সম্বন্ধে কত ভয় ভাবনার উদয় হয়। মৃত্যু যদি কেবল অন্তর্ধান হয়, যদি আমার দাগী চোখ দিয়ে দেখা ব্যাঙের মতো মিলিয়ে যাওয়া হয়···অথচ ব্যাঙটা এতদ্দণ্ডে জল থেকে উঠে থপ্‌থপ্ করে ঘাসের ওপর দিব্যি তো বসে আছে···? আমি যে অমর হয়ে থাকব এমন কথা আমি বলতে চাই না, কিন্তু কে জানে আমার কিছুটা হয়তো টিকে থাকবে? মৃত্যু কি তা হলে একটা ধূসর ধোঁয়াটে অন্ধকার যার মধ্যে আমায় প্রবেশ করতে হবে, যার মধ্যে আমি আছি অথচ আমি নেই, থাকা-না-থাকার একটা অদ্ভুত অবস্থায়? এই তো আমার সেই বাঁ চোখটার দাগ, যা এক কালে নরওয়ের মতো দেখতে ছিল। এখন তো এ-দাগ আর নরওয়ের মত দেখতে নয়··· হয় তো পরলোকের পরপারেও কিছু একটা নিশ্চয় আছে।

ইঙ্গবের্ট মাউকনার নিরিবিলি শান্তিতে তার জীবন কাটাতে লাগল। সে তার কর্তব্য করে যায়, দোকান চালায়। কোনো একটা দলে কিংবা সংঘে নাম লেখাবার জন্য তার বিন্দুমাত্র উৎসাহ দেখা গেলনা, ভারতীয় দর্শন নিয়েও সে মাথা ঘামাল না। যেসব লোক তাকে এড়িয়ে যেতে শুরু করেছিল, সেও তাদের পরিহার করল অক্লেশে। বন্ধুদের ঠাট্টাতামাশায় এখন তার মনে কোনো রাগ বা বিরক্তি দেখা যায় না। টেবিলের তলায় এল্‌জে ও গোয়েৎস-এর সঙ্গে বসে সে ঘরসংসার বানাবার খেলা খেলে। ওদের ভাবনাচিন্তার সঙ্গে নিজের ভাবনাচিন্তা এমনভাবে মিলিয়ে দেয় যে ওরা আজকাল বাবাকে না পেলে খেলতেই চায়না। আজকাল মাউকনারকে দেখলেই মনে হয় ওর হৃদয় দয়ায় করুণায় কানায় কানায় ভরে উঠেছে। যারা প্রত্যাশী ও মাউকনার-এর ওপর নির্ভরশীল, সেইরকম লোকেরা এবং বিশেষ করে শিশুরা, তার কাছে আসতে পারলে যেন বেঁচে যেত। বাদবিসম্বাদে ভরা বড়দের জগৎ থেকে রেহাই পাবার জন্য একটা আন্তরিক আকুতি তাদের চালনা করে নিয়ে যেত সেই 'হয়তো'র সম্ভাবনাময় জগতে। হোক না সে মনগড়া জগৎ— সেখানে স্নেহ আছে, মমতা আছে; হোক না সে জগৎ ঘাড়ে গর্দানে, ঈষৎ ট্যারা চোখের মণিতে দাগ ধরা অলিভিয়ান স্কোয়ারের বাসিন্দা একজন সামান্য মদের দোকানের মালিকের সৃষ্টি!

অনুবাদ: ক্ষিতীশ রায়

USSR : LIGHT FROM OTHER PEOPLE'S WINDOWS *by* YEVDOKIMOV

অন্যদের জানলার আলোয়

নিকোলাই য়েভ্‌দোকিমভ্

● সোভিয়েত ইউনিয়ন ●

আট তলার জানলায় বসে নিচের রাস্তাটা কেমন আস্তে আস্তে জেগে উঠছে দেখতে মোতিয়ার বড় ভালো লাগে। উপর থেকে, অত উঁচু থেকে, সব কিছু মনে হয় বড় নতুন, বড় ছোট্ট—খেলনার মত। বাড়ির সামনের জমিটার ঘাস তাজা ও উজ্জ্বল সবুজ; সত্যধৌত ফুটপাথগুলোতে কাঁচের মত বাড়ি গাছ ও পথচারীদের ছায়া। সারিবদ্ধ লরীগুলো একে একে পিচঢালা রাস্তার উপর দিয়ে গর্জন করতে করতে গড়িয়ে চলছে। ইঁট সিমেণ্ট ও কাঠের তক্তাবাহী এই লরীগুলো রোজ সকালে একই সময়ে দেখা যায়; তাদের ধীর ভারাক্রান্ত গতি জানলার কাঁচগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায় আর হাওয়া কাটিয়ে আটতলায় গিয়ে প্রবেশ করে একটা তীব্র পেট্রোলের গন্ধ। মোতিয়া জানে যে-কোনোও মুহূর্তে একটি লরী থামবে, গাড়ির চালক লাফিয়ে নেমে টুপিটা দু হাতে ঠিক করে নেবে, তারপর রাস্তা আর ট্রাম-লাইন পেরিয়ে সিনেমা হলের পাশে তামাকের দোকানটায় গিয়ে ঢুকবে। ফিরে আসতে আসতে সে একটা সিগারেট জ্বালাবে, আর, গাড়ির দরজা খুলে ঢোকবার আগে একবার, যে কোনোও কারণেই হোক্, মাথা তুলে দেখে নেবে বাড়িটা—মোতিয়ার বাড়ি। প্রত্যেকবারই মোতিয়ার মনে হয় যে লোকটি যেন তারই

দিকে তাকিয়ে দেখছে ; হেসে ফেলে সে তাড়াতাড়ি মুখের উপর হাত চাপা দেয়।

উপর থেকে লোকটির মুখ ভালো করে দেখা না গেলেও মোতিয়া নিশ্চয়ই জানে যে সে যুবক ও সুপুরুষ। যতদূর দৃষ্টি যায় মোতিয়া গাড়িটাকে অনুসরণ করে, তারপর ট্রলি-বাস্ স্টপের কাছের লোকগুলোর উপর ফিরে তাকায়। এই সেদিন পর্যন্ত এই সময়ে বাস্-স্টপে প্রচুর লোক জমায়েৎ হতো, সবাই হুড়োহুড়ি করত পরের বাসটার জন্যে, গাড়ির সংকীর্ণ দরজার মধ্যে ঠেলাঠেলি করে ঢুকে পড়ত। স্কুলের পোশাক পরা একটি ছেলে কখনোই পেরে উঠত না ঢুকতে, তার জন্যে মোতিয়ার কষ্ট হতো। গোটা দশেক বাস্ তাকে ছাড়তে হতো অর্থাৎ হপ্তায় প্রত্যেকদিনই তার স্কুলে পৌঁছুতে খুবই দেরী হয়ে যেত। আজকাল এ-অঞ্চলে নতুন আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেলপথ খোলার পর অবশ্য এই স্টপ্ থেকে খুব কমই লোক ওঠে আর সেই ছেলেটিকে আর সে মোটেই দেখতে পায় না।

এতক্ষণ যে-রাস্তা নির্জীব হয়ে ছিল ঠিক আটটা বাজতে না বাজতেই সেটা লোকারণ্য ও চঞ্চল হয়ে উঠল আণ্ডারগ্রাউণ্ডের উদ্দেশ্যে চলন্ত এক ঘন গাঢ় জনস্রোতে। জনতাটি বিচিত্র, বর্ণাঢ্য, উৎসব মিছিলের মত উচ্ছল। গাড়ির স্রোতও সেই সঙ্গে একটা মন মাতানো রূপ নেয়। আর লরী নয়, এই চওড়া রাস্তাটায় এখন নানান্ রকমের প্রাইভেট্ মোটরগাড়ির আধিপত্য। আলতোভাবে নিঃশব্দে এর ওর পাশ কাটাতে কাটাতে গাড়িগুলো যায়, উপর থেকে দেখতে লাগে ঠিক খেলাঘরের গাড়ির মত, লেনচক্কার চাবি দেওয়া খেলার গাড়িটার চেয়ে এক চুল বড় হবে। সাড়ে আটটার কাছাকাছি গাড়ির সংখ্যা যায় কমে, ভিড়ও পাতলা হয়ে আসে ; আরও পনেরো মিনিট পরে মোতিয়া রাস্তার প্রত্যেকটি লোক গুনে বলে দিতে পারে। এদের বেশির ভাগই স্ত্রীলোক, উপচে পড়া ব্যাগ নিয়ে বাজার করে ফিরছে। আবার লরীগুলো ফিরে আসে, এবার উল্টো দিক থেকে মাল খালাস করে। দু-চারটে এদিক ওদিক যা মোটর চলাচল করে সেগুলো একদম কোণঠাসা হয়ে যায়।

মোতিয়ার বাড়ির সামনে জমিটার উপর একজন পুলিশ এসে হাজির হয়। মোতিয়া একটু বিদ্রূপের ভঙ্গিতে ঠোঁট চাপে, দেখে অপেক্ষা করে কি হয় না হয়। পুলিশটার দিকে না তাকিয়ে সে চেয়ে দেখে রাস্তার ওপারে। দেখে জুতোর

দোকানের পাশের উঠোনটা থেকে আন্‌কাকে বেরিয়ে আসতে। আন্‌কা সিনেমা হলের দিকে যায়, সেখানে একটা চকোলেট আইসক্রীম কিনে হাতের ঝোলা ব্যাগটা দোলাতে দোলাতে রাস্তা পার হয় ছোট ছোট লাফ দিয়ে। পুলিশের কাছে আসতেই সে থেমে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে তার সঙ্গে গল্প করে, তার দেহটা দুলতে থাকে ঠিক যেন নাচের ভঙ্গিতে।

মোতিয়া যতগুলি পরিচারিকাদের চেনে তাদের মধ্যে আন্‌কাই সবচেয়ে হাসিখুশি সবচেয়ে সপ্রতিভ ও সাহসী। সে বলে সে স্বয়ং শয়তানকেও নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারে আর সে বিষয়ে মোতিয়ারও কোনো সন্দেহ নেই। আন্‌কাকে মোতিয়া হিংসে করে। আন্‌কার স্বাবলম্বিতা, তার ক্ষুরধার বাচন, তার বন্ধু জোটাবার ক্ষমতা, বিশেষ করে তার অসংখ্য প্রেণয়াকাঙ্ক্ষীদের নিপুণভাবে চালনা করবার দক্ষতা হলো এই ঈর্ষার কারণ।

গৃহ-পরিচারিকার জীবন আন্‌কার ভালোই লাগে বলে মোতিয়ার মনে হয়; তার মতন এক গৃহহীনতার অবসাদ থেকে থেকে আন্‌কাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে না। আন্‌কা প্রায়ই কাজ বদল করে, তার নিজের ভাষায় মাঝে মাঝে একটু 'পরিবর্তন' সে পছন্দই করে। যে পাঁচ বছর মোতিয়া মস্কোয় কাটিয়েছে তার মধ্যে সেও এখান থেকে ওখানে বাসা বদল করেছে, কোনো এক যৌথ রান্নাঘরে অন্যান্য বহু লোকের সঙ্গে ক্যাম্প-খাটে, বা কোনোও বাড়ির ঘিঞ্জি নোংরা বার মহলে রাত কাটাতে কাটাতে হাঁপিয়ে উঠেছে। পরের আদেশ মেনে চলতে, পরের কথামত ওঠ-বোস করতে করতে সে হয়রান হয়ে গেছে।

এখন অবশ্য সে জীবন নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট এবং চাকরিটা হারাবার ভয়ে যথেষ্ট সন্ত্রস্ত। এখন তার নিজস্ব বিছানা হয়েছে, ঘর হয়েছে, আর রান্নাঘরে শুতে হয় না। কাজ বলতে খুবই সামান্য; সারাদিন একটা বড় ফ্ল্যাটে সে একাই থাকে। লেনচ্‌কাকে বাচ্ছাদের স্কুলে একবার পৌঁছে দিয়ে এসে সে বলতে গেলে যা খুশি তাই করতে পারে। আর একটু হলে তাকে সুখীই বলা যেতে পারত। যায় না, কারণ একটা জিনিস তার নেই, সেটা হলো ভালবাসা।

মোতিয়ার যেখানে জন্মকর্ম সেই ওরেলের কাছাকাছি এক গ্রামে থাকত সান্‌কা ঝুমিখভ্‌, যে দু' বচ্ছর ধরে মোতিয়াকে চিঠিপত্র লিখেছিল। মোতিয়া সান্‌কাকে পছন্দ করত, কিন্তু ঠিকমত চাল চালতে পারে নি, তার ঠাট্টার চোটে সান্‌কা পেছু হটে গেছে। সান্‌কা একবার মস্কোয় পর্যন্ত এসেছিল

মোতিয়ার কাছে বিয়ের প্রস্তাব করতে কিন্তু মোতিয়ার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সান্‌কা তাকে কখনোই ছেড়ে যাবে না। তাই সে সান্‌কার সঙ্গে শুধু সিনেম গিয়েই ক্ষান্ত থাকত, আর বিয়ের কথা পাড়লেই বলত 'এই দেখো, এরই মধ্যে বেশ চট্‌পটে লোক তো তুমি!' আজও অবধি সান্‌কা ঝুমিখভের প্রা দুর্ব্যবহারের জন্যে তার খেদের অন্ত নেই। আরও খারাপ লাগে তাকে হারিয়েছে মনে করে। যতই দিন যায় ততই মোতিয়া তার বোকামিটা বে করে উপলব্ধি করে।

বিয়ে করার ইচ্ছে তার খুব; আন্‌কার মত আজ এর সঙ্গে কাল ও সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে সে পারে না, যদিও ছেলে-মহলে আন্‌কার সাফল্যে তা হিংসে হয়। সাধারণত ছেলেদের সঙ্গে মোতিয়ার বন্ধুত্ব যেদিন আরম্ভ হ সেইদিনই তার শেষ। ছয় ও সাত তলার মধ্যে সিঁড়িটার কোনো এ জায়গায় দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ অনুসন্ধানী হাত চালনার পর যখন নতুন বন্ধু টের পায় যে মোতিয়া বিয়ের কমে কথা বলবার মেয়ে নয় তখন সে যে সে উধাও হয়ে যায় আর পাত্তা পাওয়া যায় না। সৈনিক ইভান, ট্যাক্সি-চাল আনকুনদিন, কলের মিস্ত্রী পিটার—সবাই এইভাবেই একে একে নিখোঁ হয়েছে।

এমনকি ঐ যে পুলিশটা মোতিয়ার বাড়ির সামনে এখন পায়চারী করে সেও গোড়ায় গোড়ায় মোতিয়ারই প্রণয় প্রার্থনা করেছিল, আন্‌কার প্রতি তার দৃষ্টি যায় পরে। মোতিয়া এর জন্যে তার উপর রাগ করে নি, আন্‌কা উপরেও না; ভিতরে ভিতরে খালি একটু ব্যথা পেয়েছে। সে দেখতে পা আন্‌কা নেচে নেচে পুলিশটার সঙ্গে আলাপ জমাচ্ছে। অসন্তোষে মাথ নাড়তে নাড়তে সে জানলা থেকে সরে যায়।

লেনচ্‌কার ঘুমের অবসরে মোতিয়া মনিবের পড়বার ঘরটা গুছিয়ে রাখে আলেক্সেয়ি সার্গেইভিচ্‌ ভারতবর্ষে কাজ করতে গেছেন আজ তিন মাস হলো সেখানে তিনি নাকি একটা কারখানা তৈরি করছেন। মোতিয়ার এতে খু গর্ব, দোকানের লাইনে দাঁড়িয়েও আলেক্সেয়ি সার্গেইভিচ্‌ কত দূরে কাজে ব্যস্ত এ কথা শোনাতে সে ভোলে না।

মোতিয়ার বাড়িটার পাঁচতলায় একটি ভারতীয় দম্পতি বাস করেন একটা সময় ছিল যখন তাঁদের সঙ্গে দেখা হলে মোতিয়া সমীহ ও সংকোচভরে এক পাশ দিয়ে চলে যেত। আলেক্সেয়ি সার্গেইভিচ্‌ চলে যাবার পর থেকে

কিন্তু মোতিয়া আগের চেয়ে সাহসী হয়ে উঠেছে, সে এখন তাঁদের সঙ্গে বেশ কথা বলে, বন্ধু বলে মনে করে। সে জেনেছে যে তাঁরা একটা বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে কাজ করেন, তাঁদের বাস দিল্লী নামক এক সহরে যেখানে দুর্ধর্ষ গরম আর রাস্তায় রাস্তায় গো ভগবতীরা অবাধে বিচরণ করে থাকেন। মোতিয়ার কাছে সুদূর ভারতবর্ষ এখন এক বিশেষ পরিচিত দেশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সে সবক'টি ভারতীয় চলচ্চিত্র দেখে ফেলেছে, বহু গানও শিখে নিয়েছে। বইয়ের তাক ঝাড়তে ঝাড়তে মোতিয়া গুন্ গুন্ করে গাইতে থাকে "ম্যয় আওয়ারা হুঁ"—এই গানটাই তার সবচেয়ে প্রিয়।

আলেক্সেয়ি সার্গেইভিচের পড়বার ঘরে আজকাল থাকেন অল্‌গা ইভানভ্‌না; মোতিয়া ও লেনচ্‌কাকে তিনি অন্য ঘরটি দিয়ে দিয়েছেন। অল্‌গা ইভানভ্‌না একজন রাসায়নিক—সম্প্রতি তিনি টেলিভিশনে তাঁর কাজ ও কারখানা সম্বন্ধে এক বিবৃতি দিয়েছেন। শান্ত ভদ্র ও মিশুক স্বভাবের বলে অল্‌গা ইভানভ্‌নাকে মোতিয়ার বরাবরই ভালো লাগত, কিন্তু তাঁকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখবার পর থেকে তার এই মনোভাব একটা গভীর শ্রদ্ধায় পরিণত হয়েছে। আন্‌কা বলে মোতিয়া নাকি আজকাল আগের চেয়েও বেশি মাথায় উঠেছে কিন্তু মোতিয়া ভালো করেই জানে এটা আন্‌কার হিংসে ছাড়া আর কিছু নয়।

দালানে লেনচ্‌কার ছোট্ট ছোট্ট পায়ের আওয়াজ পেয়ে মোতিয়া বইয়ের আলমারির পেছনে গিয়ে লুকোয়। দরজাটা অর্ধেক খোলে, লীনা বিস্ময়ে খালি ঘরটা একবার তাকিয়ে দেখে। তারপর,

'মোতিয়া মাসী, কোথায় তুমি ?'

মোতিয়া মুখে হাত দিয়ে হাসি চাপে, চুপ করে থাকে।

'জানি, জানি, তুমি আবার লুকিয়েছ !'

মোতিয়া মাথাটা বার করে বলে, 'টু—কি !'

'এরকম করে ভয় দেখালে কোনও দিন আমার মাথা খারাপ হয়ে যাবে,' লেনচ্‌কা নির্বিকারভাবে বলে।

'অত সহজে তো তোমায় ভয় পাওয়ানো যায় না !'

'তাহলে আমার সাহস আছে, তাই না ?'

'খুব !' বলে মোতিয়া, 'তবে তুমি বড্ড কথা বল। যাও, গিয়ে খেয়ে নাও নইলে স্কুলে দেরি হয়ে যাবে।'

লেনচ্‌কাকে কুড়িয়ে নিয়ে মোতিয়া তাকে রান্নাঘরে নিয়ে যায়।

'আবার সেমোলিনা পুডিং! আর পারি না!' লীনা বলে ওঠে। টেবিলে গিয়ে বসে অবশ্য ঠিকই আর ভেঙচি কেটে খেতেও শুরু করে একটা অসীম সহিষ্ণুতার ভাণ করে।

'মোতিয়ামাসী, তোমার যদি একটুও কল্পনা থাকত!'

'বক বক না করে যা দেওয়া হয়েছে খেয়ে নাও।'

'খাচ্ছি তো,' লীনা বিষণ্ণ গলায় বলে, 'অবশ্য না খেয়েও আমি থাকতে পারি, ওটা মনের জোরের ব্যাপার। বড় হলে আমি রকেটে করে মঙ্গলগ্রহে যাব আর সেখানে হয়তো কোনও খাবারই পাওয়া যাবে না।'

'পাগলামি করো না তো এখন, তোমার ও-সব অদ্ভুত কল্পনা রাখ!' মোতিয়া বলে, 'এবার যাবার সময় হল।'

'তোমার মঙ্গলগ্রহে যেতে ইচ্ছে করে না?' লীনা জিজ্ঞেস করে।

'আমি তো আর বোকা নই! আমি এখানে বেশ আছি।' মোতিয়া এবারে রেগে উঠে, 'ব্যস, অনেক বক বক হয়েছে, এবার ওঠ!'

ওরা সবে দরজার কাছে পৌঁছেছে এমন সময়ে বেল বেজে উঠল। পাশের বাড়িতে কাজ করে জিনা, সে এসেছে একটু নুন চাইতে। মোতিয়া জিনাকে পছন্দ করে না, অবজ্ঞাভরে উল্লেখ করে 'বুদ্ধিজীবী' বলে। তার কারণ জিনা একটা টেকনিক্যাল কলেজে যায়, সব সময়ে বই পড়ে, লাইনে দাঁড়িয়ে পর্যন্ত। জিনার পোশাক-আশাকও হালফ্যাশানের, তার মনিবের চেয়ে কোনও অংশে কম নয়। সে কথা বলে একটা বিশেষ বিদগ্ধ ভঙ্গিতে আর ছোটখাটো চশমাপরা মলিনবেশ এক ছাত্রের সঙ্গে ঘোরাফেরা করে। মোতিয়া জানলা দিয়ে প্রায়ই দেখত ওরা সন্ধ্যাবেলায় বাড়িটার আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর কোনও একটা বিষয় নিয়ে সমানে কথা বলেই চলেছে—কোনও বৈজ্ঞানিক বিষয় হবে হয়তো। অসহ্য!

'নুন নেই বাড়িতে। তোমার খালি এই চাই আর ঐ চাই!'

জিনা একটু অপ্রস্তুতে পড়েই তাড়াতাড়ি হাসতে আরম্ভ করে দিল।

'এত রাগ কিসের? নেই তো নেই তাতে কি হয়েছে? যাই দোকানে গিয়ে কিনে আনি। কাল মোটে কিনবার সময় পেলাম না, পরীক্ষা ছিল।'

'কেমন হল, 'এ' পেয়েছ?' লীনা খুশি হয়ে জিজ্ঞেস করে।

'না লেনচ্কা, 'সি' পেয়েছি।'

'দেখছ তো, সমস্তক্ষণ খালি বই আর বই—তাও সেরকম ভালো করতে

পার না,' মোতিয়া ঠেস দিয়ে বলে। তারপর লীনার হাত ধরে সে সিঁড়ি দিয়ে নামতে থাকে।

'সত্যিই কি বাড়িতে একটুও নুন নেই?' লীনা জানতে চায়।

'ও-সবে তোমার কি দরকার? যাক, দোকানে গিয়ে কিনুক না! সমস্তক্ষণ খালি নাক উঁচু করেই আছে! কি মনে করে নিজেকে? ঘুরছেন-ফিরছেন যেন কত বড় ঘরের মেয়ে!'

'জিনার অনেক বুদ্ধি, ও কত কী জানে।'

স্কুলটা বিশেষ দূরে নয়, রাস্তা পেরিয়েই। লীনাকে তার টিচারের হাতে দিয়ে মোতিয়া হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। মেয়েটার বকবকানির চোটে তার মাথা ধরে যায়। এক-একবার লীনাকে হাত থেকে নামিয়ে মোতিয়ার মনে হয় একটা মস্ত কাজ উদ্ধার হল।

আজ সে ঠিক করেছে দিনটা নিজের খুশিমত কাটাবে। অলগা ইভানভনা দু-দিনের জন্যে কাজে বাইরে গেছেন, কাল রাত্রের আগে ফিরবেন না। সুতরাং গৃহস্থালীর কাজ আপাতত স্থগিত থাকতে পারে।

মোতিয়া মনে করল সিনেমায় যাবে, কিন্তু একটা পুরনো ছবি চলছিল। তাই সে খানিক ইতস্তত ঘুরে একটা আইসক্রিম কিনে দোকানের সাজসজ্জা দেখতে দেখতে চলতে লাগল।

প্রশস্ত লেনিন রাজপথ ক্রমশ চড়াই হয়ে টিলার উপরে উঠে গেছে। নতুন বাড়িগুলোর জানালায় রোদ পড়ে ঝিকমিক করছে। এক ঝটকা হাওয়া এসে মোতিয়ার মুখে লাগে, তার স্কার্ফে টান পড়ে।

মাত্র গেল বছরেই রাজপথের ওধারে একটা পুরনো কাঠের বাড়ি ছিল। বহু প্রাচীন একটা লেবুগাছ বাড়িটার ছাতের উপর শাখা মেলে প্রভুত্ব বিস্তার করে রোদ পোহাত। তখন সেটাকে দেখাত বিশাল, মনে হত যেন ভারের চোটে ছোট্ট বাড়িটাকে নুয়ে ফেলে মাটির নিচে ঠেলে দিচ্ছে। মোতিয়ার এ-সব বেশ মনে আছে, তার গ্রামের যে-বাড়িতে সে আশৈশব কাটিয়েছে এই বাড়িটা ঠিক তারই মত ছিল যে! কিন্তু সেই পুরনো কাঠের বাড়ি আর নেই; তার জায়গায় এক বিরাট আটতলা বাড়ি উঠেছে। লেবুগাছটা আছে বটে নতুন ইমারতের কোলে কিন্তু সেটাকে আজকাল দেখায় কত ছোট, কত নিরীহ; যেটুকু রোদ্দুর জোটে সেটুকু আশে-পাশের বাড়ির জানলা থেকে ঠিকরে-পড়া কিছু সূর্যের আলো।

দিন-তিনেক আগে নতুন বাড়িটার চারপাশের বেড়া ভেঙে ফেলা হয়েছে। এখন যন্ত্রপাতি দিয়ে রাস্তা সমান করা হচ্ছে, একটা যন্ত্র লরিতে খোয়া ইঁট পাথর ঠাসছে আর মেয়েরা জানলার কাঁচ সাফ করছে।

কয়েকমাস আগে মোতিয়ার সঙ্গে কয়েকটি মেয়ের আলাপ হয়েছিল দোকানে লাইন দিতে গিয়ে, তারা ঘরামির কাজ করে। এদের মধ্যে একজন ভেরা, সেন্‌স্ক্ থেকে এসেছে। মোতিয়ার গ্রাম থেকে সেন্‌স্ক্ মাইল কুড়ির পথ, তাই দেশের লোক পেয়ে মোতিয়া খুব খুশি। ভারতীয়দের সঙ্গে পরিচয়ে সে যতটা গর্বিত, ভেরার সঙ্গে চেনাশোনা হওয়াতেও ততটাই। সামনের বাড়িটার নির্মাণ-কাজে ভেরা একজন রাজমিস্ত্রী। আলাপ হওয়া অবধি মাত্র দুদিন ভেরার সঙ্গে দেখা হওয়া সত্বেও মোতিয়া তাকে একজন নিকট বন্ধু বলে দেখে আর ভেরা সেখানে কাজ করে বলে ঐ বড় বাড়িটাকেও অনেকটা নিজস্ব সম্পত্তি বলে মনে করে।

রাস্তা পার হয়ে মোতিয়া খনন-যন্ত্রটার তলা দিয়ে দৌড়ে চলে যায় দুঃসাহস দেখিয়ে। একজন ছোকরা শ্রমিককে ভেঙচি কেটে, আর-একজন লরি-চালকের সামনে চোখ নাচিয়ে মাটির একটা বড় গর্তর উপর দিয়ে লাফ মেরে বাড়িটার ইঁট-সুরকিভর্তি মাঠে এসে সে হাজির হয়।

এদিক-ওদিক খুঁজেও মোতিয়া ভেরাকে পেল না। কাজের ব্যাঘাত হচ্ছিল বলে সবাই মোতিয়াকে চেঁচিয়ে সরে যেতে বলছিল। মোতিয়ার কিন্তু সেটা ভালোই লাগল, সেও পাল্টা চেঁচিয়ে হাসতে লাগল। অবশেষে লম্বা অল্পবয়সী একটি লোকের তার উপর নজর পড়ল। লোকটি তার পেছনে এক থাপ্পড় মেরে বলল,

'কী, একজন সঙ্গীর দরকার? আমায় পছন্দ হয়? আমিই তো এখানে সবচেয়ে ভালো দেখতে!'

'তুমি বড্ড রোগা!' মোতিয়া সাফ জবাব দেয়।

ইতিমধ্যে ভেরা এক বালতি ভিজে সিমেন্ট নিয়ে উঠোন পেরিয়ে আসছিল। খুব আস্তে আস্তে এগোচ্ছিল ভেরা, পরনে একটা ময়লা কোট আর তার সমান নোংরা একজোড়া জুতো। তাকে এত ক্লান্ত অবসন্ন দেখাচ্ছিল যে ওর জন্যে মোতিয়ার সত্যিই কষ্ট হল; মোতিয়ার নিজের জীবন ভেরার চেয়ে কত আরামের!

মোতিয়াকে দেখতে পেয়ে ভেরা বালতি নামাল।

'তুমি এখানে কি করছ?'

'বিশেষ কিছু না। আজ খালি আছি তাই একটু হাঁটতে বেরিয়েছি।'

'বাড়িটা সুন্দর, না?' ভেরার কণ্ঠে মোতিয়া বিষাদ খুঁজে পায়।

'হ্যাঁ, বেশ।'

মোতিয়ার ভালোই লাগত বাড়িটা, যদিও তার নিজের বাড়ির ধারে-কাছে বলেও মনে করত না। মোতিয়ার বাড়ি সেই অঞ্চলের আর সব বাড়ির চেয়ে বড়, সবচেয়ে উঁচু—চোদ্দতলা। ঐ বাড়িতে থাকে বলে তার গর্বের শেষ নেই। কাছের বাস আর ট্রলি-বাস স্টপের নাম পর্যন্ত রাখা হয়েছিল ঐ বাড়ির নামে, 'মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক-আবাস'।

'হ্যাঁ, সত্যিই বেশ,' মোতিয়া বলে চলে, 'কেবল আরও ক'তলা থাকলে ভালো হত।'

'না, এমনিই বেশ,' ভেরা হাসে, 'তোমার বুঝি খুব উঁচুর দিকে নজর? তা আমাদের দলে এস না, দেবো এখন খুঁজে খুব উঁচুতে একটা কাজ।'

'কী যে বল! তাহলে আমায় আর টিঁকতে হবে না, নিজের দিকে চেয়ে দেখ একবার।'

'কেন আমার আবার কি হল?' ভেরা আশ্চর্য হয়ে যায়, 'দূর বোকা! আসছে হপ্তায় আমরা এই জায়গা ছেড়ে অন্য কাজে যাব, তাই হয়তো একটু মনমরা দেখাচ্ছে।'

এতে মনমরা হবার যে কী কারণ থাকতে পারে মোতিয়া ভেবে পেল না, কিন্তু সে আর কথা বাড়াল না। আর এ-কাজটা যে ক্লান্তিকর নয় সে-কথাও সে বিশ্বাস করে না। ভেরা বালতিটা তুলে নেয়, সেই পরিশ্রমে তার পায়ের পেশী ফুলে ওঠে, তার দেহটা যেন ক্ষীণ হয়ে যায়।

'না সত্যি, এখানে এলেই তো পার, আমরা কেমন সুখে আছি।'

মোতিয়া ঠোঁট চেপে গর্বিতভাবে বলে, 'আমি বেশ আছি। যার যা

'ওঃ, তোমার তো ভারি কাজ,' ভেরা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসে।

মোতিয়া ওর হাসি দেখে রেগে যায় শুধু নিজের জন্যে নয়, সমগ্র পরিচারিকা-সঙ্ঘের তরফ থেকে।

'তুমি তার সম্বন্ধে কি জান?' মোতিয়া গরম হয়ে বলে, 'জান আজকাল বাড়ির কাজ করবার লোকের কত দাম?'

'আচ্ছা, আচ্ছা.' ভেরা ওকে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করে, 'অত খেপছ কেন? যাই মেয়েরা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

ভেরা বাড়ির সামনের দালানের দিকে এগিয়ে যায় আর মোতিয়া উঠোন পেরিয়ে রাস্তায় নামে। ভেরার উপরে সে চটে গেছে, এখন মনে হচ্ছে কেন সে এল। মেজাজটাই বিগড়ে গেল। বেশিক্ষণ অবশ্য এই ধরনের মন খারাপ করে থাকা মোতিয়ার ধাতে নেই। চারিদিকের দৃশ্য এত সুন্দর—সূর্যের উজ্জ্বল আলো, রাজপথের গাছগুলো ঘন সবুজ, বাগিচায় টিউলিপ ফুলের রঙীন সম্ভার। মোতিয়ার বিষাদ কোথায় উবে গেল, ভেরাকে পর্যন্ত সে খুশির মাথায় ক্ষমা করে ফেলল। দোকানের জানলা দেখতে দেখতে মোতিয়া চলতে লাগল, কয়েকটা দোকানের ভিতরেও গেল, আর কিছু না কিনলেও গম্ভীরভাবে এটা-ওটার দাম জানতে চাইল। একটা বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জামের দোকানে নতুন ধরনের একটি যন্ত্র দেখে তার কৌতূহল হল। কাছে গিয়ে দেখল নাম লেখা রয়েছে 'আবহাওয়া বাষ্পীয়করণ যন্ত্র'। দেয়ালের গায়ে একটা কালো ফলক আটকানো, তারই মাঝখান থেকে অবিরাম এক জলের ধারা বেরিয়ে আসছে। মোতিয়া ভেবে পেল না জলটা কোথায় যাচ্ছে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে সে খিলখিল করে হেসে উঠল। 'লোকেরা যে কী না তৈরি করে!'

দোকান দেখতে আর তার ভালো লাগছিল না। কাছের একজায়গা থেকে একটা মিষ্টি রুটি কিনে মোতিয়া বাসে চাপল, লেনিন টিলায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে গিয়ে নামবে। নীনাকে তুলে নিতে এখনও প্রচুর দেরি; অনেকদিনের একটা ইচ্ছে সে আজ মেটাতে পারবে—নদীর উপর দিয়ে ডিজেল লঞ্চে চড়া। মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে এসে পড়ল বাসটা, পেটা-লোহার রেলিঙের এপারে। অনেকক্ষণ ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের চারদিকে চক্কর দিল, বাগান আর বীথির মধ্যে দিয়ে এগুতে লাগল।

কিছুকাল আগে এই মহাপ্রতিষ্ঠানের অভ্রভেদী চুড়োর প্রথম দর্শন মোতিয়াকে একটা গভীর বিস্ময় ও শ্রদ্ধায় ছেয়ে ফেলেছিল। মোতিয়ার নিজেকে বড় ছোট মনে হয়েছিল, ভেবেছিল পৃথিবীর কয়েকটি বিস্ময়ের মধ্যে এটি বুঝি অন্যতম। এতদিনে অবশ্য অন্যান্য ব্যাপারের মত এই বিস্ময়টিও তার ধাতস্থ হয়ে গিয়েছিল; তাও যতবারই দেখেছে ততবারই মনে মনে স্বীকার করেছে যে তার নিজের বাড়ি সে-অঞ্চলের সেরা বাড়ি হলেও এই একত্রিশতলা ইমারতটার কাছে অতি নগণ্য।

বাস থেকে নেমে বাঁধের ধারে যাবার পাথরের ধাপগুলোর দিকে এগোতে গিয়ে মোতিয়া থেমে পড়ে। সত্যিই, এমন কোনও মস্কোবাসী বোধহয় নেই যিনি লেনিন টিলার উপর থেকে সমগ্র মস্কোর সেই চিরনতুন চিত্রপট দেখবার জন্য একাধিকবার থমকে দাঁড়াবেন না। পাঁচ বছর ধরে মস্কোয় থাকার ফলে মোতিয়া ক্রমেই একজন পুরোদস্তুর মস্কোবাসী হয়ে উঠেছিল তাই সেও ঐ দৃশ্য দেখে বিচলিত না হয়ে পারল না। মাত্র পাঁচ বছর আগেও এই শহরের আওয়াজ, ভিড়, প্রকাণ্ড বাড়িঘর, রাস্তার গোলকধাঁধা মোতিয়ার কাছে বড় ভয়াবহ ঠেকেছিল। বিরাট শহরে নিজেকে তার বড় একা লাগত। প্রায়ই ভয়ে তার রাত্রে ঘুম ভেঙে যেত; ধোঁয়াধরা রান্নাঘরের নড়বড়ে খাটিয়ায় ছটফট করতে করতে সে বালিশে মুখ লুকিয়ে কাঁদত, নিজের দেশ, সেখানকার নির্জন মাঠঘাট, ভোরবেলায় মোরগ আর গরুবাছুরের ডাক আর বিশাল উদার গাছগুলোর কথা ভেবে। তখন তার মনে হত শহরে আসার মত বোকামি বুঝি আর সে কখনো করে নি; একমাত্র হাস্যাস্পদ হবার ভয়ে আর তার একরোখা স্বভাবের জন্যে সে তখন বাড়ি পালিয়ে যায় নি। এখন আর মস্কোয় এসেছে বলে তার কোনও দুঃখ নেই। এখন নিজের গ্রামটাকে মনে হয় অনেক দূরে, বাড়িতে চিঠিপত্র লেখা পর্যন্ত সে ছেড়ে দিয়েছিল। আর বাড়িতে নিজের বলতে কেউ বেঁচেও ছিলেন না এক বড় বোন ছাড়া, যাঁর প্রতি মোতিয়ার কোনোদিনই বিশেষ টান ছিল না।

শহরের ব্যস্ততা আর রাস্তাঘাটের গোলমাল মোতিয়ার অনেকদিন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। আগে যেখানে দেখত সৃষ্টিছাড়া কতকগুলো বাড়ির জটলা আজকাল সেখানে সে খুঁজে পায় এক অনুপম সৌন্দর্য।

শাদা গোলাকার সূর্যটা সামান্য এক পরত মেঘের আড়াল টেনে মোতিয়ার মাথার উপর ঝুলছিল। তার মত সূর্যটাও একদৃষ্টে চেয়েছিল নদীর ওপারে যেখানে সেই বিপুলায়তন শহর একটা অস্পষ্ট বেগ্‌নি রঙের কুয়াশায় নিজেকে মুড়ে ফেলেছিল। মেঘের ফাঁক দিয়ে একে একে সূর্যের কিরণগুলো ছেঁকে বেরিয়ে আসছিল। তার মধ্যে একটা গিয়ে পড়ল ক্রেমলিনে মহামতি ইভানের ঘণ্টা-বুরুজের সোনালি গম্বুজের উপর। আর একটা শাবলভ্‌কাস্থিত টেলিভিশন মিনারের গায়ে গিয়ে পড়ে এক অপূর্ব মায়াজাল রচনা করেছিল। দেখতে দেখতে মোতিয়ার চোখের সামনে মিনারটি এক সূক্ষ্ম অলীক জালের মত স্বচ্ছ হয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ আকাশ আর মাটি জুড়ে যেন অগ্নিকাণ্ড বেধে গেল। সেই

আলোর ধাঁধায় মোতিয়া তাড়াতাড়ি চোখ বুজে ফেলল। চোখ খুলে দেখে এবার রামধনুর সাত রঙে স্নান করছে মস্কো শহর। বাতাস এসে মেঘগুলোকে কোথায় তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, সূর্যটা প্রচণ্ড সার্চলাইটের মতো ঐ ওপারে আলো ফেলছে, বিশ্ববিদ্যালয় গেছে ছায়ার আড়ালে ডুবে।

নদীর উপর দিয়ে ডিজেল লঞ্চ চলছে, এমন জলজল করছে মনে হচ্ছে যেন তুষারে ঢাকা। লুঝনিকি স্টেডিয়ামের জানলায় প্রতিফলিত হচ্ছে উপরের নীল আকাশ। নতুন দোতলা কুব্জপৃষ্ঠ ব্রিজটার উপর দিয়ে মোটরগাড়ি বয়ে চলেছে। তাদের নিচে মেট্রো স্টেশনের কাঁচের ভিতর দিয়ে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে একটা নীলচে রেলগাড়ি গুটি-গুটি অগ্রসর হচ্ছে। ফ্রুনৃজ্‌ বাঁধের উপর গোলাপী বাড়িগুলো আলোয় উজ্জ্বল, এমনকি নোভোডেভিচি আশ্রমের গেরুয়া চূড়োটা পর্যন্ত যেন সেই দীপ্ত আলোয় শুচিস্নাত। দূরের আকাশছোঁয়া বাড়িগুলির ঋজু শিখরগুলি স্তব্ধ গম্ভীর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। আরও দূরে, দিগন্তের রেখায় মিশে গেছে কারখানার ধোঁয়া, প্রহরীর মত ক্রেনগুলো লম্বা ঘাড় তুলে আকাশ দেখছে।

'যাই বল, এত সুন্দর দৃশ্য কোথায় পাবে,' মোতিয়া নিজের মনে ভাবে। অদূরে একটা ট্যুরিস্ট লাল বাস এসে থামে। মোতিয়া মনে করে নিশ্চয়ই ওর মধ্যে অনেক বিদেশী আছেন। যাত্রীরা নামলে কিন্তু দেখা গেল একজনও ভিনদেশী না, সবাই সাধারণ রুশ, ভ্রমণে বেরিয়েছেন। দমে গিয়ে মোতিয়া সেখান থেকে সরে গেল। কিন্তু তারপরেই আবার ফিরে তাকাল, একটা চেনা-মুখ দেখা গেল না এক চটকায়?

বাস থেকে লাফিয়ে তার পাঁচ পা সামনে এসে দাঁড়াল কাতিয়া সেস্তেরকিনা। কাতিয়া ছিল মোতিয়ার স্কুলের বন্ধু, তারপরেও তারা একসঙ্গে চাষের কাজ করেছে যদিও রেষারেষিতে কাতিয়া কখনই মোতিয়ার সঙ্গে পেরে উঠত না।

'কাতিয়া!' মোতিয়া মরিয়া হয়ে চেঁচায় যেন ভীষণ বিপদে পড়েছে। কাতিয়া ফিরে চাইবার আগেই দেখে মোতিয়া তাকে সজোরে জড়িয়ে ধরেছে।

'কী মজা, কোথায় দেখা হয়ে গেল দেখ! তুমিও কি বেড়াতে বেরিয়েছ?'

'হ্যাঁ, এই এরা ঘুরিয়ে সব দ্রষ্টব্যগুলো দেখাচ্ছে। কিন্তু তোমার কি খবর? তুমি তো চিঠি লেখাও বন্ধ করে দিয়েছ।'

'চিঠিপত্তর লেখা আমার আসে না,' মোতিয়া বন্ধুকে আপাদমস্তক দেখতে দেখতে বলে।

এই ক'বছরে কাতিয়া অনেক বদলেছে, অবশ্য ভালোর দিকে নয়, মোতিয়া ভাবে। এক সুঠাম যুবকের মত গড়ন হয়েছে তার, মুখটা রুক্ষ বাতাহত, প্রশস্ত কাঁধ, অমসৃণ হাতের তালু, চলন পর্যন্ত ভারি ও পুরুষালি। তার পরনে একটা নতুন গাঢ় রঙের পোশাক—একটু পুরনো ধাঁচের—লম্বা স্কার্ট আর আঁটোসাঁটো একটা কোট। দেখলেই বোঝা যায় কাতিয়া মফঃস্বলের মেয়ে। তার পাশে আধুনিক ক্রেপ্-দ্য-শিন্ জামা-পরা, পায়ে হলদে জার্মান চপ্পল, সাজানো মাথার চুল মোতিয়াকে দেখে রীতিমত শহুরে মনে হচ্ছিল। মোতিয়া সে-বিষয়ে বেশ সচেতন—কাতিয়াকে ঈষৎ করুণার চোখে দেখতে থাকে সে।

বাসের অন্যান্য যাত্রীরা গাইডের পিছু পিছু সারবেঁধে রাস্তা পেরিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে যাচ্ছিলেন, গাইডটি সতর্ক ইস্কুল মাস্টারনীর মত নজর রাখছিলেন সকলের উপর আর থেকে থেকে তাড়া লাগাচ্ছিলেন। কাতিয়া একবার সেদিকে চেয়ে হাত নেড়ে বলল,

'ওদের ধরে ফেলব এখন। তা কেমন ছিলে বল এতদিন।'

'চমৎকার!' মোতিয়া উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে যেন এই প্রশ্নটির জন্যেই সে এতক্ষণ অপেক্ষা করেছিল। বলতে বলতে গর্বে ও তৃপ্তিতে সে কেঁপে ওঠে। আলেক্সেয়ি সার্গেইভিচ্ যিনি এখন সুদূর ভারতবর্ষে, অল্গা ইভানভ্না যাঁকে টেলিভিশনের পর্দায় দেখা গিয়েছিল, রাজমিস্ত্রী ভেরা, মোতিয়ার ভারতীয় বন্ধুরা, তার অদ্বিতীয় বাড়ি যেখানে আছে গরম জল, টেলিফোন ও ময়লা সারাবার আধুনিক উপায়, লেনচ্কা যে মঙ্গলগ্রহে যাবার জন্যে তোড়জোড় করছে—সবাইকার কথা সে একে-একে শোনায় কাতিয়াকে। এমনভাবে বলে যেন এসব তার একারই কৃতিত্ব।

কাতিয়া প্রথমটা আগ্রহের সঙ্গে শোনে, তারপর রাঙা পাথরের আলসের উপর হেলান দিয়ে মস্কো শহরের দিকে নিষ্পলক চেয়ে থাকে।

'কিন্তু তোমার কি খবর? তোমার নিজের কথা শুনতে চাই,' মোতিয়া অবশেষে থামতে কাতিয়া বলে।

'এতক্ষণ কার কথা বলছিলাম তাহলে?' মোতিয়া অবাক হয়ে যায়।

'ও তাহলে তুমি এতদিন পরিচারিকার কাজই করে চলেছ?'

'সে তো বটেই !'

'ও, আমি ভেবেছিলাম—'

'না, আমি কারখানায় ঢুকি নি। ও-কাজে কোনও মজা নেই। তারপর, তুমি কেমন আছ? চাষবাস কেমন চলছে?'

'চাষবাস?' কাতিয়া খুশি হয়ে ওঠে। এতক্ষণ সে নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়েছিল, এবারে আবার সে সজীব হয়ে ওঠে। 'আমার সেই গাইটাকে মনে পড়ে, যার নাম রেখেছিলাম 'পার্টিসান্'? সেই যে যার গায়ে তারার মত শাদা ছাপ ছিল? সে এখন খুব দুধ দিচ্ছে, আগেকার সব রেকর্ড ভাঙতে চলেছে!'

'সত্যি!' মোতিয়া বলে যেন অনেকটা ভদ্রতার খাতিরে, সত্যিকারের কৌতুহলবশে ততটা নয়, 'কিন্তু আমার তো ধারণা ছিল গোরুটা তেমন কাজের নয়।'

গোরু সম্বন্ধে মোতিয়ার আগ্রহ কমই। আসলে সান্‌কা ঝ্‌মিখভের কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যে সে ছটফট করছিল, কেবল সাহসে কুলোচ্ছিল না। কৌশলে কী করে কথাটা পাড়া যায় তাই ভাবছিল। শেষকালে কিছু না ভেবে পেয়ে খুব সহজ নির্লিপ্ত গলায় বলল,

'সান্‌কা ঝ্‌মিখভ্ মস্কোয় এসেছিল কিছুদিন আগে, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। মজার লোকটা! কেমন আছে সে?'

'ঝ্‌মিখভ্? ওর খবর জান না বুঝি? ওরেলের টেক্‌নিক্যাল কলেজে লেখাপড়া শেষ করে ও এখন আমাদের কৃষিবিশারদ হয়ে আছে। আজকাল তো ওর খুব নামডাক!'

'তাই নাকি? যাঃ, আমার বিশ্বাস হয় না!' মোতিয়া বিহ্বল হয়ে পড়ে। হঠাৎ তার বড় ক্লান্ত লাগে, মনে পড়ে যায় সে অনেকক্ষণ কিছু খায় নি, শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।

কাতিয়া নির্মমভাবে বলে চলে,

'এই সেদিন ওর বিয়েও হয়ে গেল গ্রুনিয়া মারকোভার সঙ্গে।'

'আর আমার দিদি, তার কি খবর?' কিছু একটা বলতে হবে তাই মোতিয়া এই কথা জিজ্ঞেস করে। সে আর কাতিয়ার জবাব শুনতে পায় না, খালি সেখান থেকে তাড়াতাড়ি পালাবার ছুতো খোঁজে। সে ভাবে নি সান্‌কা ঝ্‌মিখভের কথায় সে নিজে এতটা বিচলিত হয়ে পড়বে।

বাসের যাত্রীদের ফিরে আসতে দেখে মোতিয়া প্রায় উৎফুল্ল হয়ে বলে,

'ঐ যে তোমার দল এসে পড়ল, যাও তাড়াতাড়ি। মস্কোয় থাকছ কয়েকদিন? আমার বাড়িতে একবার ঢুঁ মেরে যেও না! এই নাও আমার ফোন্ নম্বর।'

বাসের ইঞ্জিন গর্জে উঠল। কে একজন মহিলা ঝুঁকে পড়ে কাতিয়াকে ডাকছিলেন। কাতিয়া মোতিয়ার গালে চুমু খেয়ে বাসে উঠে পড়ল, সেখানে দাঁড়িয়েই মোতিয়া চেঁচিয়ে যে ফোন্ নম্বরটা দিল সেটা লিখে নিল।

মোতিয়া বাড়ি ফিরে চলল। নদীতে বেড়ানো আর তার হয়ে উঠল না। অবশ্য হাতে সময় থাকলেও সে বাড়িই ফিরে যেত। আজ তার বড় ক্লান্ত লাগছে। কাতিয়া চলে যাবার পর একটু স্বস্তি পেলেও, সেই অদ্ভুত কন্‌কনে শিহরণটা কিছুতেই যাচ্ছিল না।

সান্‌কা ঝ্মিখভের কথা ভাবতে লাগল সে। সেই সান্‌কা যে আজ কৃষি-বৈজ্ঞানিক হয়েছে। চিরকালের মত সে মোতিয়ার জীবন থেকে সরে গেছে। মোতিয়া খুব চেষ্টা করল সান্‌কার পাশে গ্রুনিয়া মারকোভাকে কল্পনা করতে কিন্তু সেখানে দেখতে পেল খালি নিজেকে! সে মোতিয়াই তো আলেক্সান্দার ইভানভিচ্ ঝ্মিখভের মত গণ্যমান্য ব্যক্তির পত্নী! ঐ যে বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, সবুজ ছাদটা সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক করছে, সেটা তো ওদের দু'জনেরই বাড়ি; মোতিয়াই তো ফলের বাগান থেকে আপেল পেড়ে আনছে, মুর্গিগুলোকে ডেকে জড়ো করছে, গরম উনুনে ময়দা ঠেসে গড়ে রাখছে। সান্‌কা তো তারই জন্যে নির্জন নদীতীরে তারার আলোয় করুণ প্রেমের গান বাজিয়ে শোনাচ্ছে।

মোতিয়া বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়েছে এমন সময়ে এক পশলা বৃষ্টি নামল। ঘাস পাতাগুলোকে নাড়িয়ে দিয়ে রাস্তাঘাট ধুইয়ে দিয়ে বৃষ্টিটা ভ্নুকোভো বিমানবন্দরের দিকে ঝেঁটিয়ে চলে গেল। মোতিয়া সিনেমা হলের কোণে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। হঠাৎ তার মনটা যেন খুশী হয়ে উঠেছে, বৃষ্টিটা এসেছিল যেন তার সমস্ত মনের গ্লানি ধুইয়ে দেবারই জন্যে। আনিয়াকে রাস্তা পেরোতে দেখে মোতিয়া তার কাছে ছুটে যায়।

'আনিয়া, শোন, আজ কার সঙ্গে দেখা হলো জানো?' মোতিয়ার গলা খুশীতে আর গর্বে ভরা।

'কার সঙ্গে ?' মোতিয়ার কথা শোনবার মত আনিয়ার ধৈর্য আছে বলে মনে হয় না।

মোতিয়া তাকে তার বাল্যবন্ধু কাতিয়া আর কৃষি-বৈজ্ঞানিক সান্ক ঋমিখভের কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ একটা হতাশার ভাব করে কিছু না বলে সেখান থেকে চলে যায়, আনিয়া হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকে। নাঃ, মনটা তে তার সত্যি সত্যি খুশী হয় নি। মোতিয়া এই প্রথম উপলব্ধি করে যে সে অন্য লোকদের কাজকর্ম নিয়ে এত বলে বেড়ায় তার নিজের গর্ব করার মত কিছু নেই বলেই।

মাথা নীচু করে সে হাঁটতে থাকে। লীনার কাছে যেতে দেরী হয়ে গেল কিন্তু কিছুতেই যেন আজ তার কিছু এসে যাচ্ছে না। লেনিন সড়কে এসে পড়ে মোতিয়া আবার দেখতে পায় সেই প্রাচীন বায়ুবিক্ষোভিত অবনমিত লেবু গাছটাকে। এই গাছটার মত তারও কপালে কি আছে এর-ওর জানলা থেকে ঠিকরে পড়া একটু উষ্ণ আলোয় সারাটা জীবন কাটিয়ে দেওয়া ?

অনুবাদঃ শ্রবণা মুখোপাধ্যায়

AUSTRALIA : THE CURSE *by* KATHERINE SUSANNAH PRICHARD

ক্যাথারিন সুজানা প্রিচার্ড

আশমানী নীল, খুনখারাবি, টেট্রাথিকা, বেগুনী আর নীলকান্তমণি রং : কুঁড়ে ঘরটা, শান্ত সমুদ্রের বুকে বিধ্বস্ত জাহাজ। লাল-আঠা আর জারা গাছে অন্ধকার পাহাড়ের ঢেউয়ের মাঝখানের উপত্যকাকে স্নান করিয়ে দেয় সূর্যের আলো। জীবনের কোনো চিহ্ন নেই, শব্দ নেই, শুধু গাছগুলোর জীবন, একটা পাখির উচ্চকিত গান, কম্পমান গাছের পাতার ফাঁকে একটা পাখির দেহ। পাতার মর্মর। পাতার থরথর আওয়াজ, পাতার মর্মর, কর্কশ, ভঙ্গুর। ছোট্ট সবুজ জিভগুলো একসাথে আধো আধো আর টকাস্ টক্ আওয়াজে মোচড় খায়, পরস্পরকে লেহন করে। ফাঁকা জায়গায় ঘোড়ায় চড়ে পৌছতে পৌছতে আমাদের কানে এল ওদের ফিস্‌ফিসানি, ওদের গালগল্প :

● অস্ট্রেলিয়া ●

"অ্যাল্‌ফকে দেখেছ ?

"অ্যাল্‌ফ ?"

"অ্যাল্‌ফ জেলে।"

"জেলে ?"

"হ্যাঁ !"

"ঘোড়ার সাজ, একটা বন্দুক, আর লাগাম।"

"শুধু এই ?"

"শুধু এই পেয়েছে…"

"কুঁড়ে ঘরের মেঝের নীচে।"

"কে ?"

"ঘোড়সওয়ার পুলিশ…"

"ঘোড়সওয়ার পুলিশ আর কালো গোয়েন্দা…"

"ওরা যখন অ্যাল্‌ফকে ধরতে এল।"

"জেলে পুরতে…"

"একটা বন্দুক, ঘোড়ার সাজ আর লাগামের জন্যে।"

কুঁড়ে ঘরটার মুখোমুখি দীর্ঘ পাহাড়ী ঢালুপথে ছোট ছোট চারাগাছের ঝাড়, দীর্ঘ, ঋজুবৃন্ত সমভার পশমের মত পাতা, কচি সবুজ আর সোনালি, ভেড়ার পিঠের লোমের মত শক্ত আঁট।

"কতবার ওকে আমরা দেখেছি…"

"এ পথ দিয়ে আসতে দেখেছ ?"

"ওর বুনো ঘোড়ার পিঠে চেপে"

"ঝাঁকড়াচুলো চেষ্ট্‌নাট্ ঘোড়া…"

"অথচে, উপোসী চেহারা।"

"অ্যাল্‌ফ ?"

"না, বুনো ঘোড়াটা।"

"দুজনেই।"

"টুপিটা পাশে গোঁজা।"

"কানের উপর চুল।"

"আর ওর ক্যাঙারুর মত কুকুরগুলো…"

"দুটো, কালো সাপের মত মুণ্ডুগুলো।"

"ল্যাজগুলো পিঠের উপরে কুণ্ডলী পাকান।"

"আর মাদী কুকুরটা…"

"তামাটে, হলদেটে বাদামী।"

"চোখদুটো অ্যাল্‌ফের মত…"

"হাল্কা, বোকার মত চোখ।"

ঠেলাঠেলি করছে ঘোড়াগুলো, গেটের কাছে একটা খুঁটির উপরে লাগামগুলোর ক্যাঁচকেঁচে আওয়াজ। নীলের আঘ্রাণ নিয়ে ওরা সরে দাঁড়ায়। জিম একটা ফুল তোলে। নীল আর নীল-বেগুনী, ওর হাতের মুঠোয় কোমল,

সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলো মূর্চ্ছিত; মখমলের মত পাতা, কড়া সবুজ। ওর হাতটা, এঁটে বসা আঙুলগুলো আর উঁচু গাঁটগুলো, ফুলটার উপরে দুমড়ে আসে।

আমাদের চারিদিকের ফুলে শুধু নীল; ফুলগুলো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শক্ত বোঁটার উপরে, যেন ছোট্ট ছাতার তৈরি মিনারের চূড়া আর বুদ্ধমন্দির, একটার উপরে একটা কিংবা ছড়িয়ে পড়া নীলকান্তমণি রং আর আশমানী রং বা ফিকে লালচে নীল আর খুনখারাবি। আমাদের উপরে ভিড় করে পায়ের গোছ আর হাঁটুর নীচে পর্যন্ত পৌছে, কুঁড়ে ঘরটার দেওয়ালের গায়ে ওরা ঠেলা দিচ্ছে, চৌকাঠ ছাপিয়ে; ডুমুর গাছের নীচে পাক খেয়ে ফলবাগানের মধ্যে দিয়ে ওরা এগিয়েছে। লতা, পাতা, গুল্মের ডগ্‌ডগে আর খস্‌খসে বাড়ন্ত বোঁটাগুলো এত ঘেঁষাঘেষি যে তার ফাঁক দিয়ে কোনো আগাছা, কোনো কুঁড়ি, কোনো ঘাসের মাথা তোলার যো নেই। ওরা লোভার্ত ক্ষুধায় টানছে মাটির রস। হলের খাঁজের ছাঁচে ঢালা কর্ষিত মাটির উপরে ওরা ছড়ান, আর ফলের গাছের তলায়। অভিশাপ আকণ্ঠ শুষছে মাটির প্রাণের রস, তার নির্যাস, ম্যাঙ্গানিজ, ফস্‌ফরাস্‌, অ্যামোনিয়া, আর তাদের জাহির করছে রঙের সমুদ্রে—নীল, তুঁতে আর খুনখারাবি, যেন তামিল নাচিয়ে মেয়ের ঘাগ্‌রা।

পাতাদের বকবকানি আর খসখসানি; একটা অস্পষ্ট ধূর্ত নিরর্থক কথার ধারা সমস্ত পাহাড়ের গা বেয়ে চলেছে।

"অভিশাপ!"

"প্যাটারসনের অভিশাপ?"

"রাক্ষুসে আগাছা…"

"ও ঠিক এই কথাই বলে।"

"সমুদ্রের মত নোনা আর বিষাক্ত।"

"মন্ত্রমুগ্ধ সমুদ্র।"

"স্বপ্নের সমুদ্র।"

"মরা সমুদ্র।"

"দিল অ্যাল্‌কে সাব্‌ড়ে।"

"ফাঁসিয়ে দিল?"

"ওকে হটাতে কোনো চেষ্টাই করে নি।"

"সাহসই ছিল না লড়িয়ে দেবার।"

"কী ?"

"অ্যাল্‌ফকে হারাবার লড়াইতে।"

"অ্যাল্‌ফ ?"

"অ্যাল্‌ফের কোনো সাহসই ছিল না।"

"সব আশা ছেড়ে দিয়েছিল।"

"উপোস করে থাকত।"

"চুরি ধরল।"

"প্রথমে ছোটখাট জিনিস…"

"লাগাম আর হাল্কা কুড়োল।"

"ডুবে গেছল, না ?"

"বুদ্ধু ?"

"মোটেই না।"

"ওরা বলে মাথায় ছিট্ ছিল।"

"এভাবে এমন জায়গা ছেড়ে দেয় কেউ।"

"না।"

"ভাগ্যটাই নিরেট।"

"বুকের পাটা নেই একেবারে।"

"কুঁড়ে কোথাকার।"

"পড়তে ভালবাসত।"

"দেখা হলেই বলত, 'বই আছে কোনো ?'

"তারপর ঘোড়া ছুটিয়ে যেত থলে বোঝাই·

"ল্যারির মত সুখে।"

"বুনো ঘোড়ার পিঠে চেপে।"

"ওর ক্যাঙারুর মত কুকুরগুলো নিয়ে।"

"বীজ করার মোটে ইচ্ছে ছিল না।"

"তাইতো বলত।"

"খালি পড়ায় ঝোঁক।"

"আর ক্যাঙারু পোষায়।"

"একটুখানি ক্যাঙারুর ল্যাজের ঝোল…"

"বেড়ে।"

"খেয়েছ কখনও ?"

কুঁড়ে ঘরটা, মরাগাছের সারি দিয়ে তৈরি দেওয়াল, লোহার চাদরের ছাদটা ঝড় আর রোদের দাপটে রূপের ঝক্‌ঝকে আলোর মত সাদা; শূন্য, পরিত্যক্ত। মরচে ধরা পুরোন লাঙলের ফলা; কাঠ বওয়ার জীর্ণ ঠেলাগাড়ি। ডুমুরগাছের তলায় ঠেলাগাড়ির চাকা।

কিন্তু দরজার পাশে গুঁড়ি মেরে বসে ও ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের উপরে, হলদেটে বাদামী রঙের মাদী কুকুরটা। পিছিয়ে গেল দাঁত খিঁচিয়ে, দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই ওর, ওর শরীরের নিচে একটা থলের মত পেটটা ঝুলে পড়েছে। উপোসী কুকুরটা গুটিসুটি মেরে প্রতীক্ষা করে আছে অ্যাল্‌ফ ফিরে আসবে বলে।

পাতার হাসি, অমানুষিক অমর। স্মরণাতীত কাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত পাতারা হাসছে: অসংখ্য, ক্ষুদ্র, সবুজ জিভ আওয়াজ করছে টকাস্‌ টক্‌, ওদের শুকনো ঝিরঝির আওয়াজ ভেসে যাচ্ছে বাতাসে।

অরণ্যের অন্ধকারে, লাল-আঠা আর জারাগাছের নীচে। কাঠুরের গাড়িটানা পথ, ঝোপের ভিতর দিয়ে, পুরোন ঘায়ের শুকনো দাগ। কিন্তু পাতাদের বক্‌বকানি চলেছেই, আধো-আধো, অশ্রান্ত সুরে বলে চলেছে অ্যাল্‌ফের কথা, আর হলদেটে বাদামী রংয়ের মাদী কুকুরটা বসে আছে রোদের আলোয় বাচ্চাগুলোকে বুকে করে।

পিছলে পড়া চোখের দৃষ্টি থেকে ঢেউয়ের মত পাহাড়ের মাঝখানে রৌদ্রস্নাত উপত্যকা অদৃশ্য, আর কুঁড়ে ঘরটি, ফিকে টেট্রাথিকা আর নীলকান্তমণির শান্ত সমুদ্রে ঝাপসা, ভুতুড়ে; বন্য প্রলাপের চিৎকার তুলে মাথার উপর দিয়ে পাখিরা উড়ে যায়।

অনুবাদ: করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বি য়ো গ প ঞ্জী

নন্দলাল বসু

"যে নদীতে স্রোত অল্প সে জড়ো করে তোলে শৈবালদামের ব্যূহ, তার সামনের পথ যায় রুদ্ধ হয়ে। তেমনি শিল্পী সাহিত্যিক অনেক আছে যারা আপন অভ্যাস এবং মুদ্রাভঙ্গীর দ্বারা আপন অচল সীমা রচনা করে তোলে। তাদের কর্মে প্রশংসাযোগ্য গুণ থাকতে পারে কিন্তু সে আর বাঁক ফেরে না, এগোতে চায় না, ক্রমাগত আপনারই নকল আপনি করতে থাকে, নিজেরই কৃতকর্ম থেকে তার নিরন্তর নিজের চুরি চলে। আপন প্রতিভার যাত্রাপথে অভ্যাসের জড়ত্ব দ্বারা এই সীমাবন্ধন নন্দলাল কিছুতেই সহ্য করতে পারেন না।···সৃষ্টিকার্যে জীবনীশক্তির অস্থিরতা নন্দলালের প্রকৃতিসিদ্ধ।···তাঁর লেখনী নিজের অতীতকালকে ছাড়িয়ে চলবার যাত্রিনী। বিশ্বসৃষ্টির যাত্রাপথ তো সেইদিকেই। তার অভিসার অন্তহীনের আহ্বানে।"

—নন্দলাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য কারণ নন্দলালের শিল্পপ্রতিভার মূল কথাটি এখানে ব্যক্ত। গত ২রা বৈশাখ (১৬ই এপ্রিল) শান্তিনিকেতনে ৮৩ বছর বয়সে নন্দলালের মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু জীবনব্যাপী রূপসৃষ্টির সাধনায় আর শিল্পজিজ্ঞাসার উত্তর-সন্ধানে তিনি বরাবর অগ্রণী ছিলেন।

স্মৃতিভ্রষ্ট ভারতশিল্পকে তার নিজস্ব জাতীয় উত্তরাধিকারে আত্মপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে গুরু অবনীন্দ্রনাথের সহযোগী হিসেবে নন্দলালের শিল্পজীবনের সূত্রপাত ৬০-৬৫ বছর আগে। এই সুদীর্ঘ কাল ধরে নন্দলাল তাঁর সৃষ্টির প্রত্যেকটি পদক্ষেপে শিল্পানুসন্ধিৎসার নানা বিচিত্র ও বিস্তীর্ণ প্রান্তর পার হয়েছেন। শিল্পের নিত্য নতুন সম্ভাবনা, উপাদান, ক্ষেত্র আর রূপরীতি আবিষ্কারে নন্দলাল ছিলেন পুরোগামী। নন্দলালের শিল্পকর্মে যে ঐশ্বর্য এবং বৈচিত্র্য, তার মূল কথাটি হল—তাঁর রূপসন্ধান প্রথম থেকেই নব নব অভিযানে বের হয়েছে, নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতির মধ্যে তিনি বাঁধা থাকেন নি কোনোদিন। নন্দলালের চোখে শিল্পের রূপধর্ম ফর্মায় ফেলা কোনো বিশেষ গণ্ডিতে আটকা পড়ে নি। একদিকে অজন্তা, রাজপুত, মুঘল প্রভৃতি চিত্রকলার

রূপরীতিবৈশিষ্ট্য যেমন নন্দলালের প্রথম প্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি প্রেরণা নিয়েছেন তিনি ইওরোপীয় চিত্রকলার বিভিন্ন ধারা থেকে, চীনা-জাপানী চিত্রকলা থেকে। কিন্তু নন্দলালকে সবচেয়ে বড় প্রেরণা জুগিয়েছে বাংলার লোকশিল্প, যা একান্তই আমাদের নিজস্ব ঘরের জিনিস—পট, পুঁথির পাটা, পুতুল, কাঁথার নকশা, পোড়ামাটির মূর্তি, কুঁড়েঘরের দেওয়ালের অলংকরণ ইত্যাদি। নন্দলালের তুলির টানে টানে আশ্চর্য সুন্দর এক-একটি গীতি-কবিতার মত ফুটে উঠেছে দেশের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র সরল রূপ—দেশের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিনতার মৃত্তিকাঘনিষ্ঠ আনন্দ।

এবং নন্দলালের সেই সানন্দ রূপকল্পনার পিছনে ছিল তাঁর নিজস্ব আত্মস্থতা। বিশ্বশিল্পের রূপস্রোতে তিনি স্নান করে এসেছিলেন। জাতীয় চিত্র-ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের শিল্পকলার যা-কিছু শ্রেষ্ঠ তাকেও নন্দলাল আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। এবং সেই বিদেশী আঙ্গিক-পদ্ধতি আর আদর্শকে তিনি দেশের মনের সঙ্গে মিশিয়ে চোলাই করে নিয়েছিলেন বলেই নিজের রচনায় যখন সেটাকে প্রয়োগ করেছেন তখন আর সেটা বিদেশী থাকে নি। নন্দলালের নিজস্ব রীতিবৈশিষ্ট্যে সমন্বিত হয়ে গিয়ে একটা নতুন রূপ পেয়েছে। আর সেই সঙ্গে নন্দলাল চলেছেন বারবার নিজেকে অতিক্রম করে—যে-কথাটি রবীন্দ্রনাথ এত সুন্দর করে বলেছেন। নন্দলালের শিল্পসৃষ্টিতে এক আন্তরিক ভাবাবেগ আছে বলেই তাঁর রচনা নিরবচ্ছিন্ন টেকনিকের কসরৎ হয়ে পড়ে নি। শিল্পসাধনায় নন্দলালের যে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, তার সামনে বাজার-চলতি ফ্যাশন আর রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, বাঁধা-খরিদ্দারের অচল শক্তির খুঁটিতে বাঁধা বৈষয়িক বিচারবুদ্ধি কখনও মাথা উঁচু করতে পারে নি—যেটা হয়েছে তাঁর সমসাময়িক একাধিক শিল্পীর বেলায়। পরবর্তীদের বেলায় তো বটেই।

নন্দলাল-প্রসঙ্গে একটি কথা বারংবার বিশেষভাবে স্মরণীয়: উনিশ শতকের শেষের দিকে আর বিশ শতকের গোড়ার দিকে বাংলার নেতৃত্বে ভারতীয় চিত্রকলার মরা গাঙে নবজীবনের জোয়ার এসেছিল। সেটা ছিল আমাদের জাতীয় চেতনার এক পরিপূর্ণ বিকাশের যুগ। তখনকার সেই জাতীয় রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চেতনার নবজাগরণের অঙ্গ হিসেবে—বিশেষত সেই সময়কার শিল্পীদের বিলিতি অ্যাকাডেমিক চিত্রপদ্ধতির অনুকরণ-প্রয়াসের প্রতিবাদ হিসেবে—ঐতিহ্যধারাবাহী ভারতীয় চিত্রপদ্ধতির অনুশীলন ছিল

নিঃসন্দেহে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। বিশেষ করে যদি এই কথাটা মনে রাখি যে তার আগে পর্যন্ত আমাদের চিত্রচর্চার ক্ষেত্রে বেশ কিছুকালব্যাপী একটা ছেদ গেছে। সেই শূন্যতাকে পূরণ করার জন্যে প্রধানত অবনীন্দ্রনাথ আর তাঁর কয়েকজন সহযোগীর উদ্যমে শুরু হয় স্মৃতিভ্রষ্ট ভারতশিল্পের আত্মানুসন্ধান। এবং অবনীন্দ্রনাথের সেই সহযোগীদের মধ্যে প্রধানতম ছিলেন নন্দলাল। অবনীন্দ্র-নন্দলাল প্রবর্তিত এই তথাকথিত নব্য ভারতীয় চিত্রপদ্ধতিকে অনেকে যে শুধু 'রিভাইভ্যালিজ্‌ম্', পুরাতনের পুনরাবৃত্তি, ইত্যাদি বলে নস্যাৎ করে দেবার চেষ্টা করেছেন, তারা এর এই ঐতিহাসিক পটভূমিটুকু স্মরণে রাখেন নি বলে মনে হয়। সেই সঙ্গে, অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকর্মের খুব অমনোযোগী দর্শকের কাছেও এই কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে তিনি ঐতিহ্যধারাবাহী ভারতশিল্পের মৌল চরিত্র অক্ষুণ্ণ রেখে, এর রেখানির্ভর গঠনপদ্ধতির মূলগত গুণগুলিকে না বদলিয়ে, চিত্রের সংস্থাপনে আর রঙের বিন্যাসে সহজভাবেই ইওরোপীয় রীতিপদ্ধতিকে কাজে লাগিয়েছিলেন। নব্য ভারতীয় চিত্রকলার সেই গোড়ার যুগে ভাবে বা ভঙ্গীতে যা-কিছু বিদেশী তাকেই বর্জন করার একটা প্রয়াস থাকলেও, অবনীন্দ্রনাথ কিন্তু অবলীলাক্রমে মুঘল চিকন কাজের সঙ্গে জাপানী ছোপের কাজ আর ইওরোপীয় জলরঙের ওয়াশ-এর কারুকৌশল প্রয়োগ করেছেন একই ছবিতে। অথচ, তাঁর প্রতিভার স্পর্শে তা হয়ে উঠেছে খাঁটি ভারতীয় ছবি।—এইদিক থেকেই, অবনীন্দ্রনাথ নব্য ভারতীয় চিত্রকলার ক্ষেত্রে আমাদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত নতুন এক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠিত করেন। এবং, নন্দলাল তাঁর শিল্পীজীবনের গোড়ার দিকে, অবনীন্দ্রনাথের ছাত্র হিসেবে, ভারতীয় চিত্রকলার সমস্ত বৈশিষ্ট্য, রূপরীতি, আঙ্গিক-পদ্ধতিকে মনোযোগের সঙ্গে আয়ত্ত করেছিলেন, নিজের চিত্ররচনায় প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু আবার যখন সেই শিল্পমূল্যবোধের অনেক ক্ষেত্রে অগভীর উপলব্ধির ফলে অপেক্ষাকৃত অল্পদিনের মধ্যেই তা হয়ে দাঁড়ায় পদ্ধতিগত মামুলিয়ানার আশ্রয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকে মোটামুটি অতীতমুখী আর সমসাময়িক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন, তখন নন্দলালই প্রথম নিজেকে অতিক্রম করে এলেন অবনীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে সকলের আগে। আমাদের নতুন শিল্পান্দোলনের নদীতে যখন স্রোত ক্ষীণ হয়ে আসার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, তখন নন্দলালই তাতে মুক্তির জোয়ার এনেছেন। নব্য ভারতীয় চিত্রকলা যে নিতান্ত পদ্ধতি-নির্দিষ্ট একটা টেকনিক-

সর্বস্বতার স্তরে নেমে আসছিল, নন্দলালই তাকে সবচেয়ে সার্থকভাবে সেই সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি দিলেন চিত্রের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে জীবনের দৈনন্দিনতাকে এনে আর সেই নতুন বিষয়বস্তুর রূপদানে অঙ্কনপদ্ধতির তাৎপর্যময় হেরফের ঘটিয়ে।

নন্দলালের শিল্পীমানস যে মূলত রোম্যান্টিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ রোম্যান্টিকতা মৃত্তিকাজাত। জীবনের পরিবেশের মধ্যে আর প্রকৃতির নিত্যনতুন রূপ আবিষ্কারের মধ্যে যে অপরূপ বিস্ময়, সেই বিস্ময়বোধ থেকে এ রোম্যান্সের জন্ম। জীবনের বলিষ্ঠ আর সানন্দ উপলব্ধির উপরে এই রোম্যান্টিকতার ভিত বলেই নন্দলালের চিত্রকলার রোম্যান্টিকতা তাই যথার্থ আধুনিক অর্থেই সার্থক। চারপাশের জীবনের আর প্রকৃতির রূপসমারোহের প্রতি বিস্ময় আর ভালোবাসার মুগ্ধতায় ভরা নন্দলালের এইসব ছবি আর স্কেচগুলির ভাবঘন আবেদন আশ্চর্য আনন্দময়।

এবং, সবচেয়ে বড় কথা—শিল্পের প্রতি তাঁর এক অবিচল আত্মস্থতা, শান্ত একটি সমাহিতি—যেটা শিল্পসাধনার এক ঐকান্তিক সিদ্ধিলাভের পথে তাঁকে চলতে সাহায্য করেছিল। শিল্পের প্রতি এই আত্মোৎসর্গের মনোভাবটি আজকালকার ঘোরতর বৈষয়িক শিল্পমূল্যবোধের সঙ্গে মেলে না। নন্দলালের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বোধহয় তাই আমাদের সেই 'সাধক' শিল্পীদের যুগ শেষ হল—যাঁরা সৃষ্টির আনন্দলোক থেকে নেমে এসে কোনোদিন আর্টের নিউ মার্কেটে স্টল খুলে বসেন নি।

রবীন্দ্র মজুমদার

বিবিধ প্রসঙ্গ

'জরুরী অবস্থা'

'জরুরী অবস্থা' ঘোষিত হয়েছিল প্রায় চার বৎসর পূর্বে—চীনা আক্রমণের মুখে। মাস কয়েকের মধ্যেই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, অবস্থা আর জরুরী নেই। চীনা সৈন্যরা ভারত থেকে সরে যাওয়াতে তার অবসান হয়। কিন্তু কথাটা অন্য দিকে বিশেষ করে প্রামাণিত হয় কংগ্রেস-শাসকদেরই আচরণে। বৈদেশিক আক্রমণের আশঙ্কায় দেশের আপামর সাধারণ নিজেদের ধনপ্রাণ পণ করে ত্রস্ত দেশরক্ষায় এগিয়ে আসতে চেয়েছিল সেই দেশপ্রীতিকে কোনোরূপে মূর্ত করার বিন্দুমাত্রও চেষ্টা শাসক-পক্ষের দেখা যায় নি—একমাত্র অর্থ ও অলঙ্কারাদি সংগ্রহে তাঁরা কিছুটা তৎপরতার প্রমাণ দিয়েছেন—এটাই তাঁরা চেনেন। দেশরক্ষায় জরুরী কোনো অবস্থা আছে, তা সরকার কার্যত তখনো মানেন নি। তারপরে একদিকে খাদ্যসংকট ঘনিয়ে এল, অন্যদিকে বাধল পাকিস্তানের সঙ্গে সশস্ত্র বিরোধ। আরেকবার দেশবাসী সকল রকমে দেশরক্ষার জন্য ত্যাগ-স্বীকারে শপথ নেন। বাইশ দিনে বিরোধ শেষ হলো যাওবা তার জের ছিল তাশখন্দে সোভিয়েত মধ্যস্থতায় তাও চুকিয়ে দেবার মত অবস্থার সৃষ্টি হলো। চুকে যাবে কিনা, সে দু' পক্ষের নিজেদের উপর নির্ভর করে। অন্তত অবস্থা জরুরী নেই। তারপরে যা দুর্যোগ,—'বাঙলা বন্ধ,' 'মিজো,' 'বস্তার,'—তাতে জরুরী অবস্থা বজায় রাখার কোনো কারণই নেই এরকম আভ্যন্তরীণ 'দুর্যোগ' বর্তমান শাসক-মণ্ডলীর মূঢ়তায়, অপদার্থতায় ও ঔদ্ধত্যে দেশে দিনে-দিনে বাড়বারই সম্ভাবনা;—কমবার সম্ভাবনা কম। অর্থাৎ যা নিয়ে জরুরী অবস্থার সূচনা—বৈদেশিক আক্রমণ—তা নেই, এমন কি, তা কখনো জরুরী ছিল না, শাসক-গোষ্ঠীর আচরণেই তার প্রমাণ পরিষ্কার। তবে জরুরী অবস্থার নামে এই সাধারণের ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করা কেন? যুক্তির দ্বারা যদি এ-প্রশ্নের মীমাংসা হতো তা হলে সমস্ত ভারতের আইনজ্ঞ ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন দেশবাসীদের বিবৃতি, প্রস্তাব ও অনুরোধ প্রভৃতিতে তাঁর একটা সুমীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু যুক্তি দিয়ে কোনো প্রশ্নের মীমাংসা করা শাসকদের ধর্ম নয়। তাই, সংবিধানের উদ্দেশ্য কি বক্তব্য কি, এমন কি, আক্ষরিক ভাবেও তার নির্দেশ

কি, এই জরুরী অবস্থার ব্যাপারে তা উত্থাপন করা ও বিচার করা, আমাদের কাছে মনে হয় আরও পণ্ডশ্রম। শাসকবর্গও বারকয় দলীয় বৈঠক করে, আর তারপরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মতামত সংগ্রহ করে যে 'জরুরী মূষিক' প্রসব করেছে সেটিও কাঠের মূষিক। আইন-ঘটিত অসুবিধা সত্য কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহ অনেক। কিন্তু মূল আইন (সংবিধানের ব্যবস্থা) ও সাধারণের মূল অধিকারকে এরূপ চোরা গোপ্তা আক্রমণে বিনষ্ট করবার জন্য যে-কোনো কথাই নন্দা বা তার দল বলতে কোনো সময়ে দ্বিধা করে নি। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা? তাঁদের পক্ষে তো একমাত্র জরুরী কথা গদিতে পাকা হয়ে থাকা; ক্ষমতা এমনভাবেই কবলস্থ করা যাতে আগামী নির্বাচনেও অন্য কোনো পক্ষই আর তাদের অপসারণের মতো সময় বা সুযোগ না পায়। আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য যে আইন এদিকে আছে। তা অবশ্য সামান্য নয়। তা ছাড়া কেরলের পরে একথা তো স্পষ্ট নির্বাচনে যাই হোক, যেন-তেন-প্রকারেণ রাষ্ট্রপতির-শাসন প্রবর্তিত করে বেনামা কংগ্রেস-শাসন অব্যাহত রাখতে কোনোদিন এ শাসক-গোষ্ঠীর বাধবে না;—ফেডারল শাসক-ব্যবস্থায় কার্যত এই ক্ষমতাসীন পক্ষের কোনো সময়েই ক্ষমতাচ্যুতি প্রায় অসম্ভব—যতই হোক ভারত 'পার্লেমেণ্টারি গণতন্ত্রের' রাষ্ট্র। 'জরুরী অবস্থার' এই ব্যবস্থা বজায় রাখার জন্য এত ব্যস্ততা কেন? আসলে ব্যস্ততা নয়, এটা অভ্যাস। গণতন্ত্র অভ্যস্ত হওয়া কঠিন; কিন্তু স্বৈরতন্ত্র সহজেই অভ্যস্ত হয়ে যায়। Power corrupts, absolute power corrupts absolutely, লর্ড অ্যাক্টনের অতি-পরিচিত কথাটার অতি-প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের সামনে। এইটাই জরুরী অবস্থা—এই গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র; 'সংবিধান' তো কার্যত গঙ্গাযাত্রা করছে এই সংবিধানী ভিক্টেটরশিপের চক্রান্তে॥

গোপাল হালদার

প্রস্তাবিত ভারত-মার্কিণ ফাউণ্ডেশন

শিক্ষা-সংস্কৃতি কিংবা রাজনীতি—সবক্ষেত্রেই মার্কিণ রাষ্ট্রশক্তির প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবের কথা উঠলেই বিবেকবাণ ও চিন্তাশীল মানুষ শঙ্কিত হয়ে পড়েন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রশক্তি ও প্রতিক্রিয়াশীলতা

প্রায় একই অর্থে চিহ্নিত হয়ে থাকে। তা ছাড়া, ভারতের নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি, কিংবা সরকারী অংশে অর্থনৈতিক উন্নয়ন মার্কিণ এসটাব্লিশমেন্টের দীর্ঘকালীন সমালোচনার বস্তু। কিছুদিন আগে খোদ মার্কিণ সংবাদপত্রেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মার্কিণ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের হস্তক্ষেপের ফলে যে বহুদেশেরই সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘিত হয়েছে, তার বিশদ সংবাদ ছাপা হয়েছে, এমতাবস্থায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধীর মার্কিণদেশ সফরের সময় ওয়াশিংটনের ভোজসভায় নাটকীয়ভাবে মার্কিণ প্রেসিডেন্ট জনসনের, ভারত মার্কিণ ফাউণ্ডেশনের ঘোষণা উভয় দেশের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, ভারতের শিল্পব্যবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতির জন্য যথেষ্টই সন্দেহ উদ্রেক করেছে। এমন কী কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের এক দীর্ঘস্থায়ী সভায় ২৯শে এপ্রিল দিল্লীতে এ নিয়ে প্রবল বাগবিতণ্ডা হয়ে গেছে। ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক জীবন যে এতে ক্ষতিগ্রস্থ হবে একথাই বহু বক্তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল। বামপন্থী দলগুলি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা ইতিপূর্বেই তাঁদের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এবং এই সম্ভাব্য ফাউণ্ডেশনের বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

কিন্তু এই প্রস্তাবিত ফাউণ্ডেশনের সঙ্গে ভারতের বহুবিধ নীতি, বিশেষভাবে আত্মনির্ভরশীল অর্থনীতি রচনার পথে অন্তরায় নীতিগুলি সম্পর্কিত। ভারতের খাদ্য উৎপাদনের বাধা ও অসুবিধার সুযোগ নিয়ে এই সাংস্কৃতিক ব্ল্যাক মেলিঙের সুযোগ নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, মনে রাখা দরকার যে এ পর্যন্ত মার্কিন পি. এল ৪৮০ অনুযায়ী ভারতে বিক্রীকরা মার্কিনী গমের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমানে পাওনা হলো প্রায় ১৫০০ কোটি টাকা। এই ১৫০০ কোটি ভারতীয় টাকা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতেই ব্যয় করার কথা দীর্ঘকাল ধরেই চিন্তা করছিলেন। মার্কিনী গম ভারতের টাকায় রূপান্তর করে, মার্কিণ সরকার ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি ও শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বিস্তারের জন্য এক বিপুল পরিমাণ রসদ পেয়ে গেছে। পি. এল. ৪৮০-র নিয়ম অনুযায়ী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অর্জিত ভারতীয় টাকা ভারতেই ব্যয় করা হবে, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এই ব্যয়ের সূত্রপাত ঘটলেই ভারতে মুদ্রাস্ফীতি আরও ভয়ানক রূপ নিতে বাধ্য। কুলি ঋণদান ব্যবস্থায়, ভারতের বেসরকারী শিল্পের অংশে এই টাকা

লগ্নি করার জন্য একদা একটি কর্পোরেশনও গঠন করা হয়েছিল। ঐ কর্পোরেশনের মধ্যেই ভারত-মার্কিণ ফাউণ্ডেশনের বীজ লুকানো ছিল। লোকান্তরিত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর সম্ভাব্য মার্কিন দেশ ভ্রমণের পূর্বেই, ঐ জমা ভারতীয় টাকার শতকরা পনেরো ভাগ ব্যয়ে প্রেসিডেণ্ট কেনেডীর নামে এক ফাউণ্ডেশন গড়ার প্রস্তাব করা হয়। শোনা যায় প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের শ্রী এল. কে. ঝার নেতৃত্বে একটি দল এতে ভীষণ গদ্‌গদ হয়ে ওঠেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন এতে নাকি সত্যই ভীত হয়ে পড়েন। অর্থাৎ, শ্রীযুক্তা গান্ধীর মার্কিন সফরকালে প্রেসিডেণ্ট জনসনের ঐ ঘোষণা হঠাৎ একটা কিছু গজিয়ে ওঠা-ব্যাপার নয়। ৩০০ কোটি ডলারের এই সম্ভাব্য ফাউণ্ডেশন ভারতে জমা মার্কিন তহবিলের শতকরা দশ ভাগ বা আপাত ৫০ কোটি টাকায় সৃষ্ট হতে চলেছে। লক্ষ করা দরকার ভারতের উন্নয়নের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার এ সহায়তা নয়—এ হলো ভারতের টাকা ভারতে ব্যয় করে সামগ্রিক ভারতীয় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক জীবন পর্যুদস্ত ও বিধ্বস্ত করার চক্রান্ত। এই সম্ভাব্য ব্যয়ের জন্য, ভারত সরকারকে ১৫০ কোটি টাকা জোগাড় করতে হবে। এ টাকা হয় ব্যাঙ্ক ও নাগরিকদের নিকটে ঋণগ্রহণ করে, কিংবা কর আদায় করে, অথবা নতুন টাকা সৃষ্টি বা নোট ছাপিয়ে যোগান দিতে হবে। ভারতের অর্থনীতিক্ষেত্রে উৎপাদন ও সংগঠনের অনমনীয়তা নিশ্চিতভাবে বিপুল মুদ্রাস্ফীতির চাপ সৃজন করবে। পি. এল. ৪৮০-তে যে গম ভারত মার্কিন দেশ থেকে ভারতীয় টাকায় ক্রয় করেছে, ঐ অর্থ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতে আপাতউৎপাদক কোনো ব্যবস্থায় ব্যয় করবে না। কিংবা, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যও বাড়াবে না, উপরন্তু ঐ অর্থের সহায়তায় এদেশের সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার জীবন পর্যুদস্ত করে অবশেষে রাজনীতির ক্ষেত্রেও সাবভারশন সৃষ্টি করতে বাধ্য। ইতিমধ্যেই ভারতে বিভিন্নস্থানে বেশ কিছু মার্কিন পকেটের সৃষ্টি হয়েছে, পত্র-পত্রিকার জগতে মার্কিণ বশংবদরা ক্রমাগত শক্তিশালী হচ্ছে। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী, প্রগতিশীল বলে বহু বিজ্ঞাপিত, শ্রীএম. সি. চাগলা নাকি কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের সভায় বলেছেন যে এই মার্কিণ অর্থব্যয় ভারতের সার্বভৌমত্ব বা আত্মসম্মানকে নাকি খর্ব করবে না। ভারত সরকারের শিক্ষাখাতে ব্যয়ের তুলনায় নাকি এ সামান্য অংশ, সুতরাং এর কোনো প্রভাবই নাকি তেমন কিছু হবে না।

শ্রীচাগলাকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, ভারতের কলেজ-অধ্যাপকদের বেতনবৃদ্ধির প্রস্তাবে মাত্র সামান্য কয় কোটি টাকাও ব্যয়ও বাধা হয়েছিল, কিন্তু এ যে বছরে ছয় কোটি টাকা খোদ মার্কিন কর্তারা ব্যয় করবেন! এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, একদা লুমুম্বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ভর্তির বিষয়ে সোবিয়েৎ বিশেষজ্ঞদের দ্বারা ছাত্র-নির্বাচনের বিষয়টি নেহরু, ভারতের আভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার নীতির পরিপন্থী মনে করে, ভারতের সরকারী তত্ত্বাবধানেই ছাত্র নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। ভারতের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ও নাকি একদা এই ফাউণ্ডেশনের অনুরূপ এক প্রস্তাব মেনে নিতে পারেন নি। সুতরাং ভারতের মাটিতে মার্কিনী কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর মাটির তলা থেকে বেড়িয়ে এসে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রের এজেণ্টদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতিকে কবরে ঠেলে দিতে চাইছে। ইতিমধ্যেই ওদেশের সংবাদপত্রে, এসব দেশে সাংস্কৃতিক আহ্বান চালাবার জন্য উপযুক্ত সৈন্যবাহিনী গঠিত হচ্ছে। যেমন, সম্প্রতি ডেট্রয়টির এক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে "Enjoy a career packed with action and adventure in strange lands, join the U. S. Information Service as a combat librarian." এই প্রস্তাবিত ফাউণ্ডেশনের অবিলম্বে প্রত্যাহারের জন্য সংস্কৃতি, শিক্ষা ও স্বাধীনতাসেবীদের দলমতনির্বিশেষে এক আন্দোলন গড়ে উঠুক।

তরুণ সান্যাল

নতুন ভূমিকায় মঞ্চ ও চলচ্চিত্রকর্মী

বাংলাদেশের চলচ্চিত্র-কর্মীদের বৃহত্তম সংস্থা সংবাদপত্র মারফত গত বারোই মার্চ ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে এক খোলা চিঠি লেখেন। পুলিশ ও সরকারের একরোখা চণ্ডনীতি ও অমানুষিক রক্তপাত ও প্রাণহানির বিরুদ্ধে সংস্থাটি অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় চিঠিতে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। নানা সংগত কারণে ঐ বিশেষ দিনটিতে ঐ চিঠি এবং তার বক্তব্য ও ভাষা যে-কোনো সচেতন মানুষেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে বাধ্য।

ঐদিন কলকাতার রাস্তায় ইতিহাস তৈরি হয়েছিল। বাংলাদেশের সমস্ত বামপন্থী দলের নেতৃত্বে এক বিশাল মিছিল বেরিয়েছিল—লক্ষ মানুষের এক

শ্লোগানবিহীন মিছিল। সমস্ত দল, সমস্ত মত, সমস্ত মানুষ সেদিন একাকার হয়ে গিয়েছিল সেই মিছিলে। শোক আর ধিক্কারের এক কঠিন চেহারা সেদিন ফুটে উঠেছিল শহরের রাজপথে। লক্ষ মানুষের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে চলচ্চিত্র ও মঞ্চের অনেক শিল্পী, কলাকুশলী ও শ্রমিকও সেদিনের মৌন-মিছিলের সামিল হয়েছিলেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে খোলা চিঠি ও ব্যক্তিগতভাবে চলচ্চিত্র ও মঞ্চের সংশ্লিষ্ট কর্মীর মিছিলে যোগদান—এই দুইটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র খুঁজতে গিয়ে কোনো বাড়তি মস্তিষ্ক প্রয়োগের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের কর্মীদের সবাই এতকাল যে-চোখে দেখে এসেছেন—বিশেষ করে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের—সেদিন কিন্তু কেউই তাঁদের সেভাবে দেখলেন না, দেখবার কোনো যুক্তিও ছিল না। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে যে-ধরনের কৃত্রিম গ্ল্যামার এঁরা এতকাল নিজেদের উপর চাপিয়ে রেখেছিলেন অথবা কারো কারো উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেদিন তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। মস্ত এক রূপান্তর ঘটে গিয়েছিল সেদিন তাঁদের চেহারায়, তাঁদের চলাফেরায়, তাঁদের কথাবার্তায়। তাঁদের মধ্যে এমনও অনেকে সেদিন মিছিলে ছিলেন যাঁদের আজ থেকে দশ পনেরো বছর আগে দেখা যেত শহরের প্রতিটি মিছিলে, প্রতিটি সভায়। সেখানে তাঁরা গান করতেন, অভিনয় করতেন, রাজনৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত সাংস্কৃতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। তারপর এক এক করে তাঁরা পেশাদারি মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের চৌকাঠ ডিঙোলেন এবং ধীরে ধীরে একদিন ভাইয়ের সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন হোলো। এবং এমনিভাবেই চলছিল বেশ কিছুদিন। এবং তারপর এলো বারোই মার্চ, সকালের কাগজে বেরুলো সিনে টেকনিসিয়ান্স এণ্ড ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের খোলা চিঠি এবং শেষপর্যন্ত বামপন্থী নেতাদের ডাকে সাড়া দিলেন তাঁরা, ঐতিহাসিক মৌন-মিছিলের সামিল হলেন। মিছিলে চলতে চলতে পুরনো দিনের কথা তাঁদের মনে পড়েছিল অবশ্যই। এবং সেই মুহূর্তে এই স্মৃতিচারণ তাঁদের মনে এক নতুন আবেগের সঞ্চার করেছিল সন্দেহ নেই। এই আবেগের ভাগীদার আমিও ছিলাম।

এ-হেন রূপান্তর দেরিতে ঘটলেও ঘটতে বাধ্য। বাস্তবের একটানা পীড়নে তা ঘটবেই। এবং তাই ঘটেছিল উনিশ শ' ছেষট্টি সালের বারোই মার্চ।

গোটা পশ্চিম বাংলা জুড়ে তখন প্রচণ্ড তোলপাড়। প্রথমে চললো লাঠি, তারপর গ্যাস ও গুলি। ফলে, যা সর্বত্র সর্বসময়ে ঘটে থাকে, তাই ঘটলো। শাসকের বিরুদ্ধে সমস্ত পশ্চিম বাংলা ফেটে পড়লো। মাঠে ময়দানে রাজপথে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়লো দারুণ তীব্রতা নিয়ে। প্রদেশ-পুলিশ যথেষ্ট নয়, তাই শাসক তখন বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তর প্রদেশ থেকে আমদানি করলেন আরো পুলিশ এবং আরো লাঠি, গ্যাস ও গুলি। সৈন্যও তলব করা হলো বেশ কিছু। ইংরেজ শাসকের অনুকরণে "দুষ্কৃতিকারীদের" শায়েস্তা করতে পুলিশ ও সৈন্যদল হানা দিল বস্তিতে, কলোনিতে, ছাপোষা মানুষের সংসারে এবং যেখানেই বিক্ষুব্ধ মানুষের ভিড় দেখলো সেখানেই। "দুষ্কৃতিকারীরা" কতখানি জব্দ হলো, কটা লোককে খতম করা হলো বা কাকে গুম করা গেল তার হিসেব মিলবে গোয়েন্দা-বিভাগে বা সরকারী আমলার নথিপত্তরে, কিন্তু দেশের মানুষ দেখলো সমস্ত বাংলা খেপে উঠেছে। এবং খেপে উঠে আরো দ্বিগুণ চতুর্গুণ খেপিয়ে তুলেছে বিদেশী শাসকের মন্ত্রশিষ্য পুলিশকে, সৈন্যকে।

দিল্লির টনক নড়লো। প্রধানমন্ত্রী এলেন, এলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

এদিকে রাজনৈতিক দলগুলোর টালমাটাল অবস্থার মধ্যেও একটা বড় রকমের ঘটনা ঘটলো। সমস্ত বামপন্থীদল এককাট্টা হয়ে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ জানালো। তারই সঙ্গে পেশ করা হলো কয়েকদফা দাবি—স্পষ্ট, দৃঢ়।

অপ্রীতিকর, অবাঞ্ছিত অনেক কিছু ঘটলো। জনসাধারণের উষ্মা ও অস্থিরতা নানাভাবে প্রকাশ পেল। তাই নিয়ে ইতস্তত কিছু কিছু মতান্তর মনান্তরও দেখা দিল। এবং শেষ পর্যন্ত এলো বারোই মার্চ। সাংগঠনিক শক্তি সহ চলচ্চিত্র ইউনিয়ন সেই ডাকে সাড়া দিল আর সাড়া দিলেন এককভাবে কিছু কিছু চলচ্চিত্র ও মঞ্চ কর্মী, অভিনেতা-অভিনেত্রী, সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ঝুঁকি ও দায়িত্ব নিয়ে।

যেহেতু মিছিলে যোগদানকারী অভিনেতৃ দল মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের বৃহত্তর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং যেহেতু খোলা চিঠিটি লেখা হয়েছিল বাংলাদেশের চলচ্চিত্র-কলাকুশলী ও চলচ্চিত্র-শ্রমিকদের বৃহত্তম সংস্থার তরফ থেকে, তাই স্টুডিও চত্বরে ও পেশাদারী মঞ্চের ভিতরে ও আশেপাশে বারোই মার্চের ঘটনা নিয়ে জল্পনাকল্পনা চললো প্রচুর। এবং তার আট দিন পরে ২০শে

মার্চ টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে কলকাতার সমস্ত পেশাদারী শিল্পী, কলাকুশলী ও শ্রমিকদের এক সাধারণ জরুরী সভা ডাকা হলো। সভায় যাঁরা যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তা থেকে অবশ্যই বলা যেতে পারে যে বাংলাদেশের পেশাদারী মঞ্চ ও চলচ্চিত্রকে প্রতিনিধিত্ব করবার মতো মর্যাদা সেই সভা পেয়েছিল। সর্বসম্মতিক্রমে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সেখানে গৃহীত হয়। ঠিক হয়, সমস্ত পশ্চিম বাংলা জুড়ে সাম্প্রতিক বিশৃঙ্খলার ফলে সাধারণ মানুষ যে অসহনীয় বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন অবিলম্বে তাঁদের আর্থিক ও নৈতিক সাহায্যের উদ্দেশে ২৭শে মার্চ কলকাতার জনসাধারণের কাছে অর্থের আবেদন জানিয়ে শিল্পী, কলাকুশলী ও শ্রমিকের এক মিছিল শহরের রাজপথ পরিক্রমা করবে।

নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সেই মিছিল বেরুলো। সমস্ত রকম রাজনীতির আওতা থেকে নিজেদের বাইরে রেখে এবং কেবলমাত্র 'মানবিক' চেতনার মধ্যে নিজেদের সীমাবদ্ধ রেখে (অথবা ছড়িয়ে দিয়ে) বিধ্বস্ত মানুষের সাহায্যার্থে চলচ্চিত্র ও মঞ্চের কর্মীরা জনসাধারণের কাছ থেকে সেদিন অর্থ সংগ্রহ করলেন। ছ' ঘণ্টায় দীর্ঘ আট মাইল পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে যত না অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন তার চাইতেও অনেক বেশি মূল্যবান এক সম্পদের সন্ধান সেদিন তাঁরা পেয়েছিলেন—বিশিষ্ট চেতনার এক বলিষ্ঠ ইঙ্গিত—যে-চেতনা শিল্পীর শিল্পকর্মকে মহত্তর করে তোলে, তাঁর শিল্পসত্তাকে সার্থকতার স্তরে পৌঁছে দেয়। সেদিনের অর্থ সাহায্যের উপর এই "উপরি" সম্পদ পাওয়ার জন্যে বাংলাদেশের মঞ্চ ও চলচ্চিত্র কর্মীরা অবশ্যই কলকাতার জনসাধারণের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন, কেননা, এই জনসাধারণই তাঁদের আবেগ ভালোবাসা ও হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে এবং ঘৃণা দিয়ে হাজার আক্রমণ নির্যাতন লাঞ্ছনা আর বঞ্চনা সত্ত্বেও কলকাতাকে লোভনীয় ও বাসযোগ্য করে তুলেছেন এতকাল। এবং সেদিনও।

সেদিনের মিছিলের সঙ্গে (যা একান্তই শিল্পী, কলাকুশলী ও শ্রমিকদের) কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগের উল্লেখ করেছেন কিছু কিছু মহল, এবং তাই করে মিছিলের উদ্যোক্তাদের তাঁরা অবশ্যই অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলেছেন। এই ধরনের ভিত্তিহীন খবরের দরুণ মঞ্চ ও চলচ্চিত্র মহলে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তির সৃষ্টিও যে হয় নি এমন নয়, কিন্তু সেই বিভ্রান্তিকে ছড়িয়ে যেতে দেওয়া হয় নি এবং উদ্যোক্তারা সেইসব মহলকে

জানিয়ে দিতেও কসুর করেন নি। এবং তারই সঙ্গে তাঁদের এবং সাংবাদিকদের এ কথাও জানিয়েছেন যে মঞ্চ ও চলচ্চিত্র কর্মীদের এই নতুন ভূমিকা-গঠন কাজে সমস্ত মানুষের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত কাম্য।

আর-একটি দিকও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। প্রতিক্রিয়াশীল মহল নয়, কিছু কিছু প্রগতিশীল মহলের মধ্যেও দেখা গিয়েছে—এবং বিশেষ করে কলকাতা থেকেই প্রকাশিত সমাজচেতনার ঐতিহ্যবাহী এক বাংলা সাপ্তাহিক-এ—যাঁরা মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের বৃহৎ পরিবারে এই রূপান্তরের ঘটনাটিকে তেমন আমল দেন নি, কোনোই গুরুত্ব আরোপ করেন নি এর উপর। এইভাবে বাংলাদেশের এক বিশেষ শিল্পের আসরে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাকে উপেক্ষা করে অথবা শুধুমাত্র মিছিলের একটি ছোট ছবি ছেপে কোনোরকমে দায় মিটিয়ে তাঁরা কি নিজেদেরই বিরুদ্ধাচরণ করছেন না? তাঁদেরই শিবিরে তাঁদেরই আদর্শে চিড় খাওয়াচ্ছেন না কি?

এখানে, অনেকের সঙ্গে 'পরিচয়'-কে ধন্যবাদ জানাবো কেননা অনেকের মতো 'পরিচয়'-ও মঞ্চ ও চলচ্চিত্র মহলের এই রূপান্তরকে লক্ষ করেছে, তার যথাযথ মর্যাদা দিয়েছে এবং এই 'চেতনা'-র উত্তরোত্তর বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করছে।

মৃণাল সেন

পা ঠ ক গো ষ্ঠী

'মাঘ' সংখ্যা 'পরিচয়ে' বিবিধ প্রসঙ্গে গোপাল হালদার লিখিত 'গণ-অভ্যুত্থান' এবং অজিষ্ণু ভট্টাচার্য স্বাক্ষরিত 'পশ্চিম বাংলায় পুলিশী সন্ত্রাস : বুদ্ধিজীবীদের প্রতিবাদ' পড়লাম। এই চিঠি লেখার প্রধান উদ্দেশ্য ঐ লেখাদুটির প্রতিবাদ করা নয়, কারণ গণতান্ত্রিক সমাজে প্রত্যেকেরই স্বমত (তা সে যতই আবেগসর্বস্ব হোক না কেন) প্রকাশের স্বাধীনতা স্বীকৃত; আমি শুধু এ-প্রসঙ্গে যেসব প্রগতিবাদী ব্যক্তি গণতন্ত্রে এখনো সম্পূর্ণ আস্থা হারান নি তাঁদের নিকট কটি কথা নিবেদন করতে চাই।

খাদ্য-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গত মার্চ মাসে জনমত যে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিল তাকে স্বতঃস্ফূর্ত বলে যেমন অভিনন্দন জানান কর্তব্য তেমনি তার কোনো-কোনো দিক কঠোর ভাষায় সমালোচনা করাও কর্তব্য। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তির যুক্তি একাধিক বিরোধী জটে বড়ই জটিল। খাদ্য-সমস্যায় ও দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধিতে জনজীবনে যখন অসন্তোষ প্রবল তখনও বিরোধী দলগুলি সক্রিয় আন্দোলনে অশক্ত অনিচ্ছুক, হয়তো-বা তাদের অনিচ্ছা অশক্তিসঞ্জাত। গতবছরও যখন নিত্যদ্রব্যের মূল্য হু-হু করে বাড়ছিল তখনও জনগণ 'দম্‌দম্‌ দাওয়াই'র অত্যন্ত সীমাবদ্ধ প্রতিকার ছাড়া আর কিছুই পায় নি; তখনও স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের প্রশংসা করেই বিরোধী দল তাদের কর্তব্য শেষ করেছে। গত ক'বছর ধরে সারা বাংলায় দূরে থাক কলকাতা শহরেও খাদ্য-মূল্য ও দুর্ভিক্ষ-প্রতিরোধ কমিটি আয়োজিত আন্দোলন বন্ধ। তার কারণ নিশ্চয়ই এই নয় যে, জনগণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল হয়ে উঠেছে এবং তাদের অভিযোগ নেই। একাধিক বিরোধী দল অন্তর্দলীয় বিরোধে এতই বিব্রত ও হীনবল যে তাদের পক্ষে সম্ভব হয় নি জনগণের অভাব-অভিযোগের প্রতিকারে আন্দোলনে অবতীর্ণ হওয়া। এটা আন্দোলন না করার সমর্থন নয়, ব্যাখ্যামাত্র। এই সুযোগে বাস-ট্রামের ভাড়া বেড়েছে; জিনিসপত্রের দাম, এমনকি রেশন-ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যেরও দাম বেড়েছে। বিরোধী দলদের অক্ষমতায় সরকার আত্ম-সন্তুষ্টির মনোভাব অবলম্বন করেছে। যে-সরকার জনমতের সংবাদ রাখে না তারা গণতন্ত্রের ভিত্‌ সম্পর্কে সচেতন নয় আর সচেতন না হয়েও শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারে তার অন্যতম

প্রধান কারণ বিরোধী দলসমূহের অযোগ্যতা, অনৈক্য এবং সুস্পষ্ট লক্ষ্যহীনতা। সরকার জনমতের সংবাদ রাখে না বলেই বিক্ষোভকে 'আকস্মিক', 'বিরোধী-দলদের উস্কানি-প্রসূত' প্রভৃতি লঘু বিশেষণে আখ্যাত করেই সন্তুষ্ট; আর বিক্ষোভের পূর্বাভাস দিতে না-পারার জন্য আই. বি. ডিপার্টমেন্টকে ভৎর্সনা করেই খালাস। পক্ষান্তরে, বিরোধী দলেরা সময়োচিত নেতৃত্ব দিয়ে, আন্দোলনের সঠিক পরিপ্রেক্ষিত ও উদ্দেশ্য জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে না পেরে শুরু-হয়ে-যাওয়া স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের লক্ষ্যহীন প্রবাহের পশ্চাদনুসরণ করেছে, একে গণ-অভ্যুত্থানের ভ্রান্ত বিশেষণে ভূষিত করেছে এবং এর ভুল-ত্রুটিকে সমালোচনা করতে সাহস করে নি। বিচারকের আসন থেকে নয়, সহ-নাগরিকরূপে নাগরিককে সমালোচনা করা শুধু ন্যায় নয়—আবশ্যিক। মিথ্যা স্তোকবাক্যের তুলনায় গঠনমূলক সমালোচনা গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে অনেক বেশি সাহায্য করতে পারে। "জনগণের যুক্তিসংগত শত অভিযোগ-অনুযোগ থাকা সত্ত্বেও আমরা যখন নেতৃত্ব দিতে পারি নি তখন তাদের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে সমালোচনা করবার নৈতিক অধিকারও আমাদের নেই" —এ যুক্তি (আদৌ যদি কেউ অবতারণা করেন) নীতিসম্মত হতে পারে, কিন্তু রাজনৈতিক দূরদর্শিতার পরিচায়ক নয়।

যথার্থ রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে না দেখলে স্বতঃস্ফূর্তির ফল সহজেই খারাপ হতে পারে। কাসেমের পতনের পরে ইরাকে এবং সম্প্রতি ইন্দোনেশিয়ায় যে কম্যুনিষ্ট-নিধন যজ্ঞ হয়েছে তাকেও কোনো-কোনো মহলে স্বতঃস্ফূর্ত বলে শুধু লঘুই করা হয় নি অভিনন্দিতও করা হয়েছে। এই আমাদের এখানেই চীনা আক্রমণের সময়ে যখন কোনো-কোনো স্থানে কম্যুনিস্ট পার্টির অফিস তছনছ করা হয় এবং কম্যুনিস্ট কর্মীরা আক্রান্ত হন তখনও কোনো-কোনো মহলে এই অন্যায় আচরণকে স্বতঃস্ফূর্ত জনমতের অভিব্যক্তি বলে প্রচ্ছন্ন সমর্থন জানান হয়। অতুল্য ঘোষের নিকটে গিয়ে তখন কম্যুনিস্ট নেতৃবৃন্দ এর প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন এবং প্রতিকার প্রার্থনা করেছিলেন। এই প্রতিবাদ যথার্থ। স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন যখন বিপথগামী হয় তখন আন্দোলনেরই স্বার্থে বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতের কথা ভেবে তাকে সমালোচনা করবার শুভবুদ্ধি ও সাহস যেন আমাদের থাকে।

সরকারের ভ্রান্ত নীতি কার্যকর করতে গিয়ে পুলিশ ও শাসন-বিভাগ শুধু সরকারের রক্তচক্ষুই দেখে তা নয় বিরোধী দলসমূহের সমবেদনাহীন

নিন্দাভাজনও হয়। স্বাধীন দেশে ও বৃহত্তর রাজনৈতিক পটভূমিকায় পুলিশকে যেভাবে আমরা অনেকে দেখি তা অনুচিত। সরকারের বহুদিনের বহু অন্যায়ে ঔদাসীন্যে বিক্ষুব্ধ মানুষ যখন ফেটে পড়ে তখন পুলিশকেই তার সম্মুখীন হতে হয় (শাসকদলের নেতৃবৃন্দ তখন নীরব ও পলাতক)। যে-দলই দেশ শাসন করুক পুলিশের সাহায্য তার চাই-ই। কেরলে যখন কমিউনিস্ট শাসনের বিরুদ্ধে অন্যায় আন্দোলন শুরু হয় তখন সেখানকার পুলিশ শাসক (কমিউনিস্ট) দল যে পর্যন্ত অগণতান্ত্রিকভাবে অপসারিত না হয় সে পর্যন্ত তাদের নির্দেশই পালন করেছে। সামরিক বাহিনীর তুলনায় পুলিশবাহিনীর সঙ্গে জন-জীবনের সংযোগ নিছক সামাজিক কারণেই গভীরতর। যে-কোনো হাঙ্গামাকেই পুলিশী-উস্কানী-প্রসূত বলা ভুল। যে-দলই শাসনভার গ্রহণ করুক ব্যক্তির বা জাতির সম্পত্তি যদি কেউ ধ্বংস করার চেষ্টা করে তবে পুলিশকে তা বাধা দিতেই হবে (বাধা অবশ্য গুলি না করেই প্রায় সকল ক্ষেত্রে দেয়া যায়)। হাঙ্গামা ও উস্কানীর মধ্যবর্তী কার্যকারণ তত্ত্বটিও জটিল। হাঙ্গামার যাঁরা সমর্থক তাঁরা বলেন, "হাঙ্গামা মাত্রই কার্য, তার কারণ হল উস্কানী" ; উস্কানীর যাঁরা সমর্থক তাঁরা বলেন, "উস্কানী মাত্রই কার্য, কারণ হল হাঙ্গামা।" কার্যকারণের এই জটিল তত্ত্বটি মুক্ত বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার চেষ্টা না করে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ে অনেকে বলে থাকেন, "পশ্চিম বঙ্গের বা ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা নিতান্তই স্বতঃস্ফূর্ত এবং এর কারণ পাকিস্তানে হিন্দু-হত্যা।" এই যুক্তি বড় বিপজ্জনক এবং এর ব্যবহার সম্পূর্ণ বর্জনীয়। এই যুক্তিরই অপব্যবহার করে পাকিস্তানের কোনো-কোনো নেতা বলে থাকেন: "পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণ হিন্দুস্থানে মুস্লিম-হত্যা।" আসল কথা, পুলিশ কখনো কখনো উস্কানী নিশ্চয়ই দেয়, তবে যে আন্দোলনের নেতৃত্ব ও পরিপ্রেক্ষিত নেই সে আন্দোলনের রাজনৈতিক দূরদর্শিতাহীন একাংশ এমন কাজ-কর্মে লিপ্ত হয় যে তাদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী। এর প্রতিকার (সহজ নয়): আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিত ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে জনগণের রাজনৈতিক চেতনাকে উচ্চতর পর্যায়ে তুলতে হবে। নেতৃত্ব পেলে বিক্ষুব্ধ জনমত যে শান্ত ও সংযত হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ১৩ই মার্চ তারিখের শোকাহত, বিশাল, মৌন মিছিল।

সরকারী খাদ্য-নীতির বিশদ বিশ্লেষণ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধের বিষয় এবং তা এখানে আমি অবতারণা করতে চাই না। আমার ধারণা: যেসব অবস্থাপন্ন

চাষীরা ধান-চাল মজুত রেখে সরকারের খাদ্য-সংগ্রহ নীতিকে বানচাল করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সক্ষম তারাই গ্রামাঞ্চলে কংগ্রেস সরকারের ভিত্‌। এবং কংগ্রেস দলের একাংশ যে সরকারের খাদ্যনীতির বিরোধিতা করছে একথা খাদ্য আন্দোলন শুরু হবার পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী নিজেই বলেছেন। সর্বদলীয় খাদ্য কমিটির হাতে সর্বস্তরেই কার্যকর ক্ষমতা (শুধু উপদেশদানের ক্ষমতা নয়) না দিলে বর্তমান খাদ্য-নীতি সফল হবার সম্ভাবনা নেই। কংগ্রেস দল তার বর্তমান চরিত্র না পাল্টালে বিরোধী দলের সঙ্গে যে কার্যকর ক্ষমতা কিভাবে ভাগ করে নেবে তা আমি জানি না। রাজনীতি মুখ্যত ক্ষমতার লড়াই; বিরোধী দলের শক্তি না থাকলে শুধু হরতালের ভয় দেখিয়ে সরকারকে ভিন্ন পথে চালান সম্ভব নয়। পরিষদীয় রাজনীতির কাঠামো একবার স্বীকার করলে তার মধ্যে থেকে শক্তি অর্জন করা অনেক বিচার, কৌশল ও সময় সাপেক্ষ। খাদ্য-আন্দোলন বিরোধী দলের শক্তির স্বাক্ষরবাহী নয়, সরকারের অযোগ্যতা ও দুর্বলতার প্রকাশমাত্র। বিরোধী দলদের হাজার আবেদনে দাবীতে মামলায় যা সম্ভব হয় নি জনগণের রুদ্রমূর্তি প্রদর্শনে তাই হল: অন্যায়ভাবে আটক রাজনৈতিক বন্দীরা মুক্তি পেলেন! ভারতবর্ষের সকল রাজ্যে খাদ্য-সংগ্রহ ও রেশনিং প্রবর্তন না করে শুধু পশ্চিমবঙ্গে এই নীতি প্রবর্তন করলে সফল হবার সম্ভাবনা কম। কংগ্রেস দলের পক্ষে আবার সর্ব-ভারতীয় স্তরে এই নীতি গ্রহণ করা কঠিন।

বর্তমান খাদ্য-আন্দোলনকে আমি "গণ-অভ্যুত্থান" মনে করি না। প্রতিকারহীন ও নেতৃত্বহীন জনমতের স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভ প্রকাশের প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে; তবে, এর ত্রুটি-বিচ্যুতিকে আমরা যদি ভাবাবেগে দেখতে না পাই এবং সমালোচনা করতে ভয় পাই তাহলে বৃহত্তর আন্দোলনের জন্য আবার আমাদের স্বতঃস্ফূর্তির অনির্দিষ্ট প্রতীক্ষায় দশক-দশক কাটাতে হবে। আন্দোলনের ত্রুটি-বিচ্যুতির সমালোচক যদি "বিভ্রান্ত" বলে বিবেচিত হয় এবং সরকারের সর্বাত্মক সমালোচনাই যদি "সুস্থ নাগরিক চেতনা"র প্রকাশ হয় তাহলে সখেদে স্বীকার্য যে "নাগরিক চেতনা"য় এখনো বিপন্ন গণতন্ত্রের প্রতিবিম্ব পরিস্ফুট হয় নি।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

মাঘ সংখ্যার পরিচয়ে 'ভাসা ভাসা ভাষা' প্রবন্ধে ৫৮ পৃষ্ঠায় মুদ্রণপ্রমাদের আধিক্য কিঞ্চিৎ বেশি। একটি বাক্য আর-একটি বাক্যের সঙ্গে হঠাৎ সংযুক্ত হয়ে যেমন অর্থের তারতম্য ঘটিয়েছে সপ্তদশ লাইনে তেমনি সতেরো আঠারোটি পরবর্তী লাইন বাদ পড়েছে। ফলে, লেখাটির পারম্পর্য সম্পর্কে পাঠকের সন্দেহ স্বাভাবিক।

সপ্তদশ লাইনে ও পরবর্তী অংশে মূল রচনাটিতে আছে :

এবং শেষ পর্যন্ত হ্বিটগেনস্টাইনের ভাষাকে বেঁধে ফেলার প্রয়াসই সার্থক মডেল মনে হতে পারে। সুতরাং প্রশ্ন আলাদা হলেও ভাষা ও ভাবকে বিচ্ছিন্ন সত্তা ভাবায় ভাষা সৃষ্টির কর্মকাণ্ড ব্রিজম্যানের কাছে এক সংক্ষিপ্ত ভাষ্যে পরিণত।

ভাব ও ভাষাকে বিচ্ছিন্ন সত্তা না ভাবায় পরবর্তী মনীষিদের চর্চার প্রকাশের সম্ভাবনা আরও বিস্তৃত। যেহেতু মানুষের মনের সঙ্গে ভাষার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং মন থেকে ভাষায় আসার মাঝখানে অনেকগুলো ধাপ এবং ব্যক্তি বিশেষে এ ধাপের তারতম্য হতে পারে কাজেই ভাষা প্রসঙ্গে গণিতের হাইপথেসিস্ রাখার বদলে এ সব মনীষিরা নির্ভর করেন ভাষা ব্যবহারের তথ্যের উপর। এ প্রসঙ্গে শিশু মনের বিকাশের অনুধাবনায় ফরাসী মনস্তত্ত্ববিদ পিয়াজের কাজ গুরুত্বপূর্ণ। পিয়াজে কিংবা রুশ মনীষি ভিগট্স্কির লেখায় বারেবারেই জোর পড়ে ভাব ও ভাষার নিবিড় গতিময় দ্বন্দ্বে। এ দ্বন্দ্বে কোনটা বড় কোনটা ছোট ভাববার প্রয়াস নেই। যেমন নেই ভাষাকে কোন সীমারেখায় নির্ণীত করার প্রয়াস তেমনি ভাষা ভাবের অনুষঙ্গ মাত্র বা ভাব যৌন কথা এ রকম চিন্তায় অনড় সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস।

অসীম রায়

লেখক-পরিচিতি

বারট্রাণ্ড রাসেল : ইংরেজ দার্শনিক। সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত। শান্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা।

●

গিসেপ্পি বার্তো : জন্ম ১৯১৫, ইতালির ট্রেভিসো শহরে। দরিদ্র দোকানদারের সন্তান। পেশায় সাংবাদিক। নিবাস, রোম। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বন্দী হয়ে মারকিন যুক্তরাষ্ট্রের টেকসাসে একটি শিবিরে ছিলেন। তখন থেকেই লেখা শুরু। উল্লেখ্য রচনা : উপন্যাস 'আকাশ লাল' (দি স্কাই ইজ রেড) ও 'রাহাজান' (দি ব্রিগান্‌ড)। গল্প সংকলন : 'ঈশ্বরের সৃষ্টি' (দি ওয়ার্কস অফ গড)।

●

দারামিন বাতবায়ার : ১৯১৪ সালে মধ্য-গোবি অঞ্চলের দেলগেরখাঙ্গাই গ্রামে জন্ম। মঙ্গোলীয় রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূতত্ত্বের ছাত্র। প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় উনিশ বছর বয়সে।

●

আরকাদি ফিয়েদলের : জন্ম পোজনানে ১৮৯৪ সালে। লেখা শুরু করেন ১৯১৭ সালে। ১৯২৭ সালে প্রকৃতি-বিজ্ঞানী হিসাবে তিনি বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। এ পর্যন্ত তিনি একুশটি বই লিখেছেন। তার মধ্যে অধিকাংশই ভ্রমণ-কাহিনী।

●

টাইবর ডেরি : জন্ম ১৮৯৪। হাঙ্গেরির অন্যতম প্রধান ঔপন্যাসিক ও গল্পকার। ১৯১৯ থেকে কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। এক্স্‌প্রেশনিস্ট ও সুররিয়্যালিস্ট কবিতায় সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত। ফ্রান্স্‌, ইতালি, যুগোশ্লাভিয়া, জর্মনি ও স্পেনে দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন। ১৯৫৬-র অভ্যুত্থানের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে কারারুদ্ধ হন, ১৯৬০-এ

মুক্তিলাভ করেন। অনুবাদকরূপে হাউপট্‌মান্‌, পিরানদেল্লো, হেমিংওয়ে ও গোল্ডিং-এর রচনা অনুবাদ করেছেন। তাঁর উপন্যাস 'দি আনসার'-এ তিনি দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী কালের হাঙ্গেরিয় সমাজকে রূপায়িত করেছেন নির্মম সততার সঙ্গে।

●

থুই থু: নো-দিনদিয়েম শাসনের বিরুদ্ধে নবেম্বর, ১৯৬০ সালের বিদ্রোহে যোগ দেন। সেকেণ্ড লেফটেন্যাণ্ট ছিলেন; দক্ষিণ ভিয়েৎনাম নৌবাহিনীর মুখপাত্র 'লুওত্‌ সং'-এর প্রাক্তন সম্পাদক। মার্কিন ও তার তাঁবেদারদের জঘন্য অপরাধগুলি অবলম্বনে তিনি কিছু গল্পও লেখেন। সংকলনের গল্পটি তাঁর 'একহাজার ও একটি গল্প' সংগ্রহগ্রন্থ থেকে সমাহৃত।

●

নর্মান মেলার: জন্ম ২১ জানুয়ারি, ১৯২৩, নিউ জার্সির লং ব্রাঞ্চে। হার্ভার্ডে শিক্ষান্তে সেনাবাহিনীতে যোগ দেন, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশ নেন। সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই 'দ নেকেড্‌ অ্যাণ্ড্‌ দ ডেড্‌' রচিত হয়: পরে 'বার্বারি শোর', 'দ ডীয়ার পার্ক' উপন্যাসদ্বয়ও জনপ্রিয় হয়। রচনা-রীতিতে হেমিংওয়ে ও জন ডস্‌ প্যাসসের প্রভাব নিজেই স্বীকার করেছেন। বর্তমান গল্পটি ১৯৫৬ সালে লেখা, ইংলণ্ডের 'দ কর্ণহিল' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। মেলার নিজে গল্পটি সম্পর্কে লিখেছেন: "'দ নোটবুক' এক ঘণ্টায় লেখা হয়েছিল। এটাকে গুরুত্ব দিতে পারেন, আবার ছেলেখেলাও ভাবতে পারেন। আয়নায় নিজের মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে একটা সময় আসে যখন হঠাৎ উপলব্ধি হয়, ঐ মুখ, হ্যাঁ, ঐ একটা মুখ থেকে তুমি কখনও পার পাবে না—আমার কখনও কখনও মনে হয়, এই গল্পে অমনি একটা মুহূর্ত আমি ধরতে পেরেছি।"

●

জর্জ আয়রোন্নুর উইলিয়মস্‌: জন্ম ১৯৩৫ সালে ঘানা-র টোগো অঞ্চলে; পিতা সিয়েরা-লিওনীয়, মাতা টোগোলিজ্‌। আচিমোটা ও

ঘানা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষান্তে বর্তমানে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়েই আফ্রিকান চর্চার পরিষদে কর্মরত। সাহিত্যপত্র 'ওকিয়ামে'-র সম্পাদক। মাতৃ-ভাষায় প্রচলিত অলিখিত কবিতার বিশেষ বাগভঙ্গি আয়ত্ত করে তিনি তাঁর ইংরেজি কবিতাকে এক বিশিষ্ট রূপ দিয়েছেন। পেঙ্গুইন্ প্রকাশিত আধুনিক আফ্রিকান কবিতার সংগ্রহে কিংবা অ্যান্ টিব্‌ল্ সম্পাদিত 'আফ্রিকান-ইংরেজি সাহিত্য' (Peter Owen, 1965) গ্রন্থে তাঁর কবিতা দ্রষ্টব্য। ১৯৬৪-তে তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'রিডিস্‌কভারি অ্যাণ্ড্ আদার পোয়েম্‌স্' প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্ররূপে তিনি যেমন এলিয়ট্-পাউণ্ডের রীতির উপাদান আত্মস্থ করেছেন, ঠিক তেমনিই দেশজ আচারের উল্লেখে তাঁর কবিতা বিদেশীয় পাঠকের কাছে প্রায়ই দুর্বোধ্য।

●

জারা রিবনিকার : কবি ও গল্পলেখক। জন্ম ১৯১২ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার হ্রাদেজ-এ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কবি হিসাবে যুগোশ্লাভ সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব। তাঁর প্রধান বইগুলি হল: ডেজ অ্যাণ্ড নাইটস সাকসিড ওয়ান অ্যানাদার (কবিতা) অন দি নাইনথ্ ডে (গল্পসংগ্রহ), আনফিনিশড্ সার্কেল (উপন্যাস) ইত্যাদি।

●

প্যাভেল ভেঝিনভ: প্যাভেল ভেঝিনভ বুলগেরিয়ান সাহিত্যের একটি সুপরিচিত নাম। বুলগেরিয়ান সাহিত্যে তিনিই সর্বপ্রথম শহর-জীবন নিয়ে গল্প লেখা শুরু করেন। তার প্রথম বই 'ডেজ অ্যাণ্ড নাইটস' রীতিমত চমক সৃষ্টি করেছিল বুলগেরিয়ান সাহিত্যে।

●

অঁরি মিশো: জন্ম ২৪ মে, ১৮৯৯। জন্মে বেল্‌জিয়ান হলেও পরে ফরাসী নাগরিক। কবি, গল্পকার ও চিত্রশিল্পীরূপে সুররিয়্যালিস্টদের তীব্র জীবন-বিতৃষ্ণার দায়ভাগী কাফকা বা আলফ্রেড ইয়ারির তিক্তকৃষ্ণ পরিহাস তাঁর কাব্যকণিকাগুলির প্রাণস্বরূপ। মিশোর প্রায় সব রচনার বিষয়গুলি তাঁর কল্পনার সৃষ্টি, অথচ তাঁর কাছে বাস্তবের চেয়েও বাস্তব ও

বিপজ্জনক। মিশো নিজে বলেন, "আমার লেখাও যেমন এক খোঁজা, আমার আঁকাও তেমনি এক খোঁজা। নিজের অজান্তেই যে সত্তা আমার পরিচয়, তাকেই পুনরাবিষ্কার করার চেষ্টা করে চলেছি—সেই পন্থার সন্ধান করছি যাতে চেতনার ইমেজগুলির ফাঁকে ফাঁকে প্রতিধ্বনিগুলিকে জাগিয়ে তুলতে পারি।" মানবদশার যে প্রতিরূপ তিনি রচনা করেন, তাতে তিক্ততার সঙ্গে সঙ্গেই অজাত ভবিষ্যতের প্রত্যাশা আছে : "আমি ভবিষ্যতের মুখ জলে ধুইয়ে দিয়েছি।" "কোন এক প্ল্যুম" গল্পসংগ্রহটি ১৯৩১-এ প্রকাশিত।

●

য়ুয়ান রালফো : মেক্সিকোর সর্বাধিক পরিচিত লেখক। বয়স ৪৬। তাঁর একটি উপন্যাস ও একটি গল্পসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে।

●

প্রদ্যুম্ন অনন্ত তুর : জন্ম ১৯২৫ সালে মধ্য জাভায়। পেশা সাংবাদিকতা। নেশা সাহিত্য।

●

বোহুমিল হ্রাবাল : জন্ম ১৯১৪ সালে ব্রুনোতে। ১৯৪৬ সালে চার্লস ইউনিভার্সিটি থেকে আইন পাশ করেন। লেখা শুরু করেন ১৯৬২ সালে। 'এ পার্ল ইন দি ডেপথস্' (১৯৬৩) 'পাবিটেল' (১৯৬৪) ও 'বলরুম ডানসিং ফর এলডার অ্যাণ্ড অ্যাডভান্সড পিউপিলস' তাঁর গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য।

●

লিউ পাই-ইউ : বর্তমান চীনের অত্যন্ত পরিচিত একজন লেখক। তাঁর বয়স এখন পঞ্চাশের কাছাকাছি। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ-সংগ্রামী সৈন্যবাহিনীতে তিনি সাংস্কৃতিক কর্মী ও রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁর লেখার বিষয়বস্তুও মুখ্যত সৈনিক-জীবন।

●

আর্নলড্ ৎসোয়াইগ : জন্ম ১৮৮৭, লোয়ার সাইলেসিয়া। তাঁর প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় ১৯০৯-এ। ১৯৩৩ সালে হিটলারের অভ্যুদয়ের পর তিনি

জার্মানি পরিত্যাগ করেন। তের বছর পরে জার্মান গণতান্ত্রিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠার পর তিনি বার্লিন ফিরে আসেন। ১৯৫৮ সালে তিনি লেনিন শান্তি পুরস্কার পান।

●

ক্যাথারিন সুজানা প্রিচার্ড। জন্ম ১৮৮৩। জন্মস্থান লেভুকা, ফিজি। শৈশবেই অস্ট্রেলিয়ায় আগমন। প্রথম মহাযুদ্ধের কালে জোর করে সৈন্য-সংগ্রহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান, তখন থেকেই সমাজবাদী ভাবধারায় আস্থা রাখেন। ১৯২০ ও পরবর্তী কয়েক বছরে অস্ট্রেলীয় কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠায় এবং ত্রিশের যুগে বারবুস্ ও রোলাঁর সহযোগীরূপে শান্তি আন্দোলনের সূত্রপাতে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁর উপন্যাসের এপিক অবয়বে অস্ট্রেলিয়ার ইতিহাসের সাম্প্রতিক ধারা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিধৃত।

পরিচয়

বর্ষ ৩৫ । সংখ্যা ১০
বৈশাখ, ১৩৭৩

সূচীপত্র

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।

'পরিচয়'-এর নিয়মাবলী

- 'পরিচয়'-এর বর্ষারম্ভ শ্রাবণ মাসে ; কিন্তু যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। পত্রিকার প্রতি সংখ্যার দাম এক টাকা ; বার্ষিক গ্রাহকমূল্য দশ টাকা, ষাণ্মাষিক সাড়ে পাঁচ টাকা। বৎসরে অন্যূন তিনটি বিশেষ সংখ্যা বর্ধিতমূল্যে প্রকাশিত হয়, তজ্জন্য গ্রাহকদের অতিরিক্ত মূল্য দিতে হয় না॥
- 'পরিচয়' পাঁচ কপির কম এজেন্সী দেওয়া হয় না। কমিশন শতকরা পঁচিশ। পত্রিকা ভি. পি. যোগে প্রেরিত হয় ; ডাকব্যয় **আমরাই** বহন করি॥
- রচনাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয় ; অমনোনীত রচনা ফেরৎ পেতে হলে সঙ্গে ডাকটিকিট থাকা চাই॥
- রচনা, টাকাকড়ি ও ব্যবসায়িক চিঠিপত্র যথাক্রমে সম্পাদক, পরিচয় বা কার্যাধ্যক্ষ, পরিচয়—এই নামে ৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা ৭—ঠিকানায় প্রেরিতব্য॥

রোমাঁ রলাঁ

রবীন্দ্রনাথ পাঠ

ফ্রান্সের জনগণের কাছে টাগোর তেমন সুপরিচিত নন—যে কবি-প্রবক্তার মুখশ্রীতে বিরাজ করে গাম্ভীর্য, যাঁর মহীয়ান মূর্তি আচ্ছাদিত করে রেখেছে এক রহস্যের আবরণ; যাঁর বাক্যের শান্তি, অঙ্গসঞ্চালনের ছন্দোসৌষ্ঠব, পিঙ্গল চোখের জ্যোতি, রমণীয় পল্লবের নিবিড় ছায়াপাত এক অপার প্রসন্নতায় দীপ্যমান। প্রথমবার তাঁর সম্মুখীন হলে আপনার মনে হবে যেন এক মন্দিরে উপস্থিত হলেন; মৃদু হয়ে আসবে স্বতঃই আপনার কথা বলার স্বর। তারপর আরও নিকটে এসে তাঁর পার্শ্বমুখাবয়ব লক্ষ করলে বুঝতে পারবেন বাহ্য শান্তি ও সংগীতময়তার নিচে রয়েছে কী নিবিড় হৃদয়-বেদনা! দেখতে পাবেন দৃষ্টি মোহমুক্ত, চিত্ত দৃঢ়সঙ্কল্পবদ্ধ জীবনসংগ্রামের মুখোমুখি হতে, নয়ত তার পরিণাম হতাশার কবলে আত্মসমর্পণ। স্মরণ করুন তাঁর আলোছায়াসিক্ত অপার্থিব কবিতাগুলি, পাল তুলে দিয়ে যারা চলেছে অজানা যাত্রায়, এক ভুবন থেকে অন্য ভুবনে, চিরন্তন আত্মার স্বর্গীয় প্রেমাস্পদের সন্ধানে,—সে-পথ আলোকিত বেদ-রশ্মি স্ফুরণে। ঐ সঙ্গে স্মরণ করুন পৃথিবীর জাতিগুলির উপর ঊর্ধ্ব থেকে বর্ষিত ভবিষ্যদ্বাণী, সতর্ক করে যা বলেছে—জগতের বিজয়-গর্বিত এই সভ্যতা যাবে গুঁড়িয়ে শিবের নৃত্যের পদাঘাতে।

বলা যেতে পারে পূজাপদ্ধতির শীর্ষ-আঙ্গিক বলিদান উপলক্ষে ব্রাহ্মণ-পুরোহিত কর্তৃক এই সতর্কবাণী পূর্বপুরুষ পরম্পরায় চিরকাল উচ্চারিত হয়ে এসেছে,—আর এও মনে করা যেতে পারে যে এভাবে সতর্কবাণীটিকে সহজ ও সুপরিচিত করা হয়েছে। অথচ ইওরোপ যখন সগর্বে মনে করে ভারতকে সে

ম্যাদেলীন রলাঁ অনূদিত "চতুষ্কণ্ঠে"র (A Quatre Voix) ভূমিকা

উন্নত উদ্বুদ্ধ করেছে তখন স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে সে ভুলে যায় বুদ্ধমূর্তির ওষ্ঠে রয়েছে হাস্যবিভা: রয়েছে শিষ্যদের সঙ্গে বুদ্ধের ধর্মালোচনার মধ্যে দিলখোলা মানুষের উদার হাস্যপ্রিয়তা। প্রাচীন টেস্টামেন্টের ভয়ংকরমুখ ধর্মযাজকদের কথা ছেড়েই দিলাম যাঁরা আমার বিশ্বাস হাসতে জানতেন না। এশিয়ার দেবতারা ও ঋষিরা কিন্তু হাস্যকৌতুক জানতেন। ও দেশের সব শাস্ত্রের মধ্যে ব্যঙ্গকৌতুকের ছটা ঝলমল করছে। শুধু স্থূলবুদ্ধি আমরা—ইওরোপীয়রা—আমাদের অনন্য কঠোরতা ও গাম্ভীর্য তারিফ করি। ওদেশের ঋষিদের হাস্যকৌতুক একটা কিংবদন্তীর বিষয়।

মনে পড়ে গেল টাগোর গল্পচ্ছলে একজায়গায় বলেছিলেন,—এক ছাগলছানা একবার ব্রহ্মার কাছে এসে কেঁদে নালিশ করেছিল—"ভগবন, এমন বিধান কেন দিয়েছ যে (মাংসাশীরা) আমাদের শুধু খেতেই চায়"? ব্রহ্মা হেসে উত্তর দিয়েছিলেন,—"বৎস, তোমাকে দেখে আমারই লোভ হচ্ছে তোমাকে খেতে"। প্রজাদের প্রতি ব্রহ্মা নিজেই যখন পরিহাসপ্রয়োগে বিমুখ নন তখন তাঁর অধস্তন দেবতাদের ও ঋষিদের কৌতুক আমোদে দোষ কী? পড়ে দেখুন—এ-এম-ফর্স্টরের অতি সরেস উপন্যাসটি "প্যাসেজ-টু-ইণ্ডিয়া"; এতে লেখক শ্রীকৃষ্ণ জন্মোৎসবে অনুষ্ঠিত নাচগানের যে-বর্ণনা দিয়েছেন, দোলায় শোয়ান শিশুদেবতার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ছেলেখেলা,—উচ্চপদের আমলাবৃন্দ ও সামন্ত সমাগম, গম্ভীরমুখ পণ্ডিতের দল, খালি গা মালাগলায় করতাল-বাদক প্রভৃতির যে-বিবরণ দিয়েছেন, সেসব আর আজকের টাগোর রচিত এই উপন্যাসবর্ণিত স্বামীজীর শিষ্যদের অনুষ্ঠিত আয়োজনাদি একই ভাবের। হিমালয়ের দেবতারা তাঁদের জ্ঞাতিভাই গ্রীকদেবতাদের মতই পর্বতপ্রমাণ হাসতে পারতেন। মায়াবাদ সত্ত্বেও ভারতের ঋষিরা কৌতুক-পরিহাসে সুদক্ষ ছিলেন; তাতে ভক্তদের দিতেন অবাক করে।

বন্ধুবর সি. এফ. অ্যাণ্ড্রুজ যিনি বিশ বছর যাবৎ ভারতকে মাতৃভূমিত্বে বরণ করেছেন ও যিনি টাগোরের প্রিয় সখা, তিনি আমাকে বলেছেন,—গুরুদেবকে যেদিন তিনি প্রথম দেখেন সেদিন যদিও তিনি নিজে সন্তর্পণে ছিলেন যে গুরুদেবের গাম্ভীর্যের ও সম্ভ্রমের তিলমাত্র মাত্রা-বিচ্যুতি ঘটতে দেবেন না, সেদিনটুকু শেষ না হতেই কিন্তু টাগোর তাঁকে এমন কৌতুকবাণ নিক্ষেপ করলেন যে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অবশেষে অ্যাণ্ড্রুজ নিজেই হেসে আকুল।

ভারতের কবিদের কাব্যচিন্তায় রঙ্গব্যঙ্গের কখনও অভাব ঘটে নি। ধ্যান-

ধারণার এ হলো স্বাভাবিক ভারসাম্যক। টাগোরের চিত্তলোকেও এ ভারসাম্য সুরক্ষিত। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিকে দেখে আপনি যখন মনে করেন তিনি ধ্যানমগ্ন তখন জগতের সু বা কু পরিণাম উপলব্ধি করে তিনি হয়ত একটু কৌতুকহাসি হাসছেন, উভয়ত। আমাদের দেশ ইওরোপে এইরকম প্রাজ্ঞ শক্তিধর এপিক কবি হলেন কার্ল স্পিটেলার। শতরকম কর্মে ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও এঁদের একজন বা অপরের কাছে কিছুই ভ্রষ্ট হবার নয়।

জগতের এমন এক শোচনীয় যুগে টাগোর জন্মেছেন যে মানবের নিয়তিসিদ্ধির জন্য, বিশেষ করে অগণিত তাঁর স্বজাতির মঙ্গলসিদ্ধির জন্য যা করণীয় তার দায়িত্ব তাঁকে নিজেই তুলে নিতে হয়েছে। প্লাবিত নদীর পারে যাবার পথ খুঁজতে মানুষের যে-প্রয়াস সে-পথ দেখাবার ভার, তাতে আলো ফেলবার ব্রত গ্রহণ করেছেন নিজে। তাই তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করেছে তাঁর কাব্য ও সিদ্ধবাক্ গ্রন্থগুলি; আর দ্বিতীয় স্থান পেয়েছে তাঁর বাস্তবধর্মী গ্রন্থগুলি। এই শেষেরগুলি ইওরোপে অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত, কম সমাদৃত;—কারণ কাব্য তত্ত্বালোচনা ও নিবন্ধের মধ্যে আছে যেমন সার্বজনীনতা, উপন্যাসের পটভূমি ও উপাদান তেমনি একান্ত ভারতীয়। কিন্তু যেহেতু অনেক পাঠক দিগন্তে উদীয়মান এই ভারতকবির উজ্জ্বল কিরণ দর্শনে ইতিপূর্বেই মুগ্ধ হয়েছেন, ও অন্যান্য প্রতিভামান ভারতীয়দের,—যথা, টাগোর, অরবিন্দ ঘোষ, জগদীশচন্দ্র বোস ও মহাত্মা গান্ধীর বিষয়ে জিজ্ঞাসু, সেহেতু তাঁদেরই উচিত টাগোরের উপন্যাসগুলির সম্যক পরিচয় নেওয়া।

টাগোর রচিত উপন্যাসগুলির মধ্যে একটিমাত্র এ পর্যন্ত ফরাসীতে অনূদিত হয়েছে, যা হোল 'ঘরে বাইরে'। অতি সুন্দর ও প্রাণবন্ত এই উপন্যাসটির বাস্তবতা অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় নূতন; কিন্তু এর কাব্যময়তা ও অন্তর্মুখীনতা একে কাব্যের সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছে। এ ছাড়া তাঁর রচিত আর একগুচ্ছ অনবদ্য গল্প-উপন্যাস রয়েছে যাতে তিনি নিয়োগ করেছেন তাঁর অসামান্য দক্ষতা—ভারতের সমাজচিত্র আঁকতে। এগুলিতে তিনি অনুদার সামাজিক সংস্কারগুলিকে আঘাত করেছেন, অথচ সব তিক্ততা ত্যাগ করে, চিত্তকে মুক্ত স্বাধীন করে। দিলখোলা মনে এঁকে ধরেছেন বাঙালি ধনী ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়।

তাঁর একাধিক গল্পে স্থান পেয়েছে ভারতের স্ত্রী-সমস্যা,—বিশেষ করে বিধবার সমস্যা, যারা অতি ভাগ্যহীন, যারা দ্বিতীয়বার বিবাহের ও ঘর বাঁধার

সুখে বঞ্চিত,—যারা একরকম সর্বহারা। যে-উপন্যাসটি এখানে অনূদিত হোল তাতে এ সমস্যা আছে গৌণ হয়ে। 'মিতা' উপন্যাসে কিন্তু প্রথম স্থান অধিকার করেছে ভারতের স্ত্রী-সমস্যা।

টাগোরের শ্রেষ্ঠ ও বৃহত্তম উপন্যাস 'গোরা'-তে দেখানো হয়েছে দুটি দল, হিন্দুসমাজকে যা ভাগ করেছে দু-ভাগে: প্রথমটি হোল রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী উগ্রহিন্দু, অপরটি উদারপন্থী কিন্তু অসহিষ্ণু ব্রাহ্মসমাজ। এ উপন্যাসটি অতি সম্পদশালী, এর রচনা সুদৃঢ়। কিন্তু এ-বইটি প্রকাশিত হলে প্রভূত বিপক্ষতা সৃষ্টি হয়েছিল চতুর্দিকের নিন্দুকবৃন্দের কাছ থেকে। উপন্যাসের নায়ক চেয়েছিলেন একসঙ্গে জাতীয় রাজনৈতিক ও হিন্দুধর্মের নেতৃত্ব করতে, কিন্তু অবশেষে জানলেন তাঁর দেহে প্রবাহিত অন্য শোণিত; তিনি এক আইরিশ দম্পতির পরিত্যক্ত সন্তান, যাকে এক হিন্দুপরিবার নির্বিচারে বুকে তুলে নিয়েছিলেন সাহস করে।

বর্তমান গ্রন্থটি ফরাসীতে প্রকাশ করার উদ্দেশ্য এই যে,—এটি হোল ভারতের অন্যতম প্রখর জীবন্ত চিত্র, যদিও সর্বাধুনিক নয়। (এত দ্রুত ও বিরাট পরিবর্তন চলেছে সেখানে যে আমাদের বন্ধু ডব্লিউ. ডব্লিউ. পিয়ার্সন, যিনি ভারত ত্যাগ করেছিলেন ১৯১৬ অব্দে, ১৯১৯ অব্দে প্রত্যাবর্তন করে তিনি আর প্রায় তাকে চিনতে পারেন নি)। এই অতি উপাদেয় গ্রন্থটি ফরাসী পাঠকদের কাছে আমরা উপস্থিত করলাম, যার বাংলা নাম "চতুরঙ্গ", অর্থাৎ যার আছে চারটি ভাগ: জ্যেঠামশাই, সতীশ, দামিনী ও শ্রীবিলাস। আমার মনে হয় বইটিতে পাঠক একেবারে দিশাহারা হবেন না। আরাধ্য স্বামীজী যিনি ভাবাবেগে নৃত্য করেন, সতীশ[১] যিনি ভগবৎলাভের নিকটতম পথে চলতে গিয়ে তাঁর দর্শনলাভের প্রাক্কালে দেখলেন দেবতা আছেন পিছন ফিরে;—এ দুটি চরিত্রসৃষ্টি খাঁটি হিন্দু। ফরাসী পাঠকের কাছে ইওরোপীয় অধ্যাত্ম পথযাত্রীর অভিজ্ঞতার নিদর্শন এর মধ্যে মিলবে না। কিন্তু নিরীশ্বরবাদী উদারপন্থী সাধু জগমোহনকে আমরা, ফরাসীরা অনায়াসেই চিনব। আর চিনব আত্মজীবনীলেখক লাজুক পরাশ্রিত-মতি ও সকলরকম ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত শ্রীবিলাসকে। গ্রন্থের নায়িকা দামিনী সর্বদেশীয়। তাঁর সকল উপন্যাসেই স্ত্রী-চরিত্র রচনায় টাগোর অতি সিদ্ধহস্ত। 'মিতা'[২]

---

১. 'চতুরঙ্গের' ইংরাজী সংস্করণে 'শচীশ'-এর বদলে 'সতীশ' আছে

২. 'মিতা'—নিশ্চয় 'শেষের কবিতা'।

প্রেমবিধুর নারীহৃদয় প্রোজ্জ্বল তাঁর শ্রেষ্ঠ একটি উপন্যাস। তাঁর বইগুলির মধ্যে সর্বত্রই তাঁর নায়িকারা পুরুষদের চেয়ে আমাদের কাছে অধিকতর বিচিত্র ও জীবন্ত ঠেকে। এর কারণ রয়েছে বোধহয় এই তথ্যে যে নারীচরিত্র বিশ্ব জুড়ে এক ও প্রকৃতির নিকটতম। যুগস্রোত বা সামাজিক সংস্কার মূল নারীচরিত্রের কোথাও কোনো দাগ বসাতে পারে না।

এই বইটির রচনাভঙ্গি তীব্রভাবে মনে করিয়ে দেয় ভিক্টোরিয়ান যুগের উপন্যাসের কথা; ডিকেন্সের সৌষ্ঠবপূর্ণ ও বিস্তারিত বর্ণাঢ্য উপন্যাসগুলির কথা অথবা থ্যাকারের 'হেনরি এসমণ্ডের' কথা। মনে করিয়ে দেয় ওগুলির মধ্যে যে প্রাচুর্য, যে হাস্যামোদ, রঙ্গব্যঙ্গ ও তাদের অন্তর্লীন যে বিষাদ আছে—সে সবই। 'বলাকা' কাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হোল প্রকৃতির সংস্পর্শে কবির যে তীব্র হৃদয়-স্পন্দন হয়, তারই পুলকে স্নাত হয়ে এসেছে বলাকার কবিতাগুলি। তরল বাক্যস্রোতের অন্তরাল থেকে নিঃশব্দ সংগীতে ঝঙ্কৃত হচ্ছে আত্মার নির্বাক বাণী।

মূল ফরাসী থেকে অনুবাদ : গিরিজাপতি ভট্টাচার্য

অসীম রায়

বিষ্ণু দে-র পরবর্তী অধ্যায়

সব দেশের মতোই বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক পাঠকের প্রশংসার দাবী রাখেন এরকম লেখক যেমন নিতান্ত কম তেমনি পাঠকদের পক্ষে প্রশংসার ক্ষমতাও অত্যন্ত ক্ষীণ। প্রাক্‌-রবীন্দ্রনাথ যুগ নিয়ে ঝামেলা নেই কারণ মৃত মানেই মহৎ এই আপ্তবাক্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমালোচকই সায় দেন। আমাদের চারপাশের এই জীবন্তকালে যাঁদের কর্ম সেরকম লেখক অন্যমনস্কতার পাত্র। কেন, তার অনেকগুলি কারণের মধ্যে লেখকের গুণহীনতার প্রশ্ন বাদ দিলেও, সাহিত্যবিচারে মানদণ্ডের অভাব অত্যন্ত পীড়াদায়ক। সাহিত্য যে জীবন্ত মানসের ছায়াপথ সেভাবে বোধহয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যপাঠের ধারা প্রবর্তিত না হওয়ায়, টেকনলজির যান্ত্রিক জয়যাত্রায় অধিকাংশ শিক্ষিত বাঙালি পাঠকের আজ একমাত্র সাহিত্যিক কর্তব্য ইংরেজি ভাষা মারফত পেপারব্যাকে আনকোরা বিদেশী লেখা অনুধাবন। আর ইংরেজি আলোচনার ছাঁচে কিছু অধ্যাপকীয় আলোচনা বাদ দিলে একটি অত্যন্ত নেতিবাচক পলেসিকপ্রবণ মেজাজ প্রবর্তনের চেষ্টা লক্ষণীয় যার ফলে শেষ পর্যন্ত কিছুই কিছু না। যেখানে প্রতিটি ভাল লাগার কথা পরবর্তী অংশে 'যদিও' কিংবা 'তথাপি'-তে আবিল। বস্তুত, সাম্প্রতিক কালের কোনো লেখকের কাজ ভাল লাগার কথা এখনও বাঙালি পাঠকের কাছে এসে পৌছয় নি।

এদিক থেকে গত চল্লিশ বছর ধরে বিষ্ণু দে-র কাজের সামান্য পাঠকের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ তিনি এতরকম বাধা জয় করে বাঙালি পাঠকের কাছে এসে পৌছেছেন, এমনভাবে পর্বে পর্বে নিজেকে বিস্তারিত করেছেন বুদ্ধি ও আবেগের সাজুয্যসন্ধানে, এমনভাবে সহজ লোভের পথ ত্যাগ করেছেন, আপ্তবাক্যে অবিশ্বাস করেছেন, নিজের সীমা সম্পর্কে সজাগ হয়েছেন যে তাঁর সাহিত্যকর্মের বিশেষ ভঙ্গী অভিনিবেশের দাবী না রেখে পারে না। বস্তুত ইয়েটস্‌ প্রসঙ্গে এলিয়টের চমৎকার রচনায় উত্তরচল্লিশ লেখকদের ফুরিয়ে যাওয়ার যে-কথা আলোচিত হয়েছে সেই

অপরিণতির ভবিতব্যের করালগ্রাস থেকে একজন সচেতন বুদ্ধিমান লেখক কেমনভাবে নিজেকে মুক্ত রাখতে জাগ্রত চেষ্টা করেছেন সে প্রক্রিয়া বা মেথডলজী বিষ্ণু দে-র যেমন আয়ত্তে সেরকম ভাব সাম্প্রতিক বাংলাদেশে দুর্লভ।

এ ভাবের কথা অবশ্য সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অবতারণা করেন নি তাঁর 'চোরাবালি' প্রবন্ধে। কাব্যের উপাদান ভাবনা ও ভাষার মধ্যে প্রায় দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান টেনে কবিতার কতগুলি সত্যের কথা আমাদের স্মরণ করান এবং বলেন "বস্তুবিলাসের আধিক্য যেমন বিশ্ববীক্ষার পরিপন্থী, তেমনি সাহিত্য ও সমাচারদর্পণ সর্বসম্মতিক্রমে বিপরীতধর্মী।" কিন্তু বিলাস সর্বদাই ত্যাজ্য তা বস্তুর হোক কী প্রকরণের। আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে, যেমন হুতোম প্যাচার নক্সায় কিংবা ভারতচন্দ্রের কবিতায়, এমনকি ডিকেন্সের কিছু উপন্যাসে সাহিত্য ও সমাচারদর্পণের মাঝখানে ব্যবধান সর্বসম্মতিক্রমে নয়। বিষ্ণু দে-র উপর এই উল্লেখযোগ্য লেখায় কাব্যের মুক্তির যে নির্দেশ তা তর্কসাপেক্ষ। আমাদের মতো কবিতার পাঠকের কাছে ভাবনা না ভাষা এ পদ্ধতিতে কাব্যের উৎসসন্ধানে উৎসাহ কিঞ্চিৎ কম। কারণ ভাষার সম্ভাবনায় যে লেখকের কৌতূহল নেই, যিনি তার বিশেষ বোধের বাহন কী হবে না ভেবেই লক্ষ্যে পৌঁছতে চান তিনি আর যাই হন কবি নন। ভাষার অপ্রতুলতা সম্পর্কে সচেতনতায় কবি যেমন ভাষার জীর্ণবাস পরিত্যাগ করেন তেমনি এক সমৃদ্ধ চেতনার জগতকে তাঁর নিজের কানে নিজের বোধে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য করার প্রয়াসে ভাষার নতুন সজ্জায় সজ্জিত হন। এ প্রক্রিয়া কবিতার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রযোজ্য হলেও উপন্যাসে, নাটকে, এমনকি যাকে সচরাচর ভাবা হয় নৈর্ব্যক্তিক সেই প্রবন্ধেও অবশ্যম্ভাবী। কারণ সবচেয়ে বড় ভাষার কারিগরের আসলে অত্যন্ত ভঙ্গুর ও অনেকক্ষেত্রে এক লক্ষ্যহীন মাধ্যমেই আশ্রয়। রং পাথর কিংবা সুরের যে নির্দিষ্ট ব্যঞ্জনা ভাষায় সে নির্দিষ্টতা প্রায় অসম্ভব। ভাষায় কারিগর যেন সর্বদাই সচেতন যে একেবারে অব্যর্থ লক্ষ্যসন্ধান যখন স্বপ্ন তখন সাধনা কেবল লক্ষ্যের যতদূর কাছে যাওয়া যায়। আমাদের মস্তিষ্কে ভাবনার তরঙ্গের যে অবিরাম ঘাত-প্রতিঘাত তার বেশ কিছুটা ভাষার মারফত পৌঁছে দেবার দায়িত্ব লেখকের। শব্দের যে মনস্তাত্ত্বিক উৎসের সন্ধানের প্রয়াস আজ পুরোদমে চলেছে তার ফলে, আরও বেশি করে, ভাবনা না ভাষা কবিতার উপাদান এ প্রশ্ন শুধু

বড় হয়ে ওঠে না। বরং দেশে দেশে বিভিন্ন কালে ভাবনা ও ভাষার যে অভিন্ন অনুপ্রাণিত মিলনে কবিতার উৎসসন্ধান সে সন্ধানেই আমাদের মন যায়। কারণ ভাষার সম্ভাবনা সম্পর্কে অচেতন লেখকের যেমন মুক্তি নেই তেমনি তো মুক্তি নেই করুণ, সহানুভূতিকাতর বা দায়হীন উদ্বায়ু লেখকদের। টমাস মান যাঁদের নাম দিয়েছেন অসুস্থ দেবদূত, সেইসব দেবদূতের হাতে কি কাব্যের মুক্তি ত্বরান্বিত? আর এভাবে বলা যেতে পারে যে কোনো কোনো দেশের কোনো কোনো কালে লেখকদের ঝোঁক পড়তে পারে ভাবনা অথবা ভাষার উপর। কিন্তু যাকে হাঁটতে হবে অনেকদূর, অনেক অভিজ্ঞতা সজীব করে তুলতে হবে, অনেকভাবে বিচিত্র আবেগের রূপদানে সচেষ্ট হতে হবে তিনি নিশ্চয়ই মুগ্ধ ও অনুপ্রাণিত ভাষা ও ভাবের মিলনের অখণ্ডতায়। তিনি জানেন যদি ছুটতে হয় অনেক দূর বিদ্যুৎগতিতে অনেক বেড়া ডিঙিয়ে তাহলে যেমন বাহন হবে দক্ষ তেমনি সওয়ার হবেন মজবুত।

বিষ্ণু দে-র কবিতায় এত বৈচিত্র্যের মূল কারণ তাঁর গভীর প্রত্যয় ভাষা ও ভাবের এই মিলনের অখণ্ডতায়। যা খুবই স্বাভাবিক অর্থাৎ দীর্ঘ দিনের চর্চায় কখনোসখনো মনের ধনুর ছিলা যখন আলগা তখন এ মিলন ভাষার কৌশলে বা ভাবনার অত্যধিক চাপে আংশিক ব্যাহত। এ ভবিতব্য থেকে বোধহয় কোনো লেখকই মুক্ত নয়। কিন্তু এ মিলনের অজস্র প্রমাণ ছড়ানো কবিতার বইয়ের পর বইয়ে। নব নব রূপে ভঙ্গিমায় তার অনুরণন আমাদের পরিতৃপ্ত কানে।

কবিদের পর্বে পর্বে ভাগ করে আলোচনার ধারা প্রায়শ যান্ত্রিক। এ যান্ত্রিক চিন্তার আতিশয্যে বাঙালি নবীন কবির কিছু অংশ আচ্ছন্ন। কবি মানেই যদি যুবক পাখি তবে রক্তের তারুণ্যে আওয়াজে যার গলা যত চড়া তিনি তত বড় কবি। কিন্তু কাব্যে যে আবেগের যৌবন তার স্বাদ তো আমরা ইয়েটসে কিংবা রবীন্দ্রনাথে বারে বারে পাই। আর এই আবেগের যৌবন প্রসঙ্গে বলা যায় সেইসব কবির ক্ষেত্রেই কাব্যের মুক্তি আরও ত্বরান্বিত যাঁরা নিজেদের জীবনেরই পর্বে পর্বে নতুনভাবে তাঁদের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। মধ্য বয়সে কবি কিংবা সমস্ত শ্রেণীর লেখকেরই সমস্যা তাই, হয় চুপ করে যাওয়া পুনরাবৃত্তি এড়ানোর সততায়, অথবা আরও ঝানু দোকানদারের মতো পুরনোকে নতুনের রাংতা পরানোর কৌশল অর্জন। বেশির ভাগ লেখক ত্যাগ করেন তৃতীয় পথ যে পথে

পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে অবস্থা ও আবেগের পরিবর্তনের নব পর্যায়ে নতুন পরিচয় ঘটানোর সম্ভাবনা। এই পরিচয় যেসব কবির ক্ষেত্রে ঘটেছে রবীন্দ্রনাথের পরে, তাঁদের মধ্যে বিষ্ণু দে বারে বারেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন।

'ঘোড়সওয়ার,' 'পদাতিক,' 'জন্মাষ্টমীর' কবি বিষ্ণু দে তাঁর প্রথম যৌবনের দীপ্তিতেই ভাস্বর। তাঁর প্রথম বই 'উর্বশী ও আর্টেমিসে'-র প্রয়োজনীয় অনুশীলনের পরে দশ বারো বছর ধরে তিনি কাব্যে বিচিত্র ভঙ্গিমায় মনীষার এক নতুন ধারা সৃজন করেন। এ মনীষা যেমন ঝলকায় তেমনি গভীর আবেগে আচ্ছন্ন করে। আশ্চর্য নাটকীয় ধারালো উক্তি মাঝে মাঝে থমকায় আবেগের মন্থরতায়। বিদ্রূপের বক্রোক্তি মেশে উদার সম্ভাষণে। কখনও সংস্কৃত শব্দের অনুরণনে কখনো আটপৌরে বাংলার যথার্থতায় আমাদের কান পরিতৃপ্ত। আর সভ্যতার অনবচ্ছেদে গভীর বিশ্বাসী লেখক তাঁর চারপাশের জগতের চিত্রকল্প খোঁজেন কখনও কুরুক্ষেত্রে কখনো-বা দান্তের নরকযাত্রায়। সুখের বিষয়, এই বিদগ্ধ বিষ্ণু দে-র অকুণ্ঠ সাধুবাদ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো আরও অনেকেরই কাছে।

কিন্তু যখন আবেগে চালশে পড়ে, যখন পুনরাবৃত্তির ভবিতব্য জাজ্বল্যমান, যখন সব বলাই শেষ কেবল অবশিষ্ট শিল্পীর শৌখীনতা, তখন কোন তৃতীয় পথে কবি হাঁটবেন? বলা বাহুল্য যে কোনো ফরমায়েসী রাস্তা যখন নেই সামনে, তখন প্রত্যেকেরই এই দুস্তর পথের একক অন্বেষণ। আর এই অন্বেষণে বর্তমান প্রবন্ধলেখকের কাছে বিষ্ণু দে-র চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'সাত ভাই চম্পা' এই তৃতীয় পথের নির্দেশ। আবার 'সাত ভাই চম্পা'র মৌল আবেগ পরবর্তী দুখানা কাব্যগ্রন্থে নিঃশেষিত হয়ে নতুন আবেগ ও বিন্যাসে সঞ্জীবিত হয় আরও আট নয় বছর পর 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' গ্রন্থে।

এভাবে ভাগ করে ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত বিশ বছরের কবিতা আলোচনার প্রধান বিপদ প্রত্যেক গ্রন্থের থেকে আর-এক গ্রন্থে যাওয়ার মাঝখানে গভীর অনবচ্ছেদ। বলা যেতে পারে, কবি যেন বিশ বছর ধরে একটা দীর্ঘ কবিতা লিখেছেন এই বিপর্যস্ত বাংলাদেশের অতীত-ভবিষ্যত-বর্তমানের দিকে তাকিয়ে। কিন্তু এ অধ্যায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের সাদৃশ্য যেমন তেমনি এই দুই পর্বের আবেগ ও বিন্যাসের বিশিষ্ট রূপও পাঠকের কাছে স্পষ্ট।

মনে আছে গত যুদ্ধের শেষাশেষি স্বল্পপরিসর 'সাত ভাই চম্পা'র আবির্ভাবে সে কী উত্তেজনা! বস্তুত গত যুদ্ধের অমঙ্গল-ফলশ্রুতি যদি হয় দাঙ্গা দেশবিভাগ ও উদ্বাস্তুর হাহাকার তাহলে অন্তত বাংলা সাহিত্যের লেখক ও পাঠকের কিছু পরিমাণ সজাগ ও নৈরাত্ম্য দৃষ্টি আমাদের লাভের ঘরে। সহসা মনে হয়েছে জনপ্রিয় ও সৎ সাহিত্যের মধ্যে যে অনড় ব্যবধান বাংলায়, যার ফলে এখনও জনচিত্তে শরৎচন্দ্র আরও আপনার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের চেয়ে, তা বুঝি শেষ পর্যন্ত ভাঙল। অবশ্য পাঠকের সে আশা পূর্ণ হয় নি। যে-দেয়াল ভেঙে পড়ছিল তাকে মজবুত করা হল নতুন সিমেন্টে। একটা অত্যন্ত শৌখীন অর্ধশিক্ষিত পরিবেশ তৈরি হল যেখানে লেখকের সত্তা অনুপস্থিত। যেখানে ভাবপ্রবণ অথবা চতুর লিখিয়েদের আসর তৈরি হল।

বিষ্ণু দে-র বিশ বছরের কাব্য পরিণতির প্রসঙ্গে তাই লেখকের কর্মপদ্ধতি বা মেথডলজি আমাদের এত গভীর ভাবে আকর্ষণ করে। মর্যাদাশূন্য লিখিয়েদের আসর থেকে দূরে থেকেও বিষ্ণু দে আজ বাংলা কবিতার পাঠকের কাছে কেন অপরিহার্য হয়ে পড়েছেন সে বিষয় অনুধাবন স্বধর্মে বিশ্বাসী প্রত্যেক আত্মসচেতন লেখকের আলোচ্য।

গত যুদ্ধের শেষাশেষি জনপ্রিয় ও সৎসাহিত্যের মাঝখানে ভেঙে-পড়া দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে লেখক যেন টের পান তাঁকে অনেক ক্ষেত্রে এককভাবে হলেও শিল্পসাহিত্যের ঐতিহ্যের গভীর আশ্রয় খুঁজতে হবে। বিষ্ণু দে-র লোকশিল্প, যামিনী রায়, বাংলার প্রাক-রবীন্দ্রনাথ 'প্রতিবাদী প্রাকৃত সাহিত্যের ধারায়' এত প্রবল সজীব উৎসাহ কেন, তা আজ পরিষ্কার। কারণ 'সাত ভাই চম্পার' স্বদেশের জনজীবন সম্পর্কে যে তরুণ উৎসাহ তার দীর্ঘস্থায়ী ভবিষ্যতের সম্ভাবনা যেমন নেই বর্তমানবিরূপ রিভাইভালবাদী বিষণ্ণ মানসে তেমনি অনুপস্থিত সংকীর্ণ সমাজবাদী বিপ্লবীর অসম্পূর্ণ দৃষ্টিতে। 'জন্মাষ্টমী'র কবির কাছ থেকে তাই 'সাত ভাই চম্পার' কবিতা পেয়ে আমরা বিশেষ চমৎকৃত। পরবর্তী গ্রন্থগুলিতে এই মেজাজের আরও সমৃদ্ধ পরিচয় পেলেও এই স্বল্প পরিসর গ্রন্থটির গুরুত্ব অসীম। কারণ এ গ্রন্থে প্রায় উচ্চকণ্ঠে বিপ্লবের বন্দনা গাইলেও কবি বারে বারেই লোকসাহিত্য সংগীতের গভীর আশ্রয়েই তাঁর আবেগের উৎস খোঁজেন। বিপ্লব-প্রসঙ্গে আবেগের সরল সমীকরণ যে অনুপস্থিত তা নয় কিন্তু বিশেষ করে স্বল্পপরিসর কবিতাগুলিতে, 'সাত ভাই চম্পা'র মতো কবিতার সজীব সরলতায়

বা 'বেগার্ত নদীর বেগ, নর্তকের বেশী বহুলতা' এই আশ্চর্য ধারাল সনেটে লেখক তাঁর নতুন 'রাজনৈতিক পর্বে' তাঁর গভীর ঐতিহ্যধর্মী সমৃদ্ধ মানসেরই পরিচয় দেন।

বাস্তবিক স্বাধীনতাপরবর্তী বাংলাদেশের কয়েক বছর অন্তর অন্তর দেয়ালে মাথা খোঁড়া বিপ্লবে কোনো বড় লেখকের আশ্রয় নেওয়া মুস্কিল এ বোধ বিষ্ণু দে-র মধ্যে ক্রমশই প্রবল। অথচ তিনি শৌখীন নন, অসুস্থ দেবদূত নন, জনসাধারণের সমৃদ্ধ মানসই যে লেখকের শেষ পর্যন্ত আশ্রয় তা বিপ্লবের প্রবল যান্ত্রিকতায় কিংবা বাংলাদেশের কালচারাল্‌ পেট্রনদের তাড়নায় ভোলেন নি। তাঁকে সেইজন্যে অনেক দূর অনেক দিকে তাকাতে হয়েছে। তাকাতে হয়েছে চিত্রকলায়, কান পাততে হয়েছে ইয়োরোপীয় সংগীতে। শিল্পের এই প্রবল নর্দমান ধারাকে বারে বারে নব নব রূপে আবিষ্কার করে তিনি চারপাশের অবক্ষয় থেকে মুক্তি পাবার সাধনা করেন। তাই তো পরবর্তী গ্রন্থ 'সন্দীপের চরে' অপরূপ 'ছত্তিশগড়ী গান' :

কি করে ভাঙলে
সোনার কলসখানি
বলো তো কোথায়
হারালে তোমার জলজ্বলে যৌবন ?

২

হিরণ পাত্রে রূপালী ঢাকনা পাতা
এই আসা এই যাওয়া,
তবুও তোমার যাওয়ার আসার পথেই
অন্তত এক আধটা স্বপ্ন দিয়ো।

৩

একটা কুকুর ডাকল কোথায় গাঁয়ে
স্বপ্নে ছিলাম ভেঙে গেলো ঘুম—
কিছু নেই, কেউ নেই।

৪

তোমার দু-চোখে ওড়ে দুটি প্রজাপতি
প্রেয়সী তোমার মাথায় কোঁকড়া চুল

ওগো প্রিয়া রূপবতী
চাটুতে যে পুড়ে গেলো হায় হায়,
ক্ষুধায় কাতর সাঁঝের রাতের সাথী
তোমার দু-চোখ ওড়ে দুটি প্রজাপতি
হে প্রেয়সী সুন্দর।

যেন বা বাতাসে
পিয়াল গাছের শাখা
ও তনু শরীর
আমার বাতাসে দোলে।
পূবে মেঘ জমে
দক্ষিণে বারি ঝরে,
তোমার সদ্য যৌবন ওগো প্রিয়া
অগ্নিবৃষ্টি করে।

'সাত ভাই চম্পা'র জনতার জয়গান, বলা যায় আরও ব্যাপক মানুষের জয়গানে এসে দাঁড়ায় 'সন্দীপের চরে', বিশেষ করে তাঁর 'চৈতে-বৈশাখে' ধরনের কবিতায়। এ দৃষ্টি আরও গভীর, মানুষের আনন্দ ও দুঃখের সঙ্গে একাত্মতা আরও প্রবল। প্রাজ্ঞের পরিহাস নেই, বিপ্লবীর উচ্চকণ্ঠ সম্ভাষণ নেই, আছে চারপাশে জীবনকে গ্রহণ করার একান্ত চেষ্টা।

আমি যে শুনেছি সেই ঠাকুর গাঁয়ের ছোট প্রাচীর প্রাঙ্গণে
দম্পতির মৃত্যুহীন দৈবী প্রেমে তীব্র আলোচনা
যে-প্রেমে গ্রাম্য সে ইন্দ্র-ইন্দ্রাণীরা জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান
মুছে দেয় জীবনের ঐক্যে। আমি সেদিন দেখেছি
ডকের খালাসী এক ভিক্ষাপাত্র বয়, চোখে দু-চোখ রেখেছি

সে-চোখে ভিক্ষার লেশমাত্র নেই, উদার নয়নে
উন্মুক্ত মৈত্রীর ভাষা, সহজ নির্ভরে
সে যেন সন্তান কোনো অলকার গন্ধর্ব কিন্নর
কিংবা কোন দেবতাই

তাদের পাথার ঝড় আমার পাথায়
তাদের উড্ডীন গতি
আমি জানি শুধু এই যন্ত্রণা-প্রহরে
তাদের উধাও গতি নক্ষত্রে নক্ষত্রে আর আলোর ধাক্কায়
তাদের সে মর্ত্য গতি কালবৈশাখীর গতি পাথরে পাথরে
তাদের পাথার ঢেউয়ে ঢেউয়ে গতির প্রয়াণ
আকাশের ঘাট ধুয়ে ধুয়ে
আমার ভাবনা বাঁচে জীবন-মৃত্যুতে দুই তটে বলীয়ান।

এই কবিতার শেষ অংশে ভাষা ও ভাবের অঙ্গাঙ্গী মিলনে যে প্রবল গতিময়তা তা বাংলা কবিতায় খুব কম চোখে পড়ে। কবিতার এই প্রবল গতিময়তায় বাংলা কবিতার এক নতুন প্রকাশভঙ্গীর জন্ম। যে সমস্ত কাব্য—পাঠক ভাবেন রাজনৈতিক কবিতা মানে চিৎকৃত স্লোগান আর কবিতা অবধারিত নর ও নারীর নিঃসঙ্গ মিলনে তাঁদের ভাবনা তীব্র হোঁচট খায় বিষ্ণু দে-র এই সব আশ্চর্য কবিতায়।

প্রায় এই সময় থেকে সাঁওতাল পরগণার আকাশের রঙ আর পাহাড় বিষ্ণু দে-র কবিতায় নতুন স্বাদ আনে। শহরের সন্তাপে জর্জরিত মানুষের কাছে কবির রিখিয়ায় বাস এবং প্রকৃতি-বর্ণনা প্রথম দৃষ্টিতে পলায়ন মনে হতে পারে। কিন্তু লক্ষ করলে বোঝা যায়, এ পলায়ন সে পলায়ন নয়। এ শুধু প্রকৃতিতে আশ্রয় খোঁজা নয়, বরং প্রকৃতি থেকে মানুষের কাছে বার বার ফিরে ফিরে আসা।

তাই তেপান্তরের পাহাড়ের আড়ে
সূর্যের দেখেছি যাত্রা ফেরার বিদেশে
সেই লাল সেই সাত রঙার সিম্‌ফনি
জাগায় অমর প্রাণ ম্রিয়মাণ রক্তস্নায়ু হাড়ে
মানুষের ইতিহাসে উদ্ভাসিত ঝঞ্ঝাময় চেতনায় ধনী
খেতে ও খামারে কুটীরে টিলায় লাঙলের ঘায়

শ্রাবণের মেঘে-মেঘে আশ্বিনের পান্নায় নীলায়
হেমন্ত হাওয়ায়, শীতের স্ফটিক দিনে হীরক সন্ধ্যায়
ফাল্গুনের চঞ্চল আবেগে
সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ে ভালো লেগে লেগে

আমারও অন্বিষ্ট তাই
অণুর সংহতি
আসুক জীবনে রঙে মানবিক আমি চাই আমরা সবাই
সূর্যাস্তে ও সূর্যোদয়ে ইন্দ্রধনু ভেঙে দিই জীবনে ছড়াই
হে সুন্দর বাঁচার বিস্ময়ে বিপদে সম্ভ্রমে জীবনে আকাশ
অবকাশ বাঁচার আনন্দ চাই। (অন্বিষ্ট)

এ আনন্দের যাত্রা প্রত্যেকের জন্যে। বাংলাদেশের বর্ণহীন প্রত্যহের সামনে এই সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের ইন্দ্রধনুর আশা রাখেন কবি। যামিনী রায়ের যশোদা ও কৃষ্ণের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আমরা যেমন যুগপৎ মুগ্ধ এব বোধহয় কিছুটা অনাত্মীয়তা বোধ করি ঠিক তেমনি আমাদের মনের অবস্থাং বিষ্ণু দে-র এই আনন্দ ভৈরবী শ্রবণে। যেন এই নিপট সৌন্দর্যের ছবি আমাদের মুগ্ধ করেও সুদূর। অথবা বিষ্ণু দে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যা বলেছেন তাই অনুসরণ করে বলা যায় যে এই মেজাজ আমাদের প্রাত্যহিক বাস্তবতায় থেকেও বহু উর্ধ্বে স্বয়ংসম্পূর্ণ।

কিন্তু বিষ্ণু দে-র মেজাজে এমন অফুরন্ত বৈচিত্র্য, এমন গভীর গতিময়তা যে কোনো এক বিশেষ দিকে নিবিষ্ট হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চোখ ফেরান আর-একদিকে। তাঁর কাছ থেকে তাই প্রত্যাশা বারে বারে সঞ্জীবিত হয়। তিনি যেমন রঙের কবি তেমনি কি বর্ণহীনতার গভীর বিষাদে অতৃপ্ত নন? বিষ্ণু দে-র মেজাজের এই সমগ্রতা তাঁকে কবি হিসেবে এক দুর্লভ স্বাতন্ত্র্য দান করেছে। তাঁর 'অন্বিষ্ট' গ্রন্থেই 'জল দাও' এই আর-এক দিকে চোখ ফেরানো :

হয়তো বা যন্ত্রণাই সার
দেখে যেতে হবে ঠেকে শিখে
সত্তার অক্ষরে অক্ষরে লিখে লিখে
অত্যাচারে অনাচারে উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান
নিজে নিজে এবং সবার কৃতকর্মে শুনে যেতে হবে
কুরুক্ষেত্রে ভীষ্ম যেন কিংবা সেই বিরাট প্রাসাদে
অজ্ঞাতবাসের বীর বৃহন্নলা অর্জুনের গান
কিংবা যেন ফাল্গুন চৈত্রের প্রস্তুতির

পাতাঝরা নতুন পাতার আঁকশিতে অঙ্কুরে
শিরায়-শিরায় শিকড়ের প্রচ্ছন্ন উৎসবে
অধরা অথচ তীব্র প্রাণের স্তুতির
অনিবার্য যতির স্তব্ধতা…

শেষের দিকে দুখানি প্রকাশিত গ্রন্থ প্রধানত 'উদ্‌ভ্রান্ত উন্মাদ এই বর্তমান' নিয়ে লেখা। 'নাম রেখেছি কোমল গান্ধার' ও 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে'র বেশির ভাগ কবিতার আয়তন অপেক্ষাকৃত স্বল্প। সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের ইন্দ্রধনুর বদলে, বলা যেতে পারে খবরের কাগজের কলকাতা আর তার এলোমেলো জীবনই কবির প্রত্যহ। এই প্রত্যহেই তাঁর 'প্রচ্ছন্ন স্বদেশ', 'রথযাত্রা ইদ মুবারকে', 'পাঁচ প্রহর' এবং শেষ গ্রন্থ 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতের' আশ্চর্য প্রথম ও বহু কবিতা। বিষ্ণু দে-র পরিণতির পথ ধরে অগ্রসর হলে বোঝা যায় কেন আত্মসচেতন লেখক নিজের সবচেয়ে বড় ও সার্থক সমালোচক। গ্যায়টের উপর টমাস মানের বিখ্যাত প্রবন্ধে লেখকের বর্ণনা— কেমনভাবে প্রত্যেক গ্রন্থেই তাঁর পাঠককে এবং সমালোচককে গ্যয়টে অবাক করেছেন পাঠকের না-বলা কথা অনুধাবন করে,—সে প্রসঙ্গ মনে আসতে পারে। বস্তুত বিষ্ণু দে-র এই শেষ অধ্যায়ের কবিতায় এমন কৌশলমুক্ত সাবলীলতা, এমন সরল কথার অসাধারণ ধার যা প্রথমযুগের বিখ্যাত কবিতাগুলিতে অনুপস্থিত। এ যেন আর-এক বিষ্ণু দে, বাঁকা বিদ্রূপ ও পরিহাসের বদলে এক পরিব্যাপ্ত বিষাদ ও প্রার্থনার ভঙ্গীতে বাঙ্ময় একটার পর একটা কবিতা।

পালায় সে মেঘে-মেঘে বজ্রে ও বিদ্যুতে
মোহানার ভাঁটায় ভাঁটায়
আষাঢ়ের অশ্রুহীন হঠাৎ সন্তাপে
রেখে যায় ছায়া শুধু হাওয়া শুধু রেশ
আকাঙ্ক্ষায় আকাঙ্ক্ষায়

সেই ছায়া দিনরাত খুঁজে ফিরি সেই হাওয়া
রক্তে আঁকি সেই ছদ্মবেশ একান্ত আপন
তালী তমালের বনে মৃত্যুবাঁধা রাজপথে
তোমাদের আমাদের সামনে আড়ালে তাকে

বার বার আজো সারাক্ষণ
অস্পষ্ট আসন্ন তবু যেন বা সে
দূরাদশ্চক্রনিভস্য তন্বী
প্রচ্ছন্ন স্বদেশ ॥ (প্রচ্ছন্ন স্বদেশ)

কবি নিজেই জানেন তিনি ঘুরে ফিরে এত কথা বলতে পারবেন পুনরাবৃত্তির চোরাবালিতে পা না-দিয়েও। কারণ তিনি তো কাব্যে আধুনিকতার নামে নিরালম্ব প্রতীকবাদের চর্চা করেন নি-কিংবা অনড় অলংকারের ছাঁচেও তাঁর কাব্যকে ঢালেন নি। প্রাকৃত ভাষার গভীরতার আবেগের চরিতার্থতা আবিষ্কার থেকে সরে যান নি কখনো। তার ফলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নাটকীয় পাল্লা দেবার কথা যেমন তাঁর মনে হয় নি তেমনি কাব্যের চালু পোষাকী ভাষার বিরুদ্ধে তাঁর সজাগ দৃষ্টি বারেবারেই ফলপ্রসূ হয়েছে। তাঁর বিপ্লবে বিপ্লবীর আপ্তবাক্য নেই যেমন তাঁর প্রেমে প্রকৃতিবর্ণনায় নেই কাব্যের জরিদার ভেলভেট। মানুষ তার মুখের কথায় যে অন্তরঙ্গতার সজীব প্রাণদায়িনী ভাষা সৃষ্টি করে সে ভাষায় কবি বরাবর আশ্রয় নিয়েছেন।

মালার্মে! তোমারই মতো আমাদেরও নিষ্ঠুর বর্বর
পরবশ ধূর্ত স্মার্ট বিলাসের বিচ্ছিন্ন বিরাট
জীর্ণ শীর্ণ ভূখণ্ডের অতিভোজী অতিভাষী আর্ট
অবসন্ন করে অপশিল্পকর্মে অকর্মে জর্জর ;
তাই পরিব্রজে খোঁজা অপভ্রংশে, দেশজ ভাষায়,
আঞ্চলিক মুখে মুখে স্থানীয়ের বিশিষ্ট বাচনে,
কথ্যছন্দে, স্বরময় প্রাত্যহিক প্রাকৃত ভাষণে
শিল্পের বিশুদ্ধ অর্থ অপ্রাকৃত মধুর কথায় ;

তাই খোঁজা চৈনিকের স্বচ্ছচিত্ত পেলব পদ্ধতি
একান্ত আনন্দে যার প্রান্তিকের রেখার আভাসে
শুভ্রতনু পুষ্পপাত্রে স্মৃতিবহ গন্ধের আরতি
ভাস্বর ভঙ্গিতে নিত্য ; খুঁজি প্রতিবেশীর আশ্বাসে,
পাস্টেরনাকের দেশে, ঊর্ধ্বশ্বাস কালের বাতাসে
নব প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় মনীষার প্রতীক : প্রগতি ॥

(মালার্মে : প্রগতি

শিপ্রা সরকার

বিক্ষোভের রাজনীতি

সমাজবিপ্লব সম্পর্কে কোনোরকম দুশ্চিন্তা এ দেশের সাম্যবাদীমহলে পনের বছর আগেও ছিল না। তারপর থেকে স্বদেশ ও বিদেশে বহুক্ষেত্রে আন্দোলনের ব্যর্থতা, অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে অবশেষে পার্টি ভাঙার অবস্থা হতাশার সৃষ্টি করেছে। এইসব দুর্বলতা সম্পর্কে চেতনার এখনও যথেষ্ট অভাব আছে, এবং আত্মসন্তুষ্টির প্রায়শ্চিত্ত হিসাবেই বোধহয় মাঝে মাঝে আত্মগ্লানির তীব্রতা অনুভব করা যায়। যথা কলকাতার কোনো সাপ্তাহিকের এই মন্তব্য: "Suddenly, hopelessness threatens to hens us in : hopelessness about socialism, hopelessness about economic growth, hopelessness about our occasional resolve to stay a proud independent people"। পরাশ্রয়ী অর্থনীতির চাপে, বৈষম্যের বঞ্চনার মাঝখানে, "no prick of conscience, however, bothers the left-over intellectuals and the idealists of yesterday. Iron has entered the soul, the iron of Patton tanks. The revolution is dead; long live the revolution of me-tooism" ('নাউ', ১৭ ডিসেম্বর '৬৫)।

সুবিধাবাদের দিনে যাঁরা এমন করে লিখতে পারেন তাঁরা আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। স্বাধীন, সৎ প্রগতিবাদী বুদ্ধিজীবীদের "গতকালের আদর্শবাদ" একেবারে হাওয়ায় মিলিয়ে যায় নি বলেই আজও বাংলাদেশে এ ধরনের সম্পাদকীয় লেখা সম্ভব। কিন্তু দেশের দুরবস্থায় স্বাভাবিক নৈরাশ্য থেকে একেবারে বিপ্লবের অপমৃত্যু পর্যন্ত এমন সাংঘাতিক সরলরেখা টানার দরকার হল কেন? এখানে একটা পরিষ্কার রাজনৈতিক বক্তব্য আছে। বিপ্লবে বিশ্বাসী হলেও লেখক জনশক্তি সম্পর্কে আস্থাহীন। তাঁর মতে ছেচল্লিশ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে হাজার দেড়েক ছিল বিদ্রোহী-ভাবাপন্ন, তাদের ভারতরক্ষা আইনে ধরার পর থেকে অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো লোক দেশে নেই।

'নিয়মমতে চলা'র ব্যাধি আমাদের পেয়ে বসেছে, তাই 'বিপ্লবের শহরেও' বিপ্লব হচ্ছে না। শ্রমিকশ্রেণীর নেতারা তাদের ফেলে পালিয়েছে। অসংগঠিত অসহায় শ্রমিকের চোখে আজ কেবল দুর্ভিক্ষের দুঃস্বপ্ন।

জনতার প্রতিরোধকে সব সময়ে একটি মনগড়া 'বিপ্লবের' ছাঁচে ফেলে দেখতে হলে মুস্কিলের কথা। সম্পাদকীয় নিবন্ধটি যে তারিখের তার আগেই নতুন খাদ্যনীতির দাবিতে বাংলার গ্রামে পদযাত্রা হয়ে গেছে এবং মহারাষ্ট্রে সুতিকল শ্রমিকদের একদিনের ধর্মঘটের প্রস্তুতি চলছে। গত দেড় বছরের গণ-সত্যাগ্রহ বা শ্রমিক-সংগ্রাম বাদ দিলেও, অগাস্ট মাসের সংগ্রামে এক বিহার রাজ্যে ধৃত নরনারীর সংখ্যা যে দেড় হাজার নয়, প্রায় চার হাজার ছিল, সে কথা অন্তত মনে রাখা চলত। শ্রমিক-কৃষকের আর-একটু কাছে গেলে হয়তো দেখা যেত নিজেদের ক্লান্ত অবিশ্বাসের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে আমরা অন্যায় করছি। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই তারা গরম শ্লোগান শুনেও ঠাণ্ডা হয়ে থাকে, ছক-বাঁধা আন্দোলনের কায়দায় হয়তো সাড়া দেয় না। সেখানে রাজনৈতিক অশিক্ষা থাকতে পারে, কিন্তু এমন কোনো সামাজিক সত্যও আছে যাকে ঠিক ধরতে না পারলে রাজনৈতিক আন্দোলন আর এগোবে না। শ্রমিকশ্রেণীর ভিতরে স্তরভেদ, তাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন, নতুন ভাবনা-চিন্তার কথা না জানলে সেই অনুপাতেই আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে। হৃদয়ের বা মস্তিষ্কের উত্তাপ হঠাৎ বেড়ে গেলেও সেই ফাঁক ভরানো সম্ভব হবে না।

বাম কমিউনিস্টরাও এখন পর্যন্ত বিপ্লবের আলাদা কোনো বোধগম্য নীতি দেশবাসীর সামনে রাখতে পারেন নি। কেরালার নির্বাচন খুব জরুরী ব্যাপার হলেও নিশ্চয় বিপ্লবের সাধারণ নীতির স্থান নিতে পারে না। বিনা বিচারে কারারুদ্ধ রাজবন্দীদের মুক্তি প্রত্যেক সুস্থবুদ্ধি নাগরিকের দাবি, কিন্তু বিপ্লবের পরিস্থিতি দেশে থাকলে তো রাজবন্দীর সংখ্যা কিছু বাড়তেও পারে। সেজন্য বিপ্লবী আন্দোলনের দিকভ্রম হবে কেন ?

উপরোক্ত লেখাটিকে ব্যবহার করা হল কেবল এই কারণে যে আজকের অনেক প্রগতিবাদীর মনের কথা এখানে বলা হয়েছে। বাম কমিউনিস্টদের সম্পর্কে অনুরাগ বা বিরাগের প্রশ্ন এখানে বড় নয়। বিপ্লব নিয়ে একই ধরনের চিন্তার অভ্যাস আমাদের সকলের রক্তে ; ডান-বামের প্রভেদ অল্পদিন আগেও ছিল না, এখনও তা সম্পূর্ণ নয়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে আমরা যেভাবে

দেখেছি তার মধ্যে বোধহয় একটা ঐতিহাসিক অনিবার্যতা ছিল। অন্যান্য দেশের মতো এখানকার কমিউনিস্ট পার্টিতেও আন্তর্জাতিক আন্দোলনের প্রভাব বরাবর খুব স্পষ্ট। কমিউনিস্ট পার্টি সব দেশেই নিজের চেষ্টাতে বড় হলেও চিন্তার দিক দিয়ে একেবারে স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে নি। স্থানীয় পার্টির বাস্তব অভিজ্ঞতার তুলনায় আন্তর্জাতিক বিশ্লেষণ প্রাধান্য পেয়ে এসেছিল। বিদেশের অনেক পার্টিতে এখন আন্তর্জাতিক সংগঠনের পুনর্বিচার হচ্ছে। এখানে কিন্তু কমিনফর্ম ও বিশেষত কমিনটার্নের নিরপেক্ষ আলোচনা প্রায় হয়ই না। দুর্বল দিকটার কিছু আলোচনা সেইজন্যই দরকার, অন্যটি অপ্রধান ছিল বলে নয়।

এই শতকের তিনটি সন্ধিক্ষণে আন্তর্জাতিক সংগঠনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যে অবাস্তব, কাটাছাঁটা ধারণা উপস্থিত করা হয়, তার ফলে কার্যক্ষেত্রে বেশ ভুল হতে থাকে। ১৯১৮ সাল থেকে কিছুদিন বিশ্ববিপ্লবের ভরসায় থাকা, ১৯২৮-এ কমিনটার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেস, আর ১৯৪৮-এ কমিনফর্মের প্রতিষ্ঠা-কালে আবার নতুন রাজনৈতিক বিশ্লেষণ—তিনবারই বিপ্লবের দিক নির্ণয়ে এই দুর্বলতা ধরা পড়ে। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো তাত্ত্বিক ভুলের চেয়েও যান্ত্রিক প্রয়োগে বেশি ক্ষতি হয়, কিন্তু ফল একই।

রুশ বিপ্লবের আগে থেকেই লেনিন বিপ্লবের যুগের উপযোগী নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজন বুঝিয়ে বলেন। তৃতীয় আন্তর্জাতিকের প্রতিষ্ঠা থেকে দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে পর্যন্ত (১৯১৯-২২) কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ নিঃসন্দেহ ছিলেন যে বিপ্লব রাশিয়াতে থেমে থাকতে পারে না। সশস্ত্র প্রতিবিপ্লবের কবল থেকে সোভিয়েটভূমি রক্ষা, ১৯১৯-এর নভেম্বর থেকে কয়েক বছর জার্মানির অবস্থা, দ্বিতীয় কংগ্রেসের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে হাঙ্গেরি ও বাভারিয়ার 'সোভিয়েট প্রজাতন্ত্র', এবং পোল্যাণ্ডের যুদ্ধে প্রথমটা লাল ফৌজের সাফল্য কমিনটার্নের আত্মবিশ্বাস প্রচণ্ডভাবে বাড়িয়ে দিয়েছিল। জার্মানিতে বিপ্লবের অবস্থা ছিল না এমন কথাও জোর করে বলা শক্ত। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু পরের ত্রিশ বছর রাশিয়া থেকে গেল শত্রুবেষ্টনীর ভিতরে একা সমাজতন্ত্রের সুরক্ষিত দুর্গের মতো। ১৯২২ সালে নতুন অর্থনীতির (নেপ্) যুগে এসে স্পষ্টই বোঝা গেল বিশ্ববিপ্লব পিছু হটেছে। কমিনটার্নের কৌশলের বদল হল।

পশ্চিম ইওরোপের দু-একটি শিল্পোন্নত দেশে তখন বিপ্লব হতে পারলে পরের ইতিহাস অন্যরকম হত। আন্তর্জাতিক আন্দোলনে রুশ প্রাধান্য থাকত

কি না সন্দেহ। সমাজতন্ত্র গঠনের প্রতিযোগিতায় অনুন্নত রাশিয়ার আবার পিছিয়ে পড়ার সম্ভাবনা বলশেভিক নেতারা সেদিন সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন। অন্য কোনো দেশে বিপ্লব হল না বলেই রুশ অভিজ্ঞতা সারা পৃথিবীর কমিউনিস্টদের চোখে উজ্জ্বল আদর্শ হয়ে রইল। এই অবস্থা কেউ সচেতন-ভাবে ডেকে আনে নি। কিন্তু লেনিনের সুবিখ্যাত 'বামপন্থী কমিউনিজম : শিশুদের রোগ' গ্রন্থেও রুশ বিপ্লবের অভিজ্ঞতা এইভাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। চতুর্থ কংগ্রেসে (১৯২৩) লেনিন অবশ্য "অতিরিক্ত রুশ" প্রস্তাবের বিপদ সম্পর্কে সাবধান করে দেন। লেনিন তখন অসুস্থ। তাঁর সতর্কবাণীকে ঠিকমতো গুরুত্ব না দিয়েই এই কংগ্রেসে রুশ ছাঁচে ঢালা সাংগঠনিক নিয়মাবলী গৃহীত হয়। তখনকার দৃষ্টিভঙ্গিতে স্থানীয় পার্টিগুলি ছিল আন্তর্জাতিকের এক-একটি 'সেকশন' মাত্র।

লেনিনের মৃত্যুর চার বছর পরে, ১৯২৯-এর অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও ফাশিস্ট অভ্যুত্থানের প্রায় মুখোমুখি এসে ষষ্ঠ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। তখনকার রাজনৈতিক প্রস্তাবে ধনতান্ত্রিক সংকটের "তৃতীয় পর্যায়ে" মোটামুটি সোজা লাইনে এগিয়ে চলার একটা সরল চিত্র আঁকা হয়েছিল। "ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকট তীব্রতর হচ্ছে"—অতএব বিপ্লবের সম্ভাবনাই প্রধান হয়ে উঠেছিল। ফাশিজম্-এর শক্তি, সংগঠন ও আকর্ষণ তার পরেও ঠিক বোঝা যায় নি। আন্দোলনের সংকীর্ণতা শ্রমিকশ্রেণীকে বিপ্লবের জন্য তৈরি করার বদলে ফাশিস্ট আক্রমণের মুখে অপ্রস্তুত অবস্থায় রেখেছিল।

"বর্তমানে সোশাল-ডেমক্রেসির প্রধান কাজ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য নষ্ট করা। ধনিকের বিরুদ্ধে শ্রমিক সংগ্রামের যুক্তফ্রণ্টে ফাটল ধরিয়ে, তাকে ভেঙে, সোশাল ডেমক্রেসি শ্রমিকশ্রেণীর ভিতরে সাম্রাজ্যবাদের প্রধান সমর্থকের ভুমিকা নিয়েছে।" (কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রোগ্রাম, ১৯২৮)।

"শ্রেণী বনাম শ্রেণী" শ্লোগানের প্রভাবে জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি দেশে একই ভুল হয়—সোশাল-ডেমক্রেটিক আন্দোলনের ভিতরে সূক্ষ্ম ভেদাভেদ একেবারে উপেক্ষা করে ফাশিস্টদের সঙ্গে তাদের এক পংক্তিতে ফেলার 'বামপন্থী' ভুল। ফাশিজম্-এর বিরুদ্ধে সংযুক্ত প্রতিরোধ অসম্ভব হয়ে ওঠার একমাত্র কারণ যে সোশাল-ডেমক্রাটদের বিশ্বাসঘাতকতা নয়, এই স্বীকৃতি কমিনটার্নের সপ্তম কংগ্রেসে (১৯৩৫) ডিমিট্রভের বক্তৃতায় আছে। উগ্র

প্রতিক্রিয়া ও মধ্যপন্থীদের সীমারেখা একেবারে মুছে ফেলার এই ইতিহাস নিয়ে পশ্চিম ইওরোপের কমিউনিস্টরা এখন নতুন করে ভাবছেন।

ষষ্ঠ কংগ্রেসের আর-একটি বিখ্যাত দলিলে ঔপনিবেশিক মুক্তি সংগ্রামের পথ নির্দেশ করা হয়। চীনের বিপ্লবী আন্দোলন ১৯২৭ সাল থেকে কুওমিনটাং প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে লড়তে বাধ্য হয়েছে, সান ইয়াৎ-সেনের আমলের জাতীয় ঐক্য ভেঙে গেছে। কমিনটার্ন এই অভিজ্ঞতা সামনে রেখে সমস্ত কলোনির জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্ব সম্পর্কে একটা সাধারণ সিদ্ধান্তে এল :

"শ্রমিকশ্রেণীর একচ্ছত্র নেতৃত্বের অঙ্গ হল কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ভূমিকা, এবং এই নেতৃত্ব বাদ দিয়ে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব কোনোমতেই চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না…" (ঐ, কলোনি-সংক্রান্ত প্রস্তাব)।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরের অবস্থা প্রমাণ করেছে যে এই ধারণা সব দেশের পক্ষে ঠিক ছিল না। কমিউনিস্ট আন্দোলন তখন তৃতীয় সন্ধিক্ষণে উপস্থিত, মার্শাল প্ল্যান ও ট্রুম্যান নীতির যুগে। ১৯৪৭ সালের শেষদিকে ঝানভ-এর রিপোর্ট আমাদের অনেকেরই মনে আছে। প্রায় ষষ্ঠ কংগ্রেসের ভাষাতেই আবার "ধনতন্ত্রের সাধারণ সংকটের তীব্রতা বৃদ্ধির" কথা বলা হল। পৃথিবী দুই শিবিরে বিভক্ত, এবং আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদ নতুন যুদ্ধের বিপদ সৃষ্টি করছে, এই থেকে সিদ্ধান্ত হল :

"শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে এখন প্রধান বিপদ তার নিজের শক্তি কমিয়ে দেখা এবং সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর শক্তি বাড়িয়ে দেখার ভয়।" (নয় পার্টির সম্মেলনের প্রস্তাব, সেপ্টেম্বর ১৯৪৭)।

পরের জুন মাসে কমিনফর্মের প্রতিষ্ঠা হয়। তখনকার রাজনৈতিক বিশ্লেষণ অনেক দিক দিয়ে ভুল ছিল। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর জটিলতার প্রায় কিছুই বোঝা যায় নি। চীন বিপ্লবের যুগান্তকারী ভূমিকা সত্ত্বেও সশস্ত্র সংগ্রামের ফল সব দেশে এক হয় নি। ব্রিটিশ, ফরাসী বা ডাচ সাম্রাজ্যশক্তির সংকট সত্ত্বেও মালয়, ফিলিপিন্‌স্, বার্মাতে গেরিলা যুদ্ধ সফল হল না; যুদ্ধের পরেও কোরিয়ার আধখানা পরাধীন থেকে গেল; প্রাক্তন ফরাসী ইন্দোচীন এবং ইন্দোনেশিয়াতে যেসব জটিল সমস্যা দেখা গেল তার সমাধান এখনও হয় নি। বোঝা গেল আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের গতিরোধ বা সমাজতন্ত্র গঠনে সব দেশের পক্ষে একটা বাঁধা রাস্তা নেই। অন্যদিকে আবার অনেক দেশ দর-কষাকষি করে স্বাধীন হয়েও গেল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান ভূমিকা

সেখানে ছিল না, শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বও নয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে বরং শ্রমিক-শ্রেণী সামাজিক শক্তি হিসাবে নিতান্তই গৌণ ছিল। জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বে স্বাধীনতার 'চূড়ান্ত লক্ষ্যে' পৌছনো, অনুন্নত দেশগুলির স্বাধীন নিরপেক্ষ ভূমিকা, যুদ্ধোত্তর ধনতন্ত্রের পুনর্গঠন এবং তার সংকটের সম্পূর্ণ নতুন চেহারা, সেই সঙ্গে আবার কলোনিয়াল শোষণের নবরূপ-এর কোনোটার জন্যই কমিউনিস্ট আন্দোলন প্রস্তুত ছিল না।

আন্তর্জাতিক আন্দোলন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। ১৯৩৪ বা ১৯৫০-৫১ সালের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের যথেষ্ট দাম ছিল। সেই সঙ্গে কয়েকটা ভ্রান্ত ধারণাও যে একই জায়গা থেকে এসেছে তাতে সন্দেহ নেই। 'ক্রমবর্ধমান সংকট' থেকে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে বিপ্লবের ফর্মুলা, সশস্ত্র সংগ্রামের আদর্শ (রুশ না চীনা পথে সে তর্ক ১৯৫০ সালের) এবং সংযুক্ত ফ্রণ্ট প্রসঙ্গে সংকীর্ণ গোঁড়ামি—এই তিনটি জিনিস আমরা বাইরে থেকে পেয়েছি। এই মনোভাবকে বাড়িয়ে তোলার মতো অনেক কিছু নিশ্চয় এ দেশের জলবায়ুতেও ছিল। বাংলা দেশে অন্তত গ্রাম-সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত বিপ্লববাদের ধারাটিকে উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু আন্তর্জাতিক প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট ; কেন্দ্রীভূত সংগঠনের আদর্শ, বিপ্লবের একটি মডেল খাড়া করে তার সঙ্গে নিজেদের অভিজ্ঞতা মেলাবার চেষ্টা বোধহয় নিজেদের অজ্ঞাতসারেই সব দেশের কমিউনিস্টদের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল।

অথচ যে-দুটি দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হল তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনেকের কোনো থিসিসের হুবহু মিল নেই, এবং সেখানকার নেতারা অন্ধের মতন মিল খোঁজেন নি। আজ ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে ১৯২৩ সালেও সুখানভের সমালোচনার জবাবে লেনিনকে জোর করে বলতে হয়েছে রাশিয়াতে একটা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবই ঘটেছে, "জার্মান মডেল" বা মার্কসবাদী পাঠ্য-পুস্তকের সঙ্গে পুরো মিল না থাকা সত্ত্বেও। লেনিন লিখেছিলেন, প্রাচ্যের জনবহুল দেশগুলিতে সম্পূর্ণ আলাদা সামাজিক পরিবেশে যখন বিপ্লব হবে তখন অবশ্যই রাশিয়ার সঙ্গেও অনেক প্রভেদ থাকবে, অনেক নতুন বৈশিষ্ট্য দেখা দেবে।

লেনিনের কথা প্রমাণ হল যখন চীনের বিপ্লব অন্য কারুর সম্মতি বা পরামর্শের বিশেষ অপেক্ষা না রেখেই নিজের পথ কেটে নিল। নতুন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার রূপরেখা দেখা গেল মাও সে-তুং-এর 'চীনের নব-গণতন্ত্র'

বা 'চীন বিপ্লব ও চীনের কমিউনিস্ট পার্টির' মতো রচনায়। পার্টির ভিতরে লেখাপড়ার সমস্যা সম্বন্ধে মাও-এর কয়েকটি লেখায় "চীনের চেয়ে গ্রীসের খবর" যারা বেশি জানে সেই সব পরনির্ভর কমরেডদের নিয়ে বেশ উপভোগ্য উপহাস আছে।

আশ্চর্যের বিষয়, চীনের সেই নেতারাই আপাতত অন্য সকলের জন্য 'জনযুদ্ধের' লাইন ঠিক করে দিতে ব্যস্ত। মার্শাল লিন পিয়াও সমস্ত অনুন্নত দেশকে 'গ্রাম' এবং পশ্চিম ইওরোপ ও উত্তর আমেরিকাকে 'শহর' নাম দিয়ে চীনের অনুকরণে 'গ্রাম থেকে শহরে' অভিযান চালাতে পর্যন্ত বলেছেন। বাস্তব অভিজ্ঞতার সমস্ত বৈচিত্র্য উপেক্ষা করে সব দেশের জন্য একটা কাল্পনিক ছক এঁকে দেবার চেষ্টা নিশ্চয় বস্তুবাদী চেতনার খুব ভাল উদাহরণ নয়।

চীনের সঙ্গে আমাদের যথেষ্ট অমিল—সমাজের শ্রেণীবিন্যাসে, রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায়। চীনের ১৯২৭ সালের পর থেকে উগ্র প্রতিক্রিয়া ও সংস্কারবাদী জাতীয় নেতৃত্বের পার্থক্যের প্রশ্নটা খুব বড় ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি সংগতভাবেই ডক্টর সান্‌-এর 'তিন নীতির' উত্তরাধিকারীরূপে দেশের সামনে দাঁড়ায় এবং বিপ্লবের নেতৃত্বে এসে যায়। আর আমাদের দেশে জাতীয় বুর্জোয়া নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ঠিক করাই একটা দুরূহ সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। চীন ছাড়াও, এশিয়া বা আফ্রিকার অনেক দেশ থেকেই আমাদের অবস্থা আলাদা। জাতীয় গণতন্ত্রের একটা সোজা লাইন সর্বত্র একভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। কোনো কোনো সদ্যস্বাধীন দেশে খানিকটা বামপন্থী সামরিক শাসন দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতির ক্ষেত্রে কিছু নতুন পরীক্ষা চলছে। ভারতের পশ্চিমী মডেলের উদারপন্থী পার্লামেণ্টারি রাষ্ট্রে 'পেটিবুর্জোয়া গণতন্ত্রের' প্রভাব অনুপস্থিত; অনেক দেশের তুলনায় এখানে ধনিক-শ্রমিক দুই শ্রেণীই বেশি পরিণত; এখনও অংশত ফিউডাল সমাজের সব সমস্যার সঙ্গে নিতান্ত আধুনিক দুর্নীতি এবং মাথাভারি প্রশাসনের জটিলতা মিশে গেছে। আরও যেসব সমস্যা আছে অন্য দেশের দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদের বোঝা যাবে না।

জাতীয় সংগ্রামে আন্তর্জাতিক থিসিস গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিয়েছে, এ কথা সহজেই বোঝা যায়। কিন্তু 'শ্রেণী বনাম শ্রেণী' এবং 'সোশাল-ফাশিজ্‌ম্‌' স্লোগানে শিক্ষিত আন্দোলনের প্রভাব কি আজও থেকে যায় নি? ইওরোপীয় সোশাল ডেমক্রেসির সমস্যা এখানে না থাকলেও জনসমর্থনে অভ্যস্ত একটি বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠান ছিল, তার একটা সামাজিক অর্থনৈতিক

প্রোগ্রাম ছিল, এবং সে কর্মসূচী জনসাধারণের পক্ষে অর্থহীন নয়। Whither India-র যুগ এবং লক্ষ্ণৌ-ফয়েজপুর থেকে আবাদি-ভুবনেশ্বর অবধি এক ধরনের সমাজচিন্তার বিকাশ, সারা দেশে তার প্রভাব, আমাদের পশ্চিম ইওরোপে সোশাল ডেমক্রেসির প্রতিপত্তির কথা মনে করিয়ে দেয়। সাম্রাজ্যবাদের রথচক্রে বাঁধা পুলিস রাষ্ট্রের ছবিটা ১৯৫১ সালেই ভুল ছিল। জনসমর্থনের দিক দিয়ে কংগ্রেসের আজও কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই, এবং স্বভাবতই শ্রমিক কৃষক সেই জনসমষ্টি থেকে বাদ পড়ে না। ভারতীয় জনসাধারণ অচেতন জড়পদার্থ বা দাহ্যবস্তু নয়। জনচিত্তে সংস্কারবাদী সমাজচেতনা অনেকটা জায়গা নিয়ে আছে। এই চেতনাকে বুঝে তার চরিত্র বদলে দেবার কাজটা খুব সোজা নয়। কিন্তু আর কোনো পথ আজ ভারতের বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে খোলা আছে? একমাত্র অবাস্তব, ধোঁয়াটে চিন্তা, আর ডিমিট্রভের ভাষায় আন্দোলনের জটিল সমস্যাগুলিকে লাফ মেরে ডিঙিয়ে যাবার চেষ্টা :

"Sectarianism finds expression particularly in overestimating the revolutionization of the masses, in overestimating the speed at which they are abandoning the positions of reformism, and in attempting to leap over difficult stages and the complicated tastes of the movement" (৭ম কংগ্রেসের অভিভাষণ)।

রাজনীতিতে দুই মেরুর তত্ত্ব (polarisation) কিছু নতুন নয়, কিন্তু উগ্র প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রগতির শক্তি সমাবেশ সম্ভব না হলে সে কথা ভেবে লাভ কি? মধ্যপন্থার সমস্যাকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে সাদাসিধে কংগ্রেস-বিরোধী লাইন ধরে চলার বিপদ আমাদের জানা। যুক্তফ্রণ্ট মানে সেখানে কয়েকটি বামপন্থী দলের সাময়িক মিলনের বেশি কিছু নয়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে উগ্র দক্ষিণ-পন্থার সমর্থন, এমনকি ধর্ম ও জাতিবিদ্বেষের সতর্ক ব্যবহারও কৌশল হিসাবে স্বীকৃত। তার উপর এই ধারণাও এসে যায় যে শ্রেণী-শত্রুর শিবিরে কোনো অন্তর্দ্বন্দ্ব নেই, আর থাকলেও উগ্র দক্ষিণপন্থীরাই মোটের উপর ভাল, যেহেতু তাদের 'মুখোশ' নেই। সেইজন্যই বোধহয় গত নির্বাচনে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট নেতৃত্ব অতুল্যবাবু যে ক-জনকে শত্রু মনে করেন তাঁদের সবাইকে হারাবার জন্য অত ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

শ্রমিক-আন্দোলনে কার্যক্ষেত্রের ঐক্যের চেষ্টা বাদ দিয়েই সংস্কারপন্থী মতবাদকে আক্রমণ করা এই অবস্থায় স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৩০ সালের

মস্কো বিবৃতিতে সোশাল-ডেমক্রাটিক শ্রমিকদের কী অর্থে কমিউনিস্টদের "class-brothers" বলা হয়েছে তা-ও নিশ্চয় অনেকের কাছে স্পষ্ট নয়। অনেক সৎ কর্মী যে এখন নিজেদের হাতে-গড়া সংগঠনে পর্যন্ত ফাটল ধরাতে দ্বিধা করছেন না, তার কারণ কি এই নয় যে তথাকথিত 'সুবিধাবাদীদের' সম্পর্কে একটা কথাই এতদিন ধরে শেখানো হয়েছে? অথচ সরকারী নীতি ক্রমশ ডানদিকে সরতে থাকলে একমাত্র জাতীয় ঐক্যের অস্ত্র দিয়েই তাকে রোখা সম্ভব। প্রতিক্রিয়ার উন্মত্ত অভিযানের দিনে সমস্ত 'সংস্কারপন্থীর' সংশ্রব বাঁচিয়ে বিপ্লবী শুদ্ধতা রক্ষা করতে গেলে ভারতে জার্মান ট্র্যাজেডি আবার দেখা দেবে—অবশ্যই প্রহসনরূপে, কেন না ফাশিজম্-এর পকেট সংস্করণই এদেশে সম্ভব, আর এখানকার উগ্র বিপ্লববাদীরাও ঠিক আসল জিনিস নয়।

স্বাধীনতার পরে কমিউনিস্ট পার্টির সশস্ত্র বিদ্রোহের চেষ্টায় উগ্র বামপন্থার একটা চরম ও প্রায় ক্লাসিক রূপ দেখা যায়। দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতে যুদ্ধোত্তর আন্তর্জাতিক লাইনের সঙ্গে তার সংগতি ছিল। উত্তর পঞ্চাশের বামপন্থী গোঁড়ামি একেবারে অন্য ব্যাপার। পার্লামেণ্টারি রাজনীতির চার কোণের ভিতরেই তার জন্ম ও বৃদ্ধি; সময়বিশেষে কিছু গোলমেলে কৌশল ছাড়া অন্য কোনোরকম বিপ্লব প্রচেষ্টার প্রশ্নই সেখানে ছিল না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যাই বলুন, বাম কমিউনিস্টরা এখন হঠাৎ "গেরিলা যুদ্ধে" নেমে পড়লে এতদিনের আন্দোলনের ভিতরের লজিক মিথ্যা হয়ে যাবে। এই আন্দোলনের গোড়ার কথা বিপ্লব নয়, বিক্ষোভ। বিক্ষোভের রাজনীতিকে বর্তমান ব্যবস্থার ভিতরে খাপ খাইয়ে নেওয়া শাসকশ্রেণীর পক্ষে খুব শক্ত নয়। অভ্যস্ত রীতিতে কখনও ছোটখাট দাবি মেনে নিয়ে, কখনও গায়ের জোর খাটিয়ে, যে-কোনো সমস্যার একটা সাময়িক বুর্জোয়া সমাধান বার করা সম্ভব। এইখানেই সমাজবাদী আন্দোলনের দায়িত্বের প্রশ্ন আসে।

বিক্ষোভের রাজনীতিকে যতদূর নিয়ে যাওয়া সম্ভব আমরা তা করেছি এবং একটা বৃত্তের ভিতরে ঘুরছি বললে ভুল হয় না! সেখান থেকে সমাজতন্ত্রের রাজনীতির স্তরে উত্তরণ এখনও বাকি। লক্ষাধিক লোকের সভা, পুলিশ-জনতা সংঘর্ষ, নির্বাচনে কিছু চোখ-ধাঁধানো সাফল্যে ভবিষ্যতেও বার বার ফিরে আসা যাবে, কারণ জনতার প্রতিবাদ এইভাবেই প্রকাশ পায়। কিন্তু স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদ বা ছাড়া-ছাড়া কয়েকটি ক্যাম্পেন দিয়ে রাষ্ট্রে বা সমাজে এমন কোনো বিশেষ পরিবর্তন আসবে না যাকে আমরা নামের গৌরব দিতে পারি।

বিপ্লবের আসল কথা আমরা জানি 'ক্ষমতার প্রশ্ন'। সে বিষয়ে একটা সোজা হিসাবও বরাবরই আছে: আংশিক সংকট থেকে সাধারণ সংকট এবং অবশেষে একদিন রাষ্ট্রযন্ত্র দখল। কেউ বাস্তবিক মনে করে না যে এই অর্থে বিপ্লবের পরিস্থিতি ভারতে এখন আছে বা খুব তাড়াতাড়ি আসছে। কিন্তু সে কথা স্বীকার করতে খানিকটা সাহসের দরকার। বিপ্লবের সংজ্ঞা ঘনায়মান সংকট আর ক্ষমতা দখলের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গেছে যে এইসব ধারণা হঠাৎ ছেড়ে দেওয়া শক্ত। ভারতের সীমাবদ্ধ ধনবাদী বিকাশের সব ক্ষেত্রে ব্যর্থতা, বিপর্যয়ের একটা ছবি এঁকে ফেলা অনেক সহজ। কিন্তু এই ছবি ঠিক বিপ্লবের মানচিত্রের কাজ দেবে না। অভাব-অনটন থেকে প্রতিবাদের নানা রূপ দেখা গেলেও সাধারণ সংকট না আসতেও পারে। সমাজের কোনো কোনো স্তরে আপেক্ষিক উন্নতি অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়, কারণ তার ফলে আন্দোলনের নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ-সুবিধার ফলে চাহিদা বেড়েছে বলেই বিক্ষোভও বাড়ছে।

আমরা অবশ্য চরম দারিদ্র্যকেই বিপ্লবের একমাত্র শর্ত মনে করতে অভ্যস্ত। উন্নতির কথাটা মানতে হলে অনেকে অসহায় বোধ করবেন, যেহেতু তাঁদের ধারণা অবস্থা একটু ভাল হলেই সমাজবিপ্লব পিছিয়ে যেতে বাধ্য। অর্থাৎ বুর্জোয়া বিকাশের ছিটেফোঁটা দাক্ষিণ্যে যদি শ্রমিকের কিছু রোজগার বাড়ে, গ্রামে সামান্য উন্নতি দেখা যায়, ছাত্র-মধ্যবিত্তের কর্মসংস্থান বা অন্য সুযোগ খানিকটাও বাড়ে, তাহলেই সমাজতন্ত্রের পথ বন্ধ হবে, শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা কমবে। এটা নিতান্তই সংশোধনবাদী যুক্তি, আর পরাজয়ের যুক্তি তো বটেই। কেনেডি প্রমুখ 'উদার সাম্রাজ্যবাদী' নেতাদের বক্তব্যের একরকম প্রতিধ্বনি বললেও ভুল হয় না।

এর থেকে একটা মারাত্মক বিপরীত সিদ্ধান্তেও আসা যায়। উন্নতি হলেই যদি বিপ্লব পিছিয়ে যায় তবে চরম দুর্গতিই বাঞ্ছনীয়। আর্থিক বিপর্যয়, গণতন্ত্রের অবসান, সরকারী নীতিতে আমেরিকান প্রভুত্ব, সব কিছুতেই জনগণের মোহ ভাঙবে, বিপ্লবের সুবিধা হবে। মতাদর্শের দিক দিয়ে একেবারে রিক্ত হয়ে পড়লেই এইরকম কথা ভাবা সম্ভব।

আমরা হয়তো প্রকাশ্যে এসব কথা বলি না, কিন্তু বিপ্লবের পরিচিত ছবিটা চোখের সামনে না থাকলেই বিপন্ন বোধ করি। অন্য অবস্থায় কী ভাবে চলব সে বিষয়ে কোনো পরিষ্কার ধারণা আমাদের নেই। আন্দোলনের চরিত্র সম্পর্কে

তখন নানা প্রশ্ন ওঠে। ধারাবাহিক বা গঠনাত্মক কাজের অনুত্তেজিত 'অবিপ্লবী' ফর্মে সকলের বিশ্বাস নেই। কিন্তু সরকারকে 'গদি ছাড়ো' ইত্যাদি বলাও তো বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অঙ্গ, তার মধ্যে বিপ্লব কোথায়? প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা আর বিকল্প জাতীয় নেতৃত্বের দায়িত্ব এক নয়। বিক্ষোভ প্রদর্শনের কয়েকটি বাঁধা-ধরা উপায় দিয়ে যে সংগ্রামের শুরু আর শেষ তার সঙ্গে সমাজবাদের কিছু ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। মাঝে মাঝে এই সংগ্রামকে 'উচ্চতর স্তরে' উঠিয়েছে পুলিশের আক্রমণ, জননেতাদের কোনো পরিকল্পনা নয়। সশস্ত্র বা 'হিংসাত্মক' সংগ্রাম একটা টেকনিক মাত্র। সংগ্রাম তখনই উচ্চতর স্তরে ওঠে যখন তাকে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়ে যাবার মতো সাংগঠনিক নেতৃত্ব থাকে। লক্ষ্যের চেয়ে টেকনিক বড় নয়। লেনিন যখন লিখেছিলেন বিপ্লবী পার্টিকে সংস্কারবাদী কাজের ধরনও ("reformist action") আয়ত্ত করতে হবে তখন তিনি নিশ্চয় বলতে চান নি যে বিপ্লবীরা সব সুবিধাবাদী হয়ে যাক। কংগ্রেস বিপ্লবী না হয়েও জনসাধারণের কাছে পৌঁছবার কৌশলগুলিকে সর্বদা ব্যবহার করে। সমবায় সমিতি থেকে শুরু করে নানারকম সংগঠনে, এমনকি বাস্তুহারা বা ছাত্র সমাজে বামপন্থীদের সুপরিচিত ঘাঁটিগুলিতেও শাসকদলের তৎপরতা আমরা দেখছি।

আন্দোলনের ফর্ম দিয়ে তার চরিত্র ঠিক হয় না। প্রশ্ন হল, আজকের সীমাবদ্ধ দাবির লড়াই কি সামাজিক রূপান্তরের কোনো বৃহত্তর পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত হবে, না সরকারী নীতির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রতিবাদের পর্যায়েই থেকে যাবে? প্রতিবাদ ভাল, কিন্তু বাস্তব অবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনতে পারা আরও ভাল। দমদমের বাজারে ক্রেতাদের সংযত উদ্যোগ সীমাবদ্ধ ও স্বতস্ফূর্ত হলেও ১৯৫৯-এর খাদ্য-সংগ্রামের চেয়ে তার রাজনৈতিক মূল্য কম ছিল না। প্ল্যানিং থেকে প্রশাসন, খাদ্যনীতি থেকে জাতিগঠন অবধি প্রতিক্ষেত্রে স্থিত স্বার্থের সঙ্গে জনস্বার্থের সংঘাতে যদি সংগঠিত জনশক্তির হস্তক্ষেপে নতুন কর্মনীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় তাহলে সমাজে শ্রেণীশক্তির ব্যালান্স বদলে যাবে। আজকের অবস্থায় এই ভাবেই আমাদের প্রাত্যহিক সংগ্রাম 'ক্ষমতার প্রশ্নের' সঙ্গে মিলে যেতে পারে। না হলে যতই উত্তেজিত হই, যতই বিপ্লবের কথা বলি, আংশিক সংগ্রাম চিরকাল 'অর্থনীতিবাদের' (economism) স্তরেই আটকে থাকতে বাধ্য। বছরে এক-আধবার শহরে অচলাবস্থা, বিধানসভায় বিক্ষোভ এবং পুলিশের তাণ্ডব যদি আমাদের শ্রেণী-সংগ্রামের শেষ কথা

হয় তবে বিপ্লবের ফুল শেষ পর্যন্ত মনের আকাশেই ফুটবে আর মিলিয়ে যাবে।

বিপ্লবের প্রচলিত ধারণা আঁকড়ে ধরে 'এই অবস্থায় কিছুই সম্ভব নয়' বলে ক্ষমতাদখলের অপেক্ষায় থাকা হল রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার ছদ্মবেশ। এই জায়গায় পৌঁছে গেলে মনে করা স্বাভাবিক যে জনসাধারণ দুর্বল, রাজনৈতিক কর্মীরা সুবিধাবাদী, সরকার প্রায় ফাশিস্ট এবং বিপ্লব না হওয়ার জন্য সকলেই দায়ী। 'নাউ' পত্রিকার লেখকের মতন বাম কমিউনিস্টরাও মাঝে মাঝে এক নিঃশ্বাসে দু-রকম কথা বলতে বাধ্য হচ্ছেন। ৩০শে জানুয়ারির জনসভার আগে দক্ষিণ কলকাতার শহরতলিতে পোস্টার দেখা গেল: 'আপনার সংগ্রাম-বিমুখতা, নির্লিপ্ততা ও উদাসীনতা অত্যাচারকে দীর্ঘায়িত করছে।' কমিউনিস্টদের পক্ষে জনসাধারণকে এই ভাষায় সম্বোধন করা এক অভিনব ব্যাপার। কাছাকাছি আর-একটি পোস্টার: 'আর প্রতিবাদ নয়, চাই প্রতিরোধ।' জনসাধারণ নির্লিপ্ত, কিন্তু প্রতিরোধ চাই। স্বভাবতই সে ক্ষেত্রে তাদের বাদ দিয়েই 'প্রতিরোধ' করতে হবে। কাজে যাই হোক, চিন্তা এখানে নৈরাজ্যবাদের দিকে চলে যাচ্ছে। অসহিষ্ণু মধ্যবিত্ত মনের এই নৈরাজ্যবাদ আসলে অর্থনীতিবাদেরই উল্টো পিঠ। এই অর্থেই ১৯০২ সালে বামপন্থী এস. আর. ('সমাজবাদী-বিপ্লবী') দলের বিষয়ে লেনিন লিখেছিলেন: "The present-day terrorists are 'economists' turned inside out।" সন্ত্রাসবাদী বাম এস. আর.-পন্থীদের বিপ্লবের কর্মসূচী থেকে শ্রমিকদের সংগ্রামের জন্য সংগঠিত করার 'সামান্য' কাজটুকু বাদ পড়েছিল। কিন্তু বুদ্ধিজীবী বিপ্লববাদীর ক্লান্তি আর স্নায়বিক উত্তেজনার সংমিশ্রণে কতদূর আর যাওয়া সম্ভব?

"Demonstrations begin—and blood-thirsty words, talk about the beginning of the end flow from the lips of such people. The demonstration halt—and before they have had time to wear out a pair of boots they are already shouting: 'The people, alas, are still a long way off..." ('Revolutionary Adventurism', Lenin. collected works, Vol. 6)

লেনিনের বর্ণনা যেন আমাদের জীবনে ফলে না যায়, সেটুকু দেখার দায়িত্ব প্রত্যেক সমাজবাদীর।

লোকনাথ ভট্টাচার্য

সাহিত্যের শুকনো ভূমিখণ্ড

'সেনাপতি, ধ্বংসস্তূপ পরিখার আড়ালে এখনো যদি ভাঙাচোরা কোনো কামান তোমার অবশিষ্ট থাকে, আমাদের তুমি বোমা মেরে উড়িয়ে দাও এই শুকনো ভূমিখণ্ডের উপর। বোমাটাকে দাও ফাটিয়ে চমৎকার দোকানের কাচের জানলায়, বৈঠকখানায়—শহরকে ভক্ষণ করাও তাদের ভস্মশেষ। মানুষমুখো নালীতে ভরুক আর্দ্রতার সবুজ কলঙ্ক। জ্বলন্ত মণির গুঁড়োয় ভরে দাও নিভৃত বেশগৃহ।

দংশ আসুক সরাই-এর পেছনে প্রস্রাবখানার গন্ধে মাতাল হয়ে, মূত্রবৃদ্ধি-কারক গুল্ম-উদ্ভিদের প্রেমিক সে—একটু রশ্মি ছিটিয়ে দিয়ে যাক।'

যে-অভীপ্সা অনেকখানি আজকের সাহিত্যের, বা সাহিত্যিক জীবনের ও চিন্তার, তার এই ভূমিকা র‍্যাঁবো লিখে গিয়েছিলেন প্রায় একশো বছর আগে। 'মূত্রবৃদ্ধিকারক' উন্মাদনার প্রীতির পথে এই ক'বছর ধরে সাহিত্য এগিয়ে এসেছে আরো বেশ কয়েক ক্রোশ, তাই আজকের কবি সরাসরি বুক ফুলিয়ে কাব্যচর্চা করতে পারেন এই লিখে: 'আমি তোমার মুখে প্রস্রাব করে দিই।'

প্রস্রাবটা অবশ্য কথার কথা, আজকের সাহিত্যের সবটাই তা নয়, অন্তত এখনো নয়—তবে ঐ 'শুকনো ভূমিখণ্ডটা' এক আধ্যাত্মিক অর্থে হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় সকল সাহিত্যিক তীর্থযাত্রার একমাত্র গন্তব্যস্থান। এক মরুভূমির আবহমান আহ্বান, ও সেই ধ্বনিতে ধ্বনিত হতেই হবে সাহিত্যিক অভিনিবেশের সমস্ত মুহূর্তকে, এমন একখানা ভাব। পাশ্চাত্ত্যের এক ঔপন্যাসিক তাঁর কোনো-একটি চরিত্রের মুখ দিয়ে এই মুখ্য প্রসঙ্গটির অবতারণা করছেন স্পষ্টবাদীর ভাষায়: 'আমার মাথার মধ্যে কি আছে জানতে চাস? একটা মরুভূমি। আমাদের সকলের মাথার ভিতরটা জুড়ে রয়েছে সেই মরুভূমি। দেখেছিস আমার বাবাকে, মাকে? জানিস কী করে তাঁরা তাঁদের সেই মরুভূমির শূন্যতাটা ভরছেন? টেলিভিশনের পর্দার উপর পলকহীন চোখ রেখে।'

অতএব দাও পাঠিয়ে আমাদের সব্বাইকে সেই মরুভূমিতে, মরুভূমিটা ফেটে চৌচির হয়ে যাক, আমরা ফেটে চৌচির হয়ে যাই, এবং আমাদের সকলের ফেটে যাওয়ার কানে-তালা-ধরা শব্দে যে অভিনব সংগীত উঠবে আশপাশের আকাশে-বাতাসে, তাই ধরতে প্রলুব্ধ হোক আমাদের সাহিত্য। এ-প্রসঙ্গে র‍্যাঁবোকে টানার অর্থপূর্ণতাটা হয়তো কম, কারণ র‍্যাঁবোর বক্তব্যের অনুরণন ও আজকের আদিগন্ত নৈরাশ্য-ঝংকারের মধ্যে সম্পর্কের সূত্রটা ক্ষীণ মনে হতে পারে। তবু দৃষ্টির গভীরে কোথায় যেন র‍্যাঁবোর যুগের ও আজকের এই দুটি আপাত-বিভিন্ন আত্মিক বিক্ষোভের একটি পারস্পরিক সম্বন্ধের সুর চিহ্নিত। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ব্যক্তিক বা সামাজিক জীবনে যে বড় বড় আদর্শ নমস্য হয়ে এসেছে অবিসংবাদিতভাবে ও যা ছিল সাহিত্যের মুখ্য উপজীব্য, তাতে যেন রাতারাতি কুলোর বাতাস লাগতে আরম্ভ করল। সে-বাতাসের প্রথম স্পষ্ট অনুভব লক্ষিত হয় হয়তো বোদলেয়ারের 'পাপের ফুলের' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। পাপের ফুলের প্রথম সংস্করণ পারীর বইয়ের দোকানে পৌঁছোয় ১৮৫৭-এর ২০শে জুন, এবং র‍্যাঁবো জন্মান ১৮৫৪-এর ২০শে অক্টোবর। বোদলেয়ারের পাপবোধের আলোকে শুধু উদ্বুদ্ধই হলেন না র‍্যাঁবো, বোদলেয়ারকে তিনি সসম্মানে অভিহিত করলেন দেশ-দেশান্ত-যুগ-যুগান্তের কবিসমাজের প্রথম দ্রষ্টা বলে। যে-উন্নাসিক নীতিবাদীরা র‍্যাঁবোকে খর্ব করতে চান, তাঁদের পক্ষে এ কথা বলা সোজা যে র‍্যাঁবোর মধ্য দিয়েই আধ্যাত্মিক পাপ সাহিত্যে একটি আধুনিক যুগোপযোগী স্বীকৃতি পেল প্রথম। কারণ যে-পাপবোধের সূত্রপাত বোদলেয়ারে, তাকে র‍্যাঁবোর উচ্চকণ্ঠে ঘোষিত নমস্কার (এবং সেই পাপবোধের রক্তরাগে রঞ্জিত র‍্যাঁবোর নিজেরও ব্যক্তিগত ও সাহিত্যিক জীবন) আর পাঁচজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সহায়তা করল। আমার এই বর্তমান প্রচেষ্টায় অবশ্য কোনো প্রশ্নই নেই র‍্যাঁবোকে খর্ব করার, তবু মানবই যে চিরাচরিতের আদর্শানুগ সাহিত্যের প্রান্তরে হঠাৎ খোয়াই-ভূমি দেখা দিতে সুরু করল যখন থেকে, তখনকার ইতিহাসে র‍্যাঁবো একটি উল্লেখযোগ্য নাম। আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এই সাহিত্যিক খোয়াই-এর সমস্ত আলোচনার প্রারম্ভে র‍্যাঁবোকে স্মরণ করা তাই অপ্রাসঙ্গিক নয়।

কিন্তু সেই যে প্রথম কুলোর বাতাসের সূত্রপাত, আজ তা টাইফুনে পরিণত হয়েছে। সামাজিক সমস্ত আদর্শের কাছে যা বহুকাল পর্যন্ত ছিল ট্যাবু,

আজ এক অর্থে তাই প্রধান বিষয়বস্তু সাহিত্যের। মূত্রবৃদ্ধিকারক উন্মাদনা বা মাথা-ভর্তি মরুভূমি তার দুটি মাত্র দৃষ্টান্ত। যাঁদের আমরা সাধারণত সেকেলে বলে থাকি, তাঁরা বলবেন আজকের সাহিত্য পড়তে যাওয়া মানেই অলক্ষিতে ক্রমাগতই চপেটাঘাত খাওয়া। এ-সাহিত্য কতখানি ভালো বা কতখানি মন্দ, সে আবার এক ভয়ংকর প্রশ্ন, ও তার আলোচনার যোগ্যতা হয়তো আমাদের সমসাময়িকদের কারুরই নেই, কারণ মানুষমাত্রেই যেহেতু একটি বিশিষ্ট সময়ের ও সমাজের জীব, যুগধর্ম হতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে নিজেকে বা নিজের কোনো প্রচেষ্টাকে দেখা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ ভালো-মন্দের যাচাই করতে যাওয়া মানেই নিরপেক্ষ হতে চাওয়া, কিন্তু এত বড় আহাম্মক কে এই পৃথিবীতে যে নিজেকে নিরপেক্ষ বলতে চাইবে ?

না, ভালো-মন্দের কোনো যাচাই নয়, যে-সাহিত্যিক খোয়াই-ভূমির অবতারণা করলাম, তাকে নমস্কার করা নয় বা গালাগালি দেওয়া নয়, শুধু তার উপস্থিতির ঘটনাটাকে সত্য হিসেবে মেনে নেওয়া এবং তার কতকগুলি সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণের আলোচনা করা, তা সম্ভব হতে পারে। তবে সে-খোয়াই ইতিমধ্যেই এত বিস্তৃত ও এত বহুধা বিচিত্র যে একটি ছোট নিবন্ধের পরিসরে তার কোনো সামগ্রিক বিশ্লেষণের প্রস্তাব হবে অকল্পনীয় ধৃষ্টতা, এবং সেরকম কোনো যোগ্যতা বা জ্ঞানও আমার নেই। যা এখানে করতে পারি, ও করতে চাই, তা সেই খোয়াই-এর দুটি-একটি দিকের দুয়েকটি ইঙ্গিত অল্প কয়েকটি কথায় দেওয়া। বর্তমান আলোচনার প্রয়াসের মধ্যে আনছি আজকের সাহিত্যের এই কয়েকটি প্রসঙ্গ : অদ্ভুত বা 'অ্যাবসার্ড'-এর অবতারণা সাহিত্যে ; সাহিত্যিক দর্শনের ক্ষেত্রে এক নির্বিশেষ ও সংক্রামক অরাজকতার ভাব ; প্রতি-উপন্যাস (ফরাসীতে যা 'আঁতিরোমাঁ' ও ইংরেজিতে 'অ্যান্টি-নভেল') ও প্রতি-নাটকের (বা 'অ্যান্টি থিয়েটার') কয়েকটি মুখ্য ধ্যান-ধারণা।

আমাদের দেশীয় সাহিত্য অবশ্য অন্য ধরনের এক অর্থহীনতায় পর্যবসিত, পাশ্চাত্ত্যের সাহিত্যিক ক্রিয়াকলাপের মতো তা এখনো ততটা বুদ্ধিজীবী হয়ে ওঠে নি—তার অরাজকতা ততটা বুদ্ধির নয়, বা দুরারোগ্য কোনো মানসিক ব্যাধির নয়, যতটা থোড়-বড়ি-খাড়া-খাড়া-বড়ি-থোড় এক বালখিল্য বিচর্চিকার। তবু অবিসংবাদিত কারণে যেহেতু পাশ্চাত্ত্যের অনেক কিছুরই অনুপ্রবেশ ঘটছে ধীরে ধীরে আমাদের ব্যক্তিক বা সাহিত্যিক বা সামাজিক সত্তায়,

উক্ত প্রসঙ্গগুলির আলোচনা হয়তো আমাদের পক্ষেও সময়োপযোগী ঠেকতে পারে।

ভালো সাহিত্য আর লেখা হচ্ছে না, এ-খেদ শুধু আমাদের দেশেরই নয়, সর্বত্র। ফ্রান্সের মতো দেশেও—যেখানকার সাহিত্য-প্রতিভার সূর্য নতুন নতুন চিন্তা ও অভিব্যক্তির অভিমুখে দেশ-দেশান্তের প্রয়াসকে এতদিন করে এসেছে এক আলোকিত চেতনায় প্রকাশাকুল, সেখানেও শুনতে পাই বলবার মতো কোনো সাহিত্যসৃষ্টি বহুকাল হয় নি, গত মহাযুদ্ধের শেষ থেকে সেদেশে নাকি এমন একটি বইও আজ পর্যন্ত বেরোতে পারে নি যাকে মহান আখ্যা দেওয়া চলে। এক প্রখ্যাত ফরাসী সমালোচক প্রশ্ন করছেন, মহান বই বেরোবে কোত্থেকে, কোনো পাঠক চেয়েছে সেরকম বই? এক্ষেত্রেও, যেমন অন্যান্য সব ক্ষেত্রেই, যা পাওয়া যায়, তাকে চাওয়া হয়েছে। অর্থহীন নিঃসাড় পাঠকের রাজ্যে যে-সাহিত্য রচিত হয়, তাও সমানই অর্থহীন ও নিঃসাড়।

এই গত মহাযুদ্ধোত্তর নিঃসাড়তার প্রসঙ্গে ফরাসী ঔপন্যাসিক পল ভান ডেন বশ বলছেন: "আমরা এমন এক যুদ্ধের উচ্ছিষ্ট, অবশিষ্ট ফল, যাকে আমরা তৈরি করি নি। যুদ্ধে চলল যে-মানুষ, তাও আমরা যেমন হলাম না, তেমনি অন্যায়-অত্যাচারের কবলের মধ্যেও মূলত মানুষ থাকার জন্যে যে-যুদ্ধের প্রয়োজন, সে-যুদ্ধও আমাদের করতে হোল না। এই পৃথিবীর বুকে আমরা শিশু হয়ে জন্মালাম টুঁ শব্দটি না করে, না কেঁদে, কিন্তু যেহেতু আমাদের সেই প্রথম চোখ খুলল সেদিন এমন এক জগতে যার কোনো বিষয়ে কোনো আগ্রহ বা আসক্তি আর নেই, আমরাও তাই অন্য যে-কোনো কারুর চেয়েও নিঃসাড় চেতনার শিশু সব, আমরা অদ্ভুত, 'অ্যাবসার্ড।' এই তো গতকালও, উদ্বুদ্ধ কোনো যুবকের অন্য উপায় ছিল, সে ছুটতে পারত স্পেনে শহীদ হতে, বা ন্যায়ের পক্ষ নিয়ে যেতে পারত অন্য কোনো সমরাঙ্গনে—আমরা কোথায় যাব? যুদ্ধশেষের কালে যাদের বয়স ছিল পঁচিশ বা তিরিশ, তারা তখনি খানিকটা সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে তাদের জীবনে। তারা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদেরই সমষ্টিগত কর্মের ফল। আমরা সমষ্টি শুধু আমাদের আন্তরিক রিক্ততার ও গ্লানির। আমাদের অনেকের পক্ষেই আদর্শ বলে বস্তুটা আর কোনো সুন্দর স্মৃতির বিষয় পর্যন্ত নয়। আমাদের চামড়াটাও যেন কঠিন হয়ে গেছে। যেন কেমন ঠাণ্ডা আমরা, কেমন একটা সুদূর-সুদূর ভাব আমাদের, আমরা মূক, বয়স না হতেই বুড়িয়ে গিয়েছি। কেউ কেউ

অবশ্য এই আমাদের মধ্যেও খুঁজে পেয়েছেন এক আকুল আহ্বানের ধ্বনি। সত্যি যা, তা হয়তো আমাদের মধ্যেও আছে এক রক্ত-ঝরা ক্ষত, যা স্নান করাচ্ছে আমাদের জীবনকে ও একই সঙ্গে সাবধান করছে আমাদের এই বলে: "তোমাদের ভিতরকার প্রস্রবণটিকে শুকিয়ে ফেলো না।"

গত মহাযুদ্ধ চলতে থাকার কালে যারা তখনো ইউরোপে যুবক হয়ে উঠতে পারে নি—যারা হয় কিশোর ছিল তখন, অথবা সবে জন্মেছে, কিংবা জন্মেছে যুদ্ধশেষের পরে—এ তাদের উক্তি। এবং বুক-জোড়া যে-নিরর্থকতার ভাব হতে অদ্ভুত বা 'অ্যাবসার্ড' সাহিত্যের উদ্ভব, এ-উক্তিতে সেই ভাবেরই দ্যোতনা। এই যুগের লেখকদের শৈশব ছিল এক ধূসর প্রান্তর, তাঁদের কৈশোরও ধূসর, যৌবনও ধূসর। না কোনো মরণজয়ী আশা, না কোনো আকুল হতাশা—এঁরা কিছুই পেলেন না। এ-বয়সেরই আরেক সাহিত্যিককে বলতে শুনি তাই: "আমাদের ঘোরা-ফেরা দুটি বিন্দুর মধ্যে—একদিকে রয়েছে একটি অতীত যার কথা মনে করলে ঘৃণায় শিরশির করে উঠি, অন্যদিকে এমন একটি ভবিষ্যৎ যা ভয়ে কাঁপায়। কী করে আমরা শান্ত হই, কী করে নিজেদের স্থির করি, একটি অর্থপূর্ণ সংগতি দিই।"

যে-প্রেম জীবনকে অর্থ দেয়, ধরে রাখে, সে-প্রেমও তাই এই যুগের লেখকদের অনেককে কেবল এক ভিজে গামছার অনুভূতি দেয়, তা এঁদের কাছে ঠেকে বর্ণহীন, প্রেরণাহীন, ফ্যাকাশে ("লজ্জায় কুঁকড়ে দিতে পারি ঐ মিথ্যাভাষী দম্পতীদের," র‍্যাঁবোও লিখেছিলেন এক শতাব্দী আগে এ-যুগের মুখবন্ধ হিসাবে)। আজকের এই সাহিত্য যা করতে চাইছে, তা মানুষের সামগ্রিক সত্তা সম্বন্ধেই কয়েকটি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রশ্ন তোলা। আর কি কোনো সংগতি বা অর্থ আছে মানুষের, তাকে বেঁধে রাখার মতো কোনো ঐক্যের বন্ধন কি কোথাও আর আবিষ্কার করার আছে, আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের একটা মুখ্য জিজ্ঞাস্য তাই। এবং ঐ 'আধুনিক' কথাটারও যেন অর্থ হারিয়েছে। ইতিহাসের ঋতু-পরিবর্তনের রীতি ধরে আর পৃথিবী এগোচ্ছে না, যুগের চলা যেন হঠাৎ থমকে এসে দাঁড়িয়েছে এক নির্বিকার, নিঃসাড়, নিশ্চল, নিরুৎসুক ও নিরুৎসাহ সময়ে, যার একমাত্র নামকরণ সম্ভব শুধু একটি কথায়: যুদ্ধোত্তর। কোন আধুনিকের চেতনায় তবে অনুপ্রেরিত হতে চাইবে আজকের লোকে, নিরন্তরের আজ বলে বস্তুটাকে সময়ের যে-গতি কেবলি আধুনিক আখ্যা দেয়, সে গতিটাই যখন থেমে গেছে? তাই এই ভাঙনের নেশা এতদিনের চিরাচরিত

আদর্শের, ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনের সমস্ত শৃঙ্খলার, সাহিত্যে তাই এই উন্মাদ ও উদ্ধত চর্চা লিবিডোর আর প্রস্রাবের, কেবলি বেপরোয়া দৈহিক সঙ্গমের ও তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনার, প্রেমের অরাজকতার ও নঙর্থক অস্তিত্বের, অদ্ভুতের, অ্যাবসার্ডের। আজকের ফরাসী প্রতি-উপন্যাসবাদীদের এক প্রধান মুখপাত্র হচ্ছেন নাতালি সারোৎ, তিনি এক জায়গায় লিখছেন: "আধুনিক মানুষের দেহ আছে, আত্মা নেই। এক হিংস্র পারিপার্শ্বিকের চাপে সে কেবলি চেপ্টে যাচ্ছে, তাকে বাইরে থেকে দেখতে যেমন, তার ভিতরটাও হুবহু তাই। প্রকাশহীন ও সর্ব অনুভূতিশূন্য চাউনি তার, অগভীর ভাসা-ভাসা দুটি চোখ মুখের উপর, তা লুকিয়ে রাখে না কোনো উক্তি কোনো অন্তরের শক্তির। সে-মানুষ নিজেকে হারিয়েছে নিজের কাছে।"

অদ্ভুত বা 'অ্যাবসার্ড' সাহিত্য, যা আজ প্রায় এক ধরনের দর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে ও যার আধ্যাত্মিক তামসী রাত্রির দিগদিগন্ত প্রসারী ছায়া ক্রমশই ঘন হয়ে পড়ছে আমেরিকা ও পশ্চিম ইউরোপের বহু বিভিন্ন ভাষার লেখায়, তার একটি বুদ্ধিদীপ্ত ব্যাখ্যা দিতে প্রথম উদ্বুদ্ধ হন বোধ হয় আলবের কামু্য। কিন্তু যদিও তাঁর গোড়ার দিকের প্রায় সমস্ত রচনাতেই এই 'অদ্ভুতের' অন্তত অস্ফুট অনুরণন নানা জায়গায় ব্যক্ত হয়ে এসেছে, ১৯৫১-তে তাঁর "বিদ্রোহী মানুষ" প্রকাশ করার আগে সেই কামু্যও ব্যাপারটার এপাশ-ওপাশ ভালো করে উল্টে-পাল্টে ভেবে দেখতে প্রস্তুত হতে পারেন নি বলে মনে হয়। ১৯৫০ পর্যন্ত ব্যক্তি-মানুষের মানসিক বিদ্রোহ ও 'অদ্ভুতের' ভাব তাদের অস্তিত্বের কারণ খুঁজতে চেয়েছে বাহ্যিক সমাজের মধ্যে, যুগধর্মের স্রোতে পড়ে মানুষ যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, তার নিহিত পাপের বা পাপবোধের মধ্যে। কিন্তু "বিদ্রোহী মানবেই" কামু্য প্রথম আবিষ্কার করলেন যে মানুষের এই দুঃখটা বা তার এই নিঃসাড় 'অদ্ভুত' অমানুষিক ভাবটা শুধু একটা বাহ্যিক সমাজ-ব্যবস্থারই ফল নয়, তার একটা প্রকাণ্ড মোটা অংশ এসেছে সেই মানুষের নিজেরি অন্তর থেকে—কারণ মানুষ আর সমাজ, এ দুটো তেল ও জলের মতো বিপরীতধর্মী ভিন্ন জিনিস নয়, এর প্রথমটা দ্বিতীয়টাকে তৈরী করে, আবার উল্টে দ্বিতীয়টার দ্বারাও প্রথমটা ক্রমাগতই প্রভাবান্বিত হয়।

এই 'অদ্ভুতের' উৎপত্তির কারণ যাই হোক না, এর উপস্থিতির অবিসংবাদিত সত্যটা সাহিত্যের সৃষ্টিমুখী প্রয়াসের ক্ষেত্রে কতকগুলি বিপ্লবাত্মক ও চমকপ্রদ পরিবর্তের ধ্বনি মুখরিত ব্যঞ্জনা এনে হাজির করল। প্রতিনাটক সম্পর্কিত

একটি সাম্প্রতিক বিজ্ঞাপনের সাবধান-বাণী মনে পড়ে : "যাদের ফুসফুস দুর্বল বা যারা হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনায় সন্ত্রস্ত আছে, তারা ভুলেও কখনো এইসব নাটক-ফাটক দেখতে যেও না। কারণ আজকাল রঙ্গমঞ্চের ওপর যা-তা সব কাণ্ড ঘটে। হয়তো সেখানে দেখবে, সমস্ত মানুষ জাতি গণ্ডারে পরিণত হচ্ছে, অথবা মা তার একমাত্র শিশুসন্তানকে খুন করে অতি আদরের সঙ্গে তার দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছুরি দিয়ে কাটছে, এবং সেই শিশু-সন্তানটির বাবা অতি নির্বিকারভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে এই প্রচণ্ড কাণ্ড। অতএব খবরদার, এ-সব নাটক তোমাদের জন্যে নয়।"

অবশ্য এক অর্থে চমকপ্রদ হওয়ায় বা নিরীহ শ্রোতা-দর্শক-পাঠকদের চপেটাঘাত করার পেশা এসব ঔপন্যাসিক-নাট্যকারদের থাকা উচিত নয়, এবং চমক লাগাতে যে তাঁরা আসেন নি, এমন কথাও বুক ফুলিয়ে বলতে তাঁরা পিছপাও হবেন না। কারণ এঁদের দর্শনের একটা মুখ্য বক্তব্যই হল এই যে চমক লাগানোর আর কিছু নেই, মানুষ নিঃসাড় হতে চলেছে (যেমন ইওনেস্কো বলবেন, মানুষ গণ্ডার হতে চলেছে), এবং সেই জগতজোড়া নিঃসাড়তার একটি বিশ্বস্ত ফোটোগ্রাফ তুলে ধরাই তাঁদের সাহিত্যের কাম্য। এই দর্শনের চাপে পড়ে এতদিনের প্রেম বা অন্যান্য আদর্শ যা কিছু ছিল, তা তো গেলই, সেই সঙ্গে গেল কিছুকাল আগের সাহিত্যের মনস্তত্ত্বমুখী বাড়াবাড়ির সমস্ত সংকেত। কারণ মানুষের মন বলে বস্তুটাই যখন আর নেই আজ, তখন মনস্তত্ত্ব আসবে কোথেকে ? সুতরাং মানসিক আবেগ ইত্যাদি নিয়ে কেন আর বৃথা কিচিরমিচির করা, কেন মানুষের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করবার ব্যর্থ প্রয়াস ! "সেই মানুষের চরিত্র," বলছেন ফরাসী মরিস ব্লাঁশো, "সেটা আমার জানা নেই। তার কোনো চরিত্র আছে বা থাকতে পারে, তাও আমি মানি না।"

আদিগন্ত নিঃসাড়তার প্রকাশে উদ্বুদ্ধ এই ধরনের সাহিত্য কেমন হতে পারে, তার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে জন অসবোর্নের "রেগে তাকাও পিছন দিকে" থেকে নিম্নোদ্ধৃত সংলাপের অংশে :

'এই তো আমি বেশ বেঁচে রয়েছি, অতএব একটু খেলা করা যাক না। ধরা যাক, আমরা সবাই মানুষ, সত্যিই মানুষ, এবং আমরা সবাই সত্যি সত্যি বেঁচে আছি। শুধু এক মুহূর্তের জন্যে। কী ? একটু মানুষ হওয়ার চেষ্টা করতে দোষটা কোথায় ! আরে দাদা, উৎসাহী হতে কাউকে কতকাল যে দেখি নি !"

আরেকটি দৃষ্টান্ত, বেকেটের "গোদোর প্রতীক্ষায়।" আমরা সবাই সেই প্রতীক্ষায়, কিন্তু গোদো, যে আমাদের এত প্রতীক্ষিত, সে কোনোদিন আসবে না। আর এই প্রতীক্ষার অবসরে আমরা শুধু বসে বসে কতকগুলো বাজে কথা বলব।

অদ্ভুত বা 'অ্যাবসার্ডের' পথে অগ্রসর হয়েই প্রতি-উপন্যাস বা প্রতি-নাটকের সূত্রপাত। সামাজিক জীবন বা মনস্তত্ত্ব নিয়ে বাজে বকরবকর আর নয়, এগুলো শুধু মিথ্যা যুক্তির অবতারণা, মধ্যযুগীয় বাকবিতণ্ডা; যে-আবেগ আসলে আর নেই এবং থাকলেও আছে শুধু কল্পনায়, তাকে খামোখা রঙিয়ে ফলাও করে দেখানোর চেষ্টা করা—এ-সাহিত্যিকদের বক্তব্য এই। শুধু বস্তুর উপস্থিতি ও তার নানান ভঙ্গিমা, একমাত্র তা-ই দেয় জীবনকে রূপ, এবং সে জীবনকে কোমর বেঁধে অর্থপূর্ণ বলে প্রচার করার কোনো প্রয়োজন নেই, কারণ অর্থ তার নেই। শুধু বস্তুই একমাত্র অস্তিত্ব যেখানে, সেখানে ব্যাখ্যারও প্রশ্ন ওঠে না। কিছু হওয়ার আগে এবং সব কিছু হয়ে যাওয়ার পরও, থাকবে একমাত্র বস্তুই—ভাব নয়, আবেগ নয়, মন নয়, অর্থ নয়।

আদামভ, এক প্রখ্যাত ফরাসী প্রতি-নাট্যকার, হয়তো ধ্যানধারণায় তাঁর বহু সমগোত্রীয়ের মতো ততটা ঠাণ্ডা বা নিষ্ঠুর নন, কিন্তু তিনিও মানুষ নিয়ে বড় বড় কথা বলার বাসনার প্রতি কোনো করুণাদৃষ্টি নিক্ষেপ করতে প্রস্তুত নন। মানুষকে তিনিও দেখতে চান এক বোকামির, গাধামির, অর্থহীনতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তরূপে। তাঁরও উদ্দেশ্য: "যত ক্রূর বা স্পষ্টভাবে সম্ভব, মঞ্চের উপর দেখানোর সেই সর্বোপরি নিঃসঙ্গতাকে, সেই পারস্পরিক সম্বন্ধসূত্রের সম্পূর্ণ অভাবকে, যা একমাত্র সত্য আজ মানুষের।"

এই হল সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রসঙ্গের কয়েকটি পরিচয়। তবে কি র‍্যাঁবোর সেই নিজেদের বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার প্রশ্নটাই যথাযথ? কে জানে, হয়তো সেটাও একটা শস্তা প্রস্তাব, কারণ আসল উত্তর হয়তো তাতেও নেই।

অমলেন্দু চক্রবর্তী

একটি লৌকিক গল্প

কোনো মানেই হয় না বেঁচে-থাকার। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, শ্রীশ্রী৺রাধা গোবিন্দজিউর একনিষ্ঠ সেবক নিত্যানন্দ গোঁসাই আজও টিঁকে আছেন। একা নন, সর্বসাকুল্যে দশটি পোষ্য।

গোঁসাইজির আদি নিবাস অধুনা পাকিস্তানে, কুষ্ঠিয়ার কাছে সোনামুড়া গ্রামে। গ্রাম ছোট কিন্তু মান্যি অনেক। চার বিঘা জমি জুড়ে শ্রীশ্রী৺রাধা-গোবিন্দজিউর মন্দির, পাশে গৌরাঙ্গমহাপ্রভুর মন্দির, বিরাট নাটমণ্ডপ, চারদিকে আম-কাঁঠাল-লিচু-পেয়ারার বাগান। সাত গ্রামের মানুষ এসে ভিড় জমাত রাস-পূর্ণিমায়, মেলা চলত পনের দিন ধরে, সাড়ে চার মণ ফাগ উড়ত দোলের উৎসবে, ধুলোর সঙ্গে লাল রঙ মিশে থাকত বর্ষা পর্যন্ত। এ ছাড়া ছিল দেবোত্তর জমি বিশ বিঘা, তিনটে পুকুর, বিগ্রহের শরীরে ত্রিশ ভরি সোনা, আশি তোলা রুপো। গোঁসাইজিরা আট পুরুষ ধরে সেই বিগ্রহের সেবাইত্। শরিকে শরিকে ঝগড়ায় কিছুই অবশ্য আর ছিল না, তবু গোঁসাইজি দু' বেলা দেড় সের করে দুধ খেতেন রোজ।

সেই গোঁসাইজি এখন কলকাতায়, কসবারও দক্ষিণে নববঙ্গ কলোনীর বাসিন্দা। সেই যে সে বছর কী হলো, ওলাওঠা, মায়ের-দয়া-দুর্ভিক্ষ-মহামারী কিছু না, সেই যে মানুষগুলি দেশ-গ্রাম ছেড়ে পালাতে লাগল, কোন কিছু-না-বুঝে গোঁসাইজিও প্রাণের ভয়ে আট পুরুষের ভিটে ছেড়ে বেরোলেন। তারপর এখানে-ওখানে লাথি-ঝাঁটা খেয়ে, শূদ্র কায়স্থের সঙ্গে ছোঁয়াছুঁয়ি করে, জাত খুইয়ে অবশেষে এখানে এসে পড়েছিলেন, জবরদখল কলোনী, লাঠি-সড়কি বন্দুকের গুলি সব কিছু সামলে স্থির হয়ে বসতেই কাটল বছর পাঁচেক। এর মধ্যে প্রথমপক্ষের বড়ো ছেলেটা রেলগাড়িতে চানাচুর-ফিরি ছেড়ে দিয়ে দাঁতের মাজন ধরতেই একদিন রেল-কাটা পড়ল, ষাট বছরের বুড়ি-মা খেতে না পেয়ে বিনি চিকিৎসায় মরল, মেজো মেয়ে গোপীরানী সেই যে কার সঙ্গে ফস্টি-নস্টি করে একদিন পেট খসিয়ে ঘর ছেড়ে পালাল, আর ফিরল না। কিন্তু আশ্চর্য, এর

পরেও কিন্তু গোঁসাইজি ঠিক তেমনি আছেন। সকাল-সন্ধ্যায় গোপীচন্দন দিয়ে কপালে-কাঁধে তিলক এঁকে, নামাবলী গায়ে জড়িয়ে বিভোর হয়ে আহ্নিক করেন, ট্যাঁকে করে লুকিয়ে-আনা আটপুরুষের শালগ্রাম শিলা সামনে রেখে, চোখের ধ্যানে বিগ্রহকে কল্পনা করে দু' বেলা নিয়মিত পুজো করেন। আরও আশ্চর্য, এত কিছুর পরেও এতদিন পর্যন্ত গোঁসাইজি একটিও মিথ্যে কথা বলেন নি। এমনকি, পাপ নেই জেনেও, সরকারি লোক বা পুলিশের কাছেও না। এবং অধিকতর আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, গোঁসাইজি আজকাল মিথ্যে কথা বলছেন এবং অবলীলাক্রমে। কেননা তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের বৈষ্ণবী রাধারাণী কিছু না বলে-কয়েই হঠাৎ রেল-লাইনে মাথা রাখতে গিয়েছিল। প্রায় ঘটেই গিয়েছিল ব্যাপারটা, তবে মহাপ্রভুর অসীম দয়া সময়মতো রেলের লোকজন আর কিছু রাস্তার মানুষ দেখতে পেয়ে একেবারে ইঞ্জিনের মুখ থেকে ছিনিয়ে এনেছে। সেই নিয়ে কেচ্ছা রটল কলোনীর ঘরে ঘরে। এ কথা সত্যি রাধারাণীর রোজগারেই সংসারটা চলে। কসবার এক বাবুর বাড়িতে মাসিক পঁচিশ টাকা মাইনেয় দু বেলা রান্নার কাজ করে। লোকে বলল, বাবুদের বাড়ি কাজ, বাবুটাও মাতাল, আর মেয়েরই মতো তো মা, তাই···। গোঁসাইজি কথাগুলি শুনেছেন কিন্তু কান পাতেন নি। কারণ তারও চেয়ে আরও ভয়ংকর কথা তিনি শুনলেন রাধারাণীর কাছে। সেজো মেয়ে নন্দরাণী হঠাৎ কোথ্‌থেকে একটা সিল্কের শাড়ি এনে পরেছে, মুখে পাউডার আর পায়ে আলতা মেখে সেজেছে—কোথায় পেল, কে দিল বলে না, এমনকি গরম খুন্তির খোঁচা খেয়েও বলে না বলে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে লাইনে মাথা পেতেছিল রাধারাণী।

সুতরাং গোঁসাইজি বুক বাঁধলেন। পুরোন ছেঁড়া নামাবলীটা গায়ে চড়িয়ে নিলেন, বড়ো শিখাটা পাট করে মিশিয়ে দিলেন মাথার পিছনের দিকে, তিলক কাটলেন স্পষ্ট করে, এবং বুক চিতিয়ে পথে নামলেন। ঋষি বাল্মীকির কণ্ঠে উচ্চারিত প্রথম মন্ত্রের মতো তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এলো সেই পবিত্র মিথ্যে কথা, একের পর এক, দ্বিধা-সংকোচহীন, এখানে-ওখানে সর্বত্র, ট্রামে-বাসে, কলোনীর ঘরে ঘরে, মুদির দোকানে, যজমানের বাড়িতে, সরকারি বাবুদের কাছে, রাস্তার মুচির কাছে, নিজের ছেলের কাছে, মেয়ের কাছে, বৌর কাছে, ধার করলেন, ভিক্ষা করলেন, গালাগাল খেলেন, গলাধাক্কা খেলেন, মার খেলেন, রাস্তার ফুটপাতে জ্যোতিষী সেজে বসলেন, ফুল-চন্দন নিয়ে সকাল-সন্ধ্যায় গঙ্গাজল ছিটোলেন দোকানে দোকানে, ঘটকালি করলেন এ-বাড়ি ও-বাড়ি,

দালালি করলেন অনেক কিছুর, আরও অনেক কিছুই করলেন বাষট্টি বছরের শরীরটা নিয়ে। কি করবেন নইলে, বাঁচতে হবে, এতগুলি পুষ্যির মুখে দুবেলা দুটো দিতে হবে তো। ভগবানের জীব, কষ্ট তো দেওয়া যায় না।

কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই পারলেন না গোঁসাইজি। বড়ো মেয়ে দুর্গার জন্য একটা যেন-তেন পাত্রও জোগাড় করতে পারলেন না। তাঁর প্রচণ্ড বিশ্বাস, কোনোরকমে যদি এই মেয়েটার একটা বিহিত করতে পারেন, তাহলে হয়তো পরেরগুলির জন্য মহাপ্রভু মুখ তুলে তাকাবেন। এই মেয়েটাই তার সব দুঃখের অংশীদার। বাপের দেখাশুনা, সেবা-আত্তি, মায়ের সঙ্গে সব কাজে জোগান, এত ঝড়-ঝাপ্টার মধ্যেও একদিনের জন্য একটু টাল সামলায়নি মেয়েটা। দুর্গা তো দুগ্‌গাই, মা দুগ্‌গার মতো মুখের আদল। যেমন মুখ তেমনি শরীরের গড়ন, তেমনি দুধে আলতায় রঙ। তবে বয়েস হলো অনেক, তেইশ পেরিয়ে চব্বিশ, না খেয়ে খেয়ে শরীরটা শুকিয়ে কাঠ, চোয়াল ভাঙছে, মাথার চুল ঝরে পড়ছে। হাসপাতালের ডাক্তার বলেন—'পুলোসি'।

তবু মেয়েটার হাত ধরে যজমানদের বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন গোঁসাইজি। কেমন যেন হয়ে গেছে দিনকাল, তেমন যত্ন-আত্তি, সেবা-ভক্তিও নেই, ধর্ম-কর্মের দিকে মনও নেই কারও। যাদের ঘরে বুড়ো বুড়িগুলি আছে, সেখানে গেলে তবু দু'চার দণ্ড কথা বলা যায়, আর নইলে ছেলে-ছোকরারা মানতেই চায় না। এর কাছে ওর কাছে গিয়ে হাতে ধরলেন, কাকুতি-মিনতি করলেন, কাঁদলেন, গুরুদেব হয়ে পায়েও ধরলেন শিষ্যদের—'যেন-তেন একটা ছেলে দেখে দাও বাবা, গরিব ব্রাহ্মণ, মহাপ্রভু কৃপা করবেন, ছেলেটা যেন ব্রাহ্মণ হয়, আর যদি···'

তারপর নিজের সঙ্গে বেশ কিছুদিন লড়লেন গোঁসাইজি। শেষে এ-ও বললেন—'দাও বাবা, দেখে দাও, যদি ব্রাহ্মণ না হয় তবু···' কিন্তু হলো না।

তাই মেজো ছেলে হরিপদ যেদিন মদ খেয়ে বেহুঁস মাতাল হয়ে ঘরে ফিরল এবং যেদিন চোলাই-মদের গুণ্ডাদের সঙ্গে জেলে গেল সেদিনও গোঁসাইজি রাতে ঘুমোলেন এবং যেদিন আশি-বছরের কুঁজোবুড়ির মতো বেঁকে-যাওয়া চালাঘরটা পিছনের দিকে থেঁতলে গিয়ে মাটিতে মিশে গেল সেদিনও কোন এক কীর্তনীয়া দলের সঙ্গে অষ্টপ্রহর নামগান করতে কলকাতার বাইরে গেলেন এবং ছোট ছেলেটা মাত্র পনের বছর বয়সে কলোনীর বার নম্বরের মধু মিস্ত্রির বোবা মেয়েটার সঙ্গে নোংরামি করতে গিয়ে যেদিন মার খেয়ে ঘরে ফিরল, সেদিনও ছেঁড়া ধুতিটা রিপু করতে করতে নিরাসক্তভাবে চোখ তুলে রক্তাক্ত ছেলেটার দিকে

একবার তাকালেন, পুরো ব্যাপারটা শুনলেন এবং নিরুদ্বেগে রিপুর বাকি কাজটুকু সারতে পারলেন। কিন্তু ছ'মাস অমানুষিক পরিশ্রমের পর, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেদিন দুগ্‌গার জন্য যা-হোক একটা মেয়ে-দেখার ব্যবস্থা করলেন এবং যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল আর বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হবার পরও কেউ এলো না, আর থাকতে পারলেন না গোঁসাইজি, অধীর হয়ে উঠলেন, পাগল হয়ে গেলেন। বড়ো জ্বালা এই সংসারের। এবং অনায়াসেই সিদ্ধান্ত নিলেন—আত্মহত্যা করবেন।

সেদিন ছিল প্রচণ্ড বর্ষার দিন। ভীষণ অন্ধকার। চুপে চুপে নামাবলীর নীচে সাতপুরুষের শালগ্রাম শিলাটা বুকে চেপে ধরে গঙ্গার ঘাটে এসে দাঁড়ালেন গোঁসাইজি। নাম গাইতে গাইতে হাসিমুখে সমুদ্রের জলে দেহ রেখেছিলেন মহাপ্রভু। চোখ বুঁজে ধ্যানমগ্ন হয়ে সেই স্বর্গীয় দৃশ্যটা কল্পনা করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু মহাপ্রভু নয়, বেলাল্লাপনা-করা লম্পট ছেলেমেয়েগুলোর মুখের সারি ভেসে উঠল সামনে। দু' আঁজলা গঙ্গার জল মাথায় দিলেন, তবু সেই মাতাল ছেলে, নষ্ট মেয়ের মুখ। ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠলেন গোঁসাইজি, রক্তে রক্তে জ্বালা, চোখ ভরে এলো জলে, গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, এমন কী বৃষ্টির জলেও বুঝতে পারলেন—তিনি ঘামছেন। শুধু থর্‌থর্ করে কাঁপতে লাগলেন। মাথার উপরে কালো আকাশ, সামনে অন্ধকারে ডুবে আছেন মা-গঙ্গা, শুধু ওপারের মিলের আলোর ছায়া কাঁপছে ঢেউ-এ, দূরে ইস্টিমারের ভেঁপু, পিছনে নিমকহারাম কলকাতা শহর। চারদিকের ভয়ংকর নির্জনতায়, অন্ধকারে একটু যেন ভয় পেলেন। ফিরে যেতে চাইলেন। দুগ্‌গার মুখটা স্পষ্ট দেখলেন, গিঁট-দেওয়া ছেঁড়া-শাড়িতে জড়ানো রাধারাণীর কঙ্কাল-শরীরটা। আবার ভয় পেলেন। মা-গঙ্গাকে স্পর্শ করলেন, নাম গাইবার চেষ্টা করলেন। গলা ধরে এলো, ঠোঁট কাঁপল, অনেক চেষ্টা করেও পারলেন না। সারাজীবন নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দজিউর সেবা করেও, আজন্ম ধর্মপথে থেকে বাষট্টি বছর বয়সে অর্থহীন জীবনটার ভার বইতে না পেরে ক্লান্ত, শীর্ণ, ক্ষুধার্ত শরীরটা নিয়ে অসহায়ভাবে ডুকরে কেঁদে উঠলেন—'দয়া করো, দয়া করো ঠাকুর, জীবনভোর তোমাকে ডেকেছি, যদি সেই হাজার হাজার প্রণামের কোনো মূল্য থাকে আমাকে বাঁচাও।'

'কি চাস তুই?'

গোঁসাইজি চমকে তাকালেন। চারদিকের ঘুটঘুটে অন্ধকার, আর অন্ধকারে

গঙ্গার ছলাৎ-ছলাৎ শব্দের নিস্তব্ধতার মধ্যে পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। যেন ভগবানের লীলাশুক উপভোগ করে চৈতন্যচরিতামৃতের পুঁথি থেকে এইমাত্র উঠে এলেন। দীর্ঘ, ঋজু, সৌম্য। সুডোল কোমল ছুটি পা। উত্তেজনায়, বিস্ময়ে, আনন্দে থর্‌থর্‌ করে কেঁপে উঠলেন গোঁসাইজি। পা-দুটো জড়িয়ে ধরে অবোধ শিশুর মতো কেঁদে উঠলেন—'সংসারে বড়ো দাহ প্রভু, বড়ো জ্বালা, বড়ো যন্ত্রণা, দেখা যদি দিলে, বাঁচাও প্রভু, বাঁচাও।'

গোঁসাইজি অবাক হলেন। তাঁর হাত ধরে অনির্বচনীয় এক আলোর জগতে তাঁকে নিয়ে চললেন সেই পুরুষ। শ্বেতপাথরের মন্দিরে হীরকখচিত ঝুলন দোলায় শ্রীশ্রী৺ভগবানের যুগল স্বর্ণবিগ্রহ, সামনে ফুল-চন্দনে আচ্ছাদিত মহাপ্রভুর পাদুকা। সেই মন্দিরে এক কুশের আসনে বসে সেই পুরুষ গোঁসাইজির সব দুঃখ শুনলেন, সব শুনে প্রশ্ন করলেন—'কি চাস তুই?'

'আরগুলোর কথা ভাবি না, ওদের ছেনালিপনার জন্য ভগবান ওদের বিচার করবেন। শুধু আমার বড়ো মেয়ে দুগ্‌গা-মার জন্যে একটা বর দাও প্রভু। ওকে সুখী করো।'

'যা মানুষের কাছে যা।'

'মানুষ!' গোঁসাইজি বিস্মিত হলেন—'মানুষের কাছেই তো গেছি প্রভু। জনে জনে হাতে ধরেছি, পায়ে ধরেছি, কেঁদেছি।'

'ওরা মানুষ নয়।'

'তবে!'

সেই জ্যোতিষ্মান পুরুষ ভগবানের পা ছুঁয়ে কি যেন একটা নিয়ে এলেন। গোঁসাইজি প্রসারিত হাতে ভক্তিভরে গ্রহণ করলেন—'কি প্রভু?'

'তোদের যুগেরই একটা জিনিস। চশমা। যা, ঘরে ফিরে যা। এই চশমা চোখে দিয়ে পৃথিবীর দিকে তাকাবি। যদি মানুষ খুঁজে পাস দেবতা জেনে তার আশীর্বাদ চাইবি, সাহায্য পাবি।'

'প্রভু!'

'ঘরে ফিরে যা।'

তারপর আবার সেই অন্ধকারে গঙ্গার ধারে ফিরে এলেন গোঁসাইজি, এবার মুষলবৃষ্টি, আকাশ কালো, নদীতে জোয়ারের শব্দ, পারে ঢেউ ভাঙছে, দূরে ইস্টিমারের বাঁশি, ওপারে কারখানার আলো।

কেমন যেন শীত-শীত করতে লাগল গোঁসাইজির। বুকে নারায়ণশিলাকে

চেপে ধরে, চোখে নতুন চশমা এঁটে অন্ধকারের সুড়ঙ্গ থেকে উঠে এলেন আলোর কলকাতায়।

সন্ধ্যার পর আউটরাম ঘাটের এদিকটা ভীষণ অন্ধকার এবং নির্জন। গোঁসাইজি উপরে এসে সোজা হয়ে দাঁড়াতেই একটা বীভৎস চিৎকারে আঁৎকে উঠে ফিরে তাকালেন এবং দেখেই ভয় পেয়ে, এদিক ওদিক না তাকিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগলেন। দুটো ভল্লুক। কলকাতার রাস্তায় দুটো জ্যান্ত ভল্লুক তাঁকে তাড়া করছে এবং তিনি 'বাঁচাও-বাঁচাও' আর্তনাদ তুলে পড়ি-মরি করে দৌড়োতে দৌড়োতে ধুতির কাছা খুলে এবং কোনমতে দলা-পাকানো কাপড়টা কোমরের কাছে গুছিয়ে নিয়ে ছুটতে লাগলেন। সারাদিন কিছু খান নি, তিনদিন ঘুমোন নি, বাষট্টি বছরের ভাঙা শরীর—হাঁপিয়ে উঠলেন। অথচ দৈত্যের মতো ভয়ংকর সেই ভল্লুক দুটো ঠিক তাঁর দিকেই ছুটে আসছে। লোকালয়ের মধ্যে এসে গোঁসাইজি আরও ঘাবড়ে গেলেন। এবার শুধু দুটো ভল্লুক নয়, চারদিক থেকে আরও কিছু বাঘ, হায়না, হিপোপটেমাস, বুনো কুকুর, জোট বেঁধে আক্রমণ করেছে তাঁকে। অথচ এত আলো রাস্তায়, এত গাড়ি, মোটর, বাস, দূরে চৌরঙ্গির রঙিন বাতিগুলি। এতগুলি জানোয়ার কোথ্ থেকে এলো হঠাৎ! চিড়িয়াখানার সব দরজা খুলে গেল নাকি!

গোঁসাইজি আর পারলেন না। হুমড়ি খেয়ে আছড়ে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে এসে লাফিয়ে পড়ল সেই ভল্লুক দুটো। কোনোরকম চিৎকার পর্যন্ত করতে পারলেন না গোঁসাইজি, ভয়ে একেবারে নিজের মধ্যে সিঁধিয়ে গিয়ে চোখ বুঁজে গোঙাতে লাগলেন। সেই কুতকুতে চোখ, রোমশ শরীর, ছুঁচোল মুখ, ধারালো নখ। এক পলকের জন্য শুধু ওদের দেখতে পেয়েছিলেন গোঁসাইজি, বাঘগুলির চোখ জ্বলছে, হায়নাগুলি জিব বের করে হাঁপাচ্ছে।

'শালা শুয়ার কি বাচ্চা! ব্যাটা চোর!'

অবিকল মানুষের কণ্ঠস্বর এবং আরও আশ্চর্য, ভল্লুক দুটো টেনে-হিঁচড়ে তুলল তাঁকে। গোঁসাইজি নাম জপতে জপতে কাঁপতে লাগলেন।

'শালা, ক্যায়া, ইধার কাঁহে আয়া হো?'

'বাবা, আমি গরিব ব্রাহ্মণ। এই একটু মা-গঙ্গার জলে—'

'আরে শালা বামুন। শালা হারামির বাচ্চা! ফুঃ—' একটা ভল্লুক এমন জোরে পাছায় একটা লাথি মারল যে গোঁসাইজি হুমড়ি খেয়ে পা মুড়ে ফুটপাতে উল্টে পড়লেন। বোধ হয় মাজাটা ভেঙে গেল তাঁর, কাতর আর্তনাদ করেই

মুখ থুবড়ে পড়লেন। তবু এরই মধ্যে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস, সেই হিংস্র জন্তুগুলি চলে যাচ্ছে এবং একেবারে অহিংসভাবে। এমন একটা রক্তমাংসের জ্যান্ত মানুষকে মুঠোয় পেয়ে নরখাদকগুলি চলে যাচ্ছে। বিস্মিত হলেন তিনি। নিজের উপর আবার আত্মধিক্কারের চাবুক লাগল তাঁর।

চশমাটা দুটো কানের পাশে জ্বালা ধরিয়ে দিয়েছে। তিনি টেনে খুলে ফেললেন। এ কী! দুটো পুলিশ, কয়েকজন ষণ্ডামতো মানুষ হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছে দূরে। তিনি আবার চশমা ধরলেন চোখে—সেই পুলিশ দুটো ভল্লুক, সেই মানুষগুলির কেউ জল-হস্তী, কেউ হায়েনা, কেউ বাঘ। আবার চশমা খুললেন—মানুষগুলি আবার মানুষ। ভাঙা শরীরের ব্যথা-বেদনা, ক্লান্তি-ক্ষুধা সব ভুললেন গোঁসাইজি। লাফিয়ে উঠে বসলেন। এ তো মজার জিনিস! আজব চশমা! দু' পাশের নীলচে আলোগুলি ঠিক জ্বলছে, দূরের চৌরঙ্গিতে রঙিন বাতি, গোটা ময়দানটা আলোয় আলোয় দাউ দাউ করে জ্বলছে, বাস, মোটর, ট্যাক্সিগুলি যথানিয়মে হু-হু করে ছুটছে। গোঁসাইজি ছুটে গেলেন, উঁকি দিয়ে দেখলেন। যা ভেবেছেন তাই। চোখের উপর দিয়ে একটা জানোয়ার-বোঝাই বাস চলে গেল এবং দু'পাশের গাড়িগুলি চালাচ্ছে জন্তুগুলি, ভিতরে বসেও আছে কতগুলি পশু। কী ব্যাপার? কলকাতা থেকে মানুষগুলি উধাও হলো না কি?

'কী গো ঠাকুর!'

গোঁসাইজি চমকে উঠলেন। সেই বুনো-কুকুরটা তখনও যায় নি। পাশে এসে তাঁর পা চাটছে। চশমা খুললেন—একটা মানুষ গায়ে হাত বুলোচ্ছে তাঁর। ভয়ে অথবা ঘৃণায় পিছিয়ে এলেন তিনি। কি জাত, কোথায় ঘর কে জানে? ভয়াল-দর্শন কুকুরটা যত ভয়ংকর, মানুষটা তারও চেয়ে আরও বীভৎস। কালো চোঙার মতো প্যাণ্ট, গায়ে কলারওলা, হাফ-হাতা সাদা ডোরা-কাটা লাল গেঞ্জি, ঠোঁটে পানের কষ, ঝামা-কয়লার মতো ব্রণ-ভরা চোয়াল, কুৎসিত কালো। লোকটা শয়তানের মতো হাসছে। 'কী গো ঠাকুর। এট্টু পেন্নাম করি। ইদিকে এসো।'

'তোর কী রে হারামজাদা! পামর!'

'আ···হা, হা, চটছ কেন গো! টাকা লেবে, টাকা, অনেক টাকা।'

লোকটা সত্যি টাকা বের করল পকেট থেকে। অনেক টাকা। গোঁসাইজি তাকাতে পারলেন না।

'রোজগার করবে! বড়ো সহজ।'

গোঁসাইজি এগিয়ে এলেন।

'দালালি করবে ঠাকুর।'

'কিসের দালালি?'

লোকটা কাকে যেন ডাকল ইঙ্গিত করে। ডানদিকে রাজভবনের ঝোপ-জঙ্গল থেকে তরতর করে বেরিয়ে এলো দুটো কেউটে সাপ। চশমা খুললেন গোঁসাইজি—দুটো মেয়েছেলে। বিশ্রীভাবে সেজেছে।

'দেখো, চেয়ে দেখো ঠাকুর। পুণ্যি তো অনেক করলে, ইবার এট্টু দেখো দিকিন দুচোখ মেলে। ভিমরি খে' যাবে। ভালো মাল। ওরা লোক খুঁজছে।'

'নারায়ণ, নারায়ণ—' গোঁসাইজি দু'হাতের করতল এক করে কপালে তুললেন। এ কী বিপদে ফেললে ঠাকুর। এ কোন ছলনা তোমার।

গোঁসাইজির চমক ভাঙলো—আমার শালগ্রাম শিলা! আমার দেবতা! হাতে নেই, ট্যাঁকে নেই। ভালো করে খুঁজলেন। নামাবলীর চারকোণে কোনো গিঁট নেই, কোথাও নেই। এক মুহূর্তে শরীরে অসহ্য এক জ্বালা ধরল তাঁর। ঘেমে উঠলেন। তবে কী দৌড়োবার সময়েই ফেলে দিলেন কোথাও! যে-পথে বেশ্যা আর বেশ্যার দালাল ঘুরে বেড়ায় সেই পথে! হাহাকার করে উঠল বুকের ভিতরটা, চারদিকে এক নিরাকার শূন্যতা। এ কী হলো ঠাকুর! আমার আট পুরুষের গৃহদেবতা! বাপ-ঠাকুরদা বুকে করে মাথায় করে রেখেছেন, আর আমারই এত পাপ তুমি গ্রহণ করলে ঠাকুর!

'কী গো ঠাকুর, অমন নাচছ কেন ধেই ধেই করে?' সেই ভয়ংকর কালো আর কুৎসিত লোকটা এগিয়ে এলো।

দু'পা পিছিয়ে এসে চশমা আঁটলেন গোঁসাইজি। কুকুরটা জিব বের করে মাথা দোলাচ্ছে উপরে নিচে। খিলখিলিয়ে হেসে উঠল মেয়েদুটি। গোঁসাইজি তাকালেন—দুটো কেউটে সাপ ফণা তুলে ডানে-বাঁয়ে দোলাচ্ছে। এবং কুকুরটা আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে গেল। কুকুরটা ওর লালা-জড়ানো জিব দিয়ে একটা কেউটের শরীর চাটতে লাগল।

গা-ঘিনঘিন-করা একটা ঘৃণায় সমস্ত শরীর পাক খেল গোঁসাইজির। এ দৃশ্য তিনি দেখবেন কী করে চশমা খুলে? এ কী কলকাতা শহর। এমন বেলাল্লাপনা হয় এই ভরসন্ধ্যায় খোলা রাস্তায়। তিনি দৌড়োতে লাগলেন।

মনে মনে হরিনাম জপলেন। পাপ, পাপ ঠাকুর, পাপে ভরে গেছে দেশ। বাপ-ঠাকুরদার মাথার মাণিক আমি তোমায় পথে হারালাম।

গোঁসাইজি থমকে দাঁড়ালেন। সামনে থেকে আরও একটা কেউটে এঁকেবেঁকে তরতর করে তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। পায়ের কাছে মাথা রেখে সাপটাও থেমে গেল। ফণা তুলে একটা ঠোকর দিতে এলো তাঁর পায়ের উপর।

ভয়ে পিছিয়ে এসে গোঁসাইজি চশমা খুললেন। একটি মেয়ে তাকে প্রণাম করে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তিনি চমকে উঠলেন। একমুহূর্তে তার শরীরের রক্ত চল্‌ চল্‌ করে মাথা থেকে পায়ে গড়িয়ে পড়ল—'তুই, তুই গুপী!'

'ওরা তোমার ঠাকুরকে কেড়ে নিতেই এসেছিল বাবা। আমি ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে এসেছি। আমি তো জানি, তুমি ঠাকুরকে ছাড়া বাঁচবে না।'

'গুপী মা! গুপী…' গোটা কলকাতাকে জানান দিয়ে আর্ত-চিৎকারে ফেটে পড়লেন গোঁসাইজি—'অমন করে তুই সেজেছিস্ কেন লো গুপী, তোর সিল্কের শাড়িতে ও কিসের বাস!'

'তোমার ঠাকুর নেবে না বাবা!'

'ঠাকুর!' দু'হাত বাড়িয়ে মেয়েকে জড়াতে গেলেন গোঁসাইজি। পারলেন না। হাতের পাতায় হাত রেখে প্রসাদ নেবার ভঙ্গিতে গ্রহণ করলেন দেবতাকে।

মেয়েটা ফুটপাতের উপরই প্রণাম করতে আবার হাঁটু ভেঙে বসল। এবং নিজের মেয়ে কী করে কেউটে হয়ে যায় দেখার কৌতূহলেই গোঁসাইজি আবার চশমা আঁটলেন। কেউটেটা তাঁকে ছাড়িয়ে কিলবিল করে এঁকেবেঁকে দ্রুত পিছনের দিকে চলে গেল। সেই কুকুরটার দিকে, কুকুরটা ওর শরীর চাটবে। ভাবতে পারলেন না গোঁসাইজি। ঘৃণায়, বিদ্বেষে, অপমানে সর্বাঙ্গে দাহ জ্বলল তাঁর। দু' হাতের শক্ত মুঠোয় কঠিন শালগ্রাম শিলা। প্রচণ্ড ক্ষোভে হাতের মুঠোয় পিষে ফেলতে চাইলেন। 'বলো বলো ঠাকুর, এ কোন ছলনা তোমার!' প্রণাম নয়, হাতের নারায়ণ শিলা দিয়ে আঘাত করলেন মাথায় একবার, দুবার নয়, বারবার। 'বলো ঠাকুর, বলো, এ কোন মায়া!' কপাল ফেটে রক্ত এলো হাতে। রক্তাক্ত হলো নারায়ণ শিলা। গোঁসাইজি টলতে লাগলেন। অসহ্য যন্ত্রণা। শরীরে-মনে দাহ। নামাবলীর খুঁট দিয়ে মাথাটা চেপে ধরে টলতে টলতে বসে পড়লেন ফুটপাতের ধারে।

তারপর রাত যখন অনেক হলো, আরও গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করলেন

গোঁসাইজি। শেষ বাসে ভিড় ছিলো, হরেকরকম জন্তু-জানোয়ার—চিতাবাঘ, নেকড়ে বাঘ, জলহস্তী, বানর, হনুমান, সিংহ, মশা-মাছি সব। কী জানি কেন, গোঁসাইজি বুঝলেন না, জানোয়ারগুলিও তাঁকে করুণা করল, ভিড়ের মধ্যে উঠতে দিল, বসার না হোক, দাঁড়াবার মতো জায়গা দিল। কপাল থেকে তখনও রক্ত ঝরছিল একটু একটু, নামাবলীটা লাল হয়ে গেছে। বোধহয়, করুণা করল এরা। মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করলেন গোঁসাইজি—কী বিচিত্র তোমার লীলা প্রভু! তোমার পৃথিবীতে পশুদেরও কী জীবপ্রেম। চশমা খুলে বাসের নারী-পুরুষ মানুষগুলিকে একবার দেখে নিলেন গোঁসাইজি। আবার চোখে আঁটলেন। মেয়েদের সিটে একটা নাদুস-নুদুস হরিণীর দিকে তাকিয়ে জিব চাটছিল একটা চিতাবাঘ, আড়চোখে তাকিয়ে ঘন ঘন দেখছিল একটা সিংহ। গোঁসাইজি দেখছিলেন তামাসা। হঠাৎ একটা হট্টগোল উঠল চলতি বাসে। চিতাবাঘটা দাপাদাপি শুরু করল। কি যেন হারিয়েছে তার। মণি-ব্যাগ! কত ছিল! গোটা পঞ্চাশ! মূর্খ! এত টাকা নিয়ে ভিড়ের বাসে কেউ চলে! বেশ হয়েছে! বোঝ মজা!

এমনি বিক্ষিপ্ত আর বিচ্ছিন্ন কথাবার্তার মধ্যে গোঁসাইজি আরও কিছু মজাদার ঘটনা দেখলেন। একটা হনুমান লেজ গুটিয়ে সুরসুর করে পিছনের দিকে যাচ্ছিল। কতকগুলি জানোয়ার প্রচণ্ড হিংস্রতায় খপ্ করে ধরে ফেলল। তারপর অশ্রাব্য-অশ্লীল জঘন্য সব গালাগালির মধ্যে কিল-চড়-চাপড়-ঘুসি-লাথি—সব মিলিয়ে একটা তাণ্ডব। বাস থেমে গেল এবং জানোয়ারগুলি হনুমানটাকে রাস্তার উপর আধমরা করে রেখে আবার বাসে উঠে এলো। এবং এসে সকলেই সমবেতভাবে হা-হুতাশ করতে শুরু করল—কারও ঘড়ি নেই, কারও বোতাম, কারও টাকা, কারও বাঁধানো দাঁত। গোঁসাইজি লক্ষ করলেন—বাসে এতক্ষণ আরও যত হনুমান আর বাঁদর ছিল, এখন একটাও নেই। শুধু দু'জন মানুষ চুপচাপ—গোঁসাইজি নিজে আর দুটি জিরাফ। জিরাফদুটো বাসের কণ্ডাক্টার। কণ্ডাক্টার জিরাফ কেন? গোঁসাইজি ভাবলেন—কী ওদের পাপ! কলোনীর সিধু বসাকের সেজো ছেলে বলাইটাও কণ্ডাক্টারি করে। বড়ো ভালো ছেলে, উদ্বাস্তু কলোনীতে সেরা ছেলে। ছেলেটা চার-চারটে পাশ দিয়ে গলা উঁচু করে কথা বলতে চেয়েছিল। শেষে কলেজের পড়া শেষ না-হতেই কণ্ডাক্টারির চাকরি নিয়ে অমন স্বাস্থ্যটাকে আধেক করে ফেলল। ওকেও কী তবে জিরাফ দেখব!

রাত প্রায় বারোটার সময় কলোনীতে গিয়ে গোঁসাইজি ভড়কে গেলেন। দশ নম্বর পল্লীর হারু চৌধুরীর চালাঘরটার সামনে কয়েক হাজার জন্তু-জানোয়ার হল্লা করছে। কী ব্যাপার! ভিড় ঠেলে কোনরকমে এগিয়ে গিয়ে যা দেখলেন সেটা আরও ভয়ংকর। পালক-খসানো ছাল-তোলা একটা রক্তমাখা মুরগী বেহুঁস পড়ে আছে আর তাকে পাহারা দিচ্ছে কতগুলি লাঠি-ওলা ভল্লুক। ওদিকে শিকলে-বাঁধা দুটো মাটির-কুকুরকে নিয়ে ছুটোছুটি করছেন ভল্লুকদের সর্দার দু'জন গেরিলা। গোঁসাইজি চশমা খুলে দেখলেন—মুখ থুবড়ে পড়ে আছে হারু চৌধুরীর আঠার বছরের সোমত্ত মেয়ে পারুল, বঁটি দিয়েই বুঝি ধড়টা কেটে দিয়েছে কেউ, শাড়ি-ব্লাউজে রক্ত আর রক্ত। ওদিকে দুটো তেজী কুকুরকে নিয়ে খুনী খুঁজে বেড়াচ্ছেন দু'জন দারোগা-সাহেব। একটা মরা মানুষকে নিয়ে যেন রাত-দুপুরে দুগ্গা পুজোর উৎসব লেগে গেছে কলোনীতে। সব মুখই চেনা, এমন কী সকলের নাম পর্যন্ত জানেন গোঁসাইজি। সকলের হাঁড়ির-খবরও রাখেন। কিন্তু মানুষগুলি সবাই নিজের নিজের পাপ করে যাচ্ছে গোপনে, এতটা জাহান্নামে আর নরকে তলিয়ে যাচ্ছে সকলে মিলে, সে তো জানতেন না। শুধু কতগুলি ন্যাংটো অথবা ছেঁড়া-ময়লা জামা-পেণ্টলুন-পরা শিশু ছাড়া আর সকলেই কেমন বহু-বিচিত্র সব জন্তু আর জানোয়ার হয়ে বদলে গেছে মানুষগুলি। সবাই কেমন হিংস্র, একজন আরেকজনকে যেন ছিঁড়ে খেতে চাইছে। অথচ চশমা খুললে সবাই তো প্রতিবেশী, একই রকম দুঃখী।

এত এত হনুমান আর বাঁদর কেন কলোনীতে! এতগুলি ছেলে-ছোকরা লোকের পকেট কেটে মাথা ভেঙে পেট চালায়? গোঁসাইজি হঠাৎ দেখলেন এবং রাগে, ঘৃণায়, ক্ষোভে শিউরে উঠলেন দেখে। পারুলের মরা শরীরটাকে ঘিরে যে জন্তুগুলি হাউমাউ করে কাঁদছে, তার মধ্যে সেই কুৎসিত কালো বুনো কুকুর একটা, যে কুকুর কেউটে সাপের গা চাটে।

গোঁসাইজি আর থাকতে পারলেন না। ছুটে গিয়ে কুকুরটার লম্বা কান ধরে হিড়-হিড় করে টানতে লাগলেন। কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করল, সকলেই চিৎকার করে উঠল—'কী করছেন, কী করছেন ঠাকুরমশাই। মেয়ের শোকে মরছে মানুষটা আর তাকে নিয়ে রসিকতা।'

গোঁসাইজি চড়া গলায় খিঁচিয়ে উঠলেন—'চোপ্, চুপ কর সব জানোয়ারের দল। বেজন্মা পামর সব।'

সমবেত জনতা তখন ক্ষুব্ধ হয়ে গোঁসাইজিকে তেড়ে যেতে পারত। কিন্তু গেল না। কলোনীর নিরীহতম মানুষ গোঁসাইজির এই অদ্ভুত আচরণ, বিশেষত আজকের এই ভয়ংকর সর্বনাশা দিনে, সকলকে বিস্মিত করল। কী ব্যাপার, লোকটা আবার পাগল হলো না কী ?

সেই কুকুরটাকে একেবারে আড়ালে টেনে এনে গোঁসাইজি খুব চাপা-গলায় বললেন—'এই হারু, সত্যি করে বল্, কী করিস তুই ?'

'মানে !'

'ব্যাটা পামর, তুই বেশ্যার দালালি করিস আর তোর ছেলে-মেয়েকে শেয়ালে শকুনে খাবে না তো কে খাবে।'

'কী, কী বললে ঠাকুর ! তবে রে তোর বোষ্টমের নিকুচি করেছি। শালা, বান্…' এক ঝটকায় লাফিয়ে উঠে ফুঁসিয়ে উঠল হারু চৌধুরী। কিন্তু মুহূর্তমাত্র। সঙ্গে সঙ্গেই কেমন যেন চুপসে গেল মানুষটা। ঝরঝর করে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল গোঁসাইজির পায়ে—'তুমি দেবতা গো ঠাকুর, তুমি অন্তর্যামী। বেবাক কলোনীর কেউ জানে না, তুমি জানলে কী করে। আমার পাপেই গো ঠাকুর, আমার পাপেই মেয়েটা মরল, বৌটাকে যক্ষ্মার পোকায় খাচ্ছে। বলো ঠাকুর, উপায় বলো, পায়শ্চেত্তর বিধান দাও।'

সত্যিকার দৈবজ্ঞের মতো ঋজু-গম্ভীর হয়ে দাঁড়ালেন গোঁসাইজি—'তা হলে বল, কে পারুলকে মেরেছে, কাকে তোর সন্দ ?'

'জানি না ঠাকুর—' হারু চৌধুরী শিশুর মতো কাঁদছে—'পুলিশ বিপ্‌নেকে ধরেছে, বেঁধে রেখেছে। দেখবে চলো।'

'বিপ্‌নে ! কার্তিকের ছেলে বিপ্‌নে। ও তো সোনার ছেলে রে। কলেজে পড়ে, কত সুন্দর সুন্দর কথা বলে।'

গোঁসাইজিকে নিয়ে এলো হারু চৌধুরী। সত্যি একটা চালাঘরের দাওয়ায় বসিয়ে রাখা হয়েছে কার্তিক রায়ের ছেলে বিপিনকে। পাহারা দিচ্ছে তিনটে জাঁদরেল ভল্লুক। গোঁসাইজি ঠিক বিশ্বাস করতে পারলেন না। কানের দু'পাশে আর চোখের উপর হাত বুলিয়ে নিয়ে পরখ করে দেখলেন, চশমাটা পরা আছে কিনা। তাহলে এতগুলি জন্তু আর ওই ভল্লুকগুলির পাশে বিপনেকে ঠিক বিপনে দেখছি কেন ? আহা, অমন চাঁদপানা মুখ, উনিশ কুড়ি বছরের উঠতি বয়েস। গোঁসাইজি ডাকলেন—'বিপনে।'

কাঁদতে কাঁদতে ক্লান্ত হয়ে বুঝি অবশ হয়ে পড়েছিল বিপিন। ধড়ফড়িয়ে উঠল—'দেখ ঠাকুরমশাই দেখ, ওরা আমাকে অন্যায়ভাবে বেঁধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। পারুল আমাকে বিয়ে করবে বলেছিল, আমিও ওকে ভালবাসতাম। তুমি মান্যিজন, মিছে বলব না। পারুলকে মেরে ফেলল গো ঠাকুরমশাই, আমাকে ওরা মেরে ফেলুক, বেঁধে নিচ্ছে কেন?'

ঠাকুরমশাইর শরীরের রক্ত আবার দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। পায়ের খড়ম খুলে প্রায় তেড়ে গেলেন ভল্লুকগুলির দিকে—'ব্যাটা ভল্লুক, ভল্লুক, বেজন্মা, পাপিষ্ঠ পামর, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে ওকে।'

একটা মোটা ভল্লুকও সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়াল—'আরে কুছ বল্‌নে চাতে হে তো বলিয়ে না সাব-লোগকো।'

সাব! কোন সাব! গোঁসাইজি ছুটলেন সেই গোরিলাদুটোর দিকে—'ও দারোগাবাবু বিপনেকে ছেড়ে দিন, ও দোষী নয়।'

পুলিশের কর্তারা বিরক্ত হলেন—'কে দোষী?'

'আমি খুঁজে দেব।'

'আপনি জানেন না কি, কে খুনী?'

'জানি না, কিন্তু বলব। কলোনি ঘিরে ফেলুন, সবাইকে বেরিয়ে আসতে বলুন। আমি বলব, কে খুনী। অমন সোনার ছেলে বিপনে, ওকে কষ্ট দেবেন না গো দারোগা সাহেব।'

পুলিশ-ইন্‌সুপেক্‌টর দু'জন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসলেন, কানের কাছে আঙুল ঘুরিয়ে ইঙ্গিত করলেন—পাগল।

পুলিশী কুকুরদুটোর মতোই গোঁসাইজি ছুটোছুটি আর লাফালাফি শুরু করলেন। কী করে বলবেন তিনি, সেই সঙ্গে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের কলকাতায় শুধু একটি মানুষকেই তিনি দেখেছেন—সে বিপনে। বিপনে তার রাধারানীকে মারতে পারে না। গোঁসাইজির কাণ্ড দেখে জনতা সমস্ত দুঃখজনক ব্যাপার সত্ত্বেও অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। এবং এরই মধ্যে শুধু একটি কণ্ঠস্বর, মরা পারুলের বাপ হারু চৌধুরীর গলা শোনা গেল বারকয়েক—'তোমরা হেসো না গো, হেসো না। উনি অন্তর্যামী, ঠিক বলে দেবেন। দেখো।'

এবং এরই মধ্যে আরও একটি পুলিশের জিপ এসে থামল কলোনির সামনে। সঙ্গে দু'জন হাতকড়া-বাঁধা আততায়ী। বালীগঞ্জ স্টেশনে সন্দেহক্রমে

ধরেছে গোয়েন্দাবিভাগ, এনেছে থানায়, থানা থেকে শনাক্তকরণের জন্য এখানে কলোনিতে।

ওরা এসে দাঁড়াতেই দুটো পুলিশী কুকুর তীব্র হিংস্রতায় গিয়ে লাফিয়ে পড়ল ওদের উপর। সবাই তাকাল গোঁসাইজির দিকে। সচকিত গোঁসাইজি চিৎকার করে উঠলেন—'ওই, ওই সেই পাপিষ্ঠ পামর, নারীহন্তা—'

সবাই হতবাক। নেত্য গোঁসাই সত্যি পাগল হয়ে গেছেন।

একটা শকুন, শকুনটার নখগুলি লাল, ঠোঁট লাল, আরেকটা খাটাশ। খাটাশটার মুখে-চোখে চাপ-চাপ রক্ত। চশমা খুললেন গোঁসাইজি। এবং দেখেই টলে পড়লেন—শকুনটা হরিপদ, তার মেজোছেলে। তারপর যখন তার হুঁস হলো, দেখলেন তিনি একা, থমথম করছে চারদিক। তার চালাঘরের ভাঙা তক্তাপোশটা জুড়ে ব্যাঙ আর আরশুলা হয়ে বেহুঁসের মতো ঘুমোচ্ছে ছেলেমেয়েগুলি। দূরে ভাঙা-চিমনির হ্যারিকেন লণ্ঠনটা প্রায় নিবু নিবু হয়ে জ্বলছে।

'বাবা—'

'কে দুগ্‌গা, দুগ্‌গা মা—' হাতড়ে হাতড়ে মেয়ের শরীরটা অনুভব করলেন গোঁসাইজি। শিয়রে হাত-পাখা নিয়ে ঠায় বসে আছে মেয়েটা।

'কেমন আছো বাবা। তুমি চশমা পেলে কোথায়?'

'চশমা—' গোঁসাইজি লাফিয়ে উঠলেন। হাত বুলিয়ে, নাকের ডগায় আঙুল ছুঁয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। এবং শুদ্ধ প্রসন্নতায় একগাল হেসে চিৎকার করে উঠলেন—'দুগ্‌গা, তুই দুগ্‌গা, বাঃ বাঃ কী মজা। কেউটে নোস, কুক্কুট নোস, হরিণ নোস, দুগ্‌গা, অবিকল মানুষ। মেয়ে আমার মানুষ। বাঃ বাঃ, কী মজা।'

'বাবা, কী তুমি বলছ সব—' দুর্গা ভয় পেল—'বাবা!'

'বলব না! একশো বার বলব, হাজার বার বলব—' আকুল আবেগে মেয়েকে বুকে জড়াবার জন্য কাঁপা-কাঁপা হাত বাড়ালেন গোঁসাইজি—'তুই যে আমার মেয়ের মতো মেয়ে। তুই কোনো পাপ করিস নি। এই যে দেখছিস মানুষগুলি—সব পাপিষ্ঠ, পামর। শুধু তুই, কাতিকের ছেলে বিপনে—তোরা পাপ করিস নি।'

'পাপ!'

'হ্যাঁ রে, পাপ। ভুলেও মিথ্যে কথা বলিস নে কেন লো, কোনো পাপ করিস নি কেন?'

'ভয় করে বাবা।'

'হ্যাঁ, বুকে যে পুলোসি। যদি মরে যাই।'

গোঁসাইজি আঘাত পেলেন। পুলোসি, সেই সর্বনেশে রোগাটা। মেয়েটাকে নাকি একটু একটু করে, তিলে তিলে খাচ্ছে ভিতরে ভিতরে। গোঁসাইজি ঘোলাটে চোখে মেয়ের দিকে তাকালেন। ওই অমন সুন্দর মুখটা। যদি ওই ফাঁকা সিঁথিটায় একটু সিঁদুর ছুঁয়ে দেওয়া যেত, যদি পাত্রস্থ করে ওকে একটু সুখ দিতে পারতাম! গোঁসাইজি চমকে উঠলেন—'কার যেন গোঙানির শব্দ!'

'কে কাঁদে লো দুগ্‌গা।'

আস্তে আস্তে দুর্গাও কেমন যেন অবশ হয়ে পড়ল। বাবার বুকের উপর আছড়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল—'মা কাঁদছে গো বাবা, মা। হরিকে পুলিশে ধরে নিয়ে গেছে। লোকে বলছে, ওর নাকি ফাঁসি হবে। কেন এমন করলে বাবা, এমন সব্বনাশ!'

মনে পড়ল গোঁসাইজির। সেই তীক্ষ্ণ নখে, ঠোঁটে রক্ত-মাখা ভয়ংকর শকুন। উপায় নেই, বিপনেকে বাঁচাতে হলে ওই শকুনটাকে মরতে হবে

বুকের উপর কী একটা পাথর এসে ধাক্কা মারল হঠাৎ। চোখ বুঁজে, দম বন্ধ করে, দু'হাতে বুকটাকে শক্ত করে চেপে ধরে আঘাতটা সইতে চেষ্টা করলেন গোঁসাইজি—শকুন, একটা শকুন। আমার কী! আমার কে? শকুন আমার কেউ নয়।

আবার গোঙানির শব্দ। গোঁসাইজি তক্তাপোশ থেকেই গলা বাড়িয়ে নীচের দিকে তাকালেন। মস্ত একটা ঢ্যাঙা হুলো বেড়াল। পরিপূর্ণ সাদা। মেঝেতে পড়ে লুটোচ্ছে। তড়াক করে লাফিয়ে নামলেন—'কে লো দুগ্‌গা! এই তোর মা? তোর মা একটা বেড়াল। তোর মা পাপিষ্ঠা, পামর, কুলটা…'

'বাবা—' একটা মুরগীর গলার উপর শেয়ালের অতর্কিত কামড় পড়লে মুরগীটা হঠাৎ চিৎকার করেই যেভাবে ঝিমিয়ে যায়, দুর্গার আর্তকণ্ঠ তেমনিভাবেই যেন আটকে গেল এবং মেয়েটা কাঁদতে লাগল।

ওদিকে মস্ত সেই হুলো বেড়ালটা ফুঁসে উঠল মেঝের উপর—'আমি,

আমি কুলটা! আর তুমি ধম্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির না? তোর বাপকে এখান থেকে সরে যেতে বল্ দুগ্‌গা, নইলে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি, দক্ষযজ্ঞ হয়ে যাবে। বঁটি দিয়ে গলা ছিঁড়ে দিয়ে বিধবা হব আমি।'

চশমা খুলে নিজেও চমকে উঠলেন গোঁসাইজি। এই কি রাধারানী? চোখ লাল, চুল আলুথালু, মুখ ফুলো ফুলো, খোলামেলা বুকে গিঁট-দেওয়া ছেঁড়া শাড়িটা থেকেও থাকছে না। ভয়ে চশমাটা আবার চোখে আঁটলেন গোঁসাইজি। এর চেয়ে বরং হুলো বেড়াল হয়েই থাক।

কিন্তু রাধারানী তখনও চেঁচিয়ে যাচ্ছে—'পোড়ারমুখো, খুনী। এক পয়সার মুরদ নেই, ছেলেমেয়েগুলি বাঁচল কী মরল হুঁস নেই, অমন জোয়ান ছেলেটাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে এলো বাপ্ হয়ে। খুনী, খুনী বাপ্।'

'আচ্ছা, আচ্ছা তুই সত্যি করে বল্ দুগ্‌গার মা। দিব্যি দিয়ে বল্—' গোঁসাইজি শক্ত হলেন—'তুই পাপ করিস না!'

'পাপ!' রাধারানী আবার খিঁচিয়ে উঠল—'করি, রোজ করি। করি কী আর সাধে। দু-দুটো বৌ-এর পেট ঠেসে এই যে রাবণের গুষ্ঠি বিয়োন হয়েছে, সেগুলি কার পিণ্ডি চটকায়, অমন সাধের সোয়ামী হয়ে কার পিণ্ডি চটকান হয়, তার খবর রাখে কেউ। দেখুক, দেখুক এসে বোষ্টমের পো।'

সেই হুলো বেড়ালের নখের আঁচড় পড়ল পেটে এবং পৈতেটা টেনে ধরে তাকে নিয়ে চলল ঘরের কোণে। গোঁসাইজি ঘাবড়ে গেলেন, তক্তাপোশের নিচে, হাঁড়িতে, কলসিতে, কেরোসিনের টিনে কানায় কানায় ভরা চাল। শুধু চাল।

'দেখুক, দেখুক বোষ্টমের পো, দেখুক—' কান্না আর গোঙানির সঙ্গে সেই একটানা অনুযোগ—'এই এতগুলো পেট যাতে চলে তার জন্য রোজ রোজ আমি বাবুদের বাড়ি থেকে চুরি করি। করিই তো। নইলে অপদার্থ বাপ তো আর কাঁদবে না ওগুলো না খেয়ে মরলে। শুধু কী এই! আরও, আরও...'

কেঁদেকুঁদে সেই হুলো বেড়াল তক্তাপোশের তলা থেকে জং-ধরা পুরনো একটা টিনের বাক্স বের করল এবং বাক্সের ভিতর ছাইপাঁশ ঘেঁটে একটা রঙিন পাথর বসানো সোনার হার। ওজনে ভারি, চওড়া, সুন্দর নক্‌শা। মেমসাহেবদের গলায় দেখা যায় অমন জিনিস। চমকে উঠলেন গোঁসাইজি,

হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুর্গা। হ্যারিকেনের মিটমিটে আলোতেও যেন চোখ ধাঁধিয়ে গেল ওদের।

'দেখুক, দেখুক গোঁসাইর পো, এ হার বেচে দুগ্‌গার বে দেব আমি।' এবং সঙ্গে সঙ্গেই হুলো বেড়াল ছুটে গিয়ে ঘরের কোণ থেকে একটা চ্যালা-কাঠ এনে সজোরে পিটোতে শুরু করল গোঁসাইজিকে—'তবে বলুক, বলুক গোঁসাইর পো, আমার ছেলে বদমাশ হয়, আমার মেয়ে খানকি হয়, খানা-ডোবায় ডুবে মরে তো কার বাপের কী! হাড়জ্বালানো বুড়ো, খুনী বলুক, বলুক…'

'মা আ আ আ'—ছুটে এসেছিল দুর্গা, এত হট্টগোলে আর সব ছেলেমেয়েরাও জেগে উঠে বোবা হয়ে গিয়েছিল। মায়ের সেই ভয়ংকর ভৈরবী মূর্তির সামনে তখন সবাই কাঁপছে।

এবং সেই ক্লান্ত, ক্ষুধার্ত, ভাঙা শরীরে পিঠে-মাজায়, হাঁটুতে মার খেতে খেতে যুক্তকর বুকে তুলে, পৈত্রিক ভিটেয় ফেলে-আসা শ্রীশ্রীভগবানের স্বর্ণবিগ্রহ ধ্যানে কল্পনা করে, নিমীলিত নেত্রে জপতে লাগলেন গোঁসাইজি—'মারুক, মারুক প্রভু, আমাকে মেরে ওদের শান্তি হোক। বাঁচিয়ে রেখে মানুষ-চেনার এই দৃষ্টি দিলে কেন প্রভু, কেন এ শাস্তি দিলে। বাঁচিয়েই যদি রাখবে প্রভু, অন্ধ করো, অন্ধ করো…পৃথিবীর সব সৎ আর গরিব মানুষকে অন্ধ করে দাও—'

এবং এত ঘটনার পরেও দয়াময় ঈশ্বরের পৃথিবীতে নীরবতা এলো। দুর্গা আর দুর্গার মা অবশ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল। হয়তো কাঁদতে আর পারছিল না। ছেলেমেয়েগুলোও বেহুঁস। গোঁসাইজি উঠলেন। হাতড়ে হাতড়ে দেশলাই-কুপি আর ভাঙা আরশিটা খুঁজে নিলেন। পা টিপে এসে সন্তর্পণে বাঁশটা ঘুরিয়ে, দর্মার দরজা ফাঁক করে বাইরে এলেন। বাইরে তখন রাসপূর্ণিমার আলোর মতো পবিত্র জ্যোৎস্না, গোটা কলোনিটা নিঃঝুম, ঘরগুলির ছায়া কেমন যেন ভুতুড়ে ভুতুড়ে ঠেকে, ভয় লাগে মনে। এমন সুন্দর কলোনিটায় এক বিপনে ছাড়া আর-কোনো মানুষ নেই! সব জানোয়ার হয়ে গেছে! আর আমি!

বুকটা ধড়াস করে কেঁপে উঠল গোঁসাইজির। সত্যি তো, আমি নিজে কি? খড়ম পরেন নি তিনি, শব্দ হবে বলে। একেবারে কলোনির পূবকোণে ধর্মদাস কবিরাজের ঘরের পিছনের ডোবাটার ধারে কৃষ্ণচূড়া গাছটার তলায় এসে একবার বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলেন। সাহস কুড়োলেন।

ডোবাটার জলে কচুরিপানা, শ্যাওলার ফাঁকেও ঝলমল করছে চাঁদ। চারদিকের বনতুলসীর ঝোপের জঙ্গলে বুনো গন্ধ। বড়ো নির্জন, কেউ বড়ো আসে না এখানে। ঠিক এ জায়গাটাই বেশ নিরাপদ মনে করলেন গোঁসাইজি। কুপি আর দেশলাইটা পায়ের কাছে রেখে ভাঙা আরশিটা চেপে ধরলেন বুকে। চোখ বুজলেন। কি দেখবো প্রভু! পাপ! পাপ আমি করি নি কখনও।

কাঁপতে কাঁপতে আরশিটার দিকে একবার তাকালেন গোঁসাইজি। বুক থেকে তুলে এনে একটু উপুড় করতেই আরশির ভাঙা কাচে ঝলসে উঠল চাঁদ। গোঁসাইজি চমকে উঠেই আবার বুকে চাপলেন। তাকাব না। বিশ্বাস নেই। বুনো কুকুর আমি নই, শেয়াল নই, শকুন নই, বাঘ নই, ভল্লুক নই, হনুমান নই। কিন্তু মিথ্যেকথার পাপ কী প্রভু? দালালি করার পাপ, বেশ্যার হাত থেকে নারায়ণ শিলা তুলে নেবার পাপ, পরের চুরি-করা অন্নে পেট ভরাবার পাপ, বেশ্যার বাপ হওয়ার পাপ, খুনীর বাপ হওয়ার পাপ?

আবার সাহসে ভর করে বুকের সঙ্গে লেপটে আস্তে আস্তে আরশিটাকে তুলতে লাগলেন গোঁসাইজি। কিন্তু থুতনি পর্যন্ত এসেই থমকে গেলেন। ঘামে নেয়ে উঠল সারা শরীর। ওদিকে কাঁঠালগাছটার জটলা থেকে ডানা ঝাপ্‌টে উড়ে গেল কয়েকটা বাদুড়। থরথর করে কেঁপে উঠলেন। মনে হলো যেন শরীরের সমস্ত রক্ত জমাট বেঁধে স্থির হয়ে গেছে আর মাথার শিরাগুলি দপ্‌দপানি থামিয়ে কেমন ঝিমিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ। কিন্তু তবু প্রাণপণ সাহস কুড়িয়ে শেষ চেষ্টায় আচম্‌কা আরশিটাকে চোখের উপর টেনে তুললেন। ধাক্কা খেলো চশমার কাচ আর আরশির কাচ। কিন্তু শেষবারও পারলেন না। চোখ খুলে তাকাতেই পারলেন না এবার। এ যে আত্মদর্শন প্রভু! শেষে নিজেকেও জানোয়ার দেখলে বাঁচব কি নিয়ে?

'বাবা!'

এই নিশীথরাতের ভয়ংকর নির্জনতার মধ্যে হঠাৎ যেন আঁৎকে উঠলেন গোঁসাইজি। ফিরে তাকালেন—দুর্গা।

'তুই!'

'এত রাতে একা একা বেরোলে। ভয় লাগল যে। চুপি চুপি এলাম। কি করছ তুমি এখানে?'

'কি করছি ? সত্যিই তো, কি করছি ?' হঠাৎ লজ্জা পেলেন গোঁসাইজি, কিছুটা বিরক্তি, নিজের উপর ক্রোধ। হাতের মধ্যে আরশিটার অস্তিত্ব অনুভব করলেন। শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে আরশিটাকে ছুঁড়ে মারলেন ডোবাটার দিকে যেখানে বেহায়া চাঁদটা দাঁত বের করে খিলখিলিয়ে হাসছে। দেখুক, অলক্ষুণে চাঁদটা ওর নিজের মুখ দেখুক !

'ওটা কি ফেললে বাবা।'

'আমার শত্তুর।'

'ও তো আরশি।'

মেয়েকে জড়িয়ে ধরলেন গোঁসাইজি। এবং এত কিছুর পরেও তিনি হাসলেন, অথবা হাসতে পারলেন। চোয়ালভাঙা মুখে একগাল হেসে, মেয়ের মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন—'হুঁ, আরশিই তো আমার শত্তুর মা। ওর দিকে তাকাতে নেই।'

ভয়ে বিস্ময়ে দুর্গা ওর বাবার দিকে তাকাল। যেন একটা রহস্যের দিকে। সেই তখন থেকে কলোনির মানুষগুলি বলছে—ঠাকুরমশাই পাগল হয়ে গেছে। সত্যি কী তাই।

কিন্তু পাগল হন নি গোঁসাইজি। ব্যাপারটা প্রমাণিত হলো পরদিন সকালে। লাঠি-সোটা নিয়ে গুটিকতক ভল্লুক এলো, সঙ্গে ভল্লুকদের সর্দার দুজন গোরিলা। গোঁসাইজিকে যেতে হবে এবং এক্ষুণই। কোথায় কোন এক কেউকেটা বড়োলোকের ঘরে কাল রাতে খুন হয়েছে, সারারাত ধরে হিমশিম খেয়েও কোন হদিস মিলছে না, এত বড়ো শহরের কয়েক ডজন গোরিলা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে, কুকুরগুলিও নাকি জিব বের করে হাঁফাচ্ছে, অথচ গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে নাকি খবরের কাগজে রেডিওতে ইতিমধ্যেই তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং গোঁসাইজি যদি অনুগ্রহ করে যান, বক্‌শিস মিলবে প্রচুর, চাই কী, গোটা কলোনিটা কিনে ফেলতে পারবেন কাল। সুতরাং ভগবান আর মহাপ্রভুকে প্রণাম করে গোঁসাইজি যাত্রা করলেন। এবার তাঁর দিন ফিরবে।

সে এক হুলুস্থুল ব্যাপার। যেন একটা রাজবাড়ি, বাড়িটার সামনে কাতারে কাতারে সাধারণ সব জন্তু-জানোয়ারের ভিড়—গরু, ছাগল, মোষ, বাঁদর, হনুমান, শেয়াল, কুকুর, আর কয়েক শ' ভল্লুক, আর তারও চেয়ে বেশি মোটরগাড়ি।

বাড়িটার ভিতরে ঢুকে আর এগোতে পারছিলেন না গোঁসাইজি। গোটা বাড়িটা যেন দুধ দিয়ে ধোয়া। ভিতরে কী সুন্দর বাগান! মাঝখানে ফোয়ারা, চারদিকে বাহারের ফুলগাছ, ন্যাংটো মেয়েমানুষের মূর্তি, জ্যান্ত ময়ূর। এই বাড়িটাতে নাকি একটা মানুষ খুন হয়েছে কাল! আরও আশ্চর্য, কেউ কাঁদছে না! কাঁদলেও, এত বড়ো বাড়ি, শোনা যাচ্ছে না। শুধু উঁচুদরের জানোয়ারগুলি গিজ-গিজ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। জন্তুকুলে এরাই কুলীন—হাতি, সিংহ, বাঘ, গণ্ডার। কাল সন্ধ্যা থেকে এদের কোথাও দেখেন নি গোঁসাইজি। এ বাড়িটা কার আর এ জন্তুগুলিই বা কারা।

গোরিলা দু'জন গোঁসাইজিকে পরিচয় করিয়ে দিল ওদের বড়ো সর্দারের সঙ্গে—লম্বা চওড়া ঢ্যাঙা একটা বনমানুষ। এবং সেই বনমানুষটাই তাকে একতলা দোতলা পেরিয়ে নিয়ে গেল তিনতলার প্রকাণ্ড একটা ঘরে। ঘরটা এত বড়ো যে, দুদিকের মাথায় বাঁশ পুঁতে ছেলেরা ফুটবল খেলতে পারে। ঘরের ভিতর ভিড় করে আছে কুলীন সব জন্তু-জানোয়ারগুলি। শ্বেতপাথরের মেঝেতে খড়মের খটাখট বাজাতে বাজাতে গোঁসাইজি যেখানে গিয়ে দাঁড়ালেন—সেখানে মেহগনি কাঠের মস্ত একটা পালঙ্ক। এরই মধ্যে পালঙ্কটা নানা ফুলে আর ফুলের মালায় পাহাড় হয়ে উঠেছে, পালঙ্ক ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়ছে মেঝেতে।

বনমানুষটা থামলেন—'এই সেই মাননীয় ধুন্ধরীলাল হনুমানপ্রসাদজির মৃত-দেহ ঠাকুরমশাই। কাল রাত আনুমানিক তিনটে সাতচল্লিশ মিনিট একত্রিশ সেকেণ্ডে আততায়ীর হাতে খুন হয়েছেন। কিন্তু কে যে খুনটা করল ঠিক ধরতে পারছি না।'

পাশে দাঁড়িয়েছিল একটা বাঘ। কলকাতার দোতলা বাসগুলির গা থেকে উঠে এসেছে মনে হয়। গোঁফে তা দিয়ে বলল—'বড়ো মহাত্মা ছিলেন হনুমানজি। গোটা ভারতবর্ষে যার কোটি কোটি টাকার ব্যবসা, দিল্লী-বোম্বে তো দূরের কথা, লণ্ডন-ওয়াশিংটনে শেয়ার মার্কেট উথাল-পাথাল হবে ভয়ে তিন-তিনটে নাপিত যার পায়ের নখ কাটতে হিমসিম খেত—'

ওদিক থেকে নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা হাতি। এত জোরে শুঁড়টা পাক দিলো যে, ভয়ে তিন হাত পিছিয়ে এলেন গোঁসাইজি। খড়ম থেকে পা-টা হড়কে গেল। হাতিটা বলল—'শুধু কী তাই। কত বড়ো একটা দিল্

ছিল হনুমানজির। কী দেশপ্রেম। সেবারে ছেলেটা পরীক্ষায় ফেল মারল শুনে কি বললেন জানেন? বেশ, ভালোই হলো। দেশের কিছু ফরেন একৃস্‌চেঞ্জ বাঁচল। পাশ করলেই তো বিলেতে পাঠাতে হতো। তারপরই ব্যবসায় লাগিয়ে দিলেন। ব্যবসার জন্যেই সে-ছেলে অবিশ্যি এখন আমেরিকাতেই আছে। ট্রাঙ্ক-কল গেছে, আজ রাতেই প্লেনে ফিরবে মনে হচ্ছে। ফরেন একস্‌চেঞ্জ বোঝেন ঠাকুরমশাই, ফরেন একৃস্‌চেঞ্জ···মানে··· বিদেশী মুদ্রা···মানে···'

অনেক কিছুই বোঝেন না গোঁসাইজি, বুঝলেনও না। শুধু বুঝলেন, এই জন্তুগুলি খুব মুরুব্বিলোক, দেশটাকে চালায় এবং এতগুলি মুরুব্বি একসঙ্গে তাঁকে কিছু বলতে বা বোঝাতে চাইছে। গর্বে, অহংকারে বুক ফুলে উঠল তাঁর। কালকেতুর গল্পটা মনে পড়ল। দেবী ভগবতীর কাছে পশুরা যেমন তাদের দুঃখের কথা বলেছিল, অনেকটা তেমনি। তিনি ভাবলেন, এদের যদি খুশি করা যায়, তাহলে আর ভাবনা কী। দিন ফিরবে।

গোঁসাইজি এবার তার কাজ শুরু করলেন। এগিয়ে গিয়ে দেখতে চাইলেন যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, এত কথা সে কে? স্তূপীকৃত ফুলের চাপে মৃতদেহটা হারিয়ে গেছে। তবু এরই মধ্যে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে আবিষ্কার করলেন—একটি অসহায় এবং সৌম্যদর্শন সিংহ। কেশরের লম্বা লোমগুলি এত মোলায়েম আর ধবধবে সাদা আর এত সুন্দর যে, বড়ো সাধ হলো গোঁসাইজির একটু হাতড়ে দেখেন। কিন্তু সময় নষ্ট করলে চলে না। এর মধ্যেই যদি আততায়ী পালিয়ে যায়। সুতরাং তিনি তৎপর হলেন। ভালো করে কানের গোড়া আর নাকের ডগা পরীক্ষা করে দেখে নিলেন—চশমাটা ঠিক আছে কিনা।

তারপর সাদা পাথরের মেঝেতে খটাখট খড়মের বোল তুলে গোঁসাইজি ছুটোছুটি করতে লাগলেন। একে একে প্রত্যেকটি জন্তুর কাছে গিয়ে চারদিক ঘুরে ভালো করে লক্ষ করলেন—ওদের দাঁত, জিহ্বা, নখ, থাবা। হাতির, সিংহের, বাঘের, গণ্ডারের।

'কী করছেন ঠাকুরমশাই! খুনী কি এখানে আছে নাকি? এঁরা তো সবাই ভদ্রজন; শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, সরকারি আমলা, মাননীয় মন্ত্রী···'

'খুনী তো তোমরাই গো, তোমাদেরই একজন—' ওদিকে সকলের অলক্ষ্যে দরজা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল একজন। শিকারী কুকুরের মতো গোঁসাইজি গিয়ে লাফিয়ে পড়লেন, একেবারে জাপটে ধরলেন তাকে—'এবারে বাছাধন,

যাবে কোথা ? হুঁ, ভিড়ের মধ্যে ঘাপটি মেরেছিলে, এবার ?' এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা তুমুল হৈ-চৈ, ক্ষুব্ধ উত্তেজনা ফেটে পড়ল চারদিকে। সবগুলি জন্তু ফুঁসতে ফুঁসতে ছুটে এলো, সিংহের গর্জনে, বাঘের ক্রুদ্ধ ডাকে, হাতির শুঁড়ের ঘন ঘন ওঠা-পড়ায় সে এক ভয়াবহ কাণ্ড। গোঁসাইজি ভয় পেলেন। কাল রাতে চশমা পাবার পর এই তার প্রথম মনে হলো—জন্তুগুলি সত্যি সত্যি জন্তু, মানুষ নয়। এবং এতগুলি জন্তু একসঙ্গে মিশে মেরেই ফেলবে তাকে। আর আশ্চর্য, গণ্ডারটা হাসছে।

সকলের পিছনে দাঁড়িয়েছিল সেই গোরিলাদের বড়ো সর্দার। এগিয়ে এলো সামনে। এসেই এক ঝটকায় গোঁসাইজিকে টেনে নিয়ে প্রচণ্ড জোরে আড়াই মণ ওজনের একটা লাথি—'শালা, শূয়োরের বাচ্চা, শালা, ভণ্ড, কার গায়ে হাত তুলিস খেয়াল নেই তোর।'

একটা মুহূর্তের জন্য গোটা পৃথিবীটাকে একটু স্থির দেখলেন গোঁসাইজি। তারপর কিছুক্ষণের জন্য ঘোলাটে অন্ধকার, কোথায় যে ছিটকে পড়লেন, হুঁস নেই। যখন হুঁস হলো, দেখলেন, তার পাশে শুয়ে কাতরাচ্ছে সেই দু'জন গোরিলা যারা তাকে কলোনি থেকে তুলে নিয়ে এসেছে এবং ভল্লুকদের পাহারায় তাদের তিনজনকেই কোথায় যেন নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

'এ কী করলে ঠাকুরমশাই, ভাবলাম একটা নতুন জিনিস দেখিয়ে সকলকে তাজ্জব বানিয়ে দেব, প্রমোশনটা পাকা করে নেব, উঃ—' ডানদিক থেকে একটি গোরিলা কাতরাতে লাগল।

অন্যটি বলল—'এখন কিনা, চাকরিটা তো গেলই, নিরাপত্তা আইনের ব্যাপার। কতদিন যে পচে মরতে হবে। মন্ত্রী-টন্ত্রী বলে কথা।'

গোঁসাইজি তখন নিজের মাজার ব্যথা নিয়েই প্রায় আধমরা। তাছাড়া তিনি ঠিক বুঝেই উঠতে পারছেন না, কী হলো ব্যাপারটা। তিনি তো ঠিকই দেখেছিলেন, হলপ করে বলতে পারেন, ভুল দেখেন নি—চাপ, চাপ রক্ত গণ্ডারটার নাকের ডগায়, নখের গোড়ায়। বিশ্বাসমতো সত্যি কথা বলায় কি এমন অপরাধ ? কি আর করতে পারেন তিনি, কী-ই বা করবেন ! কতগুলি বুনো জন্তুর হাতে নিজের ভাগ্যকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে অসহায়ভাবে চুপ করে রইলেন।

তারপর ওরা তাকে একটা ভয়ংকর বীভৎস নরকে নিক্ষেপ করল। লোহার গারদটা বন্ধ হয়ে গেল পিছনে। এবং তিনি দেখলেন, তাঁকে ঢুকতে

দেখেই একঝাঁক শকুন, একপাল শেয়াল আর বুনো কুকুর চারদিক থেকে ছেঁকে ধরল তাকে, ওদের মহোৎসব লাগল যেন। নরকের ওই ছোট কুঠুরির আবছা অন্ধকারে শকুনগুলি উড়ে উড়ে ডানা ঝাপটে মাথায়-কাঁধে বসতে চাইছে, নখ দিয়ে ঠোঁট দিয়ে আঁচড়াতে চাইছে। রাগে-ঘৃণায়-ভয়ে গা বমি-বমি করে উঠল গোঁসাইজির, দু-হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে ওদের আটকাতে চাইলেন, ওদিকে শেয়ালগুলি চারদিক থেকে পা-হাঁটু চাটতে শুরু করল, উবু হয়ে ওদের বাধা দিতে চেষ্টা করলেন, কুকুরগুলি দু-পা তুলে তার কোমর আর তলপেট ধরে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাতে লাগল। অস্থির হয়ে উঠলেন গোঁসাইজি। পালাতে চাইলেন, ছুটোছুটি করতে শুরু করলেন,—মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি দাও প্রভু। কিন্তু কোথায় মুক্তি। চারদিকে শক্ত পাথুরে দেয়াল, কোথায় মহাপ্রভুর শ্রীচরণপাদপদ্ম, পায়ের তলায় সারা ঘর জুড়ে বিষ্ঠা, বমি, প্রস্রাবের স্রোত। দুর্গন্ধ, পচা ভ্যাপসা দুর্গন্ধের মধ্যে এক নরকযন্ত্রণা। গোঁসাইজি পাগল হয়ে উঠলেন। গলার সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করতে লাগলেন এবং সেই চিৎকার নরকের সেই বদ্ধ গুহার অন্ধকার দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে তাঁর নিজের কানকেই আঘাত করছে। এবং তিনি আরও বেশি অস্থির, আরও বেশি বেপরোয়া হয়ে উঠলেন। দুর্বল শরীরের সব শক্তি দিয়ে হাত-পা ছুঁড়ে, কিল-ঘুষি, চড়-লাথি মেরে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এতগুলি জন্তুর সমবেত আক্রমণের সামনে তাঁর সমস্ত প্রতিরোধ আস্তে আস্তে, একটু একটু করে একেবারে শিথিল হয়ে এলো, অবশ হয়ে এলো তাঁর শরীর, তিনি গড়িয়ে পড়লেন, লুটিয়ে পড়লেন বিষ্ঠা বমি আর প্রস্রাবের স্রোতে। একটা শকুন তার বুকের উপর, হঠাৎ দু'দিকে বিরাট দুটি ডানা ঝামটে উল্লাসে মেতে উঠে বিষাক্ত তীক্ষ্ণ ঠোঁটে অতর্কিতে কামড়ে ধরল তার কণ্ঠনালী। কে যেন আচমকা চশমাটা কেড়ে নিল তার। চমকে উঠলেন গোঁসাইজি—হরিপদ, তাঁর ছেলে, তাঁর সন্তান দু' হাতের শক্ত থাবায় গলায় টুঁটি চেপে ধরে ছিঁড়ে ফেলতে চাইছে। গোঁসাইজি শুনলেন কে যেন বলছে—'এ নরকে তুমি কেন, তুমি কেন ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির।' কিন্তু উত্তর দিতে পারছেন না গোঁসাইজি। কণ্ঠনালীতে একটা পাথরের চাপ আস্তে আস্তে বেড়ে উঠছে, সমস্ত রক্তস্রোত ধীরে ধীরে জমে শক্ত হয়ে গিয়ে মাথাটাকে ভারি করে তুলেছে, ঝিমিয়ে পড়ছে শরীর, অবশ হয়ে আসছে, দু' চোখে গাঢ় অন্ধকার, একটা ঠাণ্ডা তরল

রক্তের স্রোত···হরিপদ··আমার ছেলে···সন্তান···আমায় পিণ্ড দিস, পিণ্ড দিস বাবা···হরিপদ···একটা শকুন···খুন···খুনের রক্ত···তোমার কপালে গুপীচন্দনের রসকলি···কে বলছে রে?···তুই?···একটা আরশি···আরশি আমার শত্তুর···হাতটা সরিয়ে নে বাবা, আমার লাগছে···হরিপদ, পিণ্ড দিস··· নরক থেকে বাঁচাস···হরি···আঃ···আ···আ···

(কলকাতার বিবিধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংক্ষিপ্ত খবর— কলিকাতার আউটরাম ঘাটে গতকাল ভোরে এক অজ্ঞাতনামা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের মৃতদেহ খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ময়না তদন্তে জানা যায়, মৃত্যুর কারণ অনাহার ভীতি-সঞ্জাত হৃদয়-দৌর্বল্য।)

অশোক মুখোপাধ্যায়

রাত্রি

Armand L. Zimmermann-এর কাব্য
একাঙ্ক 'A Dream' অবলম্বনে 'রাত্রি'

চরিত্রলিপি

স্বাতী
অভীক
বাবা
মা
রাতুল
ছায়ামূর্তি
কোরাস

[পর্দা সরে গিয়ে অন্ধকার মঞ্চকে প্রকাশিত করে। রাত। স্বাতী তার বিছানায় ঘুমোচ্ছে। ধমনী স্পন্দনের মতো ক্ষীণ আবহসংগীতে রবীন্দ্রনাথের 'এ পরবাসে রবে কে' গানটির সুর বাজছে। ক্রমশ সংগীত জোর হতে থাকে। কুয়াশার মতো আলোয় কোরাস-কে আবছা দেখা যায়। সংগীত যখন উচ্চতম গ্রামে তখন কোরাসের অন্তর্বর্তী একটি কণ্ঠ বলে ওঠে—সেই মুহূর্তে সংগীত নীচু হয়ে যায়।]

কণ্ঠ ॥ শোনো, স্থির হও।

কোরাস ॥ শোনো, স্থির হও।

এই আমাদের দেশ, এ একটি স্বপ্ন। এ সেই অপরিচিত আর সীমাহীন পৃথিবী যার আলোকিত ছায়াপথে স্বপ্নার্ত মানুষেরা ঘুরে বেড়ায়। দিনের সব দৃশ্য আর শব্দ এখানে নিশীথের অস্থির নিদ্রায় কালো হয়ে যায়, কুঁকড়ে যায় লণ্ঠনের সর্পিল ছায়ার মতো।

স্বাতী ॥ (ঘুমের মধ্যে) অভীক!

কণ্ঠ॥ শোনো! স্বপ্নাতুর মানুষ ডাকছে। তার আবছায়া অদ্ভুত পৃথিবী থেকে এই বধির বিশ্বের কাছে পাঠাচ্ছে আপন আর্তি। স্বপ্নার্তের অস্ফুট ডাক কে শোনে!

কোরাস॥ পথ হাঁটো, তোমরা স্বপ্নের ভেতর দিয়ে, একা। স্পন্দমান তোমার হৃদয় নিয়ে এই নিশীথ নৈঃশব্দ্যে পথ হাঁটো একা।

স্বাতী॥ (ভীত গলায়) অভীক! অভী!

কণ্ঠ॥ ও ডাকছে, সাহায্যের জন্য ও ডাকছে। এই প্রবল দুঃস্বপ্নের পীড়িত পৃথিবীতে কে সাহায্য করবে? এখানে কম্পিত পথ দিয়ে হত্যা গড়িয়ে চলে যায়। এখানে সব দরোজা আঁট করে বন্ধ।

স্বাতী॥ (ভয়ে) ওদের এগোতে দিও না! আমাকে ছুঁতে দিও না ওদের।

কণ্ঠ॥ এই বিশৃঙ্খল কোলাহলের মাঝখানে কে আশ্রয় দেবে? মৃত্যু আর ধর্ষণ এই পৃথিবীর প্রান্তরে নিষ্ঠুর দাঙ্গা লাগিয়ে দিয়েছে।

কোরাস॥ ওঠো! জাগো! এই রাত এক রক্তিম হত্যার সাক্ষ্য হয়ে থাকবে। ওঠো! জাগো!

[দরোজা আচমকা খুলে যায়। অভীক ঢোকে। তার চলাফেরা উত্তেজিত, তাড়া-খাওয়া মানুষের মতো। দৌড়ে সে স্বাতীর শয্যার প্রান্তে চলে যায়। স্বাতীর ঘুম ভাঙে। সে উঠে বসে।]

স্বাতী॥ (আনন্দিত উত্তেজনায়) অভীক, তুমি এসেছ! (খুব সাধারণ গলায়) তুমি আসায় আমার খুব ভাল লাগছে।

অভীক॥ শ্-শ্-শ্। (আলতো হাতে সন্তর্পণে দরোজা বন্ধ করে দেয়।) ওরা আমার পেছনে আসছে। আমি ভেবেছিলুম খুব জোরে দৌড়লে ওদের এড়ানো যাবে।

স্বাতী॥ কে, অভী, কারা?

অভীক॥ কালো ফৌজ

স্বাতী॥ (চমকে ওঠে) মৃত্যুর সৈনিকেরা!

কোরাস॥ রাত্রির অন্ধকারে শব্দহীন তারা আসছে। তাদের হাতে নির্মম রাইফেল। দরোজা থেকে দরোজায় পাথরে পা ফেলে ফেলে তারা দৌড়চ্ছে।

অভীক ॥ (চমকে ফিরে তাকিয়ে) কে ওখানে—ওখানে কারা? (রিভলভার বার করে) সাবধান—আমি খুন করার জন্য গুলি ছুঁড়বো।

কোরাস ॥ স্থির হও। অপেক্ষা করো। তোমার দান আসবে। মনে রেখো, তোমার আর্তনাদে আপন অক্ষপথে পৃথিবীর আবর্তন দ্রুততর হবে না। এই স্বপ্নের সুড়ঙ্গে শেষ পর্যন্ত তোমাকে হাঁটতেই হবে। মনে রেখো, নিয়তি অপরিবর্তনীয়।

কণ্ঠ ॥ নিশীথের কুহকে মৃত ভাবনারা স্পন্দিত জীবন পায়। মুদিত চোখের সামনে দিয়ে মিছিল করে যায় দিনের সব টুকরো কাজের ভিড়। কোন কাজ, কোন বাসনা, কোন চিন্তা, কোন শব্দ মগ্ন চৈতন্যের এই প্রখর বেড়াজালকে এড়িয়ে পালাতে পারে বিস্মরণের অতলে? পুরাতনের কঠিন পুনর্বিচার হয়। অনাগতের আশ্চর্য অভিষেক। অস্তিত্বের জটিল ধাঁধাঁর কত নতুন সমাধান আবিষ্কৃত হয়, লুপ্ত হয়। সত্য ঝলসিয়ে ওঠে—ন্যায়ের অমোঘ কৃপাণ অভ্রান্ত লক্ষ্যে নেমে আসে।—অপেক্ষা করো। তোমার দান আসবে।

অভীক ॥ ওখানে কে? আমাকে উত্তর দাও।

স্বাতী ॥ (ওকে সংযত করতে চেষ্টা করে) অভী, তুমি শান্ত হও। ওখানে কেউ নেই, অভী।

অভীক ॥ (স্বাতীকে সরিয়ে দেয়) আর এক পা এগোও—আমি ক্ষমাহীন গুলি কোরবো।

কোরাস ॥ স্থির হও। এখনও তোমার সময় আসে নি।

স্বাতী ॥ (নরম গলায়) ওরা চলে গেছে, অভী। সব ঠিক হয়ে গেছে। ওরা চলে গেছে। আর কোনো ভয় নেই।

অভীক ॥ (চাপা উত্তেজনায়) না, আমি এখনও ওদের কথা শুনতে পাচ্ছি। (আচমকা দরোজাটা খুলে ফেলে। বাইরে তাকায়।)

স্বাতী ॥ দেখো, বাইরে অনাহত শান্তি। কি স্নিগ্ধ আর শব্দহীন রাত!

অভীক ॥ (একটু একটু করে শিথিল হয়) হ্যাঁ। (দরোজা বন্ধ করে। বিছানায় এসে বসে। স্বাতী ওকে কাছে টানে। স্বাতীর কোলের উপর মাথা রেখে ও শুয়ে পড়ে।) এত শব্দহীন—আমি তোমার বুকের স্পন্দন শুনতে পাচ্ছি। রাতের নৈঃশব্দ্য সাঁতরে কয়েক মাইল দূর থেকে ভেসে আসা মাদলের ক্ষীণ দ্রিমি দ্রিমি যেন। এত স্নিগ্ধ আ'র শব্দহীন রাত—(স্বাতীর হাত দুটো ওর মুঠোয় নিয়ে নিজের বুকের উপর চেপে ধরে।

স্মৃতি-মন্থর গলায়) ঠিক সেই রাতের মতো যেদিন সোনা-গলানো হ্রদের বুকে আমরা আমাদের নৌকো ভাসিয়েছিলুম—সেই রাত! আ, কতদিন হয়ে গেল। জলের তলায় স্ফুরিত নক্ষত্রের মতো সেদিনও এমনি কাঁপছিল তোমার বুকের আওয়াজ—দাঁড়ের মৃদু অভিঘাত স্থির আলোকিত জলে ভঙ্গুর বৃত্তের আল্‌পনা আঁকছিল। জলের ওপর হাল্‌কা কুয়াশা ছিল—

কোরাস॥ (মন্ত্রোচ্চারণের ভঙ্গীতে মৃদু গলায় আবৃত্তি ও পুনরাবৃত্তি করতে থাকে—মঞ্চের দুপাশে ভাগ হয়ে গেছে তারা) জলের ওপর হালকা কুয়াশা ছিল, জলের ওপর স্থির কুয়াশা, জলের ওপর অন্ধ কুয়াশা ছিল, জলের ওপর ধীর কুয়াশা, জলের ওপর হালকা কুয়াশা ছিল,······(মৃদু গলায় বলে চলে, সেই সমবেত অস্পষ্ট উচ্চারণের পটভূমিতে অভীকের গলা শোনা যায়—)

অভীক॥ রাতের কালো আকাশের বুকে শাল আর পিয়ালের ছায়া-মিছিল—সেই বুনো পথটা দিয়ে আমরা যখন হাঁটছিলুম মহুয়া ফুলের গন্ধে ভারী হয়ে ছিল বাতাস—আর সেই স্তব্ধ মাঠের প্রান্তে এসে যখন দাঁড়ালুম, একটা আশ্চর্য উল্কা একটি ছুটন্ত প্রদীপের মতো নেবে এল আকাশের বুক চিরে—তোমার মনে আছে, স্বাতী? তোমার মনে আছে, আমরা স্বপ্ন দেখেছিলুম, সেই শান্তি চিরকাল থাকবে তেমনি অ-স্পর্শিত?

স্বাতী॥ সেই বসন্তকে কত দূরে ফেলে এসেছি। সব কিছু কী নিঃসীম পালটিয়ে গেছে!

অভীক॥ সেই রাতে আমি তোমাকে ভালবেসেছিলুম। আর তুমি আমাকে। সেই রাতে।

স্বাতী॥ আমি কি ভয় পেয়েছিলুম!

অভীক॥ আমি বলেছিলুম, তুমি পাশে থাকলে আমি পৃথিবীর সঙ্গে পাঞ্জা ধরতে পারি, একা। মনে আছে?

(কোরাসের সমবেত উচ্চারণ হঠাৎ থেমে যায়। নৈঃশব্দ স্ফটিকের মতো দৃঢ় ও স্বচ্ছ মনে হয়।)

স্বাতী॥ সব মনে আছে। এত তীব্র মনে আছে যেন গত রাত। আর এখন—(নিজের হাতের উপরে রাখা অভীকের হাতের দিকে তাকায়) ও কি?

[কোরাসের দুটি বিচ্ছিন্ন অর্ধবৃত্ত অতি ধীরে ওদের দিকে এগোতে থাকে। অভীক চম্‌কে উঠে বসেছে!]

অভীক ॥ কি ?—কই, কেউ নেই তো ?

স্বাতী ॥ তোমার হাতের ঐ দাগগুলো—

অভীক ॥ (আপাতলঘু ভঙ্গীতে) ও কিছু নয়। ছায়া পড়েছে হয়তো।

স্বাতী ॥ না।

অভীক ॥ ধুলো বা কাদার দাগও হতে পারে—পথে দৌড়তে দৌড়তে পড়ে গিয়েছিলুম তো—(হাত সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে)

স্বাতী ॥ দাগগুলো টকটকে লাল—

[কোরাস এগোচ্ছে।]

। না, স্বাতী, না !

স্বাতী ॥ ওগুলো রক্তের দাগ।

অভীক । (যন্ত্রণার্ত গলায়) আঃ, চুপ করো !

[কোরাস প্রবাহের মতো এসে ওদের ঘিরে ধরে। অভীক ও স্বাতীকে পরিষ্কার দেখা যায় না।]

স্বাতী ॥ তোমার দু হাত ভর্তি রক্তের দাগ।—অভী, তুমি কি করেছ ?

অভীক । কি করেছি ? আমি—আমি একটি মানুষকে খুন করেছি।

[তীব্র আর্তনাদ করে কোরাস ওদের সামনে থেকে দ্রুত পায়ে সরে যায়। স্বাতীর শয্যার পেছনে একটি সরলরেখায় কোরাস দাঁড়ায় ও গভীর উত্তেজনায় ঝুঁকে পড়ে স্বাতী ও অভীকের কথা শুনতে থাকে।]

স্বাতী ॥ তুমি খুন করেছ ?

অভীক (কঠিন গলায়) একজন সৈনিককে। পথে দৌড়াচ্ছিলুম। সে আমাকে থামতে বলল। বলল, নাচো।

স্বাতী ॥ নাচতে বলল ?

অভীক ॥ হ্যাঁ, নাচ, নাচতে বলল।

[নেপথ্যে সৈনিকের কণ্ঠ : এ্যাই, দাঁড়াও ! রাস্তা দিয়ে অমন দৌড়োচ্ছ কে হে ? দাঁড়াও, দাঁড়াও, তোমার মুখটা দেখি !]

অভীক ॥ আমি তাকে খুব ভালো চিনি। একটা ভীতু, ছিঁচকে শয়তান। মদ খেয়ে অসুস্থ, অস্থায়ী সাহস জোগাড় করে রাস্তায় চেঁচাত,

একে তাকে অপমান করত, অকারণ মারামারি বাধিয়ে দিত। জানত, কেউ কোনোদিন ওর বিরুদ্ধে একটা আঙুলও তুলবে না।

[নেপথ্যে সৈনিকের কণ্ঠ : প্রেয়সীর কাছে যাবে বলে দৌড়োচ্ছ, মাণিকচাঁদ ? এ্যাই, এদিকে আয়, দেখি তোর পকেটে কি আছে।]

অভীক॥ আমার কাছে যা ছিল, আমি ওকে দিয়ে দিলুম। দিয়ে ভাবলুম, যাই।, ও আমার সামনে এসে দাঁড়াল। নোংরা জিভ বার করে ওর ঠোঁট দুটোকে চাটল—মোটা, লাল, ভিজে-ভিজে সেই বীভৎস ঠোঁট।

(নেপথ্যে সৈনিকের কণ্ঠ : অ্যা, দাঁড়াও, দাঁড়াও। অত তাড়া কিসের ? চল, আমরা ঐ পাঁচিলটার আড়ালে একটু যাই। এ্যাই, ছুঁড়িটাকে কি রকম দেখতে রে—পীরিতের বিছানায় বসে যে তোর জন্যে হা-পিত্যেশ করছে ? এ্যাই, কথা বল ! অ ! আচ্ছা ! কুত্তাদের কথা বলাবার দু একটা কায়দা অবশ্য আমার জানা আছে !)

স্বাতী॥ অভী, আমার ভীষণ ভয় করছে !

অভীক॥ (স্মৃতিতে আবার সেই রক্তাক্ত অভিজ্ঞতায় ফিরে গেছে) আমি একটা দেওয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম। ও আমার দিকে একটু একটু করে এগোতে লাগল। রাস্তার আলোর একটা বাঁকা রেখা এসে পড়েছিল ওর গায়ে। রাত্রির মতো কালো পোশাকে মোড়া ছিল ওর শরীর। আর ওর চোখ—তাও যেন দু টুকরো জমাট অন্ধকার। আর ওর হাতের বেয়নেট—

(নেপথ্যে সৈনিকের কণ্ঠ : তোকে নাচতেই হবে। নইলে চিরকালের জন্য তোর সব চলা-ফেরাই আমি খতম করে দেব। এ্যাই কুত্তার বাচ্চা, নাচ। নাচ, আর এ্যাকটা গান ধর। এ্যাকটা জমাটি দিল্ চশপি গান। নাচ। নাচ বলছি। একটা গান কর আর নাচ, আর নাচ—)

কোরাস॥ (নীচু গলায় শুরু করে, ক্রমশ জোর হয়) আর নাচ, আর নাচ আর নাচ, আর নাচ, আর নাচ, আর নাচ, আর নাচ—

[কোরাসের সমবেত উচ্চারণ যখন তুঙ্গবিন্দু স্পর্শ করে তখন অভীক আর্তনাদ করে ওঠে। কোরাস উঁচু হাসিতে ভেঙে পড়ে।]

অভীক॥ আমি আর সহ্য করতে পারলুম না। ও বুঝতে পেরেছিল

যে আমি লড়ব। একটা ঈগলের মতো ও ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার ওপর। আমি নীচু হয়ে বসে পড়তেই আমার ওপর দিয়ে গড়িয়ে ওর শরীরটা চলে গেল। আমি বিদ্যুদ্বেগে ফিরে ওকে চিৎ করে ফেললুম। পাগলের মতো পেঁচিয়ে ধরলুম ওকে আমার সবটুকু জোর দিয়ে। বেয়নেটের দখল নিয়ে আমাদের দুটো হাত তখন দুটো সাপের মতো লড়ছিল। আঃ, হঠাৎ আমার মুঠোর মধ্যে ঠাণ্ডা ফলাটা আমি অনুভব করলুম। উঁচুতে উঠে গেল আমার শাণিত হাত এক মুহূর্তের জন্য—তারপরে কি তীব্র বিঁধে গেল বেয়নেট ওর বুকের গভীরে। ও একবার আর্তনাদ করে উঠে স্থির হয়ে গেল। (নিরুদ্বেগ আদিমতা কণ্ঠে নিয়ে) ওর হৃৎপিণ্ডে ফলাটা নিরঙ্কুশ অমনি বিঁধে থাকলেও কোনো ক্ষতি ছিল না। তবু আমি ভাবলুম, ওটা কাজে লাগতে পারে। তাই সঙ্গেই রেখেছি।

(জামার আড়াল থেকে বেয়নেটটা বার করে)

স্বাতী॥ এটা এখনও ভেজা!

অভীক॥ হ্যাঁ, রক্তে ভেজা। একবারের জন্য অন্তত ওদেরই রক্তে ফলাটা ভেজানো গেছে। আমি ওর কোমর থেকে রিভলভারটা খুলে নিতেও ভুলি নি অবশ্য—সেটাও কাজে লাগবে।

স্বাতী॥ এখন কি হবে, অভী? তুমি যে ওদের একজনকে মারলে, ওরা তোমাকে পেলে কি ক্রূর প্রতিশোধ নেবে—তোমাকে ছিঁড়ে ফেলবে ওরা অভী—(কান্নায় ভেঙে পড়ে)

অভীক॥ (বেয়নেটটা বিছানার উপর রাখে) ওরা তো বলেছেই আমাদের কাউকেই ওরা ছেড়ে দেবে না। সময়মতো সবাইকেই ওরা মুছে দেবে—যেমন করে স্লেটের গা থেকে খড়ির দাগ মুছে নেয় অবহেলায় মানুষ। তবে আর ভয় কি? বরঞ্চ দেখাই যাক না আমরাও পারি কি না ওদের কয়েকটাকে সরিয়ে দিতে—যেমন করে ঘৃণায় জঞ্জাল সরিয়ে দেয় মানুষ।

স্বাতী॥ অভী, অভী, তুমি কী ভীষণ পালটিয়ে গেছ। কী কঠিন আর মরীয়া লাগছে তোমাকে—কি অচেনা লাগছে!

অভীক॥ (প্রবল ঘৃণা আর যন্ত্রণায় ওর মুখ থমথম্ করছিল) হতে পারে। কিন্তু যখন ওর নোংরা ঠোঁটটা চাটতে চাটতে নর্দমার পোকা ঐ মাতালটা আমাকে বলল, 'এ্যাই, নাচ'—আমার মনে হোল, 'হায় ঈশ্বর! এ কি? এ আমরা কোথায় নেবেছি? কি সহ্য করছি আমরা? আমরা

যারা জাতি হিসেবে এত গর্বিত, ঋজু ও সবল ছিলাম?' আমার ভেতরে কি যেন একটা দপ করে জ্বলে উঠল। আর তাই—

স্বাতী॥ আর তাই তুমি···(আশাভরা গলায়) কেউ দেখে নি তো, অভী? তুমি ওকে ওখানেই ফেলে রেখে চলে এলে?

অভীক॥ ওর রক্তে ভেজা শরীরটা কাঁধে ফেলে আমি নদীর দিকে হাঁটতে শুরু করলুম। হঠাৎ শুনলুম পেছনে কিছু লোকের পায়ের আওয়াজ। শরীরটাকে একটা দরোজার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড় করিয়ে গাঢ়তম ছায়ার ভেতর আমি মিশে গেলুম।

স্বাতী॥ তাহলে কেউ জানে না?

অভীক॥ ওরা শহরের সব রাস্তার মুখ বন্ধ করে ফেলবে, প্রত্যেকটা বাড়ী ওরা তন্ন তন্ন করে খুঁজবে, আগুনের মশাল দিয়ে খোঁচাবে, মানুষকে জবাবের জন্য—আমাকে পেতে ওরা শহর খুঁড়ে ফেলবে, স্বাতী।

স্বাতী॥ (ভয়ে, কষ্টে অভীকের কাছে ঘন হয়ে আসে) ওরা তোমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কি করবে, অভী?

অভীক॥ (খুব ঠাণ্ডা গলায় শুরু করে, ক্রমশ, উত্তেজিত হয়) কি করবে? আমাকে কি করবে ওরা? সবাইকে ওরা যা করে। ওদের পা চেটে দিতে এখনও আত্ম-সম্মানে বাধে, এমন অহংকারী ও দুর্বিনীতদের ওরা যা করে। ওরা তো ভীষণ সাহসী—এই সৈনিকরা—একটা খরগোসের পেছনে একপাল নেকড়ের মতো দৌড়নোয় ওদের তো ভীষণ নাম। ওরা—ওরা আমাকে টেনে নিয়ে যাবে একটা খোলা রাস্তায়—একটা দেওয়ালের দিকে মুখ করে আমাকে দাঁড়াতে বলবে—আর তারপর তিনজন, পাঁচজন কি আট, একসঙ্গে গুলি করবে আমাকে। আমি ওদের একজনকে খুন করেছি বলে নয়—শুধু যদি আমি একবার প্রতিবাদে ক্ষোভে হাত তুলতুম, ঐ যে শুধু ওদের কথায় নাচব না বলেছি, সেটুকুই যথেষ্ট। আমি ভয় পাই নি—আমি খুশী হয়েছি, দারুণ খুশী হয়েছি,। খুব ভালো লাগছে আমার। কালো ফৌজ! মৃত্যুর সৈনিক! থুঃ! শকুনির পাল! আসুক ওরা—আসুক! (বেয়নেটটা শক্ত হাতে অনুভব করে।)

কোরাস॥ ওরা আসছে। ওরা আসবে। দল বেঁধে আসবে ওরা—রক্তের ক্ষুধা ওদের পথ দেখাবে—অন্ধ হিংসা ওদের আলো দেবে—স্বৈরাচারীর দুর্মদ দম্ভে ওরা আসবে। ওদের আত্মা নেই, মন নেই, হৃদয় নেই। ওরা

লাগামে-বাঁধা ঘোঁড়ার মতো শুধু দৌড়োয়—ওরা শিকারীর পোষা কুকুর। ওদের স্বাধীনতা অপহৃত। হাতে রক্ত মাখার বীভৎস নেশা ওদের আফিমের মতো ভুলিয়েছে যে ওরাও মানুষ ছিল।—ওরা আসছে। ওরা আসবে।

স্বাতী॥ (চাপা গলায়) অভী, আমি ওদের গলা শুনতে পাচ্ছি—নীচে, রাস্তায়—অভী, ওরা এসে গেছে ?

অভীক॥ এত তাড়াতাড়ি ?

স্বাতী॥ (গভীর উদ্বেগে ছট্‌ফট্ করে) অভী, শোন, তোমার হাত দুটো ভালো করে ধুয়ে এস। জামাকাপড়টা পালটে ফেল। এস, আমরা বিছানায় গিয়ে শুই। ওরা ভাববে যে—

অভীক॥ না।

স্বাতী॥ (মিনতি-ভরা গলায়) বিছানায় আমাদের দুজনকে একসঙ্গে দেখলে ওরা তাই ভাববে। ভাববে তুমি সারারাত আমার সঙ্গেই ছিলে। ভাববে অন্য কেউ—

অভীক॥ না।

স্বাতী॥ ও, অভী, অভী ! লক্ষ্মীটি ! কথা শোন ! অভী ! আমি ওদের বলব যে—

না। আমি নাচব না। ঘরের ভেতরেও না।

[নীচে কাঁচ ভাঙার ও দরোজায় লাথি মারার শব্দ পাওয়া যায়।]

স্বাতী॥ ওরা জানালার শার্শি ভেঙে ফেলল। ওই শোন, দরোজাটাও আর বেশিক্ষণ থাকবে না। অভী, লক্ষ্মীটি—

অভীক॥ না, কিছুতেই না।

স্বাতী॥ কিন্তু ওদের কাছে তো কোনো প্রমাণ নেই যে তুমিই—

অভীক॥ আমি প্রমাণ দেব। আমিই সাক্ষী। জীবনে এই একবার আমি একটা পবিত্র কাজ করতে পেরেছি—একবারের জন্য পাল্লার এ পাশে রাখতে পেরেছি আমার প্রতিশোধ—ও পাল্লায় ওদের পাহাড়-প্রমাণ ঘৃণা আর শোষণ। না, স্বাতী, না, আমার এই এই গর্ব, আবেগের এই তীব্র শুদ্ধতাকে কোনো নীচু ভীরু কাজে আমি মলিন করব না। ওদের আসতে দাও। ওরা আসুক।

কোরাস॥ ওঠো, জাগো, চোখ থেকে ঘুম মোছ। এ একটা স্বপ্ন।

স্বপ্নের বাইরে এসো। দেখ, রাত্রির পেয়ালা ভরে রয়েছে নীরব শান্তিতে। এই আমাদের দেশ, এ এক স্বপ্ন। তোমার স্পন্দমান হৃদয়কে শান্ত করো। উঠে বোসো, তোমার ঘরের অজানা অন্ধকারকে চেনো। এ সত্য নয়। কিছু ঘটছে না। এ শুধু স্বপ্ন।

[যেন কোরাসের কথাকে ব্যঙ্গ করে বাইরে সৈনিকের কণ্ঠ শোনা যায়]

সৈনিকের কণ্ঠ ॥ (চীৎকার করে) এখানে, এই ঘরে। ইঁদুরটা ওর গর্তে ঢুকেছে। এ্যাই, দরজা ভাঙো, আর টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফ্যালো ঐ কুত্তার বাচ্চাটাকে। (দরজায় সমবেত আঘাত) কালো ফৌজকে দরজা খুলে দাও !

[পরবর্তী ঘটনাগুলো বিদ্যুৎগতিতে ঘটবে, পংক্তিগুলো এত দ্রুত উচ্চারিত হবে যে প্রত্যেকের কথা আলাদা আলাদা করে ভালো বোঝা যাবে না।]

অভীক ॥ (দরোজায় পিঠ চেপে) স্বাতী, আমি পারছি না ! আমি একা পারছি না ! আমাকে সাহায্য করো ! এসো !

[কোরাস দরোজার দিকে এগোয়।]

কোরাস ॥ দশ, বারো, ষোলজন লোক—হাতে রাইফেল ! এই শেষ ! একজনের ঠোঁটে সর্পিল হাসি—তার অধীর আঙুলগুলো ট্রিগারের ওপর খেলা করছে। নীচের উঠোন উপচিয়ে পড়ছে লোকে। ওরা আসছে, সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে সংখ্যাহীন ওরা উঠে আসছে ওপরে।

স্বাতী ॥ তোমার পিস্তলটা, অভী—কোথায় সেটা !

অভীক ॥ ওখানেই কোথাও পড়ে আছে, তাড়াতাড়ি নিয়ে এস।

কোরাস ॥ শার্শিভাঙা কাঁচে ওদের একজনের কপাল কেটে গেছে—রক্ত গড়িয়ে পড়ছে গাল বেয়ে—রক্ত ঝরে পড়ছে মাটির ওপর। (একটু থেমে) ওরা দরোজায় কাঠ লাগিয়েছে।—

অভীক ॥ আমাকে বেয়নেট্টা দাও, স্বাতী, শিগ্গির !

স্বাতী ॥ ওটা পাচ্ছি না, অভী, খুঁজে পাচ্ছি না !

অভীক ॥ তোমার বিছানার চাদরের ভাঁজে দেখ। আ, ঈশ্বর !

কোরাস ॥ অন্যায়, অন্যায় ! ওরা সংখ্যায় অগুণতি। যদি দশ গোণা পর্যন্ত দরোজাটা রাখা যায় তবে আমরা জিতব।

স্বাতী ॥ (পাগলের মতো বেয়নেটটা খুঁজতে খুঁজতে) অভী, আরও জোরে, ওদের আটকে রাখো—ওদের কিছুতেই ঘরের ভেতর আসতে দিও না!

অভীক ॥ আমি পারছি না, আমি পারছি না, স্বাতী!

স্বাতী ॥ তোমাকে পারতেই হবে! আরও জোর কেন আসছে না তোমার ভেতর!

নেপথ্যে সৈনিকের কণ্ঠ ॥ ভেঙে ফ্যালো দরজা।

[অভীকের কপালের নীল শিরাগুলো দপদপ করছে, ঘামে ভরে গেছে শরীর, ওর সব চেষ্টা ব্যর্থ করে দরোজা খুলে যেতে থাকে একটু একটু করে।]

কোরাস ॥ খুলছে, খুলে যাচ্ছে,উন্মোচিত হচ্ছে মৃত্যুর দুয়ার।

[নীচু গলায় আবৃত্তি করে চলে। তার পটভূমিতে পরবর্তী উচ্চারণগুলি শোনা যায়।]

অভীক ॥ স্বাতী, আমার কাছে এসো! আমাকে সাহায্য করো, স্বাতী!

স্বাতী ॥ (আর্ত গলায়) অভী, দরোজা খুলে যাচ্ছে! অভী, ওদের আটকাও!

[হঠাৎ তীব্র এক ঝাপট হাওয়ার মতো দরোজা ভেঙে রাত্রির মতো কালো পোশাকে মোড়া একটি মূর্তি এসে ঘরের ভেতর আছড়িয়ে পড়ে, নিঃশব্দ স্থির পায়ে অভীকের দিকে এগোয়, ঈগলের মতো সমস্ত অবয়বিক অন্ধকার নিয়ে ও যখন অভীকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন ওর হাতের দীর্ঘ বাঁকা ছুরি সহসা ঘৃণা ও প্রতিহিংসায় দপদপ করে ওঠে। দুটি মানবাস্ত্যজ আদিম পশুর মতো রক্তে ও কাদায় ও ঘামে ওরা লড়ে। অভীক হেরে যায়। ওর অচেতন দেহকে মূর্তি নিষ্করুণ ভাবে দরোজার কাছে টেনে নিয়ে যায়, জোর করে তুলে দাঁড় করায় ও ছুরির সবটুকু ঔজ্জ্বল্যকে অভীকের হৃৎপিণ্ডের রক্তিমতায় নিহিত রেখে খোলা দরোজায় অন্ধকারে মিশে যায়। অভীকের মুমূর্ষু আর্তির সঙ্গে একটু একটু করে আলো কমে আসে। স্বাতী অভীকের

নিস্পন্দ শরীরের পাশে গিয়ে বসে—অভীকের ওপর ঝুঁকে পড়ে—]

স্বাতী ॥ অভী, আমার অভী !

[সব আলো নিভে যায়। অন্ধকারে দূরাগত অস্পষ্টতায় 'এ পরবাসে রবে কে' গানটির সুর আবার বাজতে শুরু করে। আলো একটু একটু করে জোর হলে মঞ্চের সামনে সারি বেঁধে কোরাসকে বসে থাকতে দেখা যায়। স্বাতী তার বিছানায় আধো-শোওয়া ভঙ্গীতে স্থির রয়েছে। মঞ্চের বিপরীত কোণে একটি চায়ের টেব্‌লের চারপাশে বাবা, মা, ভাই তিনটি চেয়ারে বসে। মঞ্চের দূরতম পশ্চাদ্‌ভূমিতে ঠিক দরোজার মুখে একটি মূর্তি নীচু একটি আসনে বসে রয়েছে, কালো পোশাকে মোড়া, নিশ্চল, নিঃশব্দ।]

কোরাস ॥ দিনের সব দৃশ্য আর শব্দ নিশীথের অস্থির নিদ্রায় কালো হয়ে যায়, কুঁকড়ে যায় লণ্ঠনের সর্পিল ছায়ার মতো।

কণ্ঠ ॥ সংবাদপত্রের দপদপে শেষ সংবাদ আর কাণাগলিতে চাপা গলার ফিসফাস সব একটা ছকে এসে দাঁড়ায়, সব গলে মিশে এক আশ্চর্য স্বাপ্নিক বাস্তবতায় স্থির হয়।

কোরাস ॥ মশাল নদীর স্রোতের মতো জলে। হৃদয়প্রান্তের দূরতম ভয়ের ফুলকিগুলি, চলিষ্ণু মুহূর্তের জন্য অনন্ত ঘৃণা, অনাগতের জন্য দুঃসহ ভয়।

কণ্ঠ ॥ গলিত চিন্তার লাভা বিচিত্র সব আকৃতি পায়। মনের ছায়াধূসর ভাবনাগুলো 'যেন কোন পথের নিশানা পেল' এই আবেগে অস্থির হয়।

বাবা ॥ পথ ! কিসের পথ ? কোনো পথ নেই।

ভাই ॥ তবু নিশ্চয়ই কোনো উপায়—

বাবা ॥ তোমার বয়স কম, তাই এসব অলীক ভাবনার জন্য সময় খরচ করতে পারো। কোনো পথ নেই। গত রাতে আমাকে একটি লোক বলল সে এক পথের হদিস পেয়েছে। আজ ভোরে ভারী পাথর বেঁধে তাকে নদীর জলে ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে ! কোনো পথ নেই, কোনো উপায় নেই। না, নেই। অচঞ্চল থাকো নিজের কাজে আর মনে রেখো তোমার ঈশ্বরকে।

মা ॥ (ছায়ামূর্তির দিকে বারেক তাকিয়ে) ঠাকুর !

বাবা ও ভাই ॥ ঠাকুর ! (সকলে যুক্তকর কপালে ঠেকিয়ে মূর্তিকে একবার দেখে নেয় ।)

মা ॥ আয়, স্বাতী, চা-টুকু খেয়ে যা । জুড়িয়ে গেল যে রে ।

স্বাতী ॥ আসছি মা, এক মিনিট ।

ভাই ॥ ও স্বপ্ন দেখছে, হাতীর দাঁতের মিনারে চড়ে ।

মা ॥ আ, রাতুল !

ভাই ॥ রাতের আঁধারে কে এল আলোর খবর নিয়ে, বোনটি আমার ! তোমার নক্ষত্রেরা কি করতে পারল ? মেঘ ? আর আকাশ ? দূর দেশে কোন ঘণ্টাধ্বনি তরঙ্গিত হল ? কার তরওয়াল ঝলসে উঠল শান্তির সপক্ষে ?

বাবা ॥ ওকে বিদ্রূপ কোরো না । তুমিও একদিন ওরই মতো স্বপ্ন দেখতে । তোমার ঘুমের মধ্যে তুমিও চেঁচিয়ে উঠেছো, 'প্রতিবাদ করো, আঘাত করো, বিদ্রোহ !' অনেক কষ্টে তোমাকে চুপ করাতে হয়েছে, নইলে পাড়া জেগে যেত যে !

ভাই ॥ ওঃ, সে সব অনেকদিন আগের কথা ।

বাবা ॥ হ্যাঁ । আয় স্বাতী, আমার কাছে এসে বোস ।

স্বাতী ॥ (বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, সবাইর থেকে মুখ ঘুরিয়ে অন্যদিকে তাকায়) আশ্চর্য ! আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না ?

কোরাস ॥ দিনের সব দৃশ্য আর শব্দ এখানে নিশীথের অস্থির নিদ্রায় কালো হয়ে যায়, কুঁকড়ে যায় লণ্ঠনের সর্পিল ছায়ার মতো ।

ভাই ॥ তুই কেবল স্বপ্নই দেখিস । আমরা ঘুমোই, আবার জেগে উঠি, আবার ঘুমোই, আবার জেগে উঠি—কই, স্বপ্ন-টপ্ন তো আমাদের কাছ ঘেঁষে না ! এমন আচ্ছন্ন, বিষণ্ণ করে না তো আমাদের !

মা ॥ মেয়ের এখন বয়েস হচ্ছে তো—

স্বাতী ॥ না, না, এটা তা নয়—

ভাই ॥ তুই যা, গিয়ে ঘুমো, আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আবার স্বপ্ন ভাখ ।

স্বাতী ॥ (দৃঢ় গলায়) না, তোমরা শোন । (কোরাস ওর পেছনে অর্ধবৃত্ত রচনা করে দাঁড়ায় ।) আমি মধ্যরাতে যুদ্ধের দামামা শুনেছি । আগুনের তীব্র পুঞ্জ কাল প্রবল বেগে আকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়ে টুকরো টুকরো ফুলকিতে ঝরে পড়েছে ।

বাবা॥ (অস্বীকারের ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে) গত রাতে শহর সম্পূর্ণ শান্ত ছিল।

স্বাতী॥ আর এখন, এই যে আমি চোখ বুঁজছি আর খুলছি, মনে হচ্ছে একটা একদম অপরিচিত পৃথিবী আমার চোখের সামনে ছড়ানো।

ভাই॥ (হেসে) আরে স্বাতী, ঘুমটুম মুছে ভালো করে তাকা। ছাখ, সকাল কত গড়িয়ে গেছে।

[স্বাতী ওর বিছানা ছেড়ে চায়ের টেবলের দিকে আসে। মঞ্চ পরিকল্পনায় এই আভাস সর্বদাই আছে যে স্বাতী ওর স্বপ্নের পৃথিবী থেকে বার বার মা, বাবা, ভাই-এর বাস্তব পৃথিবীতে আসে এবং ফিরে যায়। এই দুই পৃথিবীর অনতিস্পষ্ট সীমানায় স্থির বসে থাকে ছায়ামূর্তি।]

স্বাতী॥ (হাঁটতে হাঁটতে) আমার এত মুক্ত লাগছে নিজেকে, এত free লাগছে!

বাবা॥ (মূর্তিকে তড়িৎ চোখে দেখে নিয়ে) এই, সাবধান! মুক্ত, free! কি বলছিস, কি তুই?

স্বাতী॥ কী যেন, কী যেন কাল রাতে ঘটে গেছে—তাই আজ সকালে সব কিছু এত উজ্জ্বল, স্বচ্ছ—বাতাস, দেয়ালের রঙ। দাঁড়াও, আমি তোমাদের একটু ভালো করে দেখি—আমি—(ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ে গভীর আগ্রহে সবাইকে দেখে। হঠাৎ একটা নতুন অনুভূতির ধাক্কায় একদম অন্য গলায় চেঁচিয়ে ওঠে) বাবা!

[কোরাস ছিটকে পেছনে সরে যায়।]

ভাই॥ কি হোল রে?

মা॥ স্বাতী!

ভাই॥ কি দেখছিস কি অমন করে?

স্বাতী॥ আমি দেখছি—না! (যেন যা দেখছে তাকে ও স্বীকার করতে চায় না।)

কোরাস॥ দূরে দামামার শব্দ—ড্রিমি ড্রিমি ড্রাম্, ড্রিমি ড্রিমি ড্রাম্, ড্রিমি ড্রিমি ড্রাম্।

বাবা॥ কি দেখছিস কি তুই?

স্বাতী ॥ আমি তোমাদের দেখছি, তোমাদের সবাইকে দেখছি, যেন কয়েক শো বছর তোমরা ওখানে বসে আছো—

কোরাস ॥ শতাব্দীর পুঞ্জীভূত ভস্ম থেকে একটি আগুনের শিখা জন্ম নিল।

স্বাতী ॥ বাবা, মা, দাদা, ওখানেই বসে আছ তোমরা, চিরকাল, অনন্তকাল। আর আমি তোমাদের দেখছি—

[খুব ধীরে স্বাতী মূর্তির দিকে ঘোরে। কোরাসও স্বাতীকে অনুকরণ করে ঘুরে দাঁড়ায়।]

বাবা ॥ ফিরে আয়, ওদিকে তাকাস না!

মা ॥ স্বাতী, এখানে চলে আয় আমার কাছে!

স্বাতী ॥ (অস্ফুট গলায়) ছায়ামূর্তি!

ভাই ॥ ওকে জাগাস না, ডাকিস না ওকে—

[স্বাতী মূর্তির দিকে এগোয়।]

বাবা ॥ ফিরে আয়, ওদিকে চাস না তুই—

স্বাতী ॥ ওর হাতে একটা চকচকে ছুরি! (হঠাৎ গত রাতের সমস্ত রক্তাক্ত স্মৃতি একটা তীব্র ঢেউ-এর মতো এসে ওকে বেসামাল করে দেয়। কান্নায়-ভেসে-যাওয়া গলায়) অভী! অভী!

বাবা ॥ (স্বাতীর পিঠে হাত রাখে) কাঁদিস নি মা, শান্ত হ', চুপ কর।

কোরাস ॥ রাত্রির অতল অন্ধকারে একটি শিখা জ্বলছে, বড় হচ্ছে, আকাশকে ছুঁতে চাইছে সেই আগুন, কালো আকাশে লাল আলপনা আঁকবে সেই শিখা! মাদলের ধ্বনি আর আগুনের শিখা!

বাবা ॥ অন্ধকার হয়ে আসছে—

ভাই ॥ আমার কিন্তু কি রকম লাগছে—

মা ॥ শীত করছে কিন্তু বেশ। অন্ধকার হয়ে আসছে আর আমার কেমন ভয় ভয় করছে।

ভাই ॥ (চম্‌কে-ওঠা গলায়) ওটা নড়ছে! ছায়ামূর্তিটা নড়ে উঠেছে!

মা ॥ (ভীষণ ভয়ে) না, রাতু, না!

ভাই ॥ আমি দেখলাম নড়ে উঠল। মাথাটা ঘুরিয়ে আমাদের দেখল।

মা। (কান্না-ভরা গলায়) ঠাকুর, তুমি আমাদের এই সর্বনাশ কোরো না, ঠাকুর! আমরা এত শান্তিতে ছিলুম। না, ঠাকুর, না, আমরা তো কোনো পাপ তোমার কাছে করি নি।

ভাই ॥ স্বাতী করেছে।

মা ॥ না, আমরা কিছুই করি নি—কেউ করি নি—

বাবা ॥ যা হবার তা হবেই।

মা ॥ কিন্তু আমরা কিচ্ছু বলি নি—কেউ বলি নি—আমরা সব মুখ টিপে সহ্য করেছি—

স্বাতী ॥ (কান্না-থামানো থম্‌থমে গলায়) কেন? যা হবার তা হবেই কেন?

বাবা ॥ আমার মনে আছে, আমার বাবা যেদিন গেলেন সেদিনও হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা পড়েছিল, হঠাৎই খুব শীত করে উঠেছিল আমাদের, ঘরটাও এমনি করে আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছিল। আমরা অপেক্ষা করছিলুম।

স্বাতী ॥ কিসের জন্য?

ভাই ॥ মূর্তিটা এখন আবার স্থির হয়ে গেছে।

বাবা ॥ হুঁ, ও আর নড়ছে না।

স্বাতী ॥ কেন, এমন হবেই কেন? চিরকাল ধরে, এই ছায়ামূর্তি আমাদের জীবনে অনড় হয়ে থাকবে?—ও কে?

বাবা ॥ তুই যা করেছিস তাতেও কি তোর আশ মেটে নি?

স্বামী ॥ আমি স্বপ্ন দেখেছিলুম, আমি স্বাধীন আর আমি সুখী।

ভাই ॥ তুই তোর স্বপ্নের মিনারে ফিরে যা। আমাদের শান্তিতে থাকতে দে।

বাবা ॥ আস্তে, কথা বল। তোর গলার স্বরে তুই মৃত্যুকে জাগিয়ে দিবি।

স্বাতী ॥ (গভীর অবিশ্বাস ও ঘৃণায়) মৃত্যু! ও মৃত্যু! ঐ মূর্তি মৃত্যুর!

বাবা ॥ আঃ, চুপ কর। আমাদের শান্তিতে থাকতে দে। চা-টুকু খেতে দে। কিচ্ছু এমন হয় নি।

স্বাতী ॥ কিছুই হয় নি, না? আর হবেও না?

মা ॥ স্বাতী, চা খেয়ে নে।

ভাই ॥ ওকে একটু ঐ কেক্ দাও না, মা, কাল যে আনলুম।

মা ॥ বোস, স্বাতী।

বাবা ॥ ওঃ, ঢের হয়েছে, অনেক হয়েছে। এই বাড়ির কর্তা কে?

আমি। আর আমি তোমাকে বলছি এসব কথা এখানে বলা চলবে না। করা চলবে না এমন প্রশ্ন।

স্বাতী ॥ আমার বাইশ বছর বয়স হয়েছে, আর বাইশ বছর ধরে ওকে আমি দেখেছি। ঠিক ঐ জায়গাটায়। ও নড়ে না, ও একটা শব্দ করে না। কালো, বোবা—ঐ চেয়ারটায় ও বসে থাকে, যেমন তোমরা বসে আছো, যেন কয়েক শতাব্দী ধরে।

বাবা ॥ আমি তোকে একবার বলেছি না তুই এসব থামা।

স্বাতী ॥ আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি তোমাদের বুক ভয়ে কাঁপছে! (গভীর গলায়) ও কে ?

বাবা ॥ (প্রবল উত্তেজনায়) বেরিয়ে যা, এক্ষুণি বেরিয়ে যা তুই। এ বাড়ি ছেড়ে এক্ষুণি চলে যা তুই।

মা ॥ ওগো, কি বলছ কি তুমি ?

বাবা ॥ কী! বলছি না বেরিয়ে যা—চলে যা আমার চোখের সামনে থেকে—

ভাই ॥ বাবা!

বাবা ॥ যা, দরোজার ওপারে ঐ শূন্য পথে, ঐ ভয়ংকর অপরিচিত পৃথিবীতে একলা খোঁজ তোর উত্তর। এ বাড়ি ছেড়ে চলে যা তুই: আমাদের সবাইর চরম সর্বনাশ তুই ডেকে আনবি।

মা ॥ ওগো শোন, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি চুপ কর। স্বাতী, তুই—

বাবা ॥ তুই আর তোর স্বপ্ন আমাদের খুন করবি ? তুই দেশের আইন জানিস না ? শাস্তির জন্য—

স্বাতী ॥ শাস্তি! নিরাপত্তা! আমি তোমাদের দিকে তাকাই আর মনে হয় তোমরা মুঠো মুঠো ছাই হয়ে গেছ। ঠাণ্ডা ধূসর ছাই-য়ে গড়া তোমরা।

বাবা ॥ বেরিয়ে যা তুই, এই মুহূর্তে।

স্বাতী ॥ ভস্ম তোমরা, শ্মশানের ধূসর ধুলো। শতাব্দীর পর শতাব্দী অস্ফুট ক্লীব প্রার্থনায় ক্ষয় কোরছো নিজেদের। আর একটা ভয়ার্ত চোখ অনির্বাণ রেখে দিয়েছ দরোজার পাশের ঐ মূর্তির ওপর। প্রার্থনা—তাও কি ঈশ্বরের কাছে ?

ভাই ॥ তুই থামবি ?

স্বাতী ॥ তোমরা মাথা নীচু কর—নির্বিবেক নতজানু হও—ঐ ওর কাছে (তীব্র অনুকম্পায় মূর্তিকে আঙুল দিয়ে দেখায়) আমাকে চলে যেতেই দাও। হায়, আমরা কি হয়েছি! কোথায় নেবেছি আমরা! আমরা যারা এত গর্বিত ঋজু আর সবল ছিলুম! আমরা এখন কি? এই লোকটাই বা কে? এমন অন্ধকারে আমরা কেন বাস করছি? তোমার বাবা, তোমার বাবার বাবা, তাঁর বাবা এবং তাঁরও বাবা কি সব সম্মান আর স্বাধীনতা বিক্রী করে এমন দেউলে আর অসহায় করে রেখে গেছে তোমাকে? তুমি কি তাই কথা বল না একটাও? তোমার হৃদয় কি তাই লজ্জায় ঘৃণায় একমুঠো ছাইয়ের মতো মৃত ও শীতল?—একবার তোমার মাথা উঁচু কর।

কোরাস ॥ রাতের কালো আকাশে মাথা উঁচু করে একবার দাঁড়াও!

বাবা ॥ (তীব্র উত্তেজনায়) ও আমার কাছে আগন্তুক, অপরিচিত। আমি ওকে চিনতে পারছি না।

মা ॥ ও তোমার মেয়ে, ও আমাদের স্বাতী!

বাবা ॥ আমাদের জীবনের কোনো দাম ওর কাছে নেই। প্রত্যেক মুহূর্তে ও আমাদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনছে। ও কিছু বোঝে না, বুঝতে চায় না। ও ভালোবাসে না আমাদের কাউকে—

স্বাতী ॥ না, একথা সত্যি নয়, সত্যি নয়।

বাবা ॥ যে মূল বিশ্বাসের ওপর আমাদের জীবন তাকে ও ঘৃণা করে। আমি তোর প্রশ্নের কোনো উত্তর জানি না, স্বাতী, জানতে চাই না। আমাদের সঙ্গে তোর কোথাও কোনো মিল নেই। দরোজা খোলা আছে—বাইরে অজানা পৃথিবীর অপরিচয় তোর জন্য অপেক্ষা করছে।

স্বাতী ॥ ও, তাহলে আমি অপরিচিত, অবাঞ্ছিত। ঠিক আছে, আমি চলে যাচ্ছি। শুধু যাবার আগে একটা কথা জিগ্যেস কোরবো? যতদূর তোমার মনে পড়ে, তোমার পূর্বপুরুষদের কথা যতদূর তুমি জানো, আমাকে বলবে, আমিই কি প্রথম এই প্রশ্ন করছি?

বাবা ॥ দরোজা খোলা আছে—

স্বাতী ॥ আমিই কি প্রথম এই প্রশ্ন করছি? অবিশ্বাসীর এই শীতল নির্বাসন কি প্রথম ঝরে পড়লো আমারই মাথায়?

বাবা ॥ আমি কোনো জবাব দেব না। দরোজা খোলা রয়েছে—

কোরাস ॥ না, এ বিদায়ের মুহূর্ত নয়। মহাকালের নখর চারিদিক

থেকে ঘন হয়ে আসছে। সময়ের বিদ্যুৎ আকাশকে এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত চিরে দিচ্ছে। বজ্রের মন্দিরায় বাজছে কালের সংকেত। দামামায় আওয়াজ তোলো!

[নীরবে ছায়ামূর্তি তার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। মা, ভাই, বাবার দিকে ফেরে। নিশ্চিত, ধীর গতিতে সে এগোয়।)

ভাই ॥ বাবা, ভাখো! ও উঠে দাঁড়িয়েছে! মূর্তিটা এগোচ্ছে আমাদের দিকে!

[বাবার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বাবাকে একহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে।]

বাবা ॥ (স্বাতীকে) ভাখ, একবার চেয়ে ভাখ, কী সর্বনাশ তুই করলি!

[মূর্তি এগোতে থাকে।]

মা ॥ রাতুল! স্বাতী! ওগো তুমি কোথায়! তোমরা আমার কাছে এস! (গলায় আকুল অসহায়তা।)

ভাই ॥ বাবা, ওকে থামাও, ওকে থামাও—

কোরাস ॥ দামামায় আওয়াজ তোলো! দুন্দুভিগুলো বেজে উঠুক! ড্রিমি ড্রিমি ড্রাম! ড্রিমি ড্রিমি ড্রাম! ড্রিমি ড্রিমি ড্রাম!

[নীচু গলায় আবৃত্তি করে চলে।]

মা ॥ আমার কী শীত করছে! আমার রক্ত বরফ হয়ে যাচ্ছে—ও আমাকে ডাকছে! ঐ মূর্তি আমাকে যেতে বলছে!

বাবা ॥ যদি ডাকে, তোমাকে যেতেই হবে।

স্বাতী ॥ না, আমি এ চাই নি। আমি কখনও এমন চাই নি। মা, তুমি যেও না মা।

ভাই ॥ আমাকে বাঁচাও, তোমরা বাঁচাও আমাকে!

[ভাই আর মা যেন কোনো প্রচণ্ড অপ্রতিরোধ্য শক্তির অদৃশ্য আকর্ষণে একটু একটু করে অপরিহার্য ভাবে দরোজার দিকে এগিয়ে যায় মূর্তিকে অনুসরণ করে।]

স্বাতী ॥ মা, দাঁড়াও! যেও না মা! দাদা! বাবা, তুমি ওদের আটকাও! মা! দাদা! (মূর্তির কাছে ছুটে গিয়ে) তুমি ওদের ছেড়ে

দাও। ওদের বদলে আমাকে নিয়ে চল। (স্বাতী মা ও ভাইকে ধরতে যায়—মূর্তি নিস্পৃহ ভঙ্গীতে ওকে সরিয়ে দেয়। স্বাতী ছিটকে এসে কান্নায় লুটিয়ে পড়ে। কোরাস থেমে যায়। নিস্তব্ধতায় স্বাতীর কান্না শোনা যায়। বাবা স্বাতীর কাছে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসেন, পিঠে হাত রাখেন।)

বাবা॥ (ক্লান্ত ভঙ্গীতে) এর বিরুদ্ধে লড়াই করা যায় না। করা উচিত নয়।

[স্বাতী কেঁদে চলে। কোরাস ওর কাছে এসে গভীর সমবেদনায় ঝুঁকে পড়ে।]

কোরাস॥ শান্ত হও। অপেক্ষা করো। তোমারও দান আসবে। মনে রেখো, তোমার আর্তনাদ আপন অক্ষপথে পৃথিবীর আবর্তন দ্রুততর হবে না। তোমারও সময় আসবে। তুমিই সেই শিখা, সেই মশাল, সেই আগুন। অপেক্ষা করো। স্বর্গের আগ্নেয় দীপ্তি তোমার প্রতীক্ষায় আছে। বজ্রগর্ভ এক সাহসিক বাণী তোমার কাছে পৌছবে বলে নক্ষত্রলোক পাড়ি দিচ্ছে সময়ের পাখায়।

স্বাতী॥ (কাঁদছে) মা!

বাবা॥ চলে গেছে, ডাকলে সে আর ফিরবে না। এবার তোর উত্তর পেয়েছিস? এবার খুশী হয়েছিস তুই?

কোরাস॥ ভীত মানুষের এই এক অপরিবর্তনীয় উত্তর—যা হবার তা হবেই। এই ঘর—সারা পৃথিবী। এই পরিবার—সমস্ত মানুষজাতি। ওই মূর্তি—অমোঘ অলঙ্ঘ্য নিয়তি।

স্বাতী॥ (হঠাৎ কান্না থামিয়ে এক ঝট্‌কায় সোজা হয়ে বসে) কেন? কেন? ওদের যেতে হোল কেন? তুমি তো জানতে, তবে ওদের যেতে দিলে কেন? কেন বাধা দিলে না? কেন অমন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে শুধু? (ঘৃণায়) বাবা! আমার বাবা! তুমি কি করে এত স্থির আর অনুদ্বিগ্ন দাঁড়িয়ে আছ এখনো? ওদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এবার কাতর প্রার্থনা করো। মানতের মোমবাতি জেলে দাও তোমার দেবতার কাছে!—ওঃ আমি তোমায় ঘৃণা করি, ঘৃণা করি। আমি যদি অতুমি হতাম, তবে—

বাবা॥ আমরা আমাদের ভাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি না—করা উচিত নয়। আমি আমার বাবার কাছে এই শিখেছি।

স্বাতী ॥ কিন্তু কেন? কেন?

বাবা ॥ আমার বাবাকে তাঁর বাবা বলেছিলেন। এমনি করতে করতে পৃথিবীর আদিমতম মানুষে ফিরে যা—এই একই অমোঘ অভিজ্ঞতা। এমনই ঘটে—চিরকাল ঘটেছে—চিরকাল ঘটবে। এই তোর প্রশ্নের উত্তর।

স্বাতী ॥ এই উত্তর? অন্য কোনো পথ—

বাবা ॥ না। ওই মূর্তি কখনো কখনো অমনি উঠে দাঁড়ায়। অন্ধকারের অসম্ভব খাদে অমনি করে ছুঁড়ে দেয়—কখনও কয়েকজনকে, কখনও সবাইকে। তারপর আবার ও বসে থাকে, বসে থাকে, বসে থাকে। আবার একদিন উঠে দাঁড়ায়—

স্বাতী ॥ আর সম্মোহিত পশুর মতো তোমরা ওর পেছন পেছন চলে যাও। কিন্তু কেন?

বাবা ॥ এই লেখা আছে আমাদের কপালে।

স্বাতী ॥ লেখা আছে? কে লিখেছে? তুমি? দাদা? মা? যদি কেউ লিখে থাকে, সে তো কবে মরে গেছে! কবে তার ছাই ছড়িয়ে গেছে হাওয়ায়। লেখা আছে! লেখা আছে তো সেটা মুছে ফ্যালো।

বাবা ॥ এই আমাদের চিরন্তন উত্তরাধিকার।

স্বাতী ॥ ঐ মূর্তি ঐ চেয়ারে চিরকাল অমনি অনড় বসে থাকবে, আর সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল, বিকেল থেকে রাত—আমরা ভয়ে কুঁকড়ে থাকব? কথা বলব চাপা ফিসফাসে? কোনোদিন সোজা হয়ে মুক্ত হয়ে দাঁড়াব না অন্য সব মানুষের মাঝে? খুঁজে নেব না আমাদের জায়গা নির্ভীক ঋজু চেষ্টায়? এই আমাদের উত্তরাধিকার!

কোরাস ॥ এই এক শৃঙ্খল সব মানুষকে এত ঘনিষ্ঠ গেঁথে রেখেছে—এই ভয়, এই শাশ্বত ভয়ে প্রত্যেকের অংশ রয়েছে।

স্বাতী ॥ কিন্তু কেন? কেন? কোন পাপে? কি করেছি আমরা? ভেঙে ফ্যালো এই স্থবির ঐতিহ্য, চূর্ণ হোক এই বিষাক্ত উত্তরাধিকার।

বাবা ॥ কিন্তু কি করবি তুই? কি করার আছে? এই আমাদের ভাগ্য।

স্বাতী ॥ মানি না, মানি না, এ ভাগ্য আমি মানি না।

বাবা ॥ যা হবার তা যে হবেই।

স্বাতী ॥ তুমি তো দাদাকেও ঐ একই কথা সুন্দর বলতে শিখিয়েছিলে। কি হোল তার এখন? কোথায় যেতে হোল তাকে?

বাবা ॥ খোকাও চলে গেল। আর কোনোদিন ওর মুখ আমি দেখব না। (একটু বিরতির পরে) আর স্বাতী, তোর মায়ের জায়গাটায় এসে বোস। আমাকে এককাপ চা করে দে তো।

স্বাতী ॥ জীবন সুতরাং একতালে বয়ে চলবে? একতিল কোথাও বদলাবে না বেঁচে থাকা? আমরা আবার তেমনি টেবিলে বসব? চা খাব? চিনি কম হলে চেয়ে নিতে ভুলব না?

বাবা ॥ আমাদের তো বাঁচতে হবে।

স্বাতী ॥ তুমি টেবিলের পাশে তোমার নিজের চেয়ারটাতে গিয়ে বসবে। আমি বসব মায়ের জায়গায়, আর শতাব্দীর পুরনো ছক আবার তেমনি চলবে গড়িয়ে গড়িয়ে? আমি বসব না। আমি দাঁড়িয়ে থাকব। চা চাই তোমার? চা? এই নাও।

[একটানে টি-পট্‌টা আছড়ে মাটিতে ফেলে ছায়।]

বাবা ॥ ইস্! এ কি করলি! অমন সুন্দর জিনিসটা যে টুকরো টুকরো হয়ে গেল! (নীচু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে টুকরোগুলো জড় করতে থাকে।) আহা, কত পুরনো আর ভালো জিনিসটা ছিল। এখন ভেঙে কয়েকটা অর্থহীন ছোট ছোট টুকরো হয়ে গেল।

স্বাতী ॥ ওগুলো মেঝেতে পড়ে থাক। অমন করে ভাঙা টুকরোয় মমতার হাত রাখতে হবে না। উঠে দাঁড়াও তুমি! ভগবানের দোহাই, তুমি একবার সোজা হয়ে দাঁড়াও বাবা। মা যখন চলে গেল, তুমি তো একবারও একটা কষ্টের কথা বলনি! 'আমরা লড়াই করতে পারি না', 'করা উচিত নয়', 'যা হবার তা হবেই'—এই বলেছ শুধু। ভাঙা টুকরোগুলোকে ফেলে দাও মাটিতে।

[দরোজা খুলে যায়। মূর্তি আবার প্রবেশ করে। বাবা স্বাতীর কাঁধের ওপর দিয়ে মূর্তিকে দেখতে পেয়ে থমকে যান।]

বাবা ॥ ছাখ স্বাতী, দরোজার দিকে তাকিয়ে ছাখ!

[স্বাতী ফিরে দাঁড়ায়।]

স্বাতী ॥ আবার এসেছে ও! মৃত আর মুমূর্ষুদের চারপাশে শকুনির মতো

লোভের চোখ নিয়ে ও ঝুঁকে পড়বে। আর নয়। এর শেষ করতেই হবে। পুরনো ঘুণে-ধরা এই ছককে এবার ভাঙতেই হবে। সোজা হয়ে দাঁড়াও, বাবা। শান্ত আর ঋজু মন নিয়ে উঠে দাঁড়াও।

বাবা॥ আমরাও চলে যাই চল্। ওর সঙ্গে যাওয়াই আমাদের নিয়তি। আমরা যুদ্ধ করতে পারিনে। (হাঁটু গেড়ে বসে থাকা অবস্থাতেই অসহায় ভঙ্গিতে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।)

স্বাতী॥ না, তুমি যেতে পারবে না। (মূর্তির প্রতি) তোমার ঐ জমাট পাথুরে অস্তিত্বকে আমি ঘৃণা করি, ঘৃণা করি। শত শতাব্দী ধরে অনড় শ্যাওলা-ধরা তোমার গায়ে আমি মৃত্যুর বীভৎস রঙ দেখে শিউরে উঠি। আজন্ম আমি তোমাকে ঘৃণা করি। বাইশ বছর আমি তোমাকে ঘৃণা করেছি। তোমার মুখের দিকে আমি কোনোদিন তাকাইনি—তবু তোমাকে ঘৃণা করেছি। আজ বুঝতে পারছি কেন। এই ঘৃণা আমার রক্তে বয়ে এনেছে মহাকাল। মাতৃগর্ভে ভ্রূণ-আমি এই ঘৃণার বীজ বহন করেছি। তোমার অচল অবরোধ আর আমার রক্তকোষের অসহ্য ঘৃণা পাশাপাশি বাস করেছে এক চূড়ান্ত মুহূর্তে মুখোমুখি দাঁড়াবে বলে।

বাবা॥ (অসহায় গলায়) আমাকে যেতে দে।

স্বাতী॥ (দুহাত ছড়িয়ে বাবার পথ আগলিয়ে দাঁড়ায়) না, তুমি যেতে পারবে না। তুমি ফিরে যাও।

বাবা॥ (যন্ত্রণায়) আঃ, আমাকে যেতে দে।

স্বাতী॥ না তুমি যেতে পারবে না। বাঁচার চেষ্টা অন্তত করো, বাবা।

বাবা॥ না, না, আমি পারি না, আমি পারছি না। এই আমাদের নিয়তি।

স্বাতী॥ (মরীয়া ভঙ্গিতে টেবিলের ওপর থেকে ছুরি কুড়িয়ে নেয়। উত্তোলিত হাতে বাবার ওপর ঝুঁকে পড়ে। নেপথ্যে দুর্গাপ্রতিমা আহ্বানের বাজনা বাজে। স্বাতীর ভঙ্গিতে দেবীত্বের আভাস স্পষ্ট হয়।) আমাদের নিয়তি হচ্ছে মৃত্যু? যদি তাই হয় তবে আমি তোমাকে প্রথমে মারব, তারপর নিজেকে। হ্যাঁ, আমি তোমাকেই আগে মারব যাতে তুমি না নাচতে পার ওদের কথায়।

কোরাস॥ নাচ আর নাচ আর নাচ আর নাচ আর নাচ আর নাচ

[কোরাসের গলা উচ্চতম গ্রাম স্পর্শ করতেই বাবা

আর্তনাদ করে ওঠেন। কোরাস হাসিতে ভেঙে যায়।]

বাবা॥ ওঃ, আমাকে যেতে দে তুই !

স্বাতী॥ (একহাত মেলে দ্যায় বাবার সামনে, অন্য হাতে ছুরি, দৃঢ় পায়ে মূর্তির দিকে এগোয়) না, বাবা, না। তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না। ওই ডাকের শক্তিকে ব্যর্থ করো তুমি।

[স্বাতী এবং মূর্তি মুখোমুখি দাঁড়ায়। কোরাস ওদের অর্ধবৃত্তের আকারে ঘিরে ধরায় ওদের আর স্পষ্ট দেখা যায় না।]

কণ্ঠ॥ মৃত্যুই নিয়তি। এর বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়াও। আঘাত করো। তোমার শৃঙ্খল টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফ্যালো। মুক্তির জন্য আঘাত করো। আঘাত করো মর্যাদার জন্য। ইতিহাসের জন্য আঘাত করো। আঘাত করো জীবনের জন্য। আঘাত করো। আঘাত করো। আঘাত করো।

[স্বাতী ও মূর্তির হাতের ইস্পাত উর্ধ্বে ঝলসে উঠতে দেখা যায়। কোরাস সামনে ঝুঁকে পড়ে একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠে সরে যায়। গভীর নৈঃশব্দ্যে মূর্তি ভেঙে পড়ে। তারপর কোনোমতে উঠে দাঁড়ায়। শরীরের গভীর থেকে এক প্রায়-অনৈসর্গিক আর্তনাদ উঠে আসে। টলতে টলতে হাতড়াতে হাতড়াতে বাইরে চলে যায়।]

স্বাতী॥ বাবা, দ্যাখো! আমরা বেঁচে আছি! বেঁচে আছি! কি তীব্র হর্ষে আমার রক্তকণিকা কল্লোলিত! আমরা বেঁচে আছি।

[স্বাতী ধীরে ধীরে বাবার কাছে এগিয়ে যায়। গভীর ভালোবাসায় বাবার হাত ধরে। বাবা একটু একটু করে উঠে দাঁড়ান। স্নেহে ও বিশ্বাসে মেয়ের পিঠে হাত রাখেন! তারপর দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে যায়। কোরাস এসে সার বেঁধে মঞ্চের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে। আলো কমে যায়। 'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ' রবীন্দ্রনাথের

এই গানটির সুর খুব আস্তে বাজতে শুরু করে। ক্রমশ জোর হয়। তার পটভূমিতে কোরাসের গলা শোনা যায়।]

কোরাস॥ শোনো! তোমরা শোনো পৃথিবীর মানুষ। শহরে গ্রামে, পথে ও গৃহে, সমুদ্রে অরণ্যে তোমরা শোনো। ঘৃণার স্থবির ঐতিহ্য ধ্বংস হয়েছে। অবক্ষয়ের আঁধার গর্ভ থেকে প্রাণ পেয়ে উঠে এসেছে শক্ত কাঁধ, ঋজু শরীরের মানুষ। আকাশের মতো নীল তাদের বাগানে সূর্যের মতো রক্তিম ভালোবাসার গোলাপ তারা ফুটিয়েছে। তারা পথ দেখিয়েছে—আজ। আপন প্রাণের শিখা থেকে মশাল জেলে তারা পথ দেখাবে—চিরকাল।

[সঙ্গীত জোরালো হয়। সমস্ত মঞ্চকে পরিপ্লুত করে বাইরে যেন উপচিয়ে পড়ে তখন, যখন পর্দা নেবে আসে।]

Armand L. Zimmermann-এর কাব্য-একাঙ্ক 'A Dream' অবলম্বনে রচিত 'রাত্রি' একাঙ্কিকা 'নান্দীকার' গোষ্ঠী প্রথম অভিনয় করেন 'মুক্ত অঙ্গন' মঞ্চে গত ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৬৫। এই বছরের ১লা ফেব্রুয়ারি তাঁরা এই নাটকটির দ্বিতীয় অভিনয়ও একই মঞ্চে করেছেন। এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে আমেরিকায় রচিত এই কাব্য-একাঙ্কটির রচয়িতা প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য কিছুই জানা যায় নি। এই নাটকের প্রযোজনার ব্যাপারে উৎসাহী যে কোনো নাট্যগোষ্ঠী সবরকম সাহায্যের জন্য 'নান্দীকার'-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

সকালে শহীদ হয়ে ফিরে আসে মায়েদের কাছে

অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন মৃত্তিকার গভীরে সংহত
স্বর্ণ-বীজ উদ্ভিদের মন
সেখান থেকেই সব নরম-পালক
সরু থির-থিরে অবয়ব নিয়ে
একরাশ নিম্নবিত্ত জন্ম নেয়
আকাশের নিচে। একরাশ তারা।
আনন্দ মাইতি আর আবুল কাশেম।
শহরতলীর বস্তি, গ্রামের মাটিতে—
কুমোরের স্নেহে গড়া মাটি-রং মায়েদের দেখেছি তাদের
ব্যথা টল্-টল্ ঘন চোখের পাতায় কাঁপে
মর্মন্তুদ জীবনের ভার—
মাটি-রং মায়েদের।
আনন্দ ও শান্তির গুপ্তচর তারা—
আবুল কাশেম আর আনন্দ মাইতি।
আমাদের দেশ আর সারা মানুষের দেশে
সংগঠন। দিনভর চাঁপদানি চটকল
লোকো-শেড ঘুরে ঘুরে শাণিত হয়েছে।
উৎকর্ণ গভীর রাত্রে টোকা দেয় দরজায়—
দরজা খুলে বাসি ঢাকা খাবারের ক্ষুধা—
মায়ের আশ্রয়।
ভুখ-মিছিলের এক মিটিংএ অসংখ্য তারা
বিন্দু বিন্দু জমে,
ময়দান—রক্তবীজ সাগর সঙ্গমে।

ওৎ পেতে ছিল—
হেলমেট্ সঙ্গীন আর ব্যুলেটের নৃশংস প্রতিভা।
রাত্রে আর চুপি চুপি ফেরে নাই তারা—
দরজায় টোকা নেই—শব্দ নেই—স্বাদ নেই ষড়যন্ত্রের।
মায়েরা গভীর ঘুমে—আচ্ছন্ন রাত্রির গায়ে নিষ্পলক তারা।
সকালে শহীদ হয়ে ফিরে আসে মায়েদের কাছে
একরাশ ফুল হয়ে, নিম্নবিত্ত জীবনের বুকে
আনন্দ মাইতি আর আবুল কাশেম ॥

আনা আখমাতোফা

দুটি কবিতা

১.

আবছা-অলীক দেখা-না-দেখার
জয় তো কেবল জ্বালা,
না-বলা বাণীর পুঞ্জিত ভরা
স্তব্ধ শব্দমালা।
অচরিতার্থ চকিত চাহনি
জানে না বিরামব্রত,
সুখে আছে শুধু অশ্রুপ্রবাহ
ঝরে যায় অবিরত।
নগরীর ধারে গোলাপের ঝাড়
সেও দিয়েছিল ভাষা…
আর লোকে বলে এরই নাম নাকি
শাশ্বত ভালোবাসা।

ওরা থাক্ সব দক্ষিণে থাক্ ছুটির হাওয়ায়
নন্দনবনে আলোকগহনে ইতস্তত,
আমি আছি খুব উত্তরপারে, গহনে তার
হেমন্তে আজ মেনেছি নিবিড় সখার মতো।

সেই শেষবার দেখা-না-হবার ধন্য স্মরণ
বহিয়া এনেছি এরই মাঝখানে হেমন্তিকা—
এনেছি আমার ললাটলেখন মুছে নেওয়ার
অতি লঘুভার অপাপশুদ্ধ শীতল শিখা।

অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ

মিহির চট্টোপাধ্যায়

কালান্তরে

ঘরে ঢুকতে দেয়নি বলেই
ছোট্ট ছেলেটি বলেছিল
"তোমার সাথে একেবারেই আড়ি।

তারপর—
সময়ের বুকে সাঁতার কেটে
এদিকে ওদিকে হাত পা ছড়িয়ে
সেই শিশু আজ
বলিষ্ঠ একুশে পৌঁছেছে।

হঠাৎ এক দমকা হাওয়ায়
মনের সমস্ত জানালাগুলো খুলতেই
সে তাকাল চোখ তুলে
তারপর আবিষ্কার করল—
হাওয়াটা অন্যদিক থেকে আসছে।

এখন কিন্তু সে ভাব করেছে
কেন না
তোমার ঘরে ঢুকে
সুযোগের কাঁধে ব'য়ে
ঠেলে তোমাকে বাইরে সরিয়ে
দরজা না দিলে
অনেকগুলো চোখে
আর ঘুম আসবে না।

তরুণ সেন

দু-একটা লোক

দু-একটা লোক হাঁটতে হাঁটতে কখনও হঠাৎ
চৌমাথার মোড়ে এসে থম্‌কে তাকিয়ে চারদিক
দেখে নিয়ে একপা দুপা ক'রে হঠাৎ নিরুদ্দিষ্ট হয়।

ফুলঅলা, সস্তা কলম, খেলার ফেরিঅলা
অন্ধ ভিখিরি আর সদাব্যস্ত কাগজের হকারের ডাকে
ফিরেও দেখে না। হেলে দুলে চলে যায় রাজনন্দিনী
ডবল ডেকার। সদাগরী অফিসের কাছে
ফিরিঙ্গী দু-একটি মেয়ে মুখ দেখে হাত-আয়নায়।
সৌখীন ভবঘুরে দু-দশটা লোক অন্যমনে হাঁটে চলে—
এমন দু-একটা লোক হঠাৎ নজরে আসে চৌরাস্তায়!

দু-একটা লোক এখনও চোখ তুলে অন্যের মুখ
খোঁজে—দেখে। পরিচিত রেখা-আঁকে চোখের তারায়।

এখনও সন্ধ্যায় রমণীর মুখের প্রলেপ
পৌরুষে চাবুক হানে। এরা কিন্তু ঘরণীর মুখে
তাকাতে পারে না আর। সন্ধ্যার মধুমজলিশে
এদের ডাকে না কেউ। কাগজের ফেরিঅলা জানলার ফাঁকে
দৈনিক বাজারের পড়তা হিসেব রেখে যায়!

বাসুদেব দেব

সমকালীন

রাজারানী প্যাকেটে চালান করে ছুরি-তিরি ছড়াই টেবিলে
'ডামাডোলের বাজার এখন, যা হোক করে কিছু করে নাও'
বন্ধুরা বল্ল। 'যা হোক করে?' 'কোন পথে ক্রমমুক্তি, কোন পথে?'
সূর্যাস্তকে প্রশ্ন করি, অতঃপর গড্ডলিকা স্রোতের পক্ষেই
একটি ভোট পেশ করে হতে চাই নির্বিরোধ নিয়তিবিলাসী!

সভ্যতা নামে এক প্রতিষ্ঠানে নিষ্ক্রিয় সভ্যের পদ টিঁকিয়ে রাখাটা
অধুনা জরুরি। আকাশের তাঁবুর নিচেই সার্কাসের আয়োজন,
সৌখিন ও হিংস্রক জন্তুরা ও নিয়ামক বুদ্ধিমান কৌশলী প্রভুর
খেলাধুলা; ছোরাগুলি একটাও হৃদপিণ্ডে বিঁধবে না…এই সব।
সুতরাং ভোরবেলা ভোঁতা ব্লেড, ভয় নেই রক্তপাত হবে না, হবে না।

চতুর্দিকে শূন্যগর্ভ প্রতিভাবিহীন পাণ্ডবের করতালি, অন্তত এখন
লৌহভীমকেও যদি চূর্ণ করে রেণু রেণু ছড়াতে পারতাম দিকে দিকে
আক্ষেপ মিটত। আগুনে পোড়ে না ছাখো ঐ সব অভিশপ্ত মূঢ়
প্রতিষ্ঠানগুলি; বিপন্ন সময় বুঝে নিজেকে বাঁচাতে ব্যস্ত সবে,
'এখনই গুছিয়ে নাও, বড়ো সুসময়।' হা ঈশ্বর, হাসব না কাঁদব
বলে দাও॥

শান্তা দেবী

নন্দলাল বসু

বাংলা ১৩২৬ সালে আমার ছোটভাই প্রসাদের মৃত্যুর পর বোধহয় সেই বছরেই বাবা বলতেন "ওর খুব মূর্তি গড়ার শখ ছিল, নিজের মনেই করত—ওর জন্য তো কিছু করা হল না—তোমার যদি ছবি কি মূর্তি কিছু শিখতে ইচ্ছা করে তো তোমায় শেখাতে পারি।" আমি বললাম, "কার কাছে শিখব ?"

বাবা বললেন, "নন্দলাল বসু।"

নন্দলালবাবু তখন কলকাতায় সিস্টার নিবেদিতার স্কুলের কাছে একটা বাড়িতে থাকতেন। বহু পরে 'প্রবাসী'-র ষষ্ঠিবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থে নন্দলালবাবু নিজেই লেখেন, 'শ্রীমতী শান্তাদেবীকে রামানন্দবাবুর কথায় আমি চিত্র শেখাতে সুরু করি—সেই বোধহয় আমার প্রথম শিক্ষকতা।'

আমাদের সমাজপাড়ার বাড়ির পাশেই 'প্রবাসী' আপিসের জন্য আর একটা বাড়ি নেওয়া হয়েছিল। সেখানে নন্দলালবাবু আসতেন—মাসে কখনও দুদিন বা কখনও চারদিন। মেঝেতে একটা মাদুর পেতে বসে খাতা পেনসিল আর রং নিয়ে কাজ শিখতাম।

সে সময় নন্দলালবাবুর 'রূপাবলী' বেরোয় নি। তবে পাতলা কাগজে ঐ ধরনের রেখাঙ্কণের ছবি এঁকে উনি আমায় দিয়ে যেতেন। ছবিগুলি ছিল মানুষের হাত পা মুখ ও গরু হাতি হরিণ প্রভৃতির। এইগুলি তো নকল করতামই, তার উপর উনি প্রায়ই আমাকে বলতেন "নিজের মন থেকে নানারকম ডিজাইন আঁকো। প্রত্যেক ডিজাইনের বাইরের একটা বিশেষ গড়ন থাকবে, তার ভিতরে আবার কাজ। যেমন কোনোটা গোল, কোনোটা ত্রিভুজ, কোনোটা পান, কোনোটা পটল এইরকম। ওঁর কাছে শিখতে গিয়ে প্রকৃতির নানা জিনিষের shape বা গড়ন প্রথমে খুব ভালোভাবে বুঝে নিতে হোল ; হঠাৎ আমার চোখে তখনও এগুলি ধরা পরে নি। কিন্তু উনি বলাতে দৈনন্দিন জীবনে যা দেখতাম তার মধ্যে এই আকৃতির ছন্দ নূতন করে চোখে পড়তে লাগল। গাছকে আমরা এলোমেলো ভাবি কিন্তু

ভালো করে দেখলে বোঝা যায় তার কয়েকটা বিশেষ গড়ন আছে। আমগাছ গোল হয়ে ডালপালা মেলে, পাইন গাছ সূক্ষ্মাগ্র পাতার মতো। এমনি জলস্রোত, মেঘপুঞ্জ, অগ্নিশিখা, সমুদ্রের ঢেউ, গাছের ডাল, চুলের গোছা, কাপড়ের ভাঁজ-সবেরই এক একটা বিশিষ্ট রূপ ও ভঙ্গি আছে।

ছবি আঁকা শুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় উনি আমাকে রঙের কথা বোঝাতে শুরু করেন, হয়ত এতে ছাত্রের ইণ্টারেস্ট্ বজায় থাকে। উনি বলতেন, "প্রকৃতির রঙের নিয়ম যেটা সেটা মেনে চলাই ভালো। সবুজ গাছে লাল ফুল দেখো—কতখানি সবুজ আর কত কম লাল। এই মাত্রাটা (proportion) সব সময় মেনে চলবে। অনেকখানি লালের মধ্যে একটুখানি সবুজ দিয়ে দেখো ভালো লাগবে না। প্রকৃতির প্রাইমারি কালারস্ লাল নীল ও হলদে অথবা তাদের মিশ্রিত রংগুলিকে ছবিতে সর্বদা স্থান দেবে। এর মধ্যে যে-কোনো একটা বাদ পড়ে গেলে বা তার proportion নষ্ট হয়ে গেলে দেখো চোখে লাগবে। শুধু লাল আর নীলে চোখ জ্বালা করে, হলদে একটু চাই, শুধু নীল আর হলদে ছবিতে লাল একটু চাই। অবশ্য সবসময়ই সব প্রাইমারি রং দিতে হবে না, তাদের মিশ্রণে নানা রং তৈরি করবে, কিন্তু তাতেও রঙের মাত্রা ঠিক রাখবে।"

নন্দলালবাবুর কাছে বাড়িতে আমি খুবই অল্পদিন শিখেছিলাম, কিন্তু তার মধ্যেই তিনি অনেক দিকে আমার চোখ খুলে দিয়েছিলেন এবং নানা রকম অঙ্কন-প্রণালী শিখিয়েছিলেন।

গোড়ার দিকে প্রারম্ভিক নিয়মগুলি শেখাবার পর শুরু করলেন পাথর, কাঠ, পিতল ইত্যাদির তৈরি জিনিসের ছবি আঁকাতে। বলতেন, "প্রত্যেকটা জিনিসের ক্যারেকটারটা বুঝতে শেখ। পাথরের বাটিকে কাগজের না মনে হয় সেদিকে লক্ষ রেখো।" পাথরের কাঠিন্য, শিশুর দেহের কোমলতা বা ধাতব পদার্থের উপর আলো-ছায়ার খেলার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন নন্দলালবাবু।

আজকাল চিত্রকলার স্কুল কলেজে নানা নিয়ম ও মত অবলম্বন করে চিত্রাঙ্কণ শেখান হয়। অতদিন আগে আমাদের দেশে এইসব নানা মত বোধহয় ছিল না। তখন অতি সামান্য সরঞ্জাম নিয়ে নন্দলালবাবু আমাকে নানারকম ভাবে প্রকৃত ছবি আঁকার শুধু নয়, ছবিকে বোঝবার মূল সূত্রটি ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। একটা জিনিস বুঝতে পেরেছিলাম—ছবি

মানুষের চোখ জুড়িয়ে দেবে এবং মনকে আনন্দ দেবে। অবশ্য বিভীষিকাময় ছবিও হতে পারে যদি মানুষ তাই চায়।

Landscape (দৃশ্যচিত্র) আঁকতে চাইলে বলতেন, "প্রথমে একটা জানালা বা দরজার ভিতর দিয়ে যা আঁকতে চাও সেটি দেখবে, তাহলে ছবির একটা frame (ফ্রেম) নিজে থেকেই হয়ে দাঁড়াবে। যেটা আঁকবে তাকে বুঝতে চেষ্টা কর—খোয়াই যে বিরাট রুক্ষ, শিশু যে কোমল ছোট্ট সেটা সবসময় মনে রাখবে। ছবিতে কোন্ জিনিসটিকে প্রাধান্য দিতে চাও ভেবে নিও, সেটিকে ছবির ঠিক মাঝখানে কখনও রেখো না, তাহলে তার প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে না।"

মনে আছে আমি যখন ছবি আঁকতাম তখন ছবিটি দেখে প্রথমেই বলতেন, 'বেশ হয়েছে।' তারপর হয়ত সংশোধন করতে শুরু করতেন। পরে অনেক সময় আমার ছবিকে আর আমার ছবি বলে চেনাই যেত না, তবু তাঁর মুখ থেকে 'ভাল হয় নি' একথা কখনও শুনি নি। অবশ্য এমন ছবিও দু-চারটা ছিল যা তিনি একটুও সংশোধন করেন নি। বেশির ভাগ সময় দেখতেন ছবি well-balanced হয়েছে কিনা। যে জিনিসটি যেখানে বেশি বা কম হচ্ছে, ছোট বা বড় হচ্ছে, সেগুলিকে যথাযথ করতে শেখাতেন—অর্থাৎ সবশুদ্ধ মিলে ছবিটি যেন প্রকৃত একটি ছবি হয়, চোখ তাতে তৃপ্তি পাবে, মন বুঝবে ছবি কী বলতে চায়। ড্রয়িং ঠিক হয়েছে কিনা লক্ষ রাখতে তো বলতেনই আর বলতেন, "ছবি খুব যত্নের জিনিস। তাড়াতাড়ি করে অসাবধান হয়ে বা অপরিচ্ছন্ন করে আঁকবে না।"

অনেক মানুষের বিষয় গল্প বলার অনেক থাকে ; কিন্তু নন্দলালবাবু খুবই স্বল্পভাষী ছিলেন, তাই তাঁর বিষয় নানারকম গল্প বলা কঠিন।

শান্তিনিকেতনে থাকার সময় দেখতাম ছবি আঁকা ছাড়া তাঁর আর-একটি মস্ত আনন্দ ছিল—ছেলেমেয়েদের নিয়ে দল করে বেড়ানো। যদি বলতাম—"যেখানে যাচ্ছি সেখানে কি আছে ?" বলতেন, "কিছু যে একটা আছে তা নয়, ওই যাওয়াটাই একটা আনন্দ।"

নন্দলালবাবু কলকাতা ছেড়ে বোধহয় শান্তিনিকেতন চলে গেলেন কিছুদিন পরে। অনেক দিন ছবি কিছুই করি নি। তারপর কিছুদিন অবনীন্দ্রনাথের কাছে যেতাম, গগনবাবু আমাকে নিজে থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেটাও খুব দীর্ঘ দিন চলে নি।

বোধহয় বাংলা ১৩২৯ সালে একলা শান্তিনিকেতনে গেলাম। সেখানে

তখন ছোটখাট কলাভবন হয়েছে। যে-বাড়িতে একসময় পিয়ার্সন সাহেব এবং পরে দিনুবাবু ছিলেন সেই বাড়িটির দোতলায় ছবির ক্লাশ বসত। তখন আমাদের সঙ্গে শিখতেন শ্রীমতী হাতীসিং, ঠান্‌দি, যমুনা বসু, সন্তোষবাবুর বোন বাসু, সুচিতা ঠাকুর ইত্যাদি। অ্যাডভান্সড্‌ ক্লাশে ছিলেন ধীরেন্দ্র দেববর্মন, রমেন্দ্র চক্রবর্তী, ভি. মাসোজি আর বোধহয় প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি একবার শিবের একটি ছবি এঁকেছিলাম চুলের জটার সঙ্গে মেঘকে মিশিয়ে। তাতে নন্দলালবাবু বললেন "শিব বা দুর্গার ছবি আঁকতে গেলে তাঁদের অনুভব না করতে পারলে ছবি ভালো হয় না।"

নন্দলালবাবু আজকালকার আধুনিক শিল্পের দিকে বেশি ঝোঁকেন নি, যতটা জানি। তবে নানা পদ্ধতিতে এঁকেছেন। ওয়াশ্‌ দেওয়া ছবি, body colour-এর ছবি, রেশমের উপর ছবি, কাঠের উপর ছবি এসব আমাদের শেখাতেন, পটের ধরনে রামায়ণের অনেক ছবি এঁকেছিলেন। তাঁর ছবি আঁকার রঙের খেলা দেখলে কাশ্মীরের মোগল উদ্যানের ফুলবাগানের কথা মনে হত। কত অজস্র রঙ আর ছোট ছোট মীনার কাজের মতো কারুকার্য এক একটি ছবিতে। কিন্তু সেই রঙগুলির সামঞ্জস্য তিনি এমন করে তুলিতে বুলিয়ে দিতেন যে মনে হত একটা মাত্র অবর্ণনীয় রঙ ফুটে উঠেছে। বনের মধ্যে গরু হারিয়ে গিয়েছে দেখাচ্ছেন, গাছে গাছে কত রঙ কিন্তু চোখ বুজলে মনে হচ্ছে বনটি যেন একটি মাত্র অপূর্ব সবুজ। তাঁকে নিজেকেই বলতে শুনেছি, "বন যখন আঁকবে দেখো একটা সবুজ নয়, কত রকমের সবুজ তাতে। পাতার অনেকরকম রঙ আছে।" শারদশ্রী ছবিটিতে কত রঙ, কিন্তু মনে হয় শুভ্রতা যেন সবচেয়ে বড় হয়ে ফুটে উঠেছে। তিনি কালিকলমের ছবি, পেনসিলের সূক্ষ্ম ড্রয়িং, শুধু তুলির পোঁচের ছবি, জল-ধোওয়া রঙের ছবি, দেয়ালের উপর ফ্রেস্কো কতই এঁকেছেন।

তাঁর বিখ্যাত সীতার অগ্নিপরীক্ষা কিংবা সীতার দেহত্যাগ কত অল্প রেখা ও রঙে কী মহিমাময় ছবি।

ছবিকে তিনি সাধনার মতো করে দেখতেন। মনে হত সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতিকে তিনি যেন নখদর্পণে আনতে চান। যখন নীরবে হেঁটে চলে যেতেন মনে হত কী যেন ধ্যান করছেন। তাঁর সঙ্গে কথার আলাপ বেশি হয় নি ; কিন্তু তাঁর শান্ত ধ্যানী রূপটির গভীরতা ভারি ভালোলাগত।

কলকাতার 'পাঠভবন'-এ নন্দলাল বসু-স্মৃতিসভায় পঠিত।

পুস্তক-পরিচয়

'কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ সাহিত্য'

Commonwealth Literature. Edited by John Press. Heinemann. 25 s.

ইংরাজের সাম্রাজ্যিক বন্ধন দৃঢ় করবার জন্যই একদা কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌-এর সৃষ্টি হয়েছিল। তাতে 'ওয়েল্‌থ্‌' 'কমন্‌' হয় নি। 'ওয়েল্‌থ্‌' গেছে ইংলণ্ডে, আর দুঃখ-দুর্দশা-দারিদ্র্য হয়েছে বাকি দেশগুলির ক্ষেত্রে 'কমন্‌'। বহু দেশের লুণ্ঠনে ধনী হয়েছে মধ্যমণি ইংরাজ। সেই লুণ্ঠনকে অবাধ ও অব্যাহত রাখবার জন্য মধ্যমণির একহাতে ছিল বন্দুক, অন্য হাতে ছিল ভণ্ডামির ইস্‌তাহার। সে ইস্‌তাহারে লেখা ছিল—সম-সম্পদের ভিত্তিতে আমরা সবাই মিলে একটা পরিবার। এই ভণ্ডামির পরিবারের নাম কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই পরিবারের বঞ্চিত সদস্যরা মধ্যমণির আসন টলিয়ে দিয়েছে, অস্তহীন সূর্যের সাম্রাজ্যকে ধ্বসিয়ে দিয়েছে। তবুও মরিয়া মধ্যমণি সেই ভুয়ো পরিবারের কঙ্কালকে এখনও আঁকড়ে ধরে আছে—তার অর্থনৈতিক স্বার্থের জন্য। সদস্যরা স্বাধীন হয়ে কেউ ছিটকে বেরিয়ে গেছে, কেউ ভেতরে থেকেও মধ্যমণিকে শাসায়। আবার ভক্ত অনুগত সদস্যও অবশ্য আছে।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গীকার ছিল—কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌-বহির্ভূত পূর্ণস্বাধীনতা। অনেক ছোট দেশও কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌-এর বাইরে গিয়েছে (যথা, বর্মা)। কিন্তু আমরা পূর্ব-অঙ্গীকার ভুলে শৃঙ্খলকে এখনও স্বীকার করছি। দাসের সবচেয়ে বড় অভিশাপ এই যে সে-শৃঙ্খলকে একদিন ভালোবেসে ফেলে। শিক্ষাক্ষেত্রে আমরা মেকলে-প্রবর্তিত সেই অভিশপ্ত দাসত্বের শৃঙ্খলকে ভালোবেসে, ভালো মনে করে টেনে চলেছি। ইংরাজি ভাষার অধীনস্থ শিক্ষা আমাদের মনকে পঙ্গু করে, সবল স্বাধীন চিন্তার অধিকারী করে না। মাটি থেকে রস নেয় না সে-শিক্ষা। ঐতিহ্যবিচ্যুতি ও কৃত্রিমতা তার মজ্জাগত। এসব কথা বলে বলে রবীন্দ্রনাথের গলা ভেঙে গিয়েছিল। বেচারী রবীন্দ্রনাথ। তিনি মরে বেঁচেছেন।

আসলে, ইংরাজ শাসনের মতো, ইংরাজি-ভাষাধীন শিক্ষারও দ্বৈত ভূমিকা

আছে। ইংরাজ শাসনের দান—রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, আধুনিক বিজ্ঞান, ঐক্যবদ্ধ ভারত। আবার তারই দান—দারিদ্র্য, শোষণ, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, সাম্প্রদায়িকতা, পরাধীনতা। ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবে আমাদের সাহিত্য অনুপ্রাণিত। আবার ইংরাজি ভাষার শৃঙ্খলে আমাদের মন পঙ্গু।

এই দ্বৈত ভূমিকার জন্য আমাদের মনোভাবও দ্বিমুখী। কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌-এর বাইরে যাব বলে প্রতিজ্ঞা করি, কিন্তু যেতে পারি না। ইংরাজিকে রাষ্ট্রভাষার সিংহাসন থেকে টেনে নামাই, কিন্তু তাকে আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরি। মেকলেকে গালাগালি দিই, কিন্তু তাঁরই অভীষ্টকে সফল করি।

এ তো গেল আমাদের দিক। অন্যদিকে ইংরাজ মরতে মরতেও কমন্‌-ওয়েল্‌থ্‌-এর ফুটো নৌকা মেরামত করে চলেছে। প্রতি বছর প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলন করে, রানীর বাড়িতে তাঁদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ায়, গাল খেতে খেতেও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা করে। এ ছাড়াও অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক নানা দিক থেকে কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌-এর বন্ধনকে দৃঢ় করবার চেষ্টা তাদের প্রতি মুহূর্তে। বৃটেনে কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌-অধিবাসীদের কিছু বাড়তি সুবিধা দেয়, পরিবারের কথাটা মনে করায়, ভারতের মাটি থেকে ব্যবসায়িক সুবিধাটা নেওয়ার চেষ্টা করে—এক পরিবারের লোক তো!

এই 'পারিবারিক' পটভূমিকায় নতুন একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো লীড্‌স্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও সম্মেলনের ব্যয়ভার বহন করেছেন ব্রিটিশ কাউন্সিল, কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ রিলেশন্‌স্‌ অফিস, ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন, কংগ্রেস ফর কালচারাল ফ্রীডম্‌, এরিয়েল ট্রাস্ট, অস্ট্রেলিয়ান হিউম্যানিটিজ্‌ রিসার্চ কাউন্সিল, কানাডা কাউন্সিল, ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটি গ্রাণ্ট্‌স্‌ কমিটি প্রভৃতি। সম্মেলনে কথিত ও পঠিত বিষয়ের নির্বাচিত এই সঙ্কলনটি সম্পাদনা করেছেন ব্রিটিশ কাউন্সিলের জন্‌ প্রেস্‌। সঙ্কলনটির নাম দেওয়া হয়েছে 'কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ লিটারেচার'। সঙ্কলনে আলোচিত বিষয়গুলি সাহিত্য ও পরিবেশ, ভাষা ও সংস্কৃতি, বহুভাষী সমাজে ইংরাজির স্থান, ভাববিনিময় ও শিল্পীর দায়িত্ব ইত্যাদি শাখায় বিভক্ত।

বক্তা ও লেখকদের মধ্যে ছিলেন জন ম্যাথুস, আর. ডি. ম্যাথুস, ডি. ই. এস. ম্যাক্সওয়েল, বালচন্দ্র রাজন্‌, আর. কে. নারায়ণ, এ. জি. স্টক, চিনুয়া আচেবি, এস. এ. আশরফ, এডমণ্ড্‌ ব্লানডেন প্রভৃতি। লেখকরা প্রত্যেকেই কৃতী এবং তাঁদের লেখাও বেশ চিন্তার খোরাক যোগায়। কিন্তু এই ধরনের সম্মেলনের

উদ্দেশ্য সম্পর্কে একাধিক কারণে অস্বস্তি বোধ করতে হয়। ভূমিকায় নর্মান জেফারেস্ বলেছেন যে কমন্‌ওয়েল্‌থ্-এর বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকরা তাঁদের নিজস্ব ঐতিহ্য এবং ধ্যানধারণার দ্বারা কমন্‌ওয়েল্‌থ্-এর 'সাধারণ সংস্কৃতি'কে (কমন্ কালচার) কিভাবে পুষ্ট করছেন তা বুঝতে চেষ্টা করাই এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন এই যে ঔপনিবেশিকতার প্রাক্তন সূত্রে গ্রথিত এবং মূলত অর্থনৈতিক কারণে শিথিলভাবে সংহত কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ভুক্ত দেশগুলির মধ্যে তেমন কোনো 'সাধারণ সংস্কৃতি'র অস্তিত্ব কি সত্যই আছে অথবা থাকা সম্ভব? বিভিন্ন দেশের সাহিত্য নিশ্চয়ই পড়ব রসাস্বাদন ও তুলনামূলক আলোচনার জন্য। লেখক-সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তাও অস্বীকার করছি না। কিন্তু বিশেষ করে কমন্‌ওয়েল্‌থ্-এর লেখকদের সম্মেলন কেন? ক্রমশ কি তাহলে আমরা 'সিয়াটো'-গোষ্ঠীর সাহিত্যিক অথবা 'ন্যাটো'-গোষ্ঠীর নাট্যকারদের সম্মেলন আয়োজিত হতে দেখব? সংকলনটির নামকরণ সম্পর্কেও অস্বস্তি বোধ না করে পারা যায় না। কারণ নামে 'কমন্‌ওয়েলল্‌থ্ লিটারেচার' হলেও কমন্‌ওয়েল্‌থ্-ভুক্ত বিভিন্ন দেশের ভাষায় রচিত সাহিত্য নিয়ে আলোচনার চেষ্টা এতে যৎসামান্য।

মূলত ইংরাজি পঠন-পাঠন এবং ইংরাজি ভাষায় লিখিত মৌলিক রচনার সমস্যা এখানে আলোচিত হয়েছে। যে কয়েকজন লেখক তাঁদের দেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি নিয়ে সাধারণভাবে আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে কানাডার জন ম্যাথুস্ এবং আর. ডি. ম্যাথুসের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কানাডার জাতীয় জীবন মার্কিন অর্থনীতির প্রভাবে কিভাবে বিকৃত হচ্ছে, সে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য কিভাবে ক্রমশ অবলুপ্তির দিকে যাচ্ছে তার বিস্তৃত আলোচনা করেছেন আর. ডি. ম্যাথুস্। এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশই আজ এই বিচিত্র সংকটের সম্মুখীন বলে প্রবন্ধটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আফ্রিকার সদ্যজাগ্রত দেশগুলিতে শিল্প-সাহিত্যের বিবিধ সমস্যা একাধিক প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এযাবৎকাল আফ্রিকার সাহিত্যের মূল সুর ছিল স্বাধীনতা-স্পৃহা এবং বিদেশী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কিন্তু বর্তমানে বহুক্ষেত্রে অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণ গণ্ডী থেকে উত্তরণের এবং আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। "জাতীয়তাবাদ ও লেখক" শীর্ষক প্রবন্ধে এলড্রেড্ ডি. জোন্স আফ্রিকার বুদ্ধিজীবীদের এই নতুন দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করেছেন। "শিক্ষকের ভূমিকায় ঔপন্যাসিক" প্রবন্ধে সুখ্যাত ঔপন্যাসিক চিনুয়া আচেবি

বলেছেন যে শিল্পী হিসাবে তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য হলো হীনমন্যতাবোধ থেকে আফ্রিকার জনসাধারণকে উদ্ধার করা এবং জাতি হিসাবে তাঁদের আত্মসচেতন ও আত্মস্থ করে তোলা। শিল্পীর স্বাধীনতা ও সামাজিক দায়িত্ব একটি বহু-বিতর্কিত বিষয়। এ-সম্পর্কে কোনো সাধারণ এবং সর্বত্র-প্রযোজ্য উত্তর দেওয়া কঠিন। একমাত্র বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতেই নির্দিষ্ট মন্তব্য প্রকাশ করা যায়। তাই আপাতত অতিসরলতা-দোষে দুষ্ট মনে হলেও আফ্রিকার সমাজজীবনের বিশেষ পটভূমিতে শিল্পীর দায়িত্ব সম্পর্কে আচেবি যে-মন্তব্য করেছেন তার সত্যতা সন্দেহাতীত।

পূর্বেই বলেছি যে সংকলনটির একটি বড় অংশে ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের সমস্যা আলোচিত হয়েছে। ইংরাজি ভাষা এশিয়া ও আফ্রিকার বহু দেশে মূলত ঔপনিবেশিকতার উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত। এতৎসত্ত্বেও ইংরাজি ভাষার দ্বারা যে এ-সকল দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয়েছে একথা উগ্র জাতীয়তাবাদী ব্যতিরেকে সকল সুস্থবুদ্ধির লোকই স্বীকার করবেন। নাইজিরিয়ার মতো দেশে যেখানে দুশো পঞ্চাশটি ভাষা এবং উপভাষা সজীবভাবে বর্তমান, সেখানে আন্তঃপ্রাদেশিক ভাববিনিময়ের ক্ষেত্রে এর মূল্য অপরিসীম। তাছাড়া দেশীয় সাহিত্য বহুক্ষেত্রেই ইংরাজির দ্বারা অনুপ্রাণিত। বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্যও ইংরাজির প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু এর পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে বহু সমস্যা আছে। অনুন্নত আঞ্চলিক উপভাষাগুলির সীমাবদ্ধ প্রকাশক্ষমতা এবং স্বরবর্ণের বিচিত্র উচ্চারণ-পদ্ধতির জন্য নাইজিরিয়ায় এ-সমস্যা যে কত জটিল তার পরিচয় পাওয়া যায় জে. ও. একপেনীয়ঙ্-এর প্রবন্ধে। ভারত ও পাকিস্তানের ইংরাজি শিক্ষাবিভ্রাট নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন এস. এ. আশরফ, বালচন্দ্র রাজন, আর. কে. নারায়ণ, এ. জি. স্টক এবং এস. নাগরাজন। দুটি দেশের ইংরাজি পঠন-পাঠনের সমস্যাগুলি বহুক্ষেত্রেই এক। দুটি দেশেই ইংরাজি সাহিত্যের মৌলিক সপ্রাণ সমালোচনা নিতান্ত স্বল্প এবং ছাত্রদের মধ্যে নিজস্ব চিন্তাশক্তির একান্ত অভাব। এই অঞ্চলে ইংরাজি পঠন-পাঠনের প্রধান বাধা হলো পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসজ্ঞানের অভাব এবং ইংরাজদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্পর্কে আমাদের ধারণার অস্পষ্টতা। ইতিহাস তবু বই পড়ে শেখা সম্ভব। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে যোগাযোগের অভাবে উদ্ভূত একধরনের অস্পষ্টতা প্রাথমিক শিক্ষার্থী থেকে গবেষণকারী পর্যন্ত সকলকেই বিভ্রান্ত করে।

স্বীকার করা ভালো যে ভারতে প্রাথমিক স্তরে যাঁরা ইংরাজি শেখান, ইংরাজি ভাষা-ভাব-আচার-ব্যবহার তাঁদের কাছে সুপরিচিত নয়। কাজেই ইংরাজি ভাষার শব্দার্থ, বাক্‌বিধি, ক্রিয়ার কালভেদ, উচ্চারণ-বিধি এবং ইংরাজ-জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে ছোটবেলা থেকেই অধিকাংশ ছাত্রের বেশ কিছুটা ফাঁক থেকে গেছে। শুধু ইংরাজি ভাষা নয়, শিশুপাঠ্য ইংরাজি বই-এর বিষয়-অনুষঙ্গও অধিকাংশ ভারতীয় শিশুর কাছে অপরিচিত। তুষারপাতের বিবরণ, খ্রীস্টমাসের আনন্দ, সাণ্টাক্লজের আগমন ইত্যাদি বহু ব্যাপার যা ইংরাজশিশুর একান্ত নিকট ও প্রিয়, ভারত-পাকিস্তানের শিশুদের কাছে তা অত্যন্ত সুদূর এবং অর্থহীন। কিন্তু বুঝুক আর নাই বুঝুক, ভালো লাগুক বা না-লাগুক, পরীক্ষাপাশের খাতিরে তাদের তা মুখস্থ করতেই হবে। শৈশব-কৈশোরের গঠনকালটি তাদের কাটছে না-বোঝা ব্যাপার গলাধঃকরণ করে। না বুঝে কণ্ঠস্থ করাকে শিক্ষার সঠিক উপায় মনে করার এই প্রবণতা অন্যত্র সংক্রামিত হচ্ছে এবং এক ধরনের মানসিক জড়ত্ব ক্রমশ তাদের স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও কল্পনাশক্তিকে গ্রাস করছে। শ্রীমতী স্টক বহুদিন ভারতে অধ্যাপনা করে এবং আপন সহৃদয়তার গুণে সমস্যাটির মর্মে প্রবেশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে ভারতীয় ছাত্রের সাংস্কৃতিক জগৎ ও আঞ্চলিক ভাষায় প্রচলিত বাক্‌বিধির সঙ্গে ইংরাজদের সাংস্কৃতিক জগৎ ও বাক্‌বিধির দুস্তর ব্যবধান। অথচ ভারতীয় ছাত্রের ইংরাজি রচনা বহুক্ষেত্রেই আঞ্চলিক ভাষা থেকে প্রচলিত ইংরাজি বাক্‌বিধিতে অনূদিত। এই অনুবাদকালে চিন্তার সূক্ষ্মতা, জটিলতা এবং স্বাধীনতা নষ্ট হয়। মাধ্যম সম্পর্কে ছাত্ররা নিজেদের অনিশ্চিত ও আস্থাহীন বোধ করে এবং ক্রমশ আপন মতপ্রকাশে নিরুৎসাহ ও অপারগ হয়ে পড়ে। সাহিত্যপাঠে তাদের নিজস্ব কোনো জিজ্ঞাসা অথবা ভূমিকা থাকে না। সাহিত্যপাঠ অধ্যাপকের একতরফা নীরস বক্তৃতায় পর্যবসিত হয়। তাছাড়া পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে পরিপার্শ্বের অসামঞ্জস্যের ফলে বহু ইংরাজিশিক্ষার্থীরই এক দ্বিধাবিভক্ত ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয়। এদেশে বাস করেও এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি-মূল্যবোধের সঙ্গে তারা একাত্ম বোধ করে না। ফলে একধরনের মূল্যহীন নিরালম্ব মানস জীবন-যাপন করে। এ-অবস্থার প্রতিকারস্বরূপ শ্রীমতী স্টক ও শ্রীনাগরাজন্ আলোচনাচক্রের সংখ্যাবৃদ্ধি, ছাত্রদের নিজ মতপ্রকাশে উৎসাহিত করা, পাঠ্যসূচী কমানো, ভারতের সাংস্কৃতিক পটভূমির সঙ্গে ইংরাজিশিক্ষার্থীর নিবিড়তর যোগাযোগ রক্ষা, সম্ভবক্ষেত্রে দেশীয় সাহিত্যের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে

ইংরাজি সাহিত্য বোঝার চেষ্টা ইত্যাদি কয়েকটি উপায় নির্দেশ করেছেন। এর সঙ্গে প্রাথমিক স্তরে যথাসম্ভব ধ্বনি ও ছবির সাহায্যে পড়ানো, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান, উচ্চ-মাধ্যমিকের পর ইংরাজিকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখা ইত্যাদি আরও কয়েকটি উপায় গ্রহণ করা যেতে পারে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কে প্রায়ই বলা হয়ে থাকে—"হলে তো খুব ভালোই হত কিন্তু তা কি সব বিষয়ে সম্ভব ?" পৃথিবীর সমস্ত সভ্যদেশেই যা অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে সম্ভব হচ্ছে একমাত্র আমাদের দেশেই বা তা সম্ভব নয় কেন বোঝা কঠিন। স্বয়ং সত্যেন বসু মাতৃভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার সপক্ষে হলেও এদেশের বহু অধ্যাপক মনে করেন যে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যা ইংরাজির মাধ্যম ছাড়া শেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যায় ভাষার ভূমিকা তো গৌণ ; সেখানে চিহ্নের ছড়াছড়ি। বোর্ডে এঁকে ও পরীক্ষাগারে হাতেকলমে দেখিয়ে শেখানোর সুবিধাও আছে। নিয়মিত ও নির্দিষ্ট চাহিদা থাকলে মাতৃভাষায় লিখিত পাঠ্যপুস্তকের অভাব হবে বলেও মনে হয় না। তাহলে আর আপত্তিটা কিসের ? শুধু জাপানের দিকে তাকালেও এঁদের আপত্তির যুক্তিহীনতা ধরা পড়বে। জাপানে নিম্নতম স্তর থেকে উচ্চতম স্তর অবধি সকল বিষয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। বিদেশী ভাষার দাসত্ব না করেও জাপান বাইরের জগতের দিকের জানালা খুলে রেখেছে ; প্রতীচ্যের আধুনিকতম বিদ্যার অংশীদার হয়েছে। অথচ প্রায় দেড়শ বছর ধরে মেরে-পিটে ইংরাজি শেখার পরেও আমরা কত ব্যাপারে কী প্রচণ্ড অনাধুনিক রয়ে গেছি !

শিক্ষা-বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধে এই সমস্যা এবং তার সমাধান সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত এবং সুচিন্তিত আলোচনা করেছেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার আঠারো বছর পরেও শিক্ষাবিভাগ তাঁর উপদেশে কর্ণপাত করেন নি। তার ফলে বিপুলসংখ্যক ছাত্রছাত্রী এক 'নিরানন্দ মানসিকশক্তিহ্রাসকারী' পাঠ্যসূচীর চাপে বিব্রত ও শীর্ণ হয়ে আছে। অস্বীকার করে লাভ নেই যে ইংরাজি ভাষা বহুক্ষেত্রেই প্রয়োজনের তাগিদে পড়া—ছাত্রদের উপর জোর করে চাপানো। উচ্চমাধ্যমিকের পর ইংরাজিকে যদি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে রাখা যায় এবং চাকুরিক্ষেত্রে ইংরাজি-জানা এবং ইংরাজি-না জানা প্রার্থীর মধ্যে কোনোরকম বৈষম্য না থাকে তবে নিঃসন্দেহে ইংরাজিশিক্ষার্থীর সংখ্যা কমবে। তখন স্বল্পসংখ্যক যথার্থ ইংরাজি-অনুরাগী ছাত্রের প্রতি বিশেষভাবে শিক্ষিত ইংরাজি শিক্ষকরা অনেক বেশি মনোযোগ দিতে পারবেন। তাতে ইংরাজির

ভারে সাধারণ ছাত্র নিপীড়িত হবে না। অথচ যারা বিশেষভাবে ইংরাজিই শিখতে চায় তাদের ইংরাজির মান অনেক উন্নত হবে। বাইরের বিশেষ কোনো চাপ না থাকা সত্ত্বেও নিছক ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগে বহু লোক যেমন ফ্রেঞ্চ ও জার্মান শিখছেন তেমনভাবে আমরা ইংরাজি শিখব। বর্তমানে সাহিত্যরসাস্বাদনের চেয়ে ইংরাজিতে পাশ করে যথাশীঘ্র চাকরি লাভের জন্য আমাদের ছাত্ররা অনেক বেশি ব্যাগ্র।

এর চাইতেও লজ্জার কথা এই যে ইংরাজি-শিক্ষা আমাদের দেশে বহু ক্ষেত্রে একধরনের সামাজিক ছাড়পত্র হিসাবে ব্যবহার হচ্ছে। আমরা সঠিক ইংরাজি উচ্চারণকে শিক্ষার মাপকাঠি বলে ধরে নিয়েছি। মাতৃভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ঔদাসীন্য ও অজ্ঞতাকে আমরা লজ্জা ও চিন্তার বিষয় বলে মনে করি না। কিন্তু ঠিকমতো ইংরাজি উচ্চারণ করতে না পারলে ভয়ানক লজ্জিত বোধ করি। মাতৃভাষা সম্পর্কে এই অপরিসীম অশ্রদ্ধা দেখিয়ে এবং সামাজিক মর্যাদার প্রতীক হিসাবে ইংরাজিকে মূল্য দিয়ে আমরা প্রচণ্ড হীনমন্যতাবোধের পরিচয় দিচ্ছি।

পরিশেষে ইংরাজিতে রচিত ভারতীয় সাহিত্য সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা যেতে পারে। বলা বাহুল্য এ-সম্পর্কে সাধারণভাবে কোনো আপত্তি থাকতে পারে না। কিন্তু এর কয়েকটি বাস্তব অসুবিধা আছে। আঞ্চলিক ভাবানুষঙ্গ ও ব্যাক্তিক চিত্রকল্পের জন্য আধুনিক পৃথিবীতে পারস্পরিক ভাববিনিময় একটি দুরূহ সমস্যা। বিদেশী ভাষাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করলে সে-সমস্যা বাড়ে বই কমে না। বহু ক্ষেত্রেই লেখকের চিন্তা-ভাবনা-অনুভূতি যেন দ্বিতীয়বার পরিশ্রুত হয়ে একটা প্রাণহীন রক্তশূন্য চেহারা নেয়। এ-দশা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ইংরাজির ক্ষেত্রেও ঘটেছে। মধুসূদন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো ইংরাজিতে সুপণ্ডিত ব্যক্তিও প্রায় অনিবার্য ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়ে এ-পথ ত্যাগ করেছিলেন। ইদানীং বহু লেখক বিস্তৃততর পাঠকগোষ্ঠীর জন্য এবং অন্যান্য কারণে ইংরাজিতে সাহিত্য রচনা করছেন। স্বভাবতই তাঁরা ভারতের বাইরে পঠিত এবং পরিচিত হচ্ছেন। বলা বাহুল্য এঁরা কেউই ভারতের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে গণ্য নন। তাছাড়া এঁদের লেখা পড়ে ভারতবর্ষকে এবং তার সাহিত্যজগৎকে জানবার সম্ভাবনা কম। সরকারের হিন্দী আনুকূল্য, প্রথমশ্রেণীর লেখকদের অনুবাদের ব্যাপারে আমাদের গাফিলতি এবং বহু ক্ষেত্রে অনুবাদের দুরূহতার জন্য অনেক তৃতীয় শ্রেণীর লেখক শুধু ইংরাজিকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করার জোরে বিদেশে কল্কে পাচ্ছেন। ভারতীয় সাহিত্যজগতে মুলুকরাজ আনন্দের কোনো বিশিষ্ট স্থান নেই; অথচ বিদেশে তিনি বহুলপ্রচারিত। ব্রিটিশ কাউন্সিল

আয়োজিত একটি আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট ভারতীয় সাহিত্যিক হিসাবে নীরোদ চৌধুরীর নাম উল্লিখিত হতে শুনেছি। এইভাবে বিদেশে ভারতীয় সাহিত্যের মান সম্পর্কে ভুল ধারণার সৃষ্টি হচ্ছে। মাধ্যম নির্বাচন সম্পর্কে শিল্পী নিঃসন্দেহে স্বাধীন কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, যেসব ভারতীয় লেখক ইংরাজিতে লিখছেন তাঁরা কোন দেশের সাহিত্য পুষ্ট করছেন? ভারতে অতি স্বল্পসংখ্যক লোক ইংরাজি বোঝেন। ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় রচিত সাহিত্যের মূল ধারার সঙ্গে ভারতীয়-রচিত ইংরাজি সাহিত্যের কোনো যোগাযোগ নেই। সুতরাং আঞ্চলিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এঁদের দান যৎসামান্য। অন্তত বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে নির্ভয়ে বলতে পারি সুধীন ঘোষ, নীরোদ চৌধুরী প্রভৃতি লেখকদের কোনো ভূমিকা নেই। অপরপক্ষে এইসব লেখকরা ইংরাজি সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করছেন, একথা মনে করার হেতু অদ্যাবধি দেখা যায় নি। 'ভারতীয় ইংরাজি' নামে একধরনের আপাতচমকপ্রদ ইংরাজির সৃষ্টি হয়েছে মাত্র। আমেরিকায় যেহেতু ইংরাজি ভাষার রূপান্তর ঘটেছে সেহেতু আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশেও ইংরাজির বিবিধ রূপান্তর ঘটুক—এ-ধরনের যুক্তিতে খুব উৎসাহ বোধ করার কারণ দেখি না। আশঙ্কা হয়, অল্পদিনের মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশে আমরা সবাই ইংরাজিতে কথা বলতে থাকলেও কেউ কাউকে বুঝতে পারব না। এসব কথা বাদ দিয়ে, শুধু ফলাফলের ভিত্তিতে বিচার করলেও বলা যায় যে রাজা রাও, আর. কে. নারায়ণ প্রভৃতি দু-একজন শক্তিশালী লেখকের লেখা ছাড়া ভারতীয় লেখকদের ইংরাজি রচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যপদবাচ্য নয়। 'ভারতে ইংরাজি' প্রবন্ধে আর. কে. নারায়ণ নিজেই বলেছেন যে ইংরাজিতে রচিত ভারতীয় সাহিত্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুকৃত ও অনুবাদগন্ধী, মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে উজ্জ্বল। কিন্তু ভারতীয়-লিখিত ইংরাজি সাহিত্য গভীর—সম্মেলনে উপস্থিত লেখকরা কেউই এ-দাবি করেন নি। বস্তুত বিদেশী ভাষায় অস্তিত্বের গভীরতর অনুভূতির প্রকাশ প্রায় অসম্ভব। কারণ প্রত্যেক দেশেরই জীবনযাত্রার একটি বিশিষ্টতা ও ভাষার একটি প্রাণ আছে, সেটিকে অন্য ভাষায় যথাযথভাবে রূপ দেওয়া দুরূহ। তাই স্বীকার করে নেওয়া ভালো ইংরাজি আমাদের কাজের ভাষা, প্রাণের ভাষা নয়। পি. এল. ব্রেণ্ট সম্পাদিত 'ইয়াং কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌ পোয়েট্‌স্‌' শীর্ষক সংকলনের অন্তর্গত নিসিম এজেকিয়েল, কমলা দাস, পি. লাল, আর. পার্থসারথি প্রভৃতি তরুণ ভারতীয় কবিদের রচনায় প্রাণশূন্যতা, অনুকৃত চিত্রকল্প এবং সচেষ্ট সপ্রতিভতা দেখে এ-ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়।

যাই হোক, ইংরাজি ছাড়া কমন্‌ওয়েল্‌থ্‌-এর অন্যান্য ভাষার সাহিত্য নিয়েও আলোচনা হবে, এমন আশ্বাস দিয়েছেন সম্মেলনের উদ্যোক্তারা। আমরা সেই আলোচনার অপেক্ষায় রইলাম।

কেয়া চক্রবর্তী

সত্যজিৎ রায়ের 'নায়ক'

মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ দানা বেঁধে উঠছিল যে, সত্যজিৎ রায়ের সৃষ্টির মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান ক্রমশই সংকুচিত হয়ে আসছে। 'কাঞ্চনজঙ্ঘা'র পরে আবার সেই নিজস্বতা ও নতুন সৃষ্টির চেহারা পেলাম 'নায়ক' ছবিতে। এইবার প্রত্যয়ের সঙ্গে বলব যে সত্যজিৎ রায় যখনই নিজের লেখা গল্প নিয়ে চলচ্চিত্র তৈরী করেছেন, তখনই তাঁর সৃষ্টি অধিকতর সার্থক হয়েছে। তিনি তখন অতি সতর্ক, অতিশয় সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত। তাঁর কাহিনীবিন্যাসের ধরন তখন একটা কেন্দ্রকে ঘিরে—কাঞ্চনজঙ্ঘায় মা,—পারিবারিক সমস্ত সমস্যার সম্পর্কগুলো বিধৃত হয়েছে মাকে কেন্দ্র করে, 'নায়ক'-এ নায়ক নিজে। যদিও 'ফর্ম'এর দিক থেকে 'নায়ক' আরও জটিল, সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন কতকগুলি চরিত্রের সমস্যার মাঝখানে নায়কের কেন্দ্রীভূত স্থানকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়েছে 'নায়ক'এর চিত্রনাট্য আরও নিপুণ ও আরও দৃঢ়বদ্ধ হওয়ার দরুণ। যেমন কাঞ্চনজঙ্ঘায়, তেমনি 'নায়ক'-এ—স্থান-কাল-পাত্র একটা নির্দিষ্টতায় আবদ্ধ ও নিয়ন্ত্রিত,—যেন একটা ছবির ফ্রেম, এই গণ্ডীর বাইরে অকারণ, অতিরিক্ত, অহেতুক বিস্তৃতির বা বিচ্যুতির কোনো পথ নেই।

এই অসাধারণ সুশৃঙ্খল গণ্ডীর মধ্যে বক্তব্যকে তিনি উপস্থাপিত করেছেন। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে কোনো ধোঁয়া নেই, যদিও সূক্ষ্মতা আছে। এয়ারকণ্ডিশনড্ কোচের যাত্রীর পাশাপাশি তিনি তৃতীয় শ্রেণীর (ভেস্টিবিউলড্) যাত্রীকে (স্বামী-স্ত্রী) দেখিয়েছেন সুস্থ বৈপরীত্যের প্রতীক করে। কিন্তু তাঁর আসল বক্তব্য সেই শ্রেণীকেই কেন্দ্র করে যারা বিত্তবান্, যারা আমাদের সমাজের উপরতলার লোক—সমাজের নায়ক, কর্ণধার। নায়ক অরিন্দম মুখার্জির জগৎ চলচ্চিত্রের জগৎ,—কিন্তু তার সহযাত্রীরা তার থেকে বেশি দূরের লোক নন, চিন্তায় কর্মে ও বাক্যে তাঁরা একই দেবতার পূজারী। যাদের মধ্যে গভীরতা নেই, শোভনতা নেই, বিবেকবোধ নেই, আছে শুধু দুরাকাঙ্খা ও আত্মপ্রসাদের দৈত অভিযান।

'নায়ক'-এর 'ট্রিটমেণ্ট'-এর ধরন আগাগোড়াই সামঞ্জস্যপূর্ণ। দৃশ্য ভেঙে ভেঙে বিভিন্ন যাত্রীকে যেমন তুলে ধরা হয়েছে, তেমনি অরিন্দমের চিন্তাও টুকরো

টুকরো ভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। আগেই বলেছি এ কাহিনী বিন্যাসের কেন্দ্র 'নায়ক' নিজে। তার সহযাত্রীদের চিন্তা ও সমস্যা বিভিন্ন, কিন্তু চরিত্রগতভাবে তারা এক। যেমন শিল্পপতির অপরের স্ত্রীর প্রতি লোভ, বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীর মক্কেল জোগাড়ের লোভ, যে জন্যে সে স্ত্রীকে ব্যবহার করতে প্রস্তুত ; শিল্পপতির স্ত্রীর 'গ্ল্যামার'-এর প্রতি লোভাতুর বাসনা, (যার বিপরীতে তাঁর মেয়ের সরল অ্যাড্‌মিরেশন) এবং নায়কের লোভ,—অর্থ, প্রতিপত্তি, গ্ল্যামার—সমস্তই একটা বিত্তবান, স্বার্থপর, আত্মসর্বস্ব শ্রেণীর প্রতি জ্বলন্ত অঙ্গুলিনির্দেশ। এদের আবার নিজস্ব নীতিশিক্ষা আছে। শিল্পপতি সিনেমা-অভিনেতার প্রতি বিরূপ এবং বিশেষ করে নারীঘটিত স্ক্যাণ্ডাল সম্পর্কে। বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ী স্ত্রীকে নিজের উন্নতির জন্য ব্যবহার করতে প্রস্তুত হলেও সিনেমায় যোগ দেওয়ার নামে আঁতকে ওঠে। এই এ. সি. সি. তে আরও একজন আছে, যার ব্যবসা ধর্মের (ডবলিউ, ডব্‌লিউ, ডব্‌লিউ, ডব্‌লিউ), সেও বিজ্ঞাপনের বাজেট তৈরী করে।

এই নীতিভ্রষ্ট, বিবেকহীন, বিত্তবান শ্রেণীর জগতের কেন্দ্র নায়ক স্বয়ং! না, তার সমস্যা গভীর নয়, অতল নয়, জটিল নয়। বরং অগভীর, ইংরেজিতে যাকে বলে 'শ্যালো'। কিন্তু নায়ক যে সমাজের কাছাকাছি মানুষ, সে সমাজটাই কি শ্যালো নয়, অগভীর নয়? এ সমাজের চরিত্রের সঙ্গে, দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে, তাদের মূল্যবোধের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় নেই, সম্ভবত সেই জন্যেই দর্শকের একাত্মবোধ আসা কঠিন। বরং তৃতীয় শ্রেণীর সহজ সুস্থচেতা স্বামী-স্ত্রীকে অনেক কাছের মানুষ বলে দর্শকের মনে হওয়া স্বাভাবিক।

প্রশ্ন ওঠে, 'তবে এমন ছবি করার কি দরকার ছিল? আমরা সত্যজিৎ রায়ের কাছে অনেক প্রত্যাশা করি, একটা উপরতলার সমাজের ছবি দেখিয়ে তিনি শুধু টেকনিকের বাহার তোলার সুযোগ নিলেন? শুধু ফর্ম? বিষয়বস্তু যাই হোক? কোথায় গেল তাঁর শিল্পচেতনা, তাঁর চরিত্রচিত্রণের মধ্যে ইমোশনাল ইন্‌টেগ্রিটি?'

অথচ 'নায়ক' ছবিতে যে সূক্ষ্ম রসবোধ আছে, যে ব্যঙ্গ আছে, সুস্থ ও অসুস্থ মনের যে বৈপরীত্য আছে, বিত্তবান ও সাধারণ মানুষের যে প্রভেদ নির্দেশ আছে, তাতে বলা কি যায় না 'নায়ক' একটা 'সোশ্যাল স্যাটায়ার'? এইখানেই 'নায়ক' ছবির বিষয়বস্তুর গভীরতা। ব্যক্তিগতভাবে নায়ক এই সমাজেরই প্রতীক।

এই পটভূমিতে অদিতি সেন বুদ্ধিজীবী, স্থিরবুদ্ধি মেয়ে, এই যুগে ধরা

সমাজের মধ্যে একটা আলোর দীপ্তি। অরিন্দম মুখার্জির কথা সে তার কাগজে লিখতে চায় না, তার পাণ্ডুলিপি সে ছিঁড়ে ফেলে, ঘৃণায় নয়, বরং সহানুভূতিতে। অরিন্দমের প্রতি তার একাত্মবোধ নেই, সে 'অন্য জগতের মানুষ' তাই দিল্লী স্টেশনে পৌঁছে একবারের জন্যেও সে পিছন ফিরে তাকায় না। কিন্তু অরিন্দম চেয়ে দেখে, যদিও পর মুহূর্তেই তার মুখের মুখোশটা বেঁচে ওঠে। ম্যাটিনি আইডল গ্ল্যামার বয়ের ছকে বাঁধা হাসির উপরে ছবির যবনিকা নামে।

কাহিনী বিন্যাসের ধরন

চতুষ্কোণগুলো একটার পর একটা বিলীন হয়ে প্রথমেই ফুটে ওঠে নায়কের মাথার পিছন দিক। তাকে দেখতে পাই না পুরোটা। অনেকক্ষণ সে থাকে অল্প দেখার আড়ালে, দেখছি তার দামী স্যুটকেস্, তার হাতে হাজার টাকার নোট, তার দামী জুতো জোড়া যতক্ষণ না পরদায় ফোটে তার মুখ। অন্যান্য চরিত্রকে পরিচিত করার ব্যাপারে সত্যজিৎ রায়ের টেকনিক একই। প্রথমেই চরিত্রের একটা বৈশিষ্ট্যকে তিনি তুলে ধরেন। কামরায় অরিন্দমের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপতি পরিবারের বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া এবং শিল্পপতিকে দেখামাত্র বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়ীর প্রতিক্রিয়া এবং তার স্ত্রীর সঙ্গে সংলাপের মাধ্যমে মুহূর্তেই বেশ একটা পরস্পর সম্পর্কের চিত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। 'স্টেট্‌স্‌ম্যান্'-এ যে-ভদ্রলোক চিঠি লেখেন ও করিডরে দেখা ছোট্ট মেয়েটি এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই অরিন্দমের একটা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ। এ সম্পর্কে স্মরণীয়—মাতাল অরিন্দম যখন বৃদ্ধের বিরক্তি উৎপাদন করার পরে সোজা হয়ে ঘুরে দাঁড়ায় তখন তার চোখে পড়ে করিডরের অপরপ্রান্তে সেই ছোট্ট মেয়েটি, সে খুব সহজ বন্ধুত্বের সুরে জিগ্যেস করেছিল 'তোমার নাম কি?' অরিন্দম তার দিকে এগোতে যায়, মেয়েটি ছুটে পালায়। তখন অরিন্দমের একাকিত্ব সম্পূর্ণ। বৃদ্ধ ও শিশু উভয়ের কাছেই সে বাতিল। এর পরেই তাকে দেখি ট্রেণের খোলা দরজায় লগ্ন হয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রায় নিরালম্ব আত্মহত্যার ভঙ্গীতে।

আবহসংগীত ও শব্দের প্রয়োগ

ছবি শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যে তীক্ষ্ণ ধাতব ধ্বনিতে ঘর মুখরিত হয়ে ওঠে সেটা যেন অরিন্দমেরই জীবনকে ধ্বনিত করে—একটা চমক, আর চটক—পেশাদারী, যান্ত্রিক, নিষ্ঠুর। ছবি এগোবার পর তাৎপর্যপূর্ণ বিশেষ মুহূর্তগুলিতে

আবহসংগীত ব্যবহৃত অতি নেপথ্যে। ট্রেণের আওয়াজকে এত নানা ধরনে, প্রয়োজনানুসারে কথনও জোরে, কথনও আস্তে, বাথরুমে কর্কশ—এয়ারকণ্ডিশনড কামরার মধ্যে চাপা মসৃণ আওয়াজ—কামরার মধ্যে স্ট্যাণ্ডে রাখা কাঁচের গেলাসের ঝন্‌ঝনি—ইত্যাদিতে এত বিশদ ও কল্পনাশ্রয়ীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে ভ্রম হয় আমরা দর্শকরাও ট্রেণের মধ্যে আছি। ব্যাক প্রোজেকশনের সার্থক ব্যবহারও এই একাত্মবোধে সাহায্য করে। শব্দের সূক্ষ্ম কাজকে নিপুণ ভাবে যন্ত্রায়ত্ত করার জন্য শব্দযন্ত্রী নৃপেন পাল (ইনডোরে) ও সুজিতনাথ ঘোষ (আউটডোরে) বিশেষভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

অভিনয় ও ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ

'নায়ক' প্রধানত পরিচালকের ছবি। অভিনয়ের স্বল্পাবকাশে ছোট চরিত্রগুলি প্রত্যেকেই অতি সহজ ও অকুণ্ঠ। অবিস্মরণীয় যমুনার কৌতুকদীপ্ত ঘরনীর রূপায়ণ—ভারতী দেবীর আধুনিক ধনী গৃহিণী ও সুস্মিতার শান্ত মুখের আড়ালে অশান্ত মনের চিত্রায়ণ। অতি ক্ষুদ্র ভূমিকায় কমল মিশ্র (মাড়োয়ারী ভদ্রলোক) মনে ছাপ রাখেন। লালি চৌধুরীর মূক ও একনিষ্ঠ ভক্তির প্রকাশ খুব সহজেই বিশ্বাস উৎপাদন করে।

শর্মিলা ঠাকুর তাঁর ভূমিকাকে জীবন্ত করেছেন চরিত্রটি সম্যক অনুধাবন করে। অন্তত সেই কথাই মনে হয়। নায়ক উত্তমকুমার কার্যক্ষেত্রেও জনপ্রিয় অভিনেতা হওয়ার দরুণ একদিকে যেমন বিশ্বাস উৎপাদন করা সহজ হয় অন্যদিকে বহুদৃষ্ট মুখে নতুনত্বের স্বাদ আনা কঠিন। সত্যজিৎ রায় এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণের আশ্রয় নিয়েছেন। উত্তমকুমার, বেশির ভাগ দেখি—হয় 'প্রোফাইলে' বা তিন-চতুর্থাংশ দৃষ্টিকোণে, এবং যখন সম্পূর্ণ সম্মুখ-দর্শনে, তখন 'মিড-শট্' এ। তাঁর অভিনয় নিঃসন্দেহে এ ছবিতে সর্বোত্তম, ম্যানারিজম্ বর্জিত এবং চরিত্রচিত্রণে জীবন্ত। এবং এই প্রথম মেকআপ্‌বিহীন, 'গ্ল্যামার'বিহীন উত্তমকুমারের মুখে সচল পেশীর প্রকাশ দেখা গেল।

'নায়ক'-এর স্বপ্নের 'সিকোয়েন্স'গুলি—বিশেষ করে প্রথমটি—যেখানে অরিন্দম টাকার স্তূপে নিমজ্জিত হয়—সেটির প্রতীতি, গতি, আলোছায়ার ব্যবহার, ক্ষীণ হতে প্রবল টেলিফোনের ও হরিসংকীর্তনের শব্দশৃঙ্খল—মনস্তত্ত্ব ও রূপকের এক অদ্ভুত সম্মেলন। শুধু পৃথক সিকোয়েন্স হিসেবে নয়,—সমস্ত ছবির গতি ও বিন্যাসের সঙ্গে এই স্বপ্নের সিকোয়েন্সটি এমনভাবে জড়িত

যে তার আগমন ও অন্তর্ধান অতি মসৃণ। মনে হয় ট্রেনের ছন্দ ও গতি পুরো ছবির এডিটিংকেই প্রভাবিত করেছে যার দরুণ ফ্ল্যাশব্যাক-এর দৃশ্যগুলি কোথাও ছন্দপতন ঘটায় না। ক্যামেরার দৃষ্টিকোণ থেকে দুটি পাশাপাশি চলন্ত ট্রেনের শট্ অতি অভিনব। 'ডাইনিং কার'এ কথোপকথনরত অদিতি ও অরিন্দমের মুখের উপরে ক্যামেরা সমান্তরালভাবে ট্রেনের গতির ছন্দে যাতায়াত করে। সুব্রত মিত্রের ক্যামেরার কাজ এ ছবিতে আরও পরিণত, আরও সংবেদনশীল।

এই গতির ছন্দোবদ্ধ পুরো 'ইন্‌ডোর'এর কাজ যে 'ব্র্যাণ্ড নিউ', এ. সি. সি ও ভেস্টবিউল্‌ড্ ট্রেনে অভিনীত, তার নির্মাণকর্তা হলেন আর্ট-ডিরেক্টর বংশী চন্দ্রগুপ্ত। যাঁরাই 'নায়ক' ছবির শুটিং দেখতে গেছেন, তাঁরা বংশী চন্দ্রগুপ্ত নির্মিত এই 'সেট' দেখে হতবাক্ হয়েছেন।

সবশেষে, 'নায়ক' সম্পর্কে এ পর্যন্ত যত চিত্র-সমালোচনা হয়েছে তার উল্লেখ না করে পারছি না। একদল সমালোচক 'নায়ক' ছবির মধ্যে কিছুই পান্ নি, উত্তমকুমারের অভিনয় ছাড়া। সে অভিনয়ও উত্তমকুমারের নিজস্ব ভঙ্গীতে। যেন ডিরেক্টরের কিছু করার ছিল না। তাঁদের মতে মিউজিক দুর্বল, গল্প কিছু নেই,—এ যেন একটি সিনেমার নায়কের জীবনের "তথ্য-চিত্র।" অপরপক্ষে যে-সমালোচনায় 'নায়ক' উৎকৃষ্ট টেকনিকের জন্য উচ্চপ্রশংসিত, সেখানেও বিষয়বস্তুর অগভীরতা নিয়ে আক্ষেপ করা হয়েছে।

প্রথমোক্ত মত শুধু মূর্খতাসঞ্জাত মনে করলে ভুল হবে; এর পিছনে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে, কারণ এই সমালোচকগোষ্ঠীর অধিকাংশেরই কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা। সত্যজিৎ রায়কে আর সোজাসুজি আক্রমণ করা সম্ভব নয় বলেই এরা চোরা আক্রমণের আশ্রয় নেয়। তবু ছবি চলে, এমনকি মফঃস্বলেও।

শেষোক্ত সমালোচনা আমার মতে অসম্পূর্ণ। কারণ 'নায়ক'এর ফর্মের সাথে বিষয়বস্তু এমন নিবিড়ভাবে জড়ানো যে ফর্মকে ভালো বললে কন্‌টেন্‌ট্‌কেও ভালো বলা হয়। বস্তুত 'নায়ক' ছবিতে সত্যজিৎ রায় চলচ্চিত্রজগতে এক নতুন চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করলেন, বাংলা ছবি আর-একবার মোড় ঘুরে নতুন পথের সন্ধানে এগোল।

নায়ক ॥ কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংগীত ও পরিচালনা: সত্যজিৎ রায়। ৬ মে কলকাতায় মুক্তিপ্রাপ্তি। আলোকচিত্রশিল্পী: সুব্রত মিত্র।

সম্পাদনা: দুলাল দত্ত। অভিনয়ে: উত্তমকুমার, শর্মিলা ঠাকুর, বীরেশ্বর সেন, সুব্রত সেনশর্মা, যমুনা সিংহ, সুস্মিতা মুখোপাধ্যায়, লালী চৌধুরী, ভারতী দেবী, নির্মল ঘোষ প্রমুখ। আর. ডি. বি প্রযোজিত ও পরিবেশিত।

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

আধুনিক চেক চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ

ভারতীয় রাগসংগীতের মতো কোনো-কোনো দেশের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেও 'ঘরাণা' নামে শব্দটি প্রাসঙ্গিক, যেখানে এক সমৃদ্ধ উত্তরাধিকারের নিরন্তর প্রবাহ খুঁজে পাওয়া যায়। যেমন ইতালি, জাপান বা ফরাসী দেশের চলচ্চিত্র। পূর্ব ইওরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি সম্বন্ধে সে কথা তেমন ভাবে বলা যায় না। আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে 'পোলিশ স্কুল'-এর পতন-অভ্যুদয় আকস্মিক তরঙ্গে চিহ্নিত। ভাভ্‌রা-উইস বা ফাব্রি-মাক্‌ তেমনই প্রক্ষিপ্ত নজির। তার চিরস্থায়ী ফল আপন দেশীয় চলচ্চিত্রশিল্পের উত্তরকালে সহজলভ্য নয়। বহুদৃষ্ট ঐ জাতীয় চলচ্চিত্রে যুদ্ধকালীন মানুষের নিপীড়িত ছবি নাজী আক্রমণ বা অত্যাচার সম্পর্কিত এক বিশেষ ধরনের মর্বিড অবসেশন থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা যায়। একদিক দিয়ে এটা সৃষ্টিশীল consistency-র দৌর্বল্য-রচনার সূচক। সম্ভবত আলোচ্য মানের চলচ্চিত্র থেকে সাম্প্রতিক বলিষ্ঠ বিপথ-পদচারণ 'নাইফ ইন দি ওয়াটার'-এ পূর্ণরূপে ঘটে। কিন্তু, দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে পোলানস্কি একক এবং কোনো গোষ্ঠীর প্রতিভূ নন। অবশ্য যে-কোনো প্রচেষ্টায় হোক, শিল্পে 'কনভেনশন' ভাঙার রীতি আছে। সেটা উভয়ত বিষয় ও আঙ্গিকগত ভাবে সম্ভব। ইদানীংকালের কিছু গোষ্ঠীগত আন্দোলনেও তার সার্থক প্রমাণ পাওয়া যায়। হাল আমলে নবতরঙ্গবাদী চেক চলচ্চিত্রকারদের কিছু কাজকর্ম এদেশে প্রদর্শিত হয়েছে। ঐ দেশীয় চলচ্চিত্রের সুদীর্ঘ এক সুপ্তিকাল অন্তে যাদের জাগরণ। যদিও আধুনিক চেক-চলচ্চিত্রের সকল অংশেই তারা বর্তমান নন। সেখানে দেখা যায় বক্তব্যকে সমতা দেবার উদ্দেশ্যে ডিজাইনের সমাধান ভারসাম্য হারিয়েছে। কখনও তার বৈপরীত্যও চোখে পড়ে। এবং বিষয়-নির্বাচনে অতীত অভিশাপও কিছু সুদূর নয়। অবশ্য এ ধরনের ছবিতে মাঝে মাঝে খণ্ডিত সাফল্যের ছাপ পাওয়া যায়। কিন্তু সকল শিল্পেই 'টোটালিটি'-র প্রশ্ন থাকে। এ বিষয়ের নিকটবর্তী ছবি ইয়ান কাদর ও এলমার ক্লস পরিচালিত

পার্টিজান আন্দোলন-আলেখ্য 'ডেথ ইজ কল্‌ড্‌ অ্যাঙ্গেলশেন'। আলোচ্য চিত্রের বিরক্তিকর দীর্ঘময়তা তার উপস্থাপনা-ভঙ্গির দুর্বলতার কারণ। এবং আঙ্গিকের সম্বন্ধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিছুটা সচেতনভাবেই সর্বত্র সংঘটিত। স্মৃতিচারণা কালে সরাসরি 'কাট্' ব্যবহারেও একটা পরিমিতিবোধের প্রয়োজন থাকে। কিংবা (দৃষ্টিগ্রাহ্যতায় শুধু) তার অ-পরিমিতিবোধও অ-শৈল্পিক না-ও হতে পারে (যেমন 'ডায়ামণ্ড্‌স্ অব দি নাইট')। এর যথার্থ প্রয়োগকলার চিত্রভাষার সৃষ্টি। কিন্তু, কাদর ও ক্লস-এর আলোচ্য চিত্রে যুগ্ম পরিচালক চিত্রভাষা সম্পর্কে যথাযথ secure বলে মনে হয় না। বস্তুত over-secured তো বটেই। তাছাড়া ছবির acme-তে মেলোড্রামাটিক মিশেল আধুনিক চলচ্চিত্রধর্মিতার সহায়ক নয়। অথচ তুলনামূলকভাবে এই পরিচালকগোষ্ঠীর পরবর্তী চিত্র 'দি ডিফেন্‌ড্যাণ্ট' রীতি ও নীতিতে শিল্পসম্মত ও উন্নততর।

অনুরূপ ভারসাম্যহীনতায় পীড়িত ব্রাইনিখের 'ট্রান্সপোর্ট ফ্রম প্যারাডাইজ' চিত্র। ইহুদিদের উপর নাজী অত্যাচারের বীভৎসতাকে এখানে ভিন্ন কথন-আঙ্গিকে উপস্থিত করা হয়েছে। কিন্তু, ছবির প্রথমাংশের 'লাইন অব ট্রিটমেণ্ট' দ্বিতীয়াংশ থেকে সমৃদ্ধতর এবং অন্যতর। ফলে গোড়ার সম্ভাবনা শেষে সম্পূর্ণ নিঃশেষিত। ছবির প্রথমদিকের একটা 'ফ্রীজ শট' (বৃদ্ধাকে গুলি করে মারার দৃশ্য) এবং সমাপ্তির জীর্ণ সাইকেলের শব্দের স্থূল ব্যঞ্জনা পাশাপাশি রেখে বিচার করলে একই চিত্রের অংশ বলে বিশ্বাস হয় না। ছবি শুরুর কালে পরিচালক প্রত্যক্ষ অত্যাচারের ভয়াবহতাকে একেবারে পরিহার করে নানা চরিত্রে তার প্রতিফলন-চলচ্চিত্রায়ণে প্রয়াসী হন। কিন্তু এই সুন্দর প্রয়াস অল্পকালেই তিরোহিত হয়ে চিরাচরিত স্থূলতাকেই আশ্রয় করে। ব্রাইনিখের অপর বা পরবর্তী চিত্র (পূর্ববর্তী কাদর-ক্লস জুটির মতোই) 'অ্যাণ্ড দি ফিফথ রাইডার ইজ ফিয়ার' অপেক্ষাকৃত পরিণত মানের। প্রায় একই বিষয়ের চলচ্চিত্রে পরিচালকের দৃষ্টি এখানে সংহত ও সাবজেকৃটিভ।

জীবন দলিল রচনা ও 'সিনেমা ভেরিত্'

ইরেজের 'ক্রাই' চিত্রের মতো চেক চলচ্চিত্রের কয়েকজন নতুন প্রবক্তার ছবিতে 'কাঁদিদ্' ক্যামেরার প্রয়োগ প্রগাঢ়ভাবে জীবনধর্মী। স্টুডিওর ধূলিবদ্ধ ফ্লোর ছেড়ে এরা যেন বাইরের পৃথিবীকে এক শিশুর চোখ নিয়ে অবাক বিস্ময়ে দেখেছেন। নগরজীবন, পথঘাট, পার্ক-হাসপাতাল-রেস্তোরাঁ-নাইটক্লাব থেকে

ফ্লাটের নির্জন কক্ষ পর্যন্ত যেন এক বিরাট জীবনপ্রবাহের ছুঁয়ে যাওয়া অবতরণিকা। জীবনের এই সোজাসুজি 'ডক্যুমেণ্টেশন' (যা ইরেজ, ফোরমান বা চিতিলোভার চিত্রের এক পরিচিত মেজাজ) চেক চলচ্চিত্রের এক সুনির্বাচিত অংশে বিশেষ মাত্রা যোজনা করেছে। 'শুটিং স্ক্রিপ্ট'-এর আলোচ্য নিজস্বতা ক্রমানুবর্তিত হলে নির্দিষ্ট এক 'চেক স্কুল' গড়ে ওঠা কিছু অসম্ভব বলে মনে হয় না। প্রসঙ্গত, মিলোস ফোরমানের 'পিটার এ্যাণ্ড পাভ্‌লা' (বা 'ব্ল্যাক পীপ') আলোচনার দাবি রাখে। কোনও পাশ্চাত্ত্য সমালোচক চিত্রটিকে অল্‌মির 'ইল্‌ পোস্তো'র সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখানে ছবির কেন্দ্র-চরিত্র পিটার কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধিতে এসে ঐ 'কাঁদিদ' ক্যামেরার চোখের মতোই চারপাশের অচেনা জগতের দিকে ফিরে ফিরে দেখেছে। সে-দর্শনে অপরিচয়ের শঙ্কা আছে, আছে নতুনকে জানার রোমাঞ্চও। শুধু পিটার নয়, ফোরমানের অপর পাত্রপাত্রীদের চোখেও এক সবিস্ময় কৌতূহল মাখা থাকে। এক ধরনের anticipation। যে-কোনো ঘটনারই পরিণতি সম্পর্কে একটা আঁচ করে নেওয়া। কিন্তু কোনো ঘটনার পরিণতিই সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না। তাই নতুন অভিজ্ঞতা যেন নতুন আবিষ্কার মনে হয়। তাছাড়া 'পিটার অ্যাণ্ড পাভ্‌লা'তে দেখা জীবন দর্পণের অংশে একটা অত্যন্ত ধীর ও নীরব বিবর্তন প্রবাহমান। অতীত থেকে আধুনিকতায়। গ্রামীন সভ্যতা থেকে urbanity-তে। সেখানে জীবনের নানা মূল্যবোধের পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। নাগরিক প্রিটেনশন তার প্রাথমিক শর্ত। দ্রষ্টব্য যে জোর্জিয়োনে অঙ্কিত 'স্লিপিং ভেনাস' ছবিটি তারিফ করার এক অসতর্ক মুহূর্তে 'শপ্‌ ইন্‌স্‌পেক্‌টর'-এর মুখে একটা জোলো মন্তব্য বার হয়ে যায়। দেওয়ালে টাঙানো ম্যাডোনা-চিত্র পিতার দৃষ্টিভূত হলেও তা পিটারের পারস্পেক্‌টিভে চোখে পড়ে না। এবং পরবর্তীকালে ঐ জোর্জিয়োনে-চিত্র পিটার এবং পাভ্‌লার মধ্যে প্রাথমিক যৌন উত্তেজনা কাজ করে। রেনেশাঁস-সৌন্দর্যবোধ তো অবশ্যই নয়। চেকোস্লোভাকিয়ার বর্তমান সমাজের নিম্ন মানসিকতার (কেনা-বেচার অবকাশে ব্যাপক চৌর্যবৃত্তি) বা যৌনবোধের অতি-পরিব্যাপ্ততার (বহু সংলাপেও যার জবানবন্দী আছে) প্রসঙ্গে ফোরমান সম্পূর্ণ চাতুরি শূন্য। এ ধরনের সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা (যা 'জোসেফ ফিলিয়ান'-এও লভ্য) সমাজতান্ত্রিক দেশের পরিপ্রেক্ষিতে কিছুটা আশ্চর্যজনক। কিন্তু, পিটার ও পিটারের পিতার বৈষম্যে ফোরমান কোনো স্থির সিদ্ধান্তের যতিদান করেন নি। এখানে অতীত ও

বর্তমানের ক্রান্তি লগ্নের দ্বিধা ('নাইফ্ ইন দি ওয়াটার'-এর সমাপ্তির মেজাজের সঙ্গে যার মিল আছে) কোনো সমাধান-বাণী থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। ইঁটখোলার ছেলেদুটি শেষপর্বে পিটারের গৃহে এসে যে-পরিস্থিতির উদ্ভব করে (এখানে পিটারের জননীর দেওয়া ঘরোয়া পিঠে খাওয়ানোর প্রসঙ্গের সঙ্গে 'সিলিং'-এর সমাপ্তি পর্বের সান্নিধ্যাভাস লক্ষণীয়) তার মূলে পুনর্বার মিথ্যা ও প্রিটেনশনের পূর্বালোচ্য ব্যাপার এসে পড়ে। ওদের মুখে 'an interesting ass' জাতীয় তিরস্কার সম্বোধনে পিটারের পিতার বিস্ময় ক্ষুব্ধ 'ফ্রীজ শট্' দেখলে মনে হয় যে প্রাচীনতা তার সকল সংস্কার এবং গ্রাম্য সারল্য ও ধূর্ততা নিয়ে আজকের মুখোমুখি এসে যেন থমকে তাকিয়েছে।

'সিনেমা ভেরিত' বা 'ট্রু সিনেমা'র অন্যতম যোগ্য নিদর্শন ভেরা চিতিলোভার 'দি সিলিং'। মাঝারি দৈর্ঘ্যের এই দৃশ্যকাব্যে প্রাগ শহরের এক manneguin-এর যেন নিঃসঙ্গ স্বগতোক্তি বিধৃত। মার্থা নামে মেয়েটির কতগুলি মুহূর্তের সময়পঞ্জী ('অ্যানাদার ওয়ে অব লাইফ্'-এ যার আঙ্গিক ডায়াডেকটিক)। ফ্যাশন-প্যারেড, রেস্তোরাঁ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্ধুমহল, পোশাকতৈরির দোকানে মডেলের কাজ, ঘুমের আগে রেডিওতে রূপকথার গল্প শোনা, নাইট ক্লাব, দয়িতের সঙ্গে রাত্রিযাপন, রাতের নাগরিক পথ প্রভৃতি চিত্রকল্প দিয়ে সাজানো এই জীবনধারায় যে-নগরচিত্র দেখা যায় তাতে জীবনের ক্লান্ত-বিষাদ শূন্যতাই (এলিয়টের কবিতার মতো) যেন লেখা হয়ে যায়। নতুন এই চেক চলচ্চিত্রকারদের মধ্যে চিতিলোভাই সম্ভবত ভাবরাজ্যে আন্তোনিওনির দ্বারা অধিক প্রভাবিত। এখানে প্রদর্শিত তার দুই চিত্রেই কম-বেশি 'human isolation' প্রসঙ্গটি আসে। এবং একাকিত্বের আকাশ-ছোঁয়া ক্লান্তি। 'সিলিং'-এর টাইটেল স্মরণ করা যায়। যবনিকা উত্থানের পর কালো সজ্জায় যখন মার্থা প্রবেশ করে তখন তার প্রতিটি movement-কে বারে বারে ফ্রীজ করে দেওয়া হয় এবং অবশেষে তার ইমেজ ঝাপসা হয়ে যায়। একটা ক্লান্ত একাকী মানুষের স্পন্দন যেন বারে বারে স্থিরীকৃত হতে হতে নিঃশেষিত (কাফ্কার 'frozen world'-এর প্রতিধ্বনি ?)। Non-being-এ পরিণতি সম্পর্কে মিলনদৃশ্যের কথা সর্বাধিক উল্লেখ্য। এখানে প্রথমত কেবল মার্থা এবং তার দয়িতের কথাবার্তা নেপথ্যে এনে ক্যামেরা শুধু কাঁচঘরে সজ্জিত কিউরিওর (সাধারণত যেগুলি সরীসৃপজাতীয় প্রাণীর অনুকৃতি) উপর দিয়ে প্যান করে যায়। এই বিরাট শূন্যতাকে পিছনে

ফেলে আসার জন্যে এক রাত্রিশেষে মার্থা গ্রামের প্রান্তে এক আলোকময় শূন্য প্রান্তরের সামনে এসে পৌছয়। দিগন্তে নির্জন সাইপ্রেসের সারি। চিতিলোভা ক্যামেরাকে সামান্য 'টিল্ট-আপ' করে দেন। সাইপ্রেসের সারি ফোর-গ্রাউণ্ড-এ আসে। ওপারে অনন্ত আকাশের শূন্যতা। 'সিলিং' শব্দটি চিত্রের দৃষ্টিভঙ্গিতে তাৎপর্যময়। ছাউনি বা নিরাপত্তা বা নীড় রচনা প্রভৃতি সাজেশন বহন করে। রেলের কামরায় বাড়িতে তৈরি পিঠের কথায় গ্রামের কথা, ঘরের কথা বা পারিবারিক উষ্ণতা মনে পড়ে। বাইরে বৃষ্টি নামে। যেন নবজন্মের আশ্বাস। কিন্তু, বর্তমানের ঐ প্যাটার্ন অব ড্রিফটিং থেকে সম্ভবত কারো পালিয়ে যাবার উপায় নেই। কাঁচের গায়ে চঞ্চল বৃষ্টির ধারা 'ফ্রীজ শট'-এ জমে শক্ত হয়ে যায়।

চিতিলোভার পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্র 'অ্যানাদার ওয়ে অব লাইফ' দুটি স্বতন্ত্র কাহিনীর বুনোনি। দুই নারীচরিত্রের দুটি ভিন্ন ধরনের জীবনবিবরণ। এই দুয়ের ফলশ্রুতিকে ('in search of real happiness') এক ধরনের সমীকরণে আনার প্রয়াস দেখা যায়। এবং সাংসারিক গৃহকর্মের মধ্যে ভেরা ও জিমন্যাস্টিক অভ্যাসের মধ্যে ইভা চরিত্রে অবশ্য isolation গড়ে ওঠে। কিন্তু, 'সিলিং'-এর মতো এখানে চরিত্রের isolation ঠিক ব্যক্তি ও সমাজ বা সভ্যতার দ্বন্দ্বভিত্তিক অন্তর্লীন কারণে রচিত নয়। বরং, কিছুটা এককেন্দ্রিক। যদিও আলোচ্য চিত্রে মানব-চরিত্রের অনেক খুঁটিনাটি বা তুচ্ছতাও লিপিবদ্ধ, তবুও সেগুলিকে ঠিক সর্বাংশে পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে responsive বলা চলে না। আর ডক্যুমেণ্টেশনের দীর্ঘসূত্রতা (বিশেষভাবে ইভা-উপাখ্যানে) দৃষ্টিগ্রাহ্যতায় ক্লান্তিকর, ও শিল্পান্বিষ্ট নয় এমন divergence-এর পরিচায়ক। মনে হয় চিত্রটি অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত হতে পারত। অবশ্য ক্যামেরার dynamization প্রথম শ্রেণীর কৃতির কথাই মনে আনে। একটি distortion স্মর্তব্য। চেতনপ্রবাহ, কাফকা, alienation……

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপে অস্তিত্ববাদের আর্তি প্রবল হয়। যুদ্ধচিহ্নিত মানুষ মেকানাইজেশনের প্রায় চূড়ান্ত পর্যায় অটোমেশনের মুখোমুখি আত্মিক বিচ্ছিন্নতা অনুভব করে। সমাজনীতি থেকে রাজনীতি—সেখানে প্রায় সকল অবস্থায় মানুষ ক্রমশ 'system'-এর শৃঙ্খলে বন্দী। দেখা যায় একক অস্তিত্ব বা সত্তা তার আপন বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে। এই বন্দী প্রমিথিয়ুসের সংগ্রাম 'স্বাধীন আত্মা'র সন্ধানে। যেহেতু বিবেকী মনের চেতনা কোন এক অদৃশ্য ক্ষমতার

বাহুবন্ধে অবরুদ্ধ। পূর্বইয়োরোপীয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে ব্যুরোক্রাসির বিশিষ্ট চেহারা এই 'system'-এর একমাত্রতাকে ভয়াবহরূপে স্মরণ করায়। কাফকা দৃষ্ট বা বর্ণিত প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর অস্ট্রো-হাঙ্গারিয়ান রীতির সঙ্গে বর্তমানের পূর্ব-ইউরোপীয় চলচ্চিত্রকারেরা বিপ্লবোত্তর আপন দেশকে একক চিন্তায় দেখেছেন। এবং তাঁদের পাত্রপাত্রী কাফকা-সৃষ্ট চরিত্রদের মতোই spiritual survival-এর জন্যে মিথ্যে মাথা কুটে মরেছে। যুদ্ধোত্তর কালে, উল্লেখযোগ্য, এই আদর্শনিষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতেই Kierkegaard-শিষ্য কাফকা নতুন করে অনুভূত হতে থাকেন। চলচ্চিত্রে সম্ভবত তার প্রাথমিক প্রকাশ ঘটে লেনিচার ছবিতে (এখানে প্রদর্শিত কেবল 'ডম' ও 'ল্যাবিরিন্থ্')। আধুনিক চেক চলচ্চিত্রের অন্তত দুটি চলচ্চিত্রের চিন্তাধারাতে কাফকার উপস্থিতি বিশেষভাবে উপলব্ধ— 'ডায়মণ্ডস্ অব দি নাইট' ও 'জোসেফ কিলিয়ান'। উভয়তই alienation-এর প্রতিপাদ্য গুরুত্ব লাভ করেছে।

ইয়ান নেমেচ্ তার 'ডায়মণ্ডস্ অব দি নাইট'-এ যুদ্ধকালীন স্মৃতিকে ভিন্ন ধারায় প্রয়োগ করেছেন। নাৎসী কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের ভয়াবহতা থেকে (মূলত বন্দীদের ট্র্যান্সপোর্ট) দুটি নামহীন যুবকের দুর্বার পলায়ন এখানে চলচ্চিত্রায়িত। এই গতিবেগ কেবল দুটি যতিদানে শুধু আংশিক ব্যাহত হয় (চাষীর বাড়িতে ও ক্ষণিক বন্দীদশায়)। এর সমান্তরাল ওদের 'stream of consciousness' বয়ে চলে: স্মৃতি, তাৎক্ষণিক চিন্তা ও এষণা। বস্তুত যেখানে ওদের physical গতি ব্যাহত, সেখানে চিন্তার গতি ছবিকে ত্বরান্বিত করেছে। যা প্রথমে কিছুটা অগোছালো কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই প্রায় পৌনঃপুনিক। 'ডায়মণ্ডস্'-কে স্বচ্ছন্দে একটা 'recurring dream'ও বলা যায়। কিন্তু, 'ডায়মণ্ডস্' প্রকৃতিগতভাবে অস্তিত্ববাদী দর্শনের উৎসরণ এবং ঐ দর্শন সম্পর্কে existentialism-এর অন্যতম প্রবক্তা কথিত আলোচ্য উক্তিকে 'ডায়মণ্ডস্'-এর leit motif আখ্যাত করা চলে: "The anguish journey of consciousness through the dark night of nothingness."

'ডায়মণ্ডস্'-এ লক্ষণীয়, পলাতক ছেলে দুটি যেমন বহির্জগতের অনিশ্চিতির মধ্যে দ্রুত ধাবমান, তেমনই meta-physical স্তরেও যে 'ambiguities and uncertainties' বর্তমান, তা স্মরণের প্রগাঢ় আত্মিক আবর্তে বিধৃত। প্রধানত যুদ্ধকালীন প্রাগের অতীত স্মৃতিচারণাগুলি প্রথমে আলোচিত হতে পারে, যার ইমেজ সাধারণত ধূসর tonal এবং কিছুটা distorted। এখানে নির্জন

পথ, কবরখানা, বীথিকা, পথঘাটের লোকজন, অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের ট্রাম ও তার যাত্রী, গবাক্ষে প্রতীক্ষমানা নারী (গোয়াইয়ার চিত্রানুসারী) ইত্যাদির frozen attitudes সম্পূর্ণ নন-কম্যুনিকেশনের ইমেজারি বিন্যাস বলে মনে হয়। তার সঙ্গে রি-জেনারেশনের ব্যর্থ আকুতি আছে। শুধু 'ওয়াইল্ড স্ট্রবেরীজ'-এর ভাবানুসারী জীর্ণ বৃক্ষের (বা ছেদিত বৃক্ষের) গুঁড়ি কিংবা চাকা খুলে-যাওয়া প্যারাম্বুলেটর প্রসঙ্গেই নয়, অথবা অন্ধকারাচ্ছন্ন স্তব্ধ অবতরণিকা, অলিন্দ বা কখনও না-খোলা বন্ধ দুয়ার ইত্যাদি চিত্রকল্পেই নয়, 'ডায়মণ্ডস্'-এর স্মৃতি-অংশের যে সামগ্রিক নিঃসীম মৌনতা সেখানে ক্রমে ক্রমে মানসিক oppression ও isolation স্পষ্ট হয়ে ওঠে (যা রচনার পিছনে কখনও কখনও সময়ের বন্ধ্যাত্ব বা discontinuity কাজ করেছে)। শুধু ছবির শেষার্ধে ঐ স্মৃতিদৃশ্যগুলির নেপথ্যে কেবল গির্জার ঘণ্টাধ্বনি spiritual revival এর আর্তি ও ব্যর্থতা ঘোষণা করে। 'ডায়মণ্ডস্ অব দি নাইট' প্রধানত কনসেনট্রেশন ক্যাম্প-চিত্র নয়। কনশেনট্রেশন ক্যাম্পের বা তার ভয়াবহতার বৃহত্তর অর্থে এখানে কাফকার অনিশ্চিত পৃথিবীর কথাই মনে পড়ে, যেখানে জৈবিক অস্তিত্বের সম্মুখে প্রাত্যহিক আত্মিক শূন্যতা প্রকট হয়। পলাতক ঐ ছেলে দুটি 'outsiders'-এর মতো (তাদের ধাবমান পথে) যতবার reality-র মুখোমুখি হয়েছে ততবার তাদের আপন সত্তা বা অস্তিত্ব হারিয়েছে। এখানে জৈবিক অনুভূতি অর্থে লোভাতুর কামনা বা ক্ষুধা। প্রথমত ট্র্যান্সপোর্টের একটি ওয়াগন—আভ্যন্তরীণ শট্-এ তার চতুর্দিক বদ্ধাবস্থার মধ্যে একটি অবরুদ্ধ জগতের সাজেস্শন আনা হয়েছে এবং তার মধ্যে এক জান্তব আগ্রহে ছেলে দুটি রুটি ও জুতো বদল করে। দ্বিতীয়ত, চাষীর খামার। এখানে একটি ঘরের মধ্যে আলাদা আলাদা ইমেজের দ্বারা প্রাচুর্য, স্বাচ্ছন্দ্য বা একটা conformism-এর আবহাওয়া দেখা যায়। ক্ষুধার্ত ছেলেটির মানসিক reaction সেটাকে বিপর্যস্ত করার জন্যে পাশবিক হিংস্রাশ্রয়ী হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত ওদের ক্ষণিক বন্দীত্ব, যার প্রথমভাগে দলবদ্ধভাবে একদল বুড়ো জার্মান হোমগার্ড (বার্ধক্যজনিত লালসা, উল্লাস বা অতিমন্থরতার একঘেঁয়েমিজনিত degradation) ওদের পশ্চাদ্ধাবন করে (হোমগার্ডদের গুলির শব্দের সঙ্গে নেপথ্যে শিশুকণ্ঠে আর্তক্রন্দন শ্রুত হয়)। দ্বিতীয়ভাগে, বন্দী অবস্থায় ওদের একটা শূন্য দেয়ালের পাদদেশে দণ্ডায়মান রাখা হয় এবং পিছনে বুড়োদের বিজয়োৎসব চলে। নৈঃশব্দকে ভেঙে এক লোভী বুড়োর চর্বণ-শব্দ ছেলে

ছুটির কানে আসে। এই জান্তব সম্ভোগের মধ্যে পলাতক ছেলে ছুটি যেন তাদের আত্মিক স্বকীয়তা হারায়। মৃত্যুচেতনা একটি পূর্ণতায় পৌছয়। সময়ও থামে। মুক্তিলাভের পরে ওদের চলা আবার শুরু 'through the dark night of nothingness'। অত্যন্ত উপযুক্তভাবেই কেবল সমাপ্তিতে একবার মাত্র 'ফেড্-আউট' ব্যবহৃত। যেন বিস্মৃতির অন্ধকারের দিকে।

আলোচ্য চিত্রে নেমেচের প্রয়োগআঙ্গিক ও কুচেরার আলোকচিত্রণকার্য (hand-held camera-র দুঃসাধ্য ব্যবহার ও আলোকের tonal নিয়ন্ত্রণ স্মরণীয়) যুগ্মভাবে 'ইন্‌টেলেক্‌চুয়াল সিনেমা'র চিত্রভাষাকে এক নবস্তরে উন্নীত করেছে। প্রকৃতপক্ষে সুররিয়ালিজম্-এর প্রভাব বুনুয়েলানুসারী পিঁপড়ে ইত্যাদির নির্দিষ্ট প্রযুক্তিতে স্থানাবিষ্ট মনে হয় না। এখানে সুররিয়ালিজম্-এর ধারা 'deformations of decor'-এ (যেমন 'ক্যালিগরী'-তে) নয়, আসলে 'deformations of narrative'-এ। মারিয়েনবাদ প্রসঙ্গে রেণে যাকে বলেছেন "circling interplay of feelings" তার উপস্থাপনা 'ডায়মণ্ডস্'-এ সংগত কারণে আপাতঅবিন্যস্ত ও অবাস্তবানুগ। এবং 'the absurd results from the implicit antagonism between the individual mind and the collective world.'

পাভেল য়ুরাচেক ও ইয়ান স্মিদের 'জোসেফ কিলিয়ান' (বা 'এ প্রপ্ ইজ ওয়াণ্টেড')-এ রাষ্ট্রীয় ব্যুরোক্রাসীর 'system'-জনিত অন্ধানুগত্যের পটভূমিকায় সেই ভীতিবহ অনিশ্চয়তা এবং alien মানুষের স্বাধীন সত্তানুসন্ধানই বিধৃত। স্বল্পদৈর্ঘ্যের এই চলচ্চিত্রে কাফকা স্বাক্ষরিত 'ক্যাস্‌ল্'-এর প্রোটোটাইপ উপস্থিতি দেখা যায়। উপন্যাসের জোসেফ কে.-র সঙ্গে কিলিয়ানের যেমন এক প্রতীকী ভাব-সাযুজ্য বর্তমান, তেমনই 'castellan' এবং 'under-castellans'-এর মতোই সকল রীতি-নিয়ন্ত্রণকর্তা সেই 'corridors of power'-ই 'কিলিয়ান'-এর অদৃশ্য শক্তি। তাছাড়া বেড়াল ধার দেবার দোকানের সেই মেয়েটিকে (এরও মুখ 'দলচে ভিতার' পাওলার মতো নিষ্পাপ) দেখে অল্‌গাকেই মনে পড়বার কথা। আসলে এখানে কাফকার পৃথিবীকে (চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের পরিণতির অমিল বাদ দিয়ে) স্পষ্টত ও প্রত্যক্ষতরভাবে চলচ্চিত্রায়িত করা হয়েছে। সেই কারণে প্রতিটি ইমেজের নির্বাচন অত্যন্ত সতর্ক এবং সাজেস্টিভ। কিলিয়ানের অন্য অভিযানের মধ্য দিয়ে বর্তমান সভ্যতার অস্থিরতা ও নিরাপত্তাহীনতার কথা যেমন

বারংবার এসেছে, অনুরূপভাবেই এসেছে মানবিক অসম্পৃক্তি বা একাকিত্ব-বোধের প্রসঙ্গ। গ্রাম থেকে আসা হেরল্ড নামে চরিত্রটি শহরজীবনে এক আগন্তুক। তার চোখে দেখা প্রাগের পরিবেশ রহস্যজনকভাবে অচেনা, বা এক কথায় নন-কম্যুনিকেটিভ। সেই আশ্চর্য নগরের পথে-ঘাটে, বার-কাফে বা বাজারে কেউ কারো কথা বোঝে না, একত্র বসেও অচেনা ভাষার সংবাদপত্র দিয়ে দুর্গ রচনার প্রয়োজন হয়, জানালার শার্সির পিছনে প্রাচীর গাঁথা থাকে, ছাইদানিতে পাইপ সশব্দে মুখরিত (বিলীয়মান কোনো ব্যক্তিপূজার status-symbol ?) এবং শূন্যকক্ষে টেলিফোন একলাই বেজে যায়। বেড়াল রাখার মেয়াদী সময় পার হয়ে গেলে কেমন এক অপরাধবোধে মন ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে (যেন স্বাধীন চিন্তার rationing না-মানা কঠিন দণ্ডনীয়)। হেরল্ডের প্রথম স্বপ্নদৃশ্যের সাবজেক্টিভিটি যেমন। অসংখ্য ফাইলিং ক্যাবিনেটলগ্ন বিরাট দেয়ালের পাশে 'টপ-লং শট্'-এ তাকে ক্ষুদ্রাকৃতি দেখায়। অনেক উপরে বিচারকের দম্ভে সমাসীন এক ওয়ার্ডার। যেন অনেকটা 'কনফেসনে'র ভঙ্গীতে হেরল্ড বলে : "I don't even know why I borrowed a cat." এবং সেই ঘটনার স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বাধীন মননের অসম্ভাব্যতা এতদূর, যা কিনা পৃথিবীর কোথাও (এমনকি ব্রাজিলেও ?) লব্ধ নয়। দপ্তর থেকে দপ্তরান্তর পরিভ্রমণের মধ্যে ক্রমশ যে-কথা স্পষ্ট হয় তার সঙ্গে গোদারের 'আলফা ভিলে'-র এক সংলাপের বিশেষ মিল আছে : "You must never say *why* ; only *because*." অর্থাৎ 'কিলিয়ানে'র শেষপর্বের মানব ও পশুর বৈসাদৃশ্যরচনাকারী শব্দ : যুক্তি নয়, বাধ্যতা। এখানে জোসেফকে (খ্রীষ্ট-পিতার নামের সঙ্গে যেন এক স্থিরতাঋদ্ধ প্রশান্তি ও নিশ্চিন্ততার আভাস জড়িত) কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। এবং বিড়াল হস্তান্তরের সমস্যা অনুবর্তিতই থাকে। অপর প্রান্তে বিপ্লবোত্তর টেকনলজীর একমাত্রতা বিচূর্ণ হয় নিম্নগামী চলন্ত সিঁড়িতে সিলিণ্ডারবাহী মানুষের উপর মহলে পৌঁছনোর ব্যর্থ চেষ্টায় এবং শেষপর্যন্ত সশব্দ পতনে। সম্ভাব্য কিলিয়ান অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন আপন পরিচয়ে। যদিও তার ঝুলিতেও বেড়ালের উপস্থিতি।

তবুও 'জোসেফ কিলিয়ান'কে নেতিবাচক চলচ্চিত্র বলা চলে না। চিত্রের basic tone-এ (সুস্থ কৌতুক রসায়নের সঙ্গে) পজিটিভিটি দেখা যায়। প্রথম দৃশ্যে হেরল্ডের উপস্থিতিতে তার ইঙ্গিত আছে। সেখানে একদল শিশু (সারল্য ও পবিত্রতা), কুচকাওয়াজরত সেনাবাহিনী (রেজিমেন্টেশন) এবং শবযাত্রার (বিনষ্টি) ধারাবাহিকতার শেষে তার আগমন একধরনের renewal-

এর প্রকল্প বহন করে। প্রাগের বদ্ধপরিবেশের মধ্যে দেশ থেকে লেখা মা'র চিঠি আর সবুজ আপেল অপর renewal-এর স্মারক। অন্ধকারময় অলিন্দে পরিত্যক্ত রাজনৈতিক প্রচারপত্রগুলি দেখলে মনে হতে পারে যে টোটালি-টারিয়ান রাষ্ট্রসুলভ ক্ষমতার labyrinth-গুলি হয়তো আর অধিককাল স্থায়ী হবে না। কোথাও যেন কারও মৃত্যু ঘটেছে। কারও অবলুপ্তি। কিলিয়ানদেরই এখন সর্বাধিক প্রয়োজন। চলচ্চিত্রে সে অনুসন্ধান শেষ হয়ে যায় নি। এবং বেড়ালটি হেরল্ডের সঙ্গেই থেকেছে। আলোচ্য চিত্রের সমাপ্তিও 'ফেড-আউট' দ্বারা চিহ্নিত। কিন্তু ধূসর থেকে সাদায়। শুভ্র আশাবাদিতায়।

রাজনৈতিক বোধ ও শিল্পবিবৃতির কাপট্যহীনতা

সামাজিক অবস্থিতি ও দায়িত্ববোধ, 'গ্রুপ-স্ট্যাটাস' লাভের দ্বন্দ্ব এবং ব্যুরোক্রাটিক বর্তমানাদর্শের ভূমিকা সম্পর্কিত উল্লেখ্য চিত্রগুলির অন্যতম গায়ের, ব্রাইনিখ ও ক্রস্কা পরিচালিত 'এ প্লেস ইন দি ক্রাউড'। চিত্রে দৃষ্ট adolescent জীবনের মধ্য দিয়ে পুনর্বার ব্যুরোক্রাসির ফলশ্রুতিকে সুচতুর ব্যঙ্গ করা হয়েছে। বয়স্কজীবনের মতো এখানে নেতৃত্বপদ নিয়ে স্কুলের ছাত্রদের যেমন লড়াই করতে দেখা যায় তেমনই গার্লফ্রেণ্ড নিয়ে রেষারেষিও কিছু কম নয়। তাছাড়া এদের উপরে মার্কিন ওয়েস্টার্ন 'হিরো'দের প্রভাবও অপরিসীম। তবে ছবির সমাপ্তিতে নায়ক ছেলেটি শেষপর্যন্ত নেতৃত্বপদ (সময়নিয়ন্ত্রণকারী ঘড়ি যার প্রতীক) লাভ করায় তাকে কিশোর-জীবনের নিজস্ব জগৎ থেকে যেন বিচ্যুত হতে দেখা যায়।

'অপটিমিস্ট' ছবিতে অনুরূপ পদমর্যাদার লড়াই এবং যৌনাসঙ্গলিপ্সার প্রসঙ্গ বিবৃত। অবশ্য সুবিধাবাদী sophistication আলোচ্য ক্ষেত্রে উপভোগ্য কৌতুকময়তা সৃষ্টি করেছে। 'অপটিমিস্ট' বা 'প্লেস ইন দি ক্রাউড'-এর সমাজ ও ব্যক্তিক মর্যাদাবোধের প্রশ্ন কাদর-ক্লস-এর 'ডিফেনড্যাণ্ট'-এ এসে বৃহত্তর জিজ্ঞাসায় পরিণত। টেকনলজীর দ্রুত উন্নতির সঙ্গে আদর্শগত দায়িত্ববোধের দাসত্ব মনুষ্যত্বের কতখানি অবমাননাসূচক সেকথা এখানে বিনারূপকেই উচ্চারিত হয়েছে। একটি থার্মাল পাওয়ার স্টেশনের অন্যতম প্রধানকে বিচারের মানদণ্ডে পরিমাপ করা হলেও শেষপর্যন্ত মানবিকতার কোনো মূল্যবোধ চলতি রাজনৈতিক দৃষ্টিতে নির্ধারিত হয়ে যায় নি। এবং অপরাধী (!) শাস্তিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, সিদ্ধান্তকে নয়। কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতামতের অন্ধদাসত্ব শুরু হলে অবশ্য তার শাস্তির কাল দ্রুত শেষ হয়ে যায় না। কিন্তু তার সিদ্ধান্তকে হয়তো অস্বীকার করা চলে। চেকোস্লোভাক সমাজজীবনে এখনও সেই আলোকিত স্থানটুকু অবশিষ্ট আছে। চেক-চলচ্চিত্রে আপন জাতীয় মানসের অকুণ্ঠ জীবনায়ন তার বলিষ্ঠ উদাহরণ।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

না ট্য - প্র স ঙ্গ

তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়া তার' : বহুরূপী-র পুনঃপ্রযোজনা

'ছেঁড়া তার'-এর পুনঃপ্রযোজনায় নির্দেশক শ্রীশম্ভু মিত্র এই মেলোড্র্যাম্যাটিক কাহিনীটিকে একই সঙ্গে রূপকথা ও সমকালীন তাৎপর্যের স্তরে স্থাপন করতে চেয়েছেন। প্রযোজনার সচেতন সুচিন্তিত শৃংখলার এই দুই স্তরের মেলবন্ধন সতর্ক নাট্যদর্শকের কাছে নতুন অভিজ্ঞতা এনে দেয়। মঞ্চপটে গ্রামের পথ ও গাছপালার পর্স্পেকৃটিভবিহীন মাত্র তিন ফীট উঁচু মিউরালোপম কাট্-আউট, বাঁদিকে রহিমুদ্দির বাড়ি (প্রয়োজনবোধে এই বাড়ির সেট্টুকু ঢেকে সামনে একটা বাঁশঝাড় আঁকা বোর্ড এনে দিলেই গ্রামের পথ বোঝানো যায়), ডানদিকে রহিমুদ্দির মায়ের ঘরের সামান্যতম আভাসমাত্র—স্বল্প উপকরণের ব্যঞ্জনায় বাস্তবভ্রম রচনার কোনো চেষ্টাই নেই। অন্যদিকে জনৈক অদৃশ্য সূত্রধারের কণ্ঠে একটা পুরনো গল্প বলার ঢঙেই (কখনও নাটকের স্বাভাবিক প্রবাহকে ভেঙে থমকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, কখনও কাহিনীর খেই ধরিয়ে দিয়ে, কখনও নিতান্তই কাহিনীর গতিবেগকে দ্রুততর করে) ইতিহাসের নজীর। এই সূত্রধারকে কোনো শারীর উপস্থিতি না দিয়ে, ডিক্লেমেশনের বদলে সহজ ন্যারেশনের সুর দিয়ে রূপকথার ধরনটাকেই বজায় রাখা হয়েছে। মঞ্চ পরিকল্পনার নন্-রেপ্রেজেন্টেশনল চেহারা ও সূত্রধারের বিশেষ ব্যবহার নাটকের দ্বৈত চরিত্রের উপযুক্ত 'ফ্রেমিং' যোগায়। নাটকটিকে বিশেষ একটি ফর্মের বাঁধুনীতে বাঁধতে গিয়ে শ্রীমিত্র মূল নাটকের যে সম্পাদনা করেছেন, সমকালীন বাংলা থিয়েটারে 'স্ক্রিপ্টিং' বা থিয়েটারোপযোগী সম্পাদনার লক্ষণীয় দৃষ্টান্তরূপে তা উল্লেখযোগ্য। মূল নাটকে শহরে মহিমের বাড়ির দৃশ্যগুলিতে সামাজিক নাটকের যে সাবেকী থিয়েটারী আমাদের বিরক্তির কারণ হয়, শ্রীমিত্র তা নির্মমভাবে বর্জন করে গ্রামের দৃশ্যপটে গ্রামেরই প্রাণচেতনায় নাটককে পরিসীমিত করেছেন। মহিম ও শহর, এই দুইকে দেখাতে প্রেক্ষাগৃহের বাঁদিকে পাশের দরজা থেকে মঞ্চের সিঁড়ি অবধি অংশ ও ডানদিকে 'এপ্রন'-এর অংশের ব্যবহার স্বাভাবিক ও সংগত লেগেছে, কারণ শহর ও মহিম রহিমুদ্দির বিবেকের সংকট ও গ্রামবাংলার জীবনসংকট থেকে এতই বিচ্ছিন্ন যে প্রোসেনিয়মের সীমার মধ্যে যেন তাদের স্থানই দেওয়া যায় না।

ঈষৎ পরিবর্তনে নাটকের এক-একটি অংশ গভীরতর নাটকীয়তা লাভ করেছে। মূল নাটকে তাল্লাকের দৃশ্যে রহিমুদ্দির নিস্তেজ প্র্যাক্‌টিক্যালিটি শ্রীমিত্রের ভাষ্যে তিনবার ঐ "তাল্লাক" শব্দটির উচ্চারণে অন্য রূপ পেয়েছে। মুখে-চোখে একটা অদ্ভুত অশান্ত ভাব, অথচ কণ্ঠের জেদী দৃঢ়তায় বেদনা গোপনের প্রাণান্ত চেষ্টার নিষ্ঠুরতার পরমুহূর্তেই ফুলজানের ভেঙে পড়ার বৈপরীত্যে কঠোর সংযম ও বাঁধভাঙা অসংযমের মুখোমুখী বিরোধে এই মুহূর্তটির নাটকীয়তা। শুধু অংশবিশেষের এ হেন সংস্কারেই নয়, সামগ্রিক সম্পাদনার পরিবর্ধন-পরিবর্জনের গুণেই এ নাটক রহিমুদ্দির পাশাপাশি গ্রামের হিন্দুমুসলমান জনতাও যেন দ্বিতীয় নায়ক হয়ে ওঠে। বহুরূপী-র যে ক'টি নাটক দেখেছি, তার মধ্যে এই প্রথম জনতার এই সামূহিক ভূমিকার নাটকীয় রূপ প্রত্যক্ষ করলাম। এ রূপও অবশ্য রূপকথা ও বাস্তবের উভয় ক্ষেত্রেরই উপাদানে গঠিত। রহিমুদ্দির রসিকতায় ("হাকিম হওয়া গেলো হায়—কিন্তুক হাকিমুদ্দি হবার পাইল্যো না কিছুতে") উত্তপ্ত হাকিমুদ্দির উত্তেজিত আক্রমণোদ্যোগের মাঝখানেই আলো নিভে গিয়ে সূত্রধারের কণ্ঠস্বর আসে: "এই ঝগড়া, গান, হাসি-ঠাট্টা—এই সব নিয়েই গ্রামের জীবন চলতে থাকে। যেমন যুগযুগান্তর থেকে চলে আসছে।" তারই মাঝখানে গানের "ও···" টান নিয়ে আলো জ্বলে ওঠে—সংরূপী গোবিন্দ গান গাইছে—গানের কথায়ও সমবেত গ্রামবাসীর সহজ সাড়ায় গ্রামের চলমান জীবনের অনুদ্বিগ্ন স্বাভাবিকতা। বৃহত্তর সমাজের বলয় থেকে সাংসারিক ক্ষেত্রে এই একই নিত্যনৈমিত্তিক স্বাভাবিকতার রূপ পরবর্তী দৃশ্যেই—পিতা, মাতা ও পুত্রের ইউনিটে রহিমুদ্দি ফুলজানের একান্ত পরস্পরনির্ভরতায়—রহিমুদ্দির পুরুষসুলভ আত্মপ্রত্যয়ের কাছে ফুলজানের আত্মসমর্পণেও কোনো অসম্মান নেই, লজ্জা নেই। রহিমুদ্দির কথার ব্যঙ্গে ঠিক সেই সুরটিই আসে, যাতে ফুলজান নিজের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে, আরো ভালো করে জানতে চায়, লজ্জা পায় না। কণ্ঠস্বরে এই সমত্ববোধের সহিষ্ণু নম্রতা অবশ্য শ্রীশম্ভু মিত্রের স্বরপ্রয়োগের অর্থবহতার দৃষ্টান্ত। বোঝা, আধো-বোঝা ও না-বোঝার এই কাব্য শ্রীমিত্র ও শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়গুণে স্নিগ্ধ কৌতুক, শ্রদ্ধা, প্রেম ও অভিমানের পর্বের পর পর্ব অতিক্রম করে এমনভাবে গড়ে ওঠে, মানুষ-পৃথিবীর ইতিহাসের আবর্তনের কথা কিংবা আদি মানুষের জিজ্ঞাসা ও আর্তির প্রয়াস এমনভাবে এই পুরুষ-নারীর সহজ আলাপনে মিশে যায় যে মনে হয়, এই দাম্পত্য সুখের লীলাটুকুই চিরন্তন, চিরস্থায়ী। "হাঁটায়

নাইগবে তোর। ধরেক হাত—চলেক—সিধা হয়া হাঁটেক !—তোক ধরি হামার কতয় সাধ ফুলজান—দোনো জনে যদি মনের সুখে কাজ কাম করি”—বলতে বলতে দুজনের সেই হাঁটায়—শ্রীমতী মিত্রের বুক চিতিয়ে আড়ষ্ট দীর্ঘ পদক্ষেপে—সহজ স্টাইলাইজেশনে ও হাস্যকরতায় দর্শককে অন্তরঙ্গ এক মমত্ববোধে জড়িয়ে ফেলে। পরমুহূর্তেই বাইরের লোকের ডাক ও ফুলজানের ত্রস্ত পলায়নের কৌতুকের মধ্য দিয়ে সংসারের বিচ্ছিন্ন বৃত্তের সীমারেখা বৃহত্তর সমাজবৃত্তের মধ্যে হারিয়ে যায়। অথচ এই একটি দৃশ্যাংশের স্মৃতি বেঁচে থাকে, এই পুরুষ-নারীর মধ্যে পরবর্তী বিচ্ছেদের কালে বৈপরীত্য রচনার স্বার্থে।

সঙের দৃশ্যের চেনা মুখগুলো যখন আকালের দৃশ্যে ফিরে আসে, একজনের “ওঃ, কী দিন যে পইল”-এর জবাবে অনেকের “হয়”, কিংবা আরেকজনের “যদি বাঁচি থাকিরে ভাই তো কবার পাইরমো যে দেখছি আকাল কাক কয়”-এর জবাবে সকলের “হয়, আকাল কাক কয়”—দীর্ঘশ্বাস ও ক্লান্ত পুনরুক্তির এই প্যাটার্নে কিংবা মঞ্চের মাঝখানে শুকনো গাছের কাট্-আউটে সমাজজীবনে একই বন্ধ্যাত্বের ব্যঞ্জনা।

অথচ মন্বন্তরের অনশনের গভীর দুঃখে দর্শককে কান্নায় ভাসিয়ে দেবার চেষ্টা নেই। নাটকের শুরু থেকেই চরিত্র ও ঘটনাকে উপস্থাপনের যে আঙ্গিকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, সেই আঙ্গিকই এখানেও যথোপযুক্ত ডিট্যাচমেণ্ট্ রচনা করতে পারে। নাটকের শুরু হয় সূত্রধারের কথায় “...পঞ্চাশের মন্বন্তর কিন্তু খুব বেশিদিনের কথা নয়। ১৯৪৩ সাল। আজ থেকে মাত্র একুশ বাইশ বছর আগে। আসুন, আমরা মনটাকে একবার সেই অনতিদূর অতীতে নিয়ে যাই। তখন আমাদের দেশ পরাধীন। আর পৃথিবীময় তখন এক মহাযুদ্ধ চলছে। সেই সময় এই বাংলাদেশে মানুষের তৈরী এক প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হয়।...এ সেই মন্বন্তরের একটা গল্প। বাংলাদেশের সেই ভয়াবহ পঞ্চাশের মন্বন্তর। সেই তেরশ’ পঞ্চাশ সালে আমরা প্রথম সচেতন হলুম যে আমাদেরই সমাজের মধ্যে এমন এক অদ্ভুত মানুষের শ্রেণী আছে যারা নিজের মুনাফার জন্য এত সহজে অপরের মৃত্যু ঘটাতে পারে। এবং আজো আমরা দেখি যে তারা দুর্বল হওয়ার পরিবর্তে দেশের অভাবের সুযোগ নিয়ে যেন আরো প্রবল হয়ে, আরো পরাক্রান্ত হয়ে আমাদের চাল-ডাল-তেল-নুন, জীবনধারণের যাবতীয় অপরিহার্য বস্তু নিয়ে তেমনই ক্রূর খেলা খেলছে। তাই আজ আরেকবার স্মরণ করা যাক এই ‘ছেঁড়া তার’ নাটককে। এ নাটকের শুরু মন্বন্তরের আগে। তখনও কোনো

মানুষ জানে না যে তাদের অদৃষ্টে কি দুর্যোগ ঘনিয়ে উঠছে। তারা তখনও হেসে খেলে কলহ করে তাদের দিন কাটাচ্ছে। তখনও বাংলার গ্রামগুলোকে দেখলে মনে হয় শান্তির নীড়।" আলো জ্বলে ওঠে—পূর্বোক্ত শূন্য মঞ্চপট। সূত্রধার তখনও বলে চলেছে: "এই হল আমাদের নাটকের ঘটনাস্থল। তেমনিই একটি মিষ্টি শান্ত সাধারণ গ্রাম। বাংলাদেশের অসংখ্য গ্রামের মধ্যে একটি গ্রাম।" এই সময়ে রহিম ঢোকে, হেঁটে চলে যায়। সূত্রধার পরিচয় করিয়ে দেয়, আলো নিভে যায়, আবার জ্বলে, সূত্রধার একে একে রহিমের মা, ফুলজান ও বসিরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়—"এরা সবাই খুব খুশী, এরা সবাই খুশী"—আলো নেভে—তারপর: "কিন্তু এই গল্পে একজন খল স্বভাবের লোকও আছে"—জোতদার হাকিমুদ্দি—আলো জ্বলতেই হাকিমুদ্দি, মুখে আল্লার নাম। দৃশ্য শেষে হাকিমুদ্দি ফুলজানের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে দেখে—সূত্রধারের মন্তব্য শোনা যায়, "এই হাকিমুদ্দির ঘরে কিন্তু চার চারটি বিবি।" হাকিমুদ্দিও যেন হঠাৎ কথাটা মনে আসতেই একটু সতর্ক হয়ে যায়, আল্লার নাম করতে করতে বেরিয়ে যায়। এই একই আঙ্গিকের প্রয়োগে রহিমুদ্দির ইমানের দর্পিত আত্মঘোষণার মধ্যেই আলো নিভে গিয়ে সূত্রধারের কণ্ঠস্বর আসে: "কিন্তু মানুষ যত সহজে সত্যের জয় এবং ধর্মের জয়কে বিশ্বাস করে, জীবনে সে জয়পরাজয় বোধ হয় অত সহজে স্থির হয় না। এই গ্রামের লোকেরা যখন অমনিভাবে গান গেয়ে, ঝগড়া করে আর সং সেজে নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছে, তখন বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষের প্রথম পদপাত শুরু হয়ে গিয়েছে।...আর তখনই সরকারী চাকুরেদের সাহায্যে দেশময় যত হাকিমুদ্দির দল কুৎসিত ক্ষতের মত সমাজের দেহের উপর ফুটে উঠল মানুষের প্রাণের বিনিময়ে মুনাফা লুটবার লোভে। এই সবই ঘটছে কিন্তু নেপথ্যে। হাকিমুদ্দিও জানে না সব কথা, কিন্তু সে এটুকু বুঝেছে যে হাওয়া ফিরেছে.. তাই সে গ্রামের মধ্যে চাষীদের মনোভাব জানবার জন্যে তার চাকর কুদরৎকে পাঠিয়েছে—চর হিসেবে।" আলো জ্বলতেই হাকিমুদ্দিকে দেখা যায়, টাকা থলিতে ভরে কোমরে গুঁজতে গুঁজতে ডাকছে, "কুদরৎ—এ কুদরৎ।" সূত্রধারের বাণী ও নাট্যঘটনার এই ঘনিষ্ঠ সংযোগ সমগ্র নাটক জুড়েই।

প্রথমেই মন্বন্তর ও পরে সামাজিক অনুশাসনের হৃদয়হীনতার মধ্যে যোগহীনতার একটা ভাব নাটকের দুর্বলতা বলে মনে হয়। দুটো পৃথক থীম যেন জোড় লাগে না। প্রথমাংশে ধর্মের শাসনের কোনো স্বতন্ত্র ভূমিকা না থাকায়

মন্বন্তর (বা মন্বন্তরের যন্ত্রণার মুখে মানুষের প্রায় জান্তব আত্মসমর্পণের বিরুদ্ধে একটি মানুষের মানবিক মর্যাদাটুকু বাঁচাবার দুর্দমনীয় চেষ্টা) একমাত্র সংকট বলে, বোধ হয়। আলো ও অন্ধকারের সযত্ন নিয়ন্ত্রণে এপ্রন থেকে মঞ্চের গভীরে প্রবেশ করায় শহর থেকে গ্রামে ফেরার যে নাটক রচিত হয়, তাতেও একটা সমাপ্তির ভাব আছে। তারপর আবার নতুন জটিলতার কল্পনা এমনই প্রস্তুতিহীন, অপ্রত্যাশিত যে তা অস্বস্তির কারণ হয়। উপরন্তু কানা ফকিরের শারীর ও ভঙ্গিগত কদর্যতায় এমন একটা ঘৃণাবোধ আসে যাতে ক্রোধটা গিয়ে পড়ে ঐ ব্যক্তিবিশেষের পরেই, নিয়মনীতির কঠোরতার বিরুদ্ধে ততটা নয়। একটা ভয়ংকর তিক্ত 'রিভাল্‌শন্‌'-এ আমরা অবসন্ন হয়ে পড়ি। শ্রীশম্ভু মিত্র ও শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র অবশ্য অভিনয়ের শক্তিতে নাটকের এই অন্তর্নিহিত দৌর্বল্যকে পেরিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন। 'হদিজ খেলাপ' ও 'গুণাহ্‌' এই কথাগুলি ঈষৎ অপরিচয়ের গুণেই তাঁদের উচ্চারণে প্রচণ্ড এক অলক্ষ্য শক্তি হয়ে দাঁড়ায়—শেষ পর্যন্ত 'সবে মিলি মোর হার মানাইলে রে'-র অসহনীয় যন্ত্রণার অভিনয়ে গিয়ে পৌছয়। কণ্ঠস্বরের প্রায় আর্তনাদ, কপালে করাঘাত ও শরীরকে দুমড়ে মুচড়িয়ে এই যন্ত্রণার আত্মপ্রকাশ। তারপরেই ফুলজানের দ্বিধার যন্ত্রণা—"আল্লা —হামি কোনটা করি। জানোয়ার তো নিজে মইরতে পারে না, কিন্তু মানুষ তো পারে, মানুষ তো পারে"—শ্রীমতী মিত্রের কণ্ঠে এই অসহায়তাই শেষে প্রায় ভাবহীন উচ্চারণে এক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়: "তুই এইটা কোনটা করলু, এইটা তুই কোনটা করলু?" আবেগহীন দিনানুদৈনিক স্বাভাবিকতার আভাসেই কথাগুলো রহিমুদ্দি-ফুলজানের পুরনো কথোপকথনের জের টেনে আনে, সুখের ঘর চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ার অনুভব রচনা করে, প্রথম সাময়িক অসাড়তায়, প্রকাশের অক্ষমতায়।

চরিত্রানুগ অভিনয়ে বহুরূপী-র শিল্পীদের সুনাম অক্ষুণ্ণ। হাকিমুদ্দির ভূমিকায় শ্রীগঙ্গাপদ বসুর শঠতার অভিনয় সহজতা ও স্থির আত্মসচেতন বুদ্ধির যুগপৎ প্রয়োগে উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিরপরাধ ভাণ খলচরিত্রের ছলনার এক বিশেষ রূপ রচনা করে। কুকড়া ও শিয়ালুর দ্বৈত ভূমিকায় শ্রীকুমার রায় কণ্ঠস্বরের মিলে ও যৌবন-বার্ধক্যের সুপরিকল্পিত অমিলে দুটি চরিত্রের বংশগত সাদৃশ্য ও বয়ঃভেদ রচনা করেন, বিশেষত কুকড়ার খবর দেওয়ার সাস্‌পেন্‌স্‌-এর সহজ চলতি রসিকতা থেকে শিয়ালুর কাতর প্রার্থনার তীক্ষ্ণ অভিশাপে রূপান্তর, অভিনয়ের দুই দুস্তর সীমান্ত ছোঁয়। প্রেসিডেন্টের ভূমিকায় শ্রীদেবতোষ ঘোষের

ইচ্ছাকৃত স্বরদৌর্বল্য চরিত্রটির পরনির্ভর পরোপজীবী ভূমিকার দ্যোতক হয়। শ্রীশোভেন মজুমদারের স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর গোবিন্দের ভূমিকায় কাজে লেগেছে ; গ্রাম্য গায়কের 'আন্‌সফিস্টিকেটেড্' প্রতিরূপ এসেছে। মন্বন্তরের দৃশ্যে কোনো কোনো অভিনেতার অনাবৃত শরীরে অনশনের কোনো ছাপ না থাকায় ঈষৎ চোখে লেগেছে। আলোর প্রয়োগ নাটকের সমগ্র ফর্মে অতি প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষত গ্রামে ফেরার দৃশ্যে মিক্‌সিং-এর অতি সতর্ক কালনিয়ন্ত্রণ অবশ্য উল্লেখ্য দৃষ্টান্ত।

অগ্নিষ্ণু ভট্টাচার্য

ছেঁড়া তার। রচনা—তুলসী লাহিড়ী। প্রযোজনা—বহুরূপী। নির্দেশনা—শম্ভু মিত্র। অভিনয়ে শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, শান্তি দাস, কুমার রায়, দেবতোষ ঘোষ, কালীপ্রসাদ ঘোষ, শোভেন মজুমদার, শিবু মুখার্জী প্রমুখ। নিউ এম্পায়ার, ১৯৬৫ শেষাংশে একাধিকবার অভিনীত।

শ্র দ্ধা ঞ্জ লি

চেদোমীর মিন্দেরোভিচ্

যুগোশ্লাভ কবি ও লেখক চেদোমীর মিন্দেরোভিচের নশ্বর দেহ ১৯৬৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী ভারতের মাটিতে বিলীন হয়েছে। এই ছিল তাঁর শেষ ইচ্ছা।

ঠিক একবছর আগে মিন্দেরোভিচ্ 'সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভারতীয় সংস্থা'র অতিথি হয়ে ভারতে এসে নানা জায়গায় যান। দিল্লীতে ১৯৬৪-র নভেম্বরে বিশ্বশান্তি-সম্মেলনে তাঁর শান্ত সৌম্যমূর্তি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, কারণ সবসময়ই তিনি নিজের কাজ ও কাগজপত্র নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, ঘুরতেন—একলা।

তাঁর একলা থাকার পিছনে কিন্তু কোনো স্বাতন্ত্র্যাভিমানের ইতিহাস নেই। মানুষকে তিনি নিবিড়ভাবে ভালোবেসেছিলেন।

অতি শৈশবেই পিতৃমাতৃহীন মিন্দেরোভিচ্ যখন ইস্কুলের ছাত্র, তখন থেকেই তাঁর সাহিত্যজীবনের শুরু। শুধু লেখার আগ্রহে নয়, জীবনধারনের তাগিদেও। তিনি লিখতেন কবিতা। এই লেখার মধ্যে দিয়েই তাঁর পরবর্তী সমাজসচেতনতা ও রাজনীতিবোধের সূচনা। মাত্র সতেরো বছর বয়সে তাঁর সাহিত্যরচনা ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য তিনি তদানীন্তন যুগোশ্লাভ সরকারের দ্বারা কারারুদ্ধ ও নিগৃহীত হন, ও তাঁর সমস্ত রচনা আইনবলে নিষিদ্ধ করা হয়। পরবর্তীকালেও তিনি অসংখ্যবার কারারুদ্ধ ও নির্যাতিত হন, কিন্তু তাঁর লেখনী ও রচনাশৈলী উত্তরোত্তর শক্তিমান হতে থাকে। বস্তুত বিপ্লবী, যোদ্ধা ও সাহিত্যিক—এই তিনের সংমিশ্রনেই তাঁর ব্যক্তিত্বের বিকাশ।

যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের একেবারে গোড়ার দিকে টিটোর নেতৃত্বে যে নিরস্ত্র বিপ্লবীদল সমবেত হয়েছিল, তিনি তাদের অন্যতম। ১৯৪১ সালেই তিনি সাম্যবাদী দলে যোগ দেন। ১৯৪৪ সালে বেলগ্রেডের মুক্তিযুদ্ধে তিনি শুধু যে হাতিয়ার নিয়ে যুদ্ধ করলেন তাই নয়, নাৎসী শত্রু যখন দিনের পর দিন বেলগ্রেড-এ বোমাবর্ষণ করে প্রতিরোধের নৈতিক শক্তিকে পর্যুদস্ত করতে চেয়েছিল, তখন এই নির্ভীক যোদ্ধা ও চারণকবি তাঁর উদ্দীপনাময় কবিতা ও সৌহার্দ দিয়ে হাজার হাজার সহযোদ্ধাকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

যুদ্ধান্তে "ক্লাউড্‌স্‌ ওভার টারা" তাঁর প্রথম যুদ্ধবিষয়ক উপন্যাস, ও "ফলোইং টিটো—এ পার্টিজান ডায়ারি" (যুদ্ধের অব্যবহিত পরে প্রকাশিত) তাঁর সহযোদ্ধাদের চরম আত্মোৎসর্গ ও বীরত্বের সাক্ষ্য।

যুদ্ধাবসানের সঙ্গে তাঁর বিপ্লবী ভূমিকা কেন্দ্রীভূত হল সাহিত্যের মধ্যে। এইবার তাঁর হাতিয়ার লেখনী। সৎ মার্কস্‌পন্থীর সুনির্দিষ্ট জীবনদর্শন ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ সাহিত্যচেতনায় তিনি বুঝেছিলেন যে সাহিত্য ও শিল্পের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের বুদ্ধিতে বিশ্বজনীন আদর্শ রোপণ করা সম্ভব। এই আদর্শস্থাপনের জন্যেই প্রাণ দিয়েছেন তাঁর অগণিত দেশবাসী, তাঁর অধিকাংশ আত্মীয়স্বজন। কঠোরতম সংগ্রামে লিপ্ত থেকে, সাধারণ কৃষক ও মৎস্যজীবীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের সমস্যার একটা অন্তরঙ্গ উপলব্ধি তাঁর মধ্যে ঘটেছিল। যে-দেশ ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব পথ বেছে নিয়েছে, সে দেশের সাহিত্যের ভূমিকা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা অত্যন্ত গভীর ছিল। তাঁর মধ্যে সমন্বয় ঘটেছিল বুদ্ধিজীবী মানুষের তীক্ষ্ণ নৈতিক চেতনার ও শিল্পিমনের সংবেদনশীলতার। তাঁর যুদ্ধোত্তর সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান লক্ষণ তাই তাঁর গভীর মানবতাবোধ। তাঁর রচনা (কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও ভ্রমণকাহিনী—প্রায় ষোলটি প্রকাশিত পুস্তক) বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ভাষা ছাড়াও ভারতীয় ভাষাতে (হিন্দী, উর্দু, পাঞ্জাবী, বাংলা, উড়িয়া, আসামী ও মালয়ালাম) অনূদিত হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ভাষার ব্যবধানের দরুণ এদের সাহিত্যগুণ অনুবাদের মধ্যে পুরোপুরি রক্ষিত হয়েছে কিনা সন্দেহ। একথা ইংরাজি অনুবাদ সম্পর্কেও প্রযোজ্য।

যুগোশ্লাভিয়ার সাংস্কৃতিক নানা সাহিত্যপত্রের পুরোধা ছিলেন চেদোমীর মিন্দেরোভিচ্‌। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর তিনি যুগোশ্লাভিয়ার জাতীয় সংগীত রচনা করেন। বহু বৎসর ধরে তিনি যুগোশ্লাভিয়ার লেখক-সমবায়ের ও শান্তি-সমিতির কর্ণধার ছিলেন। জাতীয় সরকারও তাঁকে যোগ্য পদমর্যাদা দিয়ে তাঁর সমাদর করেছেন। তাঁর শেষ সরকারী পদ—যুগোশ্লাভ জাতীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ।

ইয়োরোপীয় লেখক-সমবায়ের সদস্য হিসাবে তিনি পৃথিবীর বহু দেশ-ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর শৈশবস্বপ্ন প্রথম রূপ নিল যখন তিনি দিল্লীতে যুগোশ্লাভ দূতাবাসে সাংস্কৃতিক সচিব হয়ে এলেন (১৯৫৪-৫৭)। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আশৈশব। ১৯২৬ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ

বেলগ্রেডে আসেন যুগোশ্লাভিয়ায় তখন পুরোদস্তুর সামন্ততন্ত্র। দেশের তদানীন্তন রাজা মুসোলিনীর মন্ত্রশিষ্য। রবীন্দ্রনাথ ইতিমধ্যে ইতালী ঘুরে এসেছেন। সুইজারল্যাণ্ডে রোমঁ্যা রোলঁ্যার কাছে জেনেছেন ফ্যাশিস্তদের প্রকৃত স্বরূপ। খবরের কাগজে রবীন্দ্রনাথ সেই সর্বনাশা একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মতপ্রকাশ করেছেন। যুগোশ্লাভিয়ায় তাই তাঁর অভ্যর্থনা রাজকীয় পরিবেশে ঘটে উঠল না। সংবর্ধনাসভার ব্যবস্থা হল বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখানে প্রবেশপত্রের বাধা না মেনে ভেঙে পড়েছিল অগণিত জনতা, আর সেই জনস্রোতে ভেসে এসেছিল একটি কিশোর—চেদোমীর মিন্দেরোভিচ্—জন্ম যার বেলগ্রেডে, ১৯১২ সালে।

ভারতকে জানবার ও জানাবার দায়িত্বকে মিন্দেরোভিচ্ জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন যুগোশ্লাভ জাতীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ। ভারতীয় পুস্তকের এক বিশাল ও অভূতপূর্ব সংগ্রহে তিনি এই গ্রন্থাগারকে সমৃদ্ধ করেছেন। সাংস্কৃতিক সচিব থাকার সময়ে ও পরে তিনি বহু ভারতীয় লেখক ও শিল্পীর সংস্পর্শে এসেছেন। ভারতীয় সাহিত্যের যুগোশ্লাভ ভাষায় অনুবাদ ও যুগোশ্লাভ সাহিত্যের ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ সম্পর্কে তাঁর অবদান অনেকখানি। তাঁর স্ত্রী জোরা মিন্দেরোভিচ্ ভারতীয় লেখকদের বহু ছোটগল্প, প্রেমচাঁদ-এর 'গোদান' ও জৈনেন্দ্রকুমারের 'পদত্যাগ' সার্বো-ক্রোয়াশিয়ান ভাষায় অনুবাদ করেছেন।

এই শান্ত, স্বল্পবাক্ মানুষটিকে দেখলে কিন্তু চট্ করে বোঝা যেত না, তাঁর জীবন কী মথিত, তাঁর কর্মকাণ্ড কী বিরাট, তাঁর হৃদয় কী স্নেহার্দ্র। খুব অল্প কয়েকদিনের জন্যে তাঁকে কাছাকাছি দেখবার সুযোগ হয়েছিল আমার। তখন তাঁর পটভূমি আমার কিছুই জানা নেই। ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে তিনি কলকাতায় এসে আমাদের বাড়িতে ছয়টি দিনের জন্যে ছিলেন। আশৈশব সংগ্রামের দাম দিতে হয়েছে স্বাস্থ্যের বিনিময়ে। অ্যান্‌জাইনা পেক্‌টোরিসের রুগী; খাওয়া দাওয়া সাবধানে। বেশির ভাগ তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকতাম; প্রয়োজন হলেই তিনি চলে আসতেন আমার রান্নাঘরে। এত সহজ ও স্বাভাবিক ছিল ওঁর ব্যবহার, যেন আমাদের প্রিয়জন, নিত্যই ওঁর এইভাবে আমাদের বাড়িতে যাওয়া-আসা, টেবিলে খেতে বসে নানা গল্পে যোগ দেওয়া—এই একটা সময়ই আমাদের বাড়ির সকলে একত্র হত। দুই ছেলে তাঁর—বড় ছেলে আমার মেয়ের চেয়ে কিছু

ছোট,—ছেলেটি ভালোবাসে পিয়ানো বাজাতে। দূরে গিয়েও তিনি আমাদের নিয়মিত চিঠি লিখতেন, আমার মেয়েকে নানা দেশের স্ট্যাম্প পাঠাতেন। ভারতীয় বন্ধুদের নমস্কার জানাতেন। ১৯৬৬ সালের ৪ঠা জানুয়ারি তিনি ভারতের মাটিতে আবার এসে পৌঁছলেন—উদ্দেশ্য, অনূদিত পুস্তকপ্রকাশনা ও ভারতীয় লেখক ও সংস্কৃতিকর্মীদের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ স্থাপন। খুব সুস্থ ছিলেন না। দেশ থেকে রওনা হওয়ার অল্প কিছু আগে একটা হার্ট-অ্যাটাকের পর হাসপাতাল থেকে বেশিদিন বেরোন নি। দিল্লী থেকে ওঁর শেষ চিঠি আমাদের কাছে পৌঁছল ওঁর মৃত্যুর পরে। লিখেছেন, "কলকাতা না দেখে, তোমাদের না দেখে আমি দেশে ফিরতে পারি না…"

তাঁর অকালমৃত্যু আমাদের পরিবারের প্রত্যেকটি মানুষের বেজেছে একান্ত প্রিয়জনের বিচ্ছেদশোকের মতো। কী করে এমন হল? এত অল্পসময়ে তিনি কী করে আমাদের হৃদয় জয় করলেন ভেবে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। এই কি ওঁর সাচ্চা মার্কস্‌বাদী শিক্ষা, যাতে মানুষ আর রাজনীতিকে অভিন্ন করে দেখতে শেখায়? এই কি ওঁর শিল্পিমনের সীমাহীন মানবতাবোধ যা ওঁকে টেনেছে অজানার টানে, দূরকে করেছে নিকট আর পরকে করেছে ভাই? এই লোভ দ্বন্দ্ব আর হানাহানির দুনিয়ায় তাঁর সাধনা ছিল সত্য শিব ও সুন্দরের। তাই ভারতের সঙ্গে তাঁর সাংস্কৃতিক যোগ পরিণত হল আত্মিক যোগাযোগে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসকে তিনি যে গভীর ঔৎসুক্য ও সহানুভূতির সঙ্গে অনুধাবন করেছেন তাই নয়, ভারতের সংস্কৃতি ও আত্মাকে বুঝবার আগ্রহ ছিল অদম্য। তাঁর "গ্লিম্প্‌সেস্ অফ ইণ্ডিয়া"র (তাঁর অতি-সাম্প্রতিক রচনা—১৯৬৪ সালের ভারতভ্রমণের কাহিনী) যুগোশ্লাভ সমালোচক কর্তৃক আলোচনায় দেখতে পাচ্ছি তিনি শুধু পরিব্রাজকের রোজনামচা করেন নি, ভারতে তাঁর নানাবিধ অভিজ্ঞতার চিত্রে উদ্‌ঘাটিত করেছেন তার অগণিত মানুষকে, তার জীবনধারাকে, তার দেশকে—তাঁর কবিচিত্ত দৃশ্যমান বস্তুকে অতিক্রম করে দেশকালপাত্রের অন্তরস্থিত ভাবকে আয়ত্ত করতে প্রয়াসী হয়েছে।

এ থেকেই জন্মেছিল তাঁর ভারত ও ভারতীয় জীবনের সঙ্গে একাত্মবোধ। মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র আগে তিনি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার চিরায়ত জীবনদর্শনকে জানার ও বোঝার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। দিল্লীতে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধানিবেদনের জন্যে তাঁর যে বন্ধু ও গুণগ্রাহীরা সমবেত হয়েছিলেন, তাঁদের

শ্রদ্ধার্ঘ্যের সূচীতে সর্বপ্রথমে ছিল ধ্রুপদী সংগীতের পরিবেশন—কারণ ভারতীয় ও পাশ্চাত্য, উভয় দেশেরই ধ্রুপদী সংগীতের ভক্ত ও সমজদার ছিলেন। মিন্দেরোভিচ্। এবং সর্বশেষ সূচী ছিল ভাগবদ্‌গীতার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের আবৃত্তি। এই শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করছেন কেমন করে মানসিক শান্তি অর্জন করা যায়, কারণ অর্জুন তাঁকে প্রশ্ন করছেন: "হে কেশব, যাঁর বুদ্ধি স্থির, যাঁর চিন্তা কেন্দ্রীভূত, সে মানুষের লক্ষণ কি? তিনি কী-ভাবে বাক্যালাপ করেন কীভাবে উপবেশন করেন, কীভাবে গমনাগমন করেন?"

সমস্ত মানুষের বেদনাকে জানা ও ভাষা দেওয়ার কাজে রত ছিল তাঁর সচেতন কবিমন, তাঁর যুদ্ধবিধ্বস্ত শান্তিকামী মন। তিনি জীবনকে ভালোবেসেছিলেন বলেই মানুষের প্রতি ভালোবাসায় তাঁর হৃদয় উন্মুখ ছিল। সেই উন্মুখ হৃদয়ের নিজস্ব বেদনাবোধকে তিনি কোনোদিন প্রচার করেন নি, যদিও তিনি কবি, তিনি শিল্পী। হয়তো সেইজন্যেই, যতটুকু তাঁকে দেখেছি তাঁর মনের পরিচয় পেয়েছি, মনে হয়েছে একটা নিঃসঙ্গতাবোধের ছায়া তাঁকে যেন আমরণ অনুসরণ করেছে। যদিও তাঁর 'অন্তহীন প্রাণ' অমর হয়ে রইল তাঁর প্রত্যেকটি লেখায়—যে লেখার সঙ্গে আমাদের পরিচয় এখনও অতি স্বল্প, আংশিক।

করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিশ্বমানবের স্বাস্থ্যলাভ

প্রতি চার বছর পরে পরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) পক্ষ থেকে একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। রিপোর্টের বিষয়, বিশ্বের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যা। তৃতীয় রিপোর্টটি সবে পাওয়া গিয়েছে। এই রিপোর্ট পড়ে জানা যায়, ১৯৬১-৬৪ সময়কালের মধ্যে হোমো স্যাপিয়েন্স্ নামক রুগীটি কী-কী রোগে ভুগছে বা কী-কী রোগ থেকে মুক্ত হয়েছে।

রিপোর্টটি পড়ে রুগীর অবস্থা সম্পর্কে আশান্বিত হওয়া চলে না। তা শুধু এ-কারণে নয় যে রিপোর্টে এমন সমস্ত তথ্য ও বিবরণ উপস্থিত করা হয়েছে যার মধ্যে মানুষের অপরিসীম দুঃখদুর্দশার চিত্র ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। তার চেয়ে বড় কথা, রিপোর্টটি পড়ে মনে হয়, বিশ্বমানবের স্বাস্থ্যলাভ কখনোই কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়, ওটা নিতান্তই কল্পনার স্বর্গরাজ্য, আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন যতই অর্থ ব্যয় করি না কেন এই স্বর্গরাজ্যে আমরা কোনোকালেই পৌছতে পারব না।

বিগত কুড়ি বছরের দিকে তাকালে দেখা যায়, রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে চিকিৎসকের তূণীরে নতুন নতুন ব্রহ্মাস্ত্রের কোনো অভাব ঘটে নি। এক মাত্র ক্যানসার ছাড়া অন্য কোনো রোগকেই এখন আর দুরারোগ্য মনে করা হয় না। সংক্রামক ব্যাধিকে তো পুরোপুরি জয় করা হয়েছে বলেই দাবি করা হয়ে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যাচ্ছে, 'সংক্রামক ব্যাধির হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা পঞ্চাশ বছর আগেকার রোগীর সংখ্যার চেয়ে কোনো দিক থেকেই কম নয়। অন্যদিকে, যতোই ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করা হোক না কেন ব্যাধি পুরোপুরি নির্মূল হচ্ছে না, নতুন চেহারায় নতুন ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে মাত্র। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ঘোষিত লক্ষ্য ছিল বিশ্বকে রোগমুক্ত করা। বোঝাই যাচ্ছে যে পুরোপুরি রোগমুক্তি এখন আর সম্ভব নয়। রোগকে যতটা পারা যায় ঠেকিয়ে রাখাটাই এখন লক্ষ্য হওয়া উচিত।

একটি দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা আরও স্পষ্ট হবে। স্মলপক্স্ বা বসন্ত এমন একটি রোগ যার বিরুদ্ধে প্রতিষেধক ব্যবস্থা খুবই সহজ। কিন্তু এই

রোগটিকেও কি সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে? আমাদের দেশের কথা বাদ দিচ্ছি। এমনকি ব্রিটেনের মতো দেশেও যেটুকু হয়েছে তা নির্মূলীকরণ নয়, আংশিক নিয়ন্ত্রণ মাত্র। এ-মাসে ১৯শ বিশ্ব স্বাস্থ্য অধিবেশনে বসন্ত নির্মূলীকরণের একটি দশ-সালা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কাজ শুরু হবে আগামী বছর থেকে। কর্মসূচীতে বলা হয়েছে যে আগামী দশ বছরের মধ্যে আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ আমেরিকার সমগ্র অধিবাসীদের বসন্ত প্রতিষেধক টীকা দেওয়া হবে। কিন্তু যদি ধরেও নেওয়া যায় যে এই কর্মসূচী পুরোপুরি সফল হল তাহলেও কি বসন্ত রোগ সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া চলবে? বসন্ত রোগের সংক্রমণ কি শুধু মানুষ থেকে মানুষে, পশু থেকে মানুষে নয়? তা যদি নাও হয় তো, নিশ্চিন্ত শব্দটা এক্ষেত্রে অর্থহীন। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় তো বসন্ত রোগ প্রায় পুরোপুরি নির্মূলীকৃত। কিন্তু সেজন্যে যে-পরিমাণ সজাগ থাকতে হচ্ছে ও যে-পরিমাণ অর্থব্যয় করতে হচ্ছে তার দাম বড় কম নয়। শুধু অর্থব্যয়ের পরিমাণ বছরে ৪৩ থেকে ৭০ মিলিয়ন ডলার।

যৌনব্যাধি কি নির্মূল হয়েছে? যুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তীকালে অন্ত তাই মনে হয়েছিল। আর এই অসাধ্য সাধনের কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছি পেনিসিলিনকে। কিন্তু এখন আবার দেখা যাচ্ছে, যৌনব্যাধির প্রকো যুদ্ধের সময়ের মাত্রা স্পর্শ করেছে।

কলেরা? ১৯৫০ সালে মনে হয়েছিল কলেরা নির্মূল হবার মুখে। কি তা হয় নি। রিপোর্টেই স্বীকার করা হয়েছে যে কলেরার দ্বারাই এখন বিশ্বে স্বাস্থ্য সত্যিকারের বিপন্ন।

ম্যালেরিয়া? বিশ্বের বহু এলাকাই এখনো পর্যন্ত ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত জীবাণুনাশক ওষুধে এখন আর বিশেষ কাজ হচ্ছে না। রিপোর্টে বলা হয়েছে ম্যালেরিয়া অধ্যুষিত এলাকায় ১৫৬০ মিলিয়ন অধিবাসীর মধ্যে ৪৪৪ মিলি অধিবাসীকে ম্যালেরিয়া-মুক্ত করা হয়েছে এবং আরো ৭২৩ মিলি অধিবাসীকে ম্যালেরিয়া-মুক্ত করার কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সেই একই অবস্থা। কোনো সময়েই নিশ্চিন্ত হওয়া চলবে না। লড় চলতেই থাকবে, তার শেষ বলে কিছু নেই।

আরেকটি ব্যাধি ট্রাকোমা। এই একটি ব্যাধিতেই বিশ্বের যত মা অন্ধ হয় এমন আর কিছুতে নয়। দশ বছর আগে ট্রাকোমা-রোগীর সং

ছিল ৪০০ মিলিয়ন। রিপোর্টে বলা হয়েছে, এখন এই রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে এই রোগ ভয়াবহ মাত্রায় ছড়িয়েছে। অথচ এখনো পর্যন্ত এই রোগের প্রতিষেধক অনাবিষ্কৃত।

উন্নত দেশগুলিতে অবশ্য সংক্রামক রোগের প্রকোপ না-থাকার মতো। কিন্তু এসব দেশে তেমনি শতকরা ৪০ জনের মৃত্যু ঘটছে কার্ডো-ভাস্‌কুলার রোগে। সবচেয়ে বেশি মৃত্যু অবশ্য দুর্ঘটনায়। তবে শেষোক্ত কারণটি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্টের এক্তিয়ারভুক্ত নয়।

অতএব, রোগ আমাদের চিরসঙ্গী এটুকু ধরে নিয়েই অগ্রসর হতে হবে। তবে এমন আয়োজন নিশ্চয়ই থাকবে যাতে এই চিরসঙ্গীকে যতদূর সম্ভব দমিয়ে রাখা যায়। তাকে চিরকালের মতো দূর করা যাবে, এমন আশা না রাখাই সঙ্গত।

আরো একটি ব্যাধি—স্কুলফোবিয়া

গত ২৯শে মে তারিখের লণ্ডন টাইম্‌স্‌ পত্রিকায় বড় বড় হরফে একটি খবর বেরিয়েছে। ব্রিটিশ স্কুলের ছেলেমেয়েরা নাকি নতুন একটি ব্যাধিতে আক্রান্ত। ব্যাধির নাম—স্কুলফোবিয়া। ব্রিটিশ প্রধান শিক্ষক সমিতির সভাপতি শ্রী এ. জি. বার্লো সাম্প্রতিক একটি ভাষণে এই ব্যাধির বিবরণ দিয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে ছেলেমেয়েরা ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে, তারা ক্লাশে আসে না, গুণ্ডামি করে বেড়ায়, ধনসম্পত্তি নষ্ট করে, কোনো নিয়ম শৃঙ্খলা মানে না, নেশা করে, মোড-রকার-বীটনীক দলে ভিড়ে হৈ-হৈ করে, এমন কি যৌন ব্যভিচারেও লিপ্ত হয়। না অভিভাবক, না শিক্ষক—কাউকেই এই ছেলেমেয়েরা মানে না।

শ্রীবার্লো এই ব্যাধির কারণস্বরূপ কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন: রেডিও ও টেলিভিশনের বিকৃত প্রচার, খবরের কাগজের লোমহর্ষক বিবরণ, যৌনউদ্দীপক ব্যবসায়িক বিজ্ঞাপন, কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের অবজ্ঞা করার চালিয়াতি এবং সাধারণভাবে জাতির নৈতিক মানের অবনতি।

আমাদের দেশে এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কোচিং ক্লাশের র‍্যাকেটিয়ারিং ও হিন্দী সিনেমার পোস্টার। স্বভাবতই ব্রিটেনের চেয়ে আমাদের দেশে ব্যাধির প্রকোপ প্রবলতর হওয়ার কথা।

কাগজের মলাটের যুদ্ধ

পেপারব্যাক বা কাগজের মলাটের বই প্রথম বাজারে ছেড়েছিলেন পেঙ্গুইন, ১৯৩৬ সালে। মলাটের ওপরে কোনো ছবি থাকত না, এখনো নেই। শুধু টাইপ সাজিয়ে মলাট। দামও খুবই কম। গোড়ার দিকে এ-ধরনের বইয়ের প্রকাশক হিসেবে পেঙ্গুইন ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। চটকদার সাজসজ্জা ছাড়াই বই বিক্রি হত। বইয়ের বিচার হত তার নিজস্ব মূল্যে।

কিন্তু এ-অবস্থা বেশিদিন বজায় থাকেনি। পরবর্তী কালে কাগজের মলাটের বাজারে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব হয়েছে। তাদের বইয়ের মলাটে দগদগে রঙীন ছবি, লোমহর্ষক বিজ্ঞপ্তি। অনেক সময়ে আকারেও অতি বিপুল, হিসেব করলে দেখা যাবে প্রকাশকের লাভ তো থাকছেই না, বরং ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু প্রকাশক নিজে কিন্তু এ-ক্ষতিকে ক্ষতি মনে করছেন না, কেননা এ-বইয়ের প্রচার মূল্য ভাঙিয়ে তিনি অন্য বইয়ে প্রচুর মুনাফা ঘরে তুলছেন।

এমনিভাবে কাগজের মলাটের জগতে প্রায় একটা যুদ্ধের অবস্থা তৈরি হয়েছে বলা চলে। শুরু হয়ে গিয়েছে বাজার দখল করার জন্যে নানারকমের কলাকৌশল। এমনকি সিনেমা-স্টারের প্রায়-নগ্ন মূর্তি ও তৎসহ নগ্নতর বিজ্ঞপ্তি এখন আর বইয়ের প্রচ্ছদপটে বিরল নয়।

বলা যা হয়েছে তা পেঙ্গুইনের পক্ষে আশাব্যঞ্জক নয়। বইপিছু টাকার লেনদেনের একটি হিসেব উপস্থিত করলে ছবিটি স্পষ্ট হয়। একটি বইয়ের ক্ষেত্রে পেঙ্গুইনের সর্বোচ্চ লেনদেনের পরিমাণ ১০,০০০ পাউণ্ড, বইটি হচ্ছে ট্রুম্যান কাপোৎ-এর 'ইন কোল্ড ব্লাড'। সে জায়গায় নিউ ইংলিশ লাইব্রেরির দুটি বইয়ের হিসেব এই : হ্যারল্ড রবিন্স-এর 'দি অ্যাডভেঞ্চারার্স,' ৫২,০০০ পাউণ্ড; 'দি কার্পেটব্যাগার্স', ৩৭,০০০ পাউণ্ড। লে কার-এর 'দি লুকিং গ্লাস ওঅর' (প্যান) বইয়ের লেনদেন ৫০,০০০ পাউণ্ড, হেনরি মিলার-এর 'ট্রপিক অফ ক্যানসার' (প্যান্থার)-এর ৩৪,০০০ পাউণ্ড, ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস-এর 'মাই লাইফ অ্যাণ্ড লাভস্' (কোর্গি)-এর ২৫,০০০ পাউণ্ড।

অর্থাৎ, কাগজের মলাটের যুদ্ধে সবচেয়ে বেশি মার খাচ্ছে পেঙ্গুইন। বেস্টসেলারের তালিকাতেও পেঙ্গুইনের স্থান এখন দ্বিতীয়। প্রথম স্থান প্যান-এর। দশ লক্ষেরও অধিক কপি বিক্রি হয়েছে এমন বই এই প্রকাশকের আছে চোদ্দটি (তার মধ্যে দশটিই বণ্ড সিরিজের, বাকি চারটি হচ্ছে

'পেটোন প্লেস,' 'রিটার্ন টু পেটোন প্লেস,' 'স্যাটারডে নাইট অ্যাণ্ড সানডে মর্নিং' ও 'দি ড্যামবাস্টার্স')।

দশলক্ষেরও অধিক কপি বিক্রি হয়েছে এমন বই পেঙ্গুইনের আছে ছটি : শ'-র 'পিগ্ম্যালিয়ন', এইচ্-ডি-এফ কিটো-র 'দি গ্রীক্স', হোমারের 'ওডিসী,' 'অ্যানিম্যাল ফার্ম,' 'লেডি চ্যাটালিস লাভার' ও 'এয়ারক্র্যাফ্ট রিকগ্নিশন'।

তবে মোট বিক্রির দিক থেকে পেঙ্গুইন এখনো শীর্ষস্থানীয়। গতবছর সারা বিশ্বে পেঙ্গুইনের বই বিক্রি হয়েছে মোট ২৫ মিলিয়ন কপি। কিন্তু প্যান-এর বিক্রি-সংখ্যাও বিপজ্জনক রকমের কাছাকাছি : ২১ মিলিয়ন। তারপরে আসছে নিউ ইংলিশ লাইব্রেরি, প্যান্থার, কোর্গি ও ফন্টানা— প্রত্যেকেরই ১০ মিলিয়নের কাছাকাছি।

এ-অবস্থায় পেঙ্গুইনের মতো প্রকাশককেও বাজার দখল করার জন্যে নতুন কলাকৌশলের কথা ভাবতে হচ্ছে। তার সূত্রপাতও হয়ে গিয়েছে গত ১লা জুন তারিখে। ঐদিন পেঙ্গুইনের কর্তৃপক্ষ ষাটজন সাংবাদিককে উড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন বার্লিনে। সেখানে লেন ডাইটনের 'ফিউনারেল ইন বার্লিন' বইয়ের শুটিং চলছিল। সাংবাদিকরা অবশ্য এমনি বিনাপয়সায় উড়বার সুযোগ অহরহই পেয়ে থাকেন। কিন্তু পেঙ্গুইনের ত্রিশ বছরের ইতিহাসে এ-ধরনের উদ্যোগ এই প্রথম। অনেকটা বাধ্য হয়েই এ-উদ্যোগ নিতে হচ্ছে। নইলে, পেঙ্গুইনের সম্পাদকীয় দপ্তরের অধ্যক্ষ টনি গডউইনের আশঙ্কা, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে পেঙ্গুইন সমস্ত লেখক হারাবে।

বার্লিনের শুটিং দেখে ফিরে আসার পরে সাংবাদিকরা নিশ্চয়ই ফলাও বিবরণ লিখবেন। বইটি প্রকাশিত হবে তার পরে। পেঙ্গুইনের বাজার হাতে রাখার জন্যে টনি গডউইন যে-অজস্র কলাকৌশলের কথা ভাবছেন, এই হচ্ছে তার একটি নমুনা।

অমল দাশগুপ্ত

আবদুল হালিম

কয়েকদিন আগে কলকাতায় হঠাৎ খবর পেলাম কয়েক ঘণ্টা আগে সহসা আবদুল হালিম মারা গিয়েছেন। সংবাদটা শুনে মর্মাহত হলাম। দীর্ঘ কারাবাসের পর মাত্র দিন দশেক আগে তিনি ছাড়া পেয়েছিলেন। স্বাস্থ্য তাঁর কখনই খুব ভাল ছিল না। বিশেষ করে জেলখানায় তিনি নানা রকম অসুখ-বিসুখে ভুগছিলেন। তবু কেউই ভাবতে পারে নি—তাঁর জীবনের সমাপ্তি এতো তাড়াতাড়ি ঘনিয়ে আসবে।...

হালিম তাঁর বড় ভাই-এর প্রভাবে কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হন তখন তাঁর বয়স কুড়ি হয় নি। এই ভাই রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে পড়িয়েছিলেন কিছুদিন। তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনের বিকৃত যুগে সাম্যবাদ ছিল এমন এক ভয়াবহ মতবাদ যা ভদ্রলোকের চিমটে দিয়ে ছোঁওয়াও উচিত নয়। ভবিষ্যৎ আন্দোলন এবং হালিনের পরম সৌভাগ্য যে তিনি তার চেয়ে বছর দশেকেরও বড় একজনের কাছে সাহায্য ও প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি হলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মুজফ্‌ফর আহমদ, অবশ্য যদি কোনো ব্যক্তি-বিশেষকে তা গণ্য করা যায়।...

বিশ শতকের প্রথম দিকে আবদুল হালিম কমিউনিস্ট হন। তারপর থেকে কোনোদিন তিনি পেছনে ফিরে তাকান নি। লেখাপড়ার প্রতি অনুরক্ত হালিমের অন্যতম আবেগ মিশ্রিত প্রচেষ্টা ছিল মার্কসবাদ বিষয়ে জনপ্রিয় বই লেখা, একই সঙ্গে তিনি এও বুঝেছিলেন যে শ্রেণী সংগঠন শ্রেণী সংহতির শক্তি ছাড়া অত্যন্ত উচ্চস্তরের যুক্তিসর্বস্বতা অর্থহীন ঠুনকো ব্যাপার। এইভাবে 'ওয়াকার্স এণ্ড পেজেণ্টস' পার্টিতে ট্রেড ইউনিয়নে এবং নিজের জেলা বীরভূম ও অন্যত্র কৃষকদের সঙ্গে কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর হাতে খড়ি হয়।

পার্টি এবং শ্রেণী সংগঠন দপ্তর বলতে গেলে একাই তিনি চালু রাখতেন। দিনের বেলা মেঝে ঝাট দিতেন আবার রাত্রিবেলা ওইখানেই ঘুমোতেন। ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দকে ঘৃণায় প্রত্যাখ্যান করে তিনি স্পার্টানদের মতো সরল জীবন যাপন করতেন, অবশ্য একথা ঠিক নয় যে 'মধুর জীবন' সম্পর্কে তাঁর বিরূপতা ছিল। শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ব্যাপক সংখ্যা গরিষ্ঠ মানুষ এই ভোগবিলাস থেকে নিদারুণভাবে বঞ্চিত ছিল বলেই তিনি একে ঘৃণা করতেন। প্রতিনিয়ত পুলিসি নির্যাতন, বারবার জেলে যাওয়া, অনাহার, অর্ধাহার এমন

কি কমিউনিস্ট ভীতি প্রচারের ফলে বিষিয়ে যাওয়া জনসাধারণের জন্যে প্রথম যুগের কমিউনিস্টদের কাজ অত্যন্ত কঠিন ছিল। আবদুল হালিম এতে কখনও দমে যান নি। আর যেখানেই পার্টির হেড কোয়ার্টার হয়েছে—সেখানেই তিনি পার্টির পতাকা তুলে ধরেছেন। মধ্য কলকাতায় যে ছোট্ট পরিসরে পার্টির হেড কোয়ার্টার ছিল—তাকে হেড কোয়ার্টার বলতে একটু বাঁধে, তা সত্ত্বেও তা ছিল হেড কোয়ার্টারই। তাই যেখানেই যে-নামেই কমিউনিস্টদের হেড কোয়ার্টার থাকুক না কেন—আবদুল হালিম সেখানেই থাকতেন।…

আবদুল হালিমের সঙ্গে পার্টির প্রথম দিকের পত্রিকা 'গণশক্তি' আর বাংলাদেশের পার্টি প্রকাশনা সংস্থার পরিচালক সমিতিতে একসঙ্গে কাজ করেছি বহুদিন, বেশ কয়েক বছর একটানা প্রতিদিন পার্টি অফিসে আসা ছিল অবশ্য কর্তব্য। পার্টির নির্দেশে অন্যত্র না গেলে হালিম সর্বদাই সেখানে থাকতেন। ১৯৫২ থেকে '৬২ সালের নির্বাচনগুলোতে প্রচারের জন্যে হালিমের সঙ্গে তার নিজের জেলায় ঘুরেছি অনেক। অনায়াসলভ্য সততা আর অমায়িকতা সত্ত্বেও হালিম স্বকীয় মতে দৃঢ় ছিলেন। তাঁর চরিত্রের এই দিকটি সকলেই লক্ষ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের কমিউনিস্ট সদস্য হিসাবে তিনি ছিলেন অজাতশত্রু। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন রাজনৈতিক মতামতের লোকেরাও তাকে জানিয়েছিলেন অপরিসীম শ্রদ্ধা, আবদুল হালিম ছিলেন পুরোপুরি কমিউনিস্ট।…

১৯৬২ সালের অক্টোবরে, কলকাতায় পার্টির রাজ্য পরিষদের সভায় আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছিলাম—সীমান্তের ঘটনাবলীতে তিনি কতখানি বিচলিত হয়েছিলেন। নিজের দেশ ভারতবর্ষের জন্যে তাঁর ছিল অপরিসীম ভালোবাসা। কিন্তু ভারত সরকার যে চীনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে ঝামেলা বাড়িয়ে তুলেছিলেন, এমন কথা অস্বীকার করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। যদিও তাঁর বিশ্লেষণ সম্পর্কে আমার মতৈক্য ছিল না তবুও আমি দেখেছি কি ভাবে ভারতের জনগণের স্বার্থের প্রতি তাঁর আনুগত্যকে তিনি শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা সম্পর্কে নিজের ধারণার সঙ্গে মেলাবার চেষ্টা করেছিলেন। আমাদের ছোটখাট একটা বিতর্ক হয়েছিল কিন্তু আমরা পরস্পরকে বোঝাতে পারি নি। কিন্তু আমি দেখেছিলাম—যে নীতির ভিত্তিতে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তগুলো খাড়া করেছিলেন, সেই সিদ্ধান্তগুলি কেউ গ্রহণ না করতে পারেন কিন্তু শ্রদ্ধা না করে পারবেন না।

কলকাতায় তাঁর বন্ধুরা তাঁকে যে বিদায় অভিনন্দন জানালো—তা রাজা-রাজড়াদেরও ঈর্ষা করার মতো। আমি আনন্দিত যে অন্তহীন মিছিল তাঁর দেহাবশেষকে বিশ্রামভূমিতে নিয়ে গিয়েছে, সেই মিছিলে আমি ছিলাম। জনসাধারণের জন্যে সারা জীবন তিনি কাজ করে গিয়েছেন। শবাধারের পেছনে শোকোদ্বেল জনতার মধ্যে তাঁর প্রতি অপরিসীম

শ্রদ্ধা ও ভালবাসায় উজ্জীবিত হয়েছিল তাঁরই মূর্ত প্রকাশ, অজাতশত্রু, জনগণের সেবক ও পথিকৃত, সত্য এবং সৎ একজন মানুষের জীবনের উপর যবনিকা নেমে এলো, তবু যে মশাল তিনি অকম্পিত হস্তে ধরে রেখেছিলেন তার প্রতি লাল সেলাম জানাতে উদ্যত কয়েক সহস্র মানুষের হাতে তা তিনি দিয়ে গেছেন। আবদুল হালিমের স্বপ্ন একদিন সত্য হবেই। মানবজাতির সমগ্র দিগন্ত একদিন লাল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।*

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

সৌরীন্দ্রমোহন

প্রবীন কথা-সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে (১১ই মে, ১৯৬৬) বাংলা সাহিত্যের একটি যুগের সমাপ্তি হল। 'ভারতী' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যগোষ্ঠী বাংলা সাহিত্যকে তাঁদের অজস্র দানে সমৃদ্ধ করেছিলেন সৌরীন্দ্রমোহন ছিলেন তাঁদের মধ্যমণি। শেষপর্যন্ত এই পত্রিকার সম্পাদনার ভার (১৯১৩-৩০) তাঁর উপরই পড়েছিল।

সৌরীন্দ্রমোহনের জন্ম ২৪-পরগণার ইছাপুরে, ১৮৮৪ সনের ৯ই জানুয়ারী। সাহিত্য সাধনার শুরু ছাত্র জীবনেই। ১৯০৪ সালে তিনি কুন্তলীন পুরস্কার পান এবং সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সাহিত্য পত্রিকায় লিখতে শুরু করেন। সরলা দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক নিযুক্ত হন ১৯০৭ সালে।

আইন-ব্যবসায় পেশা হলেও তা তাঁর সাহিত্য-সাধনাকে স্তিমিত করতে পারে নি। জটিলতা না থাকলেও এমন একটা সহজ সরলতা ছিল তাঁর রচনায় যা তাঁকে একদা জনপ্রিয়তার শিখরে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কাল প্রভাবে সে জনপ্রিয়তা অবশ্য কিছুটা ম্লান হয়েছে, কিন্তু 'বাব্‌লা' প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনাগুলিকে বাঙালি সহজে ভুলতে পারবে না।

আমরা তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে জানাই আমাদের শ্রদ্ধা।

দীপ্তেন্দ্রকুমার

সাহিত্যের আসরে দীপ্তেন্দ্রকুমার সান্যালের আবির্ভাব, বলা যেতে পারে, খিড়কীর দরজা দিয়ে। কিন্তু প্রথম আবির্ভাবেই তিনি বাংলা সাহিত্যে নিজের জন্য একটি আসন করে নিয়েছিলেন তাঁর তীক্ষ্ণ রচনাশৈলীর গুণে। তাঁর বক্তব্যের সঙ্গে আমরা কদাচিৎ একমত হতাম কিন্তু তাঁর বলবার ভঙ্গীতে অনেক সময়ই আমোদও পেতাম। অকালে, তাঁর আকস্মিক প্রয়াণে সাহিত্য-সাংবাদিকতার একটি ধারার অবসান হল দীপ্তেন্দ্রকুমার-ই ছিলেন যার প্রবর্তক।

শচীন বসু

* ইংরাজী প্রবন্ধের অংশ বিশেষের তরজমা। অনুবাদ করেছেন সলিল দাশগুপ্ত।

পরিচয়

বর্ষ ৩৫ । সংখ্যা ১১-১২
জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩৭৩

সূচীপত্র

সম্পাদক

সহ সম্পাদক

সম্পাদকমণ্ডলী

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত ।

নিম্নলিখিত পুরনো সংখ্যাগুলি আছে

১৩৫৬ মাঘ, চৈত্র।

১৩৫৭ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন।

১৩৫৮ শ্রাবণ, ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ, মাঘ, চৈত্র।

১৩৫৯ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, ফালগুন।

১৩৬০ জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, চৈত্র।

১৩৬১ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, মাঘ।

১৩৬২ সব সংখ্যা পাওয়া যাবে।

১৩৬৩ শ্রাবণ, শারদীয় ছাড়া অন্য সবগুলি পাওয়া যাবে। মাঘ থেকে বারো আনা, পৌষ (মানিক-স্মৃতি-সংখ্যা) এক টাকা।

১৩৬৪ শ্রাবণ ছাড়া অন্য সব সংখ্যা পাওয়া যাবে।

১৩৬৫ বৈশাখ, শ্রাবণ ছাড়া অন্য সব সংখ্যা পাওয়া যাবে।

১৩৬৬ সব সংখ্যা পাওয়া যাবে।

১৩৬৭ শ্রাবণ ছাড়া সব সংখ্যা পাওয়া যাবে।

১৩৬৮ বৈশাখ, ফালগুন ছাড়া সব সংখ্যা পাওয়া যাবে। ফালগুন সংখ্যা থেকে ১·০০ দাম।

১৩৬৯ শ্রাবণ ছাড়া অন্য সব সংখ্যা পাওয়া যাবে।

১৩৭০ জ্যৈষ্ঠ ছাড়া সব সংখ্যা পাওয়া যাবে।

ও

পরিচয় জয়ন্তী গল্প সংকলন—সাড়ে তিন টাকা

পরিচয়—৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

অশ্রুকুমার সিকদার

ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে 'রাজসিংহ'

"ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত আদর্শ দুরধিগম্য; ইতিহাসের বিশাল সংঘটনের ছায়াতলে আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের চিত্র আঁকিতে হইবে; দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার যোগসূত্রগুলির মধ্যে সম্পর্কটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে ইতিহাসের বিপুলতা, ঘটনাবৈচিত্র্য ও বর্ণসম্পদ ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে, অন্যদিকে আমাদের বাস্তব-জীবনের কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খল, সত্যের কঠোর বন্ধনের দ্বারা ইতিহাসের কল্পনা-প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে; এবং সর্বোপরি উভয়ের মধ্যে মিলনটি সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে—যেন সমস্ত উপন্যাসটির আকাশ বাতাসের মধ্যে একটি নিগূঢ় ঐক্য আনিতে পারা যায়।" এই দুইটি বাক্যের সাহায্যে, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত আদর্শ কত দুরধিগম্য এবং তার বিষয়বস্তু কী তা বোঝাবার প্রয়াস পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে ঐতিহাসিক উপন্যাসের বর্ণনীয় বিষয় হল "হৃদ্‌বিপ্লবের পশ্চাতে রাষ্ট্রবিপ্লবের মেঘাড়ম্বর"। সুতরাং উপন্যাসে ঐতিহাসিক পুরুষের নাম, ঐতিহাসিক তারিখ ও ঘটনার উল্লেখ থাকলেই তা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে গ্রাহ্য হবে না। লেখকের পটভূমিকা হবে অতীত, কিন্তু সেই অতীত এই জাতীয় উপন্যাসে বর্তমানবৎ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে। ইতিহাসে যে ঘটনা অতীতকালের ঘটনারূপে বর্ণিত হয়, ঐতিহাসিক উপন্যাসে সেই ঘটনাই রূপান্তরিত হয় প্রবহমান বর্তমানে। অবশ্য বর্তমানকাল ব্যবহার করাই সব চেয়ে বড় কথা নয়, বস্তুত বর্তমানের পক্ষে তাৎপর্যের ইঙ্গিত ব্যতীত যেমন ইতিহাস রচনা, তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা অসম্ভব। অতীতের সঙ্গে বর্তমানের এই তাৎপর্যময় যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার অর্থ এই নয় যে কাল-অনৌচিত্য

দোষকে প্রশ্রয় দিতে হবে, বা এমন চরিত্রকে স্থান দেওয়া হবে যার মনস্তত্ত্ব বর্ণিতব্য কালের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন। এ কথার অর্থ, এমনভাবে ঐতিহাসিক উপন্যাসে অতীত উপস্থাপিত হবে যেন তাকে বর্তমানের পূর্বগামী বলে উপলব্ধি করা যায় এবং বর্তমান যে-যে কারণে অতীতকে অনিবার্যভাবে অনুসরণ করেছে তার কার্যকারণ পরম্পরা যেন আপনা-আপনি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। একেই হেগেল ইতিহাসের "necessary anachronism" বলেছিলেন।

অতিক্রান্ত কালের ঐতিহাসিক উপখ্যান নতুন করে বলাও ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য নয়, তার প্রধান উদ্দেশ্য ঐতিহাসিক ঘটনায় অংশগ্রহণকারী সমগ্র জনমণ্ডলীকে কাব্যকল্পনার স্পর্শে পুনরুজ্জীবিত করা। বিশেষ ঐতিহাসিক বাস্তব পরিবেশে যে সমস্ত সামাজিক কারণে জনমণ্ডলী ঐভাবে চিন্তা করেছিল, অনুভব ও কাজ করেছিল, পাঠককে সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে নতুনভাবে নিয়ে যাওয়া এই জাতীয় উপন্যাসের উদ্দেশ্য। অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাসের দুইটি দাবি—এক, ঐতিহাসিক নরনারী সম্বন্ধে সত্যরক্ষার দাবি; এবং দুই, যে যুগকে লেখক পটভূমিকা হিসাবে নির্বাচন করেছেন সেই যুগের বাস্তবতা বজায় রাখার দাবি। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ঐতিহাসিক চরিত্রকে যথাসম্ভব অবিকৃত রাখার উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন, "যাহার যে চরিত্র তাহার মূল প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গল্পাংশ সহজ সরল ও সহজে বোধগম্য করিবার জন্য অবান্তর বিষয়ের কিছু কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিলে ইতিহাসের ক্ষতি নাই, সাহিত্যের বিলক্ষণ লাভ।" কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রকে অবিকৃত রাখলেই চলে না, তার সঙ্গে প্রয়োজন যুগের বাস্তবরূপকে অবিকৃত রাখা। শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক শুধু শহর গ্রামের, অস্ত্রশস্ত্র, রীতিনীতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, কুসংস্কার-চিন্তাধারার যথাযথ বহিরঙ্গ বর্ণনায় নিপুণতার প্রমাণ দেবেন না, তিনি যুগের অন্তরঙ্গ প্রকৃতি বা আত্মচেতনাকে জীবন্তভাবে রূপায়িত করবেন, অর্থাৎ জনমণ্ডলীর মধ্যে যে বিরাট বীর্যবান মানবীয় সম্ভাবনা-সমূহ বর্তমান, যে সম্ভাবনাগুলি ঐতিহাসিক কোনো ঘটনায় সামাজিক কোনো বিপর্যয়ে সহসা বিস্ফোরক শক্তি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে, তিনি সেগুলিকে উদ্‌ঘাটিত করবেন, উপস্থাপিত করবেন। বাস্তবিকপক্ষে সামাজিক উপন্যাসে ও ঐতিহাসিক উপন্যাসে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই, প্রথমটি বর্তমানের বাস্তবতা বর্ণনায় বিশ্বস্ত, দ্বিতীয়টি অতীতের বাস্তবতা বর্ণনায় নিষ্ঠাবান।

দুই

ঐতিহাসিক উপন্যাসের এই উচ্চ আদর্শে সম্পূর্ণভাবে সাফল্য অর্জনের বহুবিধ ক্ষমতা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে বর্তমান ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগৃতির অন্যতম ফল জাতীয় চেতনার উন্মেষ, স্বাজাত্যবোধের অনিবার্য ফল জাতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আগ্রহ, জাতির পূর্ব মহিমায় গৌরববোধ এবং অতীতের জাতীয় অবমাননা সম্বন্ধে তীব্র সংবেদনা। উনিশ শতকের নবোন্মেষিত বঙ্গদেশ জাতীয় ইতিহাসের যে প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিল সেই প্রয়োজনবোধকে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধাবলীর মধ্যে ভাষা দিয়েছেন। ভারতবর্ষের, বিশেষভাবে বঙ্গদেশের ইতিহাস নেই বলে তাঁর মনঃক্ষোভের অন্ত ছিল না। তিনি আক্ষেপ করে বলেছেন, "গ্রীনলণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরী জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড় তাম্রলিপ্ত সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধচরিত গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি সে দেশের ইতিহাস নাই।" (বাঙ্গালার ইতিহাস)। তিনি সেই জাতীয় ইতিহাস উদ্ধারের ব্রতে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারেন নি বটে, কিন্তু তার বহুসংখ্যক উপন্যাসের পিছনে ঐতিহাসিক পটভূমিকা ব্যবহার করে তিনি পাঠানযুগ থেকে নবাবী আমল পর্যন্ত বাংলা দেশের ধারাবাহিক ইতিহাসের পরিচয় দেবার যেন চেষ্টা করেছেন। যদিও এই ইতিহাসের ধারা অনেকাংশে কবির চোখে দেখা ইতিহাস, কিন্তু ইতিহাসকে অবিকৃত রাখার প্রয়াসে তথ্যসংগ্রহে তিনি বিমুখ ছিলেন না। যে গুণদ্বয় ট্রেভেলিয়ানের মতে ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের সার্থকতা লাভের প্রধান উপায়—"an historical mind apt to study the records of a period, and a power of creative imagination able to reproduce the perceptions so acquired in a picture that has all the colours of life." সেই গুণদ্বয় বঙ্কিমমানসে প্রচুর পরিমাণে বর্তমান ছিল।

কেউ কেউ মনে করেন ঈশ্বর গুপ্তের নিকট সাহিত্যের শিক্ষানবীশী বঙ্কিমের ইতিহাসচেতনা উন্মেষে সাহায্য করেছিল, "বাংলার অতীত নিয়ে সংবাদ-প্রভাকর সে রকম ঐতিহাসিক গবেষণা করে নি, যদিও একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ করে এবং ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত রচনা করে ঈশ্বর গুপ্ত ইতিহাস-নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন।...ঈশ্বর গুপ্ত ঠিক চিন্তাশীল মনীষী ছিলেন না বলেই বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর মমত্বকে ঠিক

ঐতিহাসিক যুক্তিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। এই অপূর্ণতাটি বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষায় পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল।" (ভবতোষ দত্ত, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র)। পাঠ্যাবস্থায় যে তাঁর সব চেয়ে প্রিয় বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম ছিল ইতিহাস, এ বঙ্কিমের জীবনী থেকে জানা যায়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সাক্ষ্যে আরো জানা যায় বাংলার একটি ইতিহাস লিখে যান, এই বঙ্কিমের একান্ত মনোবাসনা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও 'বিবিধ প্রবন্ধ'-র দ্বিতীয় ভাগের ভূমিকায় লিখেছেন, "এক সময়ে ইচ্ছা করিয়াছিলাম বাঙ্গালার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়া একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিব। অবসরের অভাবে এবং অন্যের সাহায্যের অভাবে সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। অন্যকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য বঙ্গদর্শনে বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।" তাঁর ভারতেতিহাস রচনারও বাসনা ছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই নবীনচন্দ্রকে এক চিঠিতে তিনি এই বাসনা প্রকাশ করেন এবং তাতে তিনি পরিকল্পিত গ্রন্থের এইরূপ বিষয় নির্বাচন করেছিলেন—Character of the Ancient Hindus, Maritime Power and Habits, External Commerce, Manners and Customs (Women and Widow Marriage), Dates of Authors, Wealth of Ancient India, Government Military Power, Arab Expedition, Arab Geographers, Historical and Miscellaneous. একদিকে এই বিষয় তালিকা, অন্যদিকে যখন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালার ইতিহাস' নামক গ্রন্থের তিনি প্রশংসা করে বলেন, "ইহা কেবল রাজাগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকা মাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস" তখন বোঝা যায় ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টি কতদূর আধুনিক ছিল এবং সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পক্ষে তাঁর ইতিহাস সম্বন্ধীয় এই ধারণা কতদূর অনুকূল ছিল। বাংলার সত্যকার ইতিহাস লিখতে গেলে কী কী বিষয়ের বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন তারও একটি তালিকা 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দিয়েছেন। সেই তালিকার মধ্যে একদিকে যেমন রাজ্যশাসন প্রণালী, বিচারপ্রথা ও প্রজাসাধারণের অবস্থার কথা আছে, তেমনি অন্যদিকে সামাজিক অবস্থা, বিবাহ, জাতিভেদ, বাণিজ্যশিল্প, যানবাহনের কথা আছে। এই সমস্ত কারণেই ঐতিহাসিক প্রণালী সম্বন্ধে বঙ্কিমের গভীর উপলব্ধির কথা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেছিলেন। শুধু ঐতিহাসিক প্রণালীই

তাঁর আয়ত্তে ছিল না, যে ইতিহাস-বিবেক না থাকলে নির্লিপ্ত দৃষ্টি দিয়ে ইতিহাস রচনা করা যায় না, সেই বিবেক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র বঞ্চিত ছিলেন না। অনেক উপন্যাসে ঐতিহাসিক পটভূমিকা ব্যবহার করলেও এই বিবেকবান পুরুষ শুধু 'রাজসিংহ'-কেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে দাবি করেছিলেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাই বলেছেন, "বঙ্কিমের ঐতিহাসিক বিবেক (Historical conscience) বা সত্যনিষ্ঠা যে ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকদের অপেক্ষা কম এ কথা মনে করিবার কোনো হেতু নাই।"

তিন

এইরূপ মানসিক প্রস্তুতি এবং মানসিক প্রবণতা নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাস রচনায় বৃত হয়েছিলেন। 'রাজসিংহ' বাস্তবিক ঐতিহাসিক উপন্যাসের দাবি পূরণ করতে পেরেছে কিনা এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হবার পূর্বে লক্ষ করি, বঙ্কিম নিজে এই গ্রন্থটিকে তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস বলে দাবি করায় পরবর্তী সমালোচকগণ বিনা প্রতিবাদে তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দিয়ে আসছেন। অবশ্য অনেক সমালোচকের আলোচনা ও সিদ্ধান্তের মধ্যে যখন স্ববিরোধ চোখে পড়ে তখন সন্দেহ হয় যে 'রাজসিংহ'-কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায় কি না এ-বিষয়ে তাঁরা কেউ কেউ সংশয়াচ্ছন্ন ছিলেন। "রাজসিংহে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে", এই উক্তি সত্ত্বেও শেষপর্যন্ত শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই উপন্যাসকে রোমান্স শ্রেণী-ভুক্ত করেছেন। অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্ত মহাশয় 'বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থে যদিও বলেছেন "ইতিহাস প্রসিদ্ধ চরিত্রকে অযথা প্রাধান্য দিলে এই (অর্থাৎ ঐতিহাসিক উপন্যাসের) আদর্শ ক্ষুণ্ণ হইবার সম্ভাবনা থাকে", তবু বঙ্কিমের দাবি শিরোধার্য করে তিনি 'রাজসিংহ'-কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেছেন। দুর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ সমালোচক আবার 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস কি না এই বিষয়ে আলোচনা করতে যেয়ে, এই উপন্যাসে ঐতিহাসিক তথ্য কতটা নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করা হয়েছে, কোথায়ও সেই তথ্য বিকৃত হয়েছে কি না, এই জাতীয় বাহ্য বিষয়ের অবতারণায় ও অনুসন্ধানে রত হয়েছেন। 'রাজসিংহ'-র ঐতিহাসিকতা বিচারে এই জাতীয় সূত্র ব্যবহারের জন্য দায়ী উক্ত গ্রন্থ সম্বন্ধে বঙ্কিমের নিজের দাবির প্রকৃতি; চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, "স্থূল ঘটনা অর্থাৎ যুদ্ধাদির ফল, ইতিহাসে যেমন আছে, প্রায়

তেমনই রাখিয়াছি। কোনো যুদ্ধ বা তাহার ফল কল্পনাপ্রসূত নহে।··· ঔরঙ্গজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, উদিপুরী, ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি। ইহাদের চরিত্রও ইতিহাসে যেমন আছে, সেইরূপ রাখা গিয়াছে। তবে ইহাদের সম্বন্ধে যে সকল ঘটনা লিখিত হইয়াছে, সকলই ঐতিহাসিক নহে। উপন্যাসে সকল কথা ঐতিহাসিক হইবার প্রয়োজন নাই।" অতঃপর কোন ইতিহাসগ্রন্থ থেকে কোন ঘটনাটি উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন সে সম্বন্ধে এবং গৃহীত ঘটনাগুলির সত্যতা সম্বন্ধে বঙ্কিম এই ভূমিকায় আলোচনা করেছেন।

'রাজসিংহ' রচনাকালে বঙ্কিমের ভিত্তি ছিল টডের রাজস্থান। অর্ম, মান্নুচ্চি ও বার্নিয়েরের বিবরণ। এই দুর্বল ভিত্তির উপর নির্ভর করে যে উপন্যাস রচিত হয়েছিল তাকে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার "বঙ্কিমের পর অর্ধশতাব্দীরও কম সময়ের মধ্যে যে সব ঐতিহাসিক উপাদান আবিষ্কৃত হইয়াছে" তার মানদণ্ডে বিচার করে সিদ্ধান্ত করেছেন "বঙ্কিম কল্পনার বেগে সত্য অতিক্রম করেন নাই, সত্যকে জীবন্ত আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন মাত্র" এবং "তিনি এই গ্রন্থে প্রকৃত ইতিহাসকে লঙ্ঘন করেন নাই।" ঐতিহাসিক তথ্যকে লঙ্ঘন না করার দরুন যদুনাথ সরকার এই গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা দিয়েছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও অনুরূপ কারণে অনুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, "রাজসিংহে ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে। ইহা একটি প্রকৃত ইতিহাস বর্ণিত ব্যাপারেরই বিবৃতি।" উপন্যাসের আভ্যন্তরীণ বিচার না করে, বাইরের ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে উপন্যাসের ঐতিহাসিক বিচারের প্রবণতা অন্যান্য সমালোচকদের মধ্যেও লক্ষিত হয়! যেমন একজন গবেষক লিখেছেন, "আউরঙ্গজেব স্বয়ং রাজপুতদের হাতে লাঞ্ছিত হন নি এইটেই ঐতিহাসিক সত্য। বঙ্কিম জ্ঞাতসারে কোনো তথ্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করেন নি। রাজসিংহ উপন্যাসে যে সব তথ্যবিভ্রান্তি আছে তা বঙ্কিমের ইচ্ছাকৃত নয়; কতকটা তথ্যের বিরলতা, কতকটা বিকৃত ইতিহাস এর জন্য দায়ী।" (বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস)।

এই জাতীয় আলোচনা ঠিক সাহিত্য-সমালোচনা কিনা এই প্রশ্ন আপাতত মুলতবী রাখলেও, এই শ্রেণীর আলোচনার অন্য কয়েকটি গুরুতর দুর্বলতার কথা না বললে চলে না। সর্বক্ষণ বহু সংখ্যক ঐতিহাসিক জাতীয় ইতিহাসের তথ্যসন্ধানে নিযুক্ত রয়েছেন। কোনো এক বিশেষ সময় পর্যন্ত আবিষ্কৃত সমস্ত

তথ্যকে আত্মসাৎ করে, নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হলেও, পরবর্তীকালের গবেষণার ফলে নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হলে, এই জাতীয় অতি-তথ্যনির্ভর ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা অনেকাংশে মিথ্যা হয়ে যায়—অবশ্য যদি ঐতিহাসিক উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা বিচারের এই সূত্র স্বীকার করে নেওয়া যায়। অথচ আমরা জানি, সাহিত্যের সত্য নিজ পরিধির মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, বাহ্য তথ্যের মূল্যবিচারে পরিবর্তন সেই সত্যকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে না। অতীতের রীতিনীতি, পোশাক পরিচ্ছদ, সমাজ-রাষ্ট্র-পরিবার জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটি তথ্যকে যথাযথভাবে সংগ্রহ করে, সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংগ্রহের ফলকে পূর্ণ আনুগত্যে অনুসরণ করে যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়, এবং এই জাতীয় তথ্যের উপর নির্ভর করে উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা বিচার করে যে সমালোচনা, তাকে পূর্ব ইউরোপের বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ও নন্দনতাত্ত্বিক জর্জ লুকাচ্ "decorative caricature of historical faithfullness", "mere costumery" ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। এই জাতীয় উপন্যাসের দুর্বলতা নাচারালিস্টিক বা প্রকৃতিবাদী উপন্যাসের দুর্বলতার তুল্য। ফোটোগ্রাফি যে কারণে শিল্প হিসাবে অঙ্কিত চিত্রের তুল্য নয়, প্রকৃতিবাদী উপন্যাস যে কারণে তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা সত্ত্বেও বাস্তববাদী উপন্যাসের তুল্য নয়, ঠিক সেই কারণে যে উপন্যাস শুধু বাহ্য ঐতিহাসিক তথ্যকে অন্ধনিষ্ঠায় অনুসরণ করে সেই উপন্যাস যুগ-আত্মা রূপায়ণকারী বাস্তব-ধর্মী ঐতিহাসিক উপন্যাসের তুল্য নয়। সুতরাং, প্রথমত নবাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্যের মানদণ্ডে পুরাতন তথ্যের ভিত্তিতে লিখিত উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা আলোচনা অসঙ্গত। তা করলে পৃথিবীর কোনো ঐতিহাসিক উপন্যাসই শেষ পর্যন্ত সেই মর্যাদায় অক্ষুণ্ণ থাকবে না। রবীন্দ্রনাথও এই বিষয়ে সমীচীন প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, কবে জানা যাবে যে একটা বিষয় সম্বন্ধে ইতিহাসবেত্তাদের শেষতম কথা বলা হয়ে গেল? কোনোদিনই না। তাই এই প্রসঙ্গে জনৈক লেখক যথার্থ উক্তি করেছেন, "কী ইতিহাস বঙ্কিম পরিবেশন করেছেন সেটা বিবেচ্য নয়,—কী পদ্ধতিতে ইতিহাসের মূলসুরকে তিনি মানবজীবনের ব্যক্তি স্বরূপের সঙ্গে মিলিয়েছেন—সেটাই বিচার্য।" (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা উপন্যাসের কালান্তর)। দ্বিতীয়ত, তাৎপর্যময় ও অকিঞ্চিৎকর নির্বিশেষে তথ্যের প্রতি অন্ধ আনুগত্য ঐতিহাসিক উপন্যাসকে প্রকৃতিবাদী উপন্যাসের নিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনে। অথচ সত্যকার

ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তববাদী উপন্যাসেরই উত্তরাধিকারী—তার লক্ষ্য "an artistically faithful image of a concrete historical epoch" (লুকাচ্) পরিস্ফুট করে তোলা। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাস কিনা তার বিচারের মাপকাঠি হিসাবে তথ্যনিষ্ঠা ব্যবহার না করে, অন্য উপযুক্ত মাপকাঠি ব্যবহার করা উচিত।

আমার মনে হয়, হাঙ্গারিদেশীয় মার্কসবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক লুকাচ্ তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাস (Historical Novel) গ্রন্থে ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে মৌলিক সূত্রগুলি প্রস্তাব করেছেন সেগুলি উপযুক্ত মাপকাঠির সন্ধানে আমাদের মনোযোগ দাবি করতে পারে। মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্য বিচারের অভ্রান্ত বা সর্বোত্তম পদ্ধতি কিনা সে বিষয়ে মতভেদের যথেষ্ট অবকাশ থাকতে পারে। কিন্তু অন্য ক্ষেত্রে যাই হোক, বিশেষভাবে উনিশ শতকের বাস্তববাদী সাহিত্যের বিচারে মার্কসবাদী সাহিত্যতত্ত্বের পদ্ধতি সার্থকভাবে প্রযুক্ত হতে পারে দুই কারণে। প্রথমত, মার্কসবাদ সাহিত্যাদর্শ হিসাবে বাস্তববাদে বিশ্বাসী এবং দ্বিতীয়ত, বাস্তববাদী উপন্যাস যেমন অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবেশের ফল তেমনি মার্কসবাদও সেই একই পরিবেশ থেকে উদ্ভূত। এই সাহিত্যতত্ত্ব ঐ শতাব্দীর সাহিত্য বিষয়ে কতদূর সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে, 'ইউরোপীয় বাস্তবতা' নামক গ্রন্থে লুকাচ তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রমাণ রেখে গিয়েছেন। বর্তমান শতাব্দীতে যিনি উনিশ শতকী ঔপন্যাসিকের সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী সেই টোমাস মানের আলোচনায় তিনি একই মাপকাঠি ব্যবহার করে কুশলতা ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। আবার এই সাহিত্যাদর্শের সীমাবদ্ধতাও ধরা পড়ে যখন সমকালীন বাস্তবতার আলোচনায় কাফকা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য এবং জয়স সম্বন্ধে তাঁর প্রকট অনীহার কথা পড়ি। এই সীমাবদ্ধতা মনে রেখেও বলা যায়, ঐতিহাসিক উপন্যাস যেহেতু বাস্তববাদী উপন্যাসেরই অন্তর্গত একটি ধারা, সেই কারণে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে, আরো বিশেষ করে উনিশ শতকে রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে, এই সাহিত্যতত্ত্বের বিচারপ্রণালী সর্বাধিক প্রযোজ্য। কারণ মার্কসবাদের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ এবং রাজনৈতিক কার্যক্রম যাঁরা সমর্থন করেন না তাঁরাও স্বীকার করেন, তথাকথিত ঐতিহাসিক determinism বাদ দিলে মার্কসবাদী ইতিহাসতত্ত্বের অনেকটাই গ্রহণযোগ্য। বস্তুত, মার্কসবাদী ইতিহাসতত্ত্ব বর্তমানকালের ইতিহাস রচনা-পদ্ধতিকে

বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে। তাই ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্বন্ধে এই সাহিত্যাদর্শ যে মৌলিক সূত্রগুলির কথা বলে সেগুলি অবশ্যই অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনাযোগ্য।

চার

'রাজসিংহ'-র উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি মন্তব্য পাই—"অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে—হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই—হিন্দু হউক, মুসলমান হউক, সেই নিকৃষ্ট। ঔরঙ্গজেব ধর্মশূন্য, তাই তাঁহার সময় হইতে মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইল। রাজসিংহ ধার্মিক, এজন্য তিনি ক্ষুদ্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া মোগল বাদশাহকে অপমানিত ও পরাস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। ইহাই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য।" চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় আবার বঙ্কিম বলেছেন, "হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য। উদাহরণস্বরূপ আমি রাজসিংহকে লইয়াছি।" এই সব মন্তব্য থেকে অনুমান করা যায় যে, বঙ্কিমের পরবর্তী বয়সের অন্যান্য উপন্যাসের মত 'রাজসিংহ' উপন্যাসও আদর্শমূলক, উদ্দেশ্যমূলক —নির্লিপ্তভাবে যুগবাস্তবতাকে চিত্রণ অপেক্ষা বিশেষ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করাতেই তিনি অধিক উৎসাহী ছিলেন। পূর্বনির্দিষ্ট একটি উদ্দেশ্য বা একটি ছক সামনে রেখে লিখলে যেমন ইতিহাসের অপক্ষপাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তেমনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের বাস্তবতা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা থাকে। অথচ পূর্বেই বলেছি, সত্যকার ঐতিহাসিক উপন্যাস বাস্তববাদী উপন্যাসেরই উত্তরাধিকারী। অবশ্য জীবন বা ইতিহাস সম্বন্ধে একটি পূর্বনির্দিষ্ট ধারণা থাকলে বাস্তবতা লঙ্ঘিত হবেই এমন কথা সব সময় সত্য নয়। তাছাড়া নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যতিরেকে শিল্পীর শিল্পসৃষ্টিও সম্ভব নয়। ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁর স্বকীয় যে মতবাদের কথা 'যুদ্ধ ও শান্তি' (ইংরেজী নাম 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস্') উপন্যাসের শেষে টলস্টয় বিস্তারিতভাবে বলেছেন বাস্তববাদী ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার পক্ষে তার সবটুকুই অনুকূল নয়। অথচ সেই উপন্যাসটি একই সঙ্গে ঐতিহাসিক ও বাস্তববাদী উপন্যাসের একটি সর্বোত্তম উদাহরণ। টলস্টয়ের এই উপন্যাসে বাস্তবতা অক্ষুণ্ণ থাকার কারণ, তাঁর বাস্তববাদী শিল্পপ্রতিভা তাঁর তাত্ত্বিকতা ও মতবাদকে উপেক্ষা করে জয়ী হতে পেরেছে। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

সুনির্বাচিত ঘটনা-উপঘটনার মাধ্যমে রুশ সৈন্যবাহিনী ও রুশ জনসাধারণের মনোভাবকে জীবন্ত রূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন। এরূপ আর একজনের কথাও জানি—রাজতন্ত্রবাদে বিশ্বাসী বালজাকের রাজনৈতিক মতবাদ তাঁর উপন্যাসের বাস্তবতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। কিন্তু যেখানে শিল্পীর তাত্ত্বিকতা বা উদ্দেশ্য উপন্যাসকে আচ্ছন্ন করে, উপন্যাসের অভ্যন্তর থেকে উদ্দেশ্যের আত্ম-প্রকাশ না হয়ে বাইরে থেকে উদ্দেশ্য আরোপিত হয়, সেখানে বাস্তবতাধর্ম বজায় রাখা যায় না। বঙ্কিমের 'রাজসিংহ' উদ্দেশ্যমূলক হওয়ায় এই দুর্বলতার বীজ সেই উপন্যাসে রয়ে গেছে।

ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের আদর্শস্থানীয় স্কটের উপন্যাসের আলোচনা করতে যেয়ে লুকাচ্ বলেছেন, "Scott's historical novel is the direct continuation of the great realistic social novel of the eighteenth century." তাঁর মতে স্কট, বালজাক, টলস্টয়ের মত সত্যকার ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের রচনায় থাকে, এঙ্গেলস্ যাকে বলেছেন, "triumph of realism"। বাস্তবতার অর্থ, একই সঙ্গে সূক্ষ্ম জটিল ও স্বাতন্ত্র্যময় জগৎ সৃষ্টি করা, এবং তারই মধ্য দিয়ে স্পষ্ট করে দেওয়া যে, এই বিচিত্র বহুমুখী বহিঃপ্রকাশ সত্ত্বেও সমগ্র মানব-নিয়তির একটি অন্তর্লীন ঐক্যময় ভিত্তি বর্তমান। চরিত্রগুলির স্বতন্ত্র নিজস্ব গুণাগুণ ও তাদের পৃথক নিয়তির সঙ্গে অপৃথক সামাজিক-অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটের একটি গূঢ় জটিল সামঞ্জস্য প্রতিষ্ঠা করাই স্বাভাবিক ও অকৃত্রিম বাস্তবতার প্রধান কাজ। বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপন্যাসের যে বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছিলেন তা এই বাস্তবতা বজায় রাখার পক্ষে বিশেষ অনুকূল ছিল। বিশ্ব-ইতিহাসের বৃহত্তম ঘটনাগুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসে বাস্তব-সততার সঙ্গে রূপায়িত করা কঠিন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে যে সব ঐতিহাসিক ঘটনা মোটের উপর অপ্রধান সেগুলি অবলম্বনে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করলে বাস্তবতা রক্ষার দুরূহ আদর্শে যেমন সহজে সফল হওয়া যায়, তেমনি অপ্রধান ঘটনার মুকুরে প্রধান ঐতিহাসিক নিয়তিকে ইঙ্গিতে প্রতিবিম্বিত করা যায়। যেমন স্তাঁদাল পার্মার ক্ষুদ্র রাজ্য অবলম্বনে বিশ্বস্ত বাস্তবতায় বৃহত্তর ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বকে রূপায়িত করেছিলেন। ক্ষুদ্র মেবারের সঙ্গে মোগল শক্তির বিরোধের মধ্য দিয়ে মোগল সাম্রাজ্যের অবক্ষয় ও আসন্ন পতনকে বঙ্কিম রূপায়িত করতে পারতেন। কিন্তু বঙ্কিম উপযুক্ত বিষয়বস্তু নির্বাচন করেও তার সদ্ব্যবহার করতে পারেন নি, বাস্তবতাগুণ রক্ষায় যথোচিত

নিষ্ঠা দেখান নি বলে। 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে উক্তি করেছেন তার থেকে আমরা এই উপন্যাসের বাস্তবতাগুণের অভাব উপলব্ধি করি—"অনাবশ্যক কেন, অনেক আবশ্যক ভারও (বঙ্কিম) বর্জন করিয়াছেন, কেবল অত্যাবশ্যকটুকু রাখিয়াছেন মাত্র।...সেইজন্য রাজসিংহ পড়িতে পড়িতে মনে হয় সহসা এই উপন্যাসজগৎ হইতে মাধ্যাকর্ষণশক্তির প্রভাব যেন অনেকটা হ্রাস হইয়া গিয়াছে।" মাধ্যাকর্ষণশক্তি হ্রাস পেয়েছে এই কথার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে বাস্তবতাগুণের অভাবের দিকেই রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করেছেন। "রাজসিংহে বিবৃত ঘটনাগুলি এতই বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষক যে, পাঠকের মন চরিত্র-বিশ্লেষণের দাবি করিতে ভুলিয়া যায়;—দৃশ্যের পর দৃশ্য দ্রুতবেগে পরিণতির দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে, কোথাও অনাবশ্যক বাহুল্য নাই, কোথাও গতিবেগ মন্থর হইয়া আসে নাই, কোথাও কেন্দ্রাভিমুখী রেখা হইতে তিলমাত্র বিচ্যুতি হয় নাই।" এই কারণেই শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন, এই উপন্যাসে "উপন্যাসোচিত গুণের অপেক্ষাকৃত অভাব লক্ষিত হইবে।" বঙ্কিমচন্দ্র দ্রুতগতিতে চোরাবালির উপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ায় তাঁর পদস্খলন হয় নি, এই কথা বলে যদিও জনৈক সমালোচক সমস্যা এড়াতে চেয়েছেন, তথাপি তিনিও স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, "উপন্যাসের বহু গ্রন্থিই অবিশ্বাস্যতার চোরাবালিতে আবৃত; যথা, মাণিকলালের কীর্তি-কলাপ, নির্মলের মুঘল রাজপ্রাসাদে প্রবেশ, মাণিকলাল কর্তৃক মবারকের পুনর্জীবন দান, ছদ্মবেশে মবারকের বাদশাহী সৈন্যশিবিরে গমন, যুদ্ধক্ষেত্রে দরিয়ার আবির্ভাব, ইত্যাদি ইত্যাদি। যে-কোনো মুহূর্তে যে কোনো গ্রন্থি ছিঁড়িয়া কাহিনী টুকরা টুকরা হইয়া যাইতে পারিত।" (অরবিন্দ পোদ্দার, বঙ্কিমমানস)। ইউরোপীয় বাস্তবতা বিষয়ক গ্রন্থে লুকাচ্ বলেছিলেন, "realism means three-dimensionality", সেই বাস্তবতার তৃতীয় মাত্রার অনুপস্থিতি 'রাজসিংহ'-কে উপন্যাসোচিত বেধ বা ঘনত্ব দিতে পারে নি। বাস্তবতার একটি প্রধান লক্ষণ কার্যকারণ-পরম্পরাসূত্রের স্বীকৃতি। বস্তুত কার্যকারণ সূত্রের কঠিন শৃঙ্খলের উপস্থিতি-অনুপস্থিতির উপর কোনটি বাস্তববাদী উপন্যাস ও কোনটি রোমান্স তা নির্ভর করে। বাস্তববাদী উপন্যাসে যে আকস্মিক ঘটনা আদৌ থাকে না তা অবশ্য নয়, সেখানে কিন্তু আকস্মিকতাও কার্যকারণ-পরম্পরার অনিবার্যতা লাভ করে। বালজাক প্রসঙ্গে লুকাচ্ এই কথাই বলেছেন,—"he saw more clearly than

anyone else before him the infinite net of chance which formed the precondition of his necessity." বঙ্কিমের রোমান্স-জাতীয় রচনায় যে আকস্মিক ঘটনার পরম্পরা লক্ষ করি, যে আকস্মিকতা সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের মুগ্ধ ও হতচকিত করে, সেই জাতীয় আকস্মিক ঘটনা 'রাজসিংহ' উপন্যাসেও অবিরল, এবং তার মধ্যে বালজাক-সুলভ অনিবার্যতা নেই। সুকুমার সেন মহাশয় 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে যদিও একবার বলেছেন, "রাজসিংহ বঙ্কিমের একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস," তিনিও স্ববিরোধকে প্রশ্রয় দিয়ে অন্যত্র তাই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন, "বঙ্কিমের সব উপন্যাসই রোমান্সজাতীয়, কাহিনী ইতিহাসের পৃষ্ঠা হইতে সংকলিত হোক অথবা ভদ্র বাঙালীর সংসার হইতে আহৃত হোক।" 'রাজসিংহ' উপন্যাসে এক দিকে যেমন বাস্তবের মাটির টান বা মাধ্যাকর্ষণশক্তির অভাব, তেমনি অপর দিকে কার্যকারণ-পরম্পরারও বেশ অভাব—এই দুই অভাব প্রকারান্তরে একই অভাবের দুই স্বতন্ত্র পিঠ।

প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে জাতীয় চরিত্রকে নায়ক হিসাবে মনোনীত করা হয় বঙ্কিমচন্দ্র 'রাজসিংহ'-এ সেই জাতীয় চরিত্রকে নায়কপদে অভিষিক্ত করেন নি। ঐতিহাসিক উপন্যাসের বিশিষ্ট লক্ষণ তার নায়ক চরিত্রগুলির অনৈতিহাসিকতা এবং তাদের পশ্চাতে এক বা একাধিক ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চরিত্র ও ঘটনা। স্কটের উপন্যাসে ঐতিহাসিক ব্যক্তিরা নায়কপদ লাভ না করে অপ্রধান অংশ অধিকার করেছে এবং কাল্পনিক ব্যক্তিরাই নায়কের মর্যাদা লাভ করেছে। স্কট ঐতিহাসিক উপন্যাসের অন্যতম মৌলিক লক্ষণ হিসাবে উপন্যাসের মধ্যে ঐতিহাসিক চরিত্রকে প্রধান স্থান না দেওয়ার ঔচিত্যের কথা উল্লেখ করেছেন—"it is not desirable to have real historical figures among the leading characters". ঐতিহাসিক প্রখ্যাত পুরুষকে উপন্যাসের নায়কপদে অধিষ্ঠিত করার যে রোমান্টিক প্রথা উগো প্রভৃতি অনুসরণ করেছিলেন, পুশ্‌কিনও সেই প্রথার বিরোধিতা করেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসে, বিশেষ করে স্কটের উপন্যাসে ঐতিহাসিক চরিত্রকে অপ্রধান স্থান দেওয়ার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দুইটি কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। "প্রথমতঃ ঐতিহাসিক চরিত্র পাঠকের বিশেষ পরিচিত বলিয়া, তাহাদিগকে কল্পনার সাহায্যে রূপান্তর করার পক্ষে বিশেষ বাধা আছে; ঔপন্যাসিকের

রুচি ও আদর্শ অনুযায়ী তাহাদিগকে পরিবর্তিত করা চলে না।...দ্বিতীয়তঃ প্রত্যেক যুগেরই সাধারণ জীবন, রীতিনীতি ও আচারব্যবহার সম্বন্ধে স্কটের জ্ঞান এত ব্যাপক ও গভীর ছিল যে, প্রত্যেক শতাব্দীরই বিশেষ প্রাণস্পন্দন তিনি এতই সূক্ষ্ম সহানুভূতির সহিত ধরিতে পারিতেন যে, সমাজচিত্রের কেন্দ্রস্থলে রাজাকে স্থাপন করার তাঁহার প্রয়োজন হইত না।"

ঐতিহাসিক অনন্যসাধারণ চরিত্র নায়ক না হয়ে কল্পিত মাঝারি ধরনের চরিত্র কেন ঐতিহাসিক উপন্যাসের নায়ক হয় তার আরো গভীরতর মৌলিক কারণ লুকাচ্ উল্লেখ করেছেন। কোনো প্রধান ঐতিহাসিক পুরুষ নায়ক হলে সেই ঐতিহাসিক উপন্যাসে সমাজের উপরের স্তরের রাজনৈতিক ঘটনাচক্রগুলি রূপায়িত হয় বটে, কিন্তু সেই যুগের নিম্নস্তরে যে সাধারণ মানুষ—তাদের জীবন উপন্যাসে উপেক্ষিত হবার সম্ভাবনা থাকে। অথচ সেই যুগ নিয়েই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হতে পারে, যে যুগে ইতিহাস হয় "mass experience"-এর বিষয়, ঐতিহাসিক ঘটনা যে যুগে সমাজের প্রত্যেক স্তরে প্রভাব বিস্তার করে বা সমাজের সর্বস্তরের গূঢ় আন্দোলন যে যুগে ঐতিহাসিক ঘটনায় চূড়ান্ত আত্মপ্রকাশ পায়। একমাত্র সেই যুগেই সর্বশ্রেণীর মানুষ উপলব্ধি করে, "their own existence as something historically conditioned" (লুকাচ্)। সেইরূপ যুগকে সক্রিয় পটভূমিকা হিসাবে ব্যবহার করে ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেখাতে হয় উপরের রাজনৈতিক ঘটনাচক্র নিম্নতম স্তরে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করছে, আবার নিম্নতম স্তরের সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কীভাবে উচ্চতম স্তরের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্দেশ্য যেহেতু অতীতের বিশেষ যুগের সর্বস্তরের বাস্তবচিত্র রূপায়ণ সেই কারণে মাঝারিধরনের গড়পড়তা একজন মানুষকে নায়ক মনোনীত করলে সেই সর্বস্তরব্যাপী বাস্তবতারক্ষার উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়। বস্তুত বাস্তবতার দাবি পূরণ করার জন্যই এই জাতীয় উপন্যাসে নায়ক হন অনৈতিহাসিক মধ্যস্তরভুক্ত কল্পিত ব্যক্তি। মধ্যবর্তী এই নায়ক সমাজের উচ্চনিম্ন দুই কোটির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং সেইজন্য তার মধ্য দিয়ে সমগ্র সমাজের "extreme, opposing forces can be brought into a human relationship with one another" (লুকাচ্)। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের আদর্শস্থানীয় স্কটের ঐতিহাসিক-সামাজিক টাইপচরিত্রকে

জীবন্ত মানবরূপ দেবার প্রতিভা ছিল এবং তিনি ইতিহাসের দ্বন্দ্ব এবং বিরোধসমূহ সেই সমস্ত কল্পিত অনৈতিহাসিক চরিত্রের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছেন যারা সামাজিক প্রবণতা ও ঐতিহাসিক শক্তিসমূহের প্রতিনিধিত্ব করে। এইরূপ চরিত্রকে নায়ক নির্বাচনের প্রধান কারণ আঠারো-উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ ইংরেজি সামাজিক উপন্যাসের মতো সত্যকার ঐতিহাসিক উপন্যাসেও বস্তুত জীবনই নায়ক—সেই জীবনপ্রবাহকে স্বরূপ দেবার প্রয়োজন থেকেই এই জাতীয় নায়কনির্বাচন অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে সমাজের উচ্চতম স্তরের মানুষ রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেব প্রধান চরিত্র হওয়ায় আমরা উচ্চস্তরের রাজনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাতের পরিচয় পাই, কিন্তু ঐতিহাসিক সংঘর্ষের পিছনে যে বিপুল সামাজিক শক্তিসমূহের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাই না। এখানে যুদ্ধ, সৈন্যসংস্থান, চক্রান্তজাল বর্ণনায় লেখক নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু যে সামাজিক ঐতিহাসিক শক্তির সংঘর্ষ এই যুদ্ধ ও চক্রান্তের মধ্যে দিয়ে চরমরূপ লাভ করেছে সেই সক্রিয় সামাজিক শক্তির কোনো বাস্তবানুগ চিত্র দেন নি। ফলে এই কারণেও, এই উপন্যাসের বাস্তবধর্ম অসম্পূর্ণ থেকে গেছে।

পাঁচ

অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেবকে প্রধান চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই বাস্তব অসুবিধার বাধ্যবাধকতার কথা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় চমৎকার ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। "বিভিন্ন যুগের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে আমরা এতই অজ্ঞ যে, আমোদের মধ্যে এক যুগ হইতে অপরের ভেদরেখা অতি ক্ষীণ ও অস্পষ্ট। সুদূর হিন্দু অতীতের কথা ছাড়িয়া দিলেও, এমন কি মুসলমান অধিকারের পরেও কোনো শতাব্দীরই বিশেষরূপ সম্বন্ধে, সামাজিক জীবনের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আমাদের বেশ স্পষ্ট ধারণা নাই।...আমাদের অতীত ইতিহাসের কোনো অধ্যায়কে মনশ্চক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত করিবার একমাত্র উপায় তৎকালীন রাজার নামের দিকে দৃষ্টিপাত করা; উপন্যাসবর্ণিত ঘটনা কোন যুগে ঘটিয়াছিল তাহার সম্বন্ধে ধারণা করার একমাত্র উপায় সেই সময়ের শাসনকর্তার কালনির্ধারণ—সে সময় রাজা কে ছিল—আকবর, জাহাঙ্গীর, আউরঙ্গজেব, সিরাজদ্দৌলা, কি মীরকাসিম এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা; আভ্যন্তরীণ প্রমাণের দ্বারা

কিছুই জানিবার উপায় নাই। এইজন্যই বঙ্গসাহিত্যে যাঁহারা প্রকৃত ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিবার ভার গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই কার্যের কঠোর দায়িত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহারা অধিকাংশ স্থলেই রাজা ও সম্রাটজাতীয় পুরুষকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের কল্পনার জাল বুনিয়াছেন।"

পূর্বেই বলেছি, যে-যুগে ইতিহাসের বেগ ও ঘটনা সর্বসাধারণের অভিজ্ঞতার বিষয় হয়—যখন ইতিহাসের ঘূর্ণাবর্ত উচ্চতম থেকে নিম্নতম শ্রেণীর সকল মানুষকে অনিবার্যভাবে আকর্ষণ করে—একমাত্র সেই যুগকে অবলম্বন করেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হতে পারে। নেপোলিয়নের উদয়াস্ত ইউরোপ-খণ্ডের সর্বস্তরের মানবসম্প্রদায়ের অভিজ্ঞতার বিষয় হয়েছিল বলেই তাকে কেন্দ্র করে টলস্টয়ের 'যুদ্ধ ও শান্তি' রচিত হতে পেরেছিল। কিন্তু আমাদের অবস্থা স্বতন্ত্র। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায়, "ইতিহাস কোনোদিনই আমাদের সাধারণ সামাজিক জীবনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; এবং গুরুতর রাজনৈতিক পরিবর্তন ও রাষ্ট্রবিপ্লবের মধ্যেও আমাদের দৈনন্দিন জীবন নিজ শান্ত, অপরিবর্তিত প্রবাহ রক্ষা করিয়াছিল।" রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক ঘটনা যেহেতু ভারতবর্ষীয় সমাজের উপরতলকে মাত্র স্পর্শ করেছে, নিম্নতল যেহেতু রাজবংশের পরিবর্তনে, যুদ্ধবিগ্রহে মোটামুটি নির্লিপ্ত থেকে গেছে, সেই কারণে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করতে যেয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবত উচ্চনিম্ন দুই স্তরের মধ্যে যোগসূত্র বজায় রাখার জন্য কোনো মধ্যবর্তী অনৈতিহাসিক চরিত্রকে নায়কপদে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজন বোধ করেন নি। ঐতিহাসিক পরিবর্তন যেহেতু আপাতদৃষ্টিতে অন্তত সমাজের উচ্চতম স্তরকেই প্রভাবিত করত, সেই কারণে ভারতীয় ইতিহাসের ও সমাজের প্রকৃতিতে নিরুপায় হয়ে সম্ভবত, বঙ্কিম উচ্চতম স্তর থেকে রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেবকে নিয়ে প্রধান পুরুষের মহিমা দিয়েছিলেন।

এই বাস্তব কারণগুলি, না বঙ্কিমের মানসিক প্রবণতা প্রখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্রকে নায়কপদে মনোনয়নের জন্য দায়ী, তা নির্ণয় করা সহজ নয়। তবে কাল্পনিক মধ্যবর্তী শ্রেণীর মানুষকে না করে ঐতিহাসিক পুরুষকে 'রাজসিংহ' উপন্যাসে প্রধান চরিত্র হিসাবে গ্রহণ করার পিছনে বাস্তব বাধার সঙ্গে ইতিহাস সম্বন্ধে বঙ্কিমের স্বকীয় ধারণা কিছু পরিমাণে কাজ করেছে বলে মনে হয়। টলস্টয় তাঁর 'ওয়ার এ্যাণ্ড পীস' উপন্যাসের এপিলোগের দ্বিতীয় খণ্ডে মন্তব্য

করেছেন, "it would seem impossible to continue studying historical events, merely as the arbitrary products of the free will of individual men." ইতিহাসের নিয়ামক সামাজিক-অর্থনৈতিক শক্তিসমূহ, অসাধারণ কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা বা স্বাধীন ইচ্ছা নয়। ঐ অংশে আরো বিস্তারিত আলোচনা করতে যেয়ে তিনি প্রথমেই বলেছেন, "The subject of history is the life of people and of humanity." প্রাচীনদের মতে, ইতিহাসের নিয়ামক ঈশ্বর। তদানীন্তন আধুনিকদের মতে, ব্যক্তি। জীবনচরিতমূলক ঐতিহাসিকদের মতে বীরেরাই ইতিহাসের নিয়ামক, ইতিহাসের গতির উৎস। সংস্কৃতিমূলক ঐতিহাসিকেরা আবার চিন্তানায়কদের মননচিন্তাকেই ইতিহাসের নিয়ামক বলে গণ্য করেন। এই মতগুলির ভ্রান্তি, দুর্বলতা ও পরস্পরবিরোধিতা এই অংশে টলস্টয় আলোচনা করেছেন। কোনো শক্তিধর পুরুষকেই তিনি ইতিহাসের নিয়ন্তা বলতে প্রস্তুত নন। কারণ সমগ্র জাতির জীবন মুষ্টিমেয় নেতার মধ্যে বিধৃত হয়েছে এমন দাবি করা চলে না; যেহেতু সেই মুষ্টিমেয় নেতা ও সমগ্র জাতির মধ্যে সম্বন্ধসূত্রটি আজো আবিষ্কৃত হয় নি। জতির যৌথ-ইচ্ছা ঐতিহাসিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে মূর্ত হয়, জাতি ও জাতীয় নেতার মধ্যে এই সম্বন্ধসূত্র একটি আনুমানিক তত্ত্বমাত্র। বরং টলস্টয় মনে করেন, "Examining the events themselves, and that connection in which the historical characters stand with the masses we can find that historical characters and their commands are dependent on the events." এই উপলব্ধি সক্রিয় ছিল বলেই 'যুদ্ধ ও শান্তি' উপন্যাসে নেপোলিয়ন বা কুটুজভকে ঐতিহাসিক ঘটনাবেগের নিয়ন্তা মনে হয় না, বরং মনে হয় উভয়েই ঐতিহাসিক ঘটনাবর্তের নিজস্ব গতির দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত। স্কটের উপন্যাসের এপিকধর্ম বিষয়ে মন্তব্য প্রসঙ্গে বেলিন্স্কিও বলেছেন, এপিকের মতো ঐতিহাসিক উপন্যাসেও ব্যক্তি ঘটনাবর্তের অধীন। ইতিহাসের জনপ্রবাহকে তাহলে বেগ দেয় কোন শক্তি সে সম্বন্ধেও টলস্টয়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:—"by the activity of all men taking part in the event, who are combined in such a way that those who take most direct part in the action take the smallest share in responsibility, and vice versa..." কিন্তু 'রাজসিংহ' উপন্যাস পাঠ

করলে মনে বিপরীত ধারণার সৃষ্টি হয়। এখানে সমস্ত ঘটনাচক্রের উৎস দুই ব্যক্তি—রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেব। তাঁরা যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ ঐতিহাসিক শক্তিসমূহের প্রতিনিধি এবং তাঁদের বিরোধ যে নৈর্বক্তিক ঐতিহাসিক শক্তিসমূহের বিরোধ, একথা অনুভূত হয় না। এখানে ব্যক্তি-সমীকরণ নিঃসন্দেহে অনুচিত প্রাধান্য পেয়েছে। রাজপুত ও মোগলের সংঘর্ষের ঐতিহাসিক কারণ উপন্যাসের বাইরে এবং অভ্যন্তরে যে পরিমাণে লেখক কর্তৃক কথিত হয়েছে (যেমন পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে), সেই পরিমাণে উপন্যাসে রূপায়িত হয় নি। চঞ্চলকুমারী-হরণ জনিত যুদ্ধকে মোগল-রাজপুত বা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের একটি অংশ হিসাবে দেখানো হয় নি, তাই মনে হতে থাকে এ বিরোধ যেন রাজপুত্রীকে নিয়ে রাজসিংহ ও ঔরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত বিরোধ। বস্তুত এক স্থানে রাজসিংহ চঞ্চলকুমারীকে বলেছে, "এই দেখ, তুমি এখনও আমার ভার্যা হও নাই, তথাপি তোমার জন্য ঔরঙ্গজেবের সঙ্গে আমার বিবাদ বাধিয়াছে।" উপন্যাসের উপসংহারে মনে হতে থাকে যেন ঔরঙ্গজেবের এই পরাজয় নিতান্ত সাময়িক ব্যাপার। এই যুদ্ধ যে মোগলসাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম সূচনা, তার মধ্যে যে রাষ্ট্রীয় সংকটের পূর্বগামিনী ছায়া সম্পাতিত, তা মনে হয় না, যদিও যোধপুরীর ভক্তিতে প্রজার অসন্তোষ ও মোগলসাম্রাজ্যের পতনসম্ভাবনার কথা আছে ("দিল্লীর সিংহাসন টলিতেছে। দক্ষিণে মারহাট্টা মোগলের হাড় ভাঙিয়া দিতেছে। রাজপুতেরা একত্রিত হইতেছে। জেজিয়ার জালায় সমস্ত রাজপুতানা জ্বলিয়া উঠিয়াছে।")। এই অনুচিত ব্যক্তি-সমীকরণ চরম পর্যায়ে ওঠে যখন দেখি পরিবেষ্টিত পরাজিত ঔরঙ্গজেব নির্মলকুমারীর উদ্দেশে পারাবত ওড়াতে ব্যস্ত।

ইতিহাস সম্বন্ধে টলস্টয়ের অনুরূপ উপলব্ধি আমরা রবীন্দ্রনাথের রচনাতেও পাই। তিনি 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' প্রবন্ধে বলেছেন, "প্রায়ই জাতীয় অভ্যুত্থানের মূলে এক বা একাধিক মহাপুরুষ আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে, সেই সকল মহাপুরুষ আপন শক্তিকে প্রকাশ করিতেই পারিতেন না, যদি দেশের মধ্যে মহৎভাবের ব্যাপ্তি না হইত। চারিদিকে আয়োজন অনেক দিন হইতেই হয়; সেই আয়োজনে ছোটোবড় অনেকেরও যোগ থাকে; অবশেষে শক্তিশালী লোক উঠিয়া সেই আয়োজনকে ব্যবহারে প্রয়োগ করেন।" হেগেলও জানতেন 'world-historical

individual' দাঁড়িয়ে থাকে অগণ্য 'maintaining individual'-এর ভিত্তির উপর। একই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ আবার বলেছেন, "মারাঠার ইতিহাসে আমরা শিবাজীকেই বড় করিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু শিবাজী বড় হইয়া উঠিতে পারিতেন না, যদি সমস্ত মারাঠা জাতি তাঁহাকে বড় করিয়া না তুলিত। ...মারাঠার ধর্মান্দোলনে দেশের সমস্ত লোক একত্র মথিত হইয়াছিল। শিবাজীর প্রতিভা সেই মন্থন হইত উদ্ভূত।" টলস্টয় ও রবীন্দ্রনাথ দুইজনেই ভাববাদী হলেও ইতিহাসতত্ত্ব বিশ্লেষণের ব্যাপারে তাঁরা ব্যক্তিপূজারী ছিলেন না। পূর্বে যদিও ইতিহাসসম্বন্ধে বঙ্কিমের অপ্রত্যাশিত আধুনিক দৃষ্টির কথা বলেছি, যে দৃষ্টির ফলে তিনি জানতেন 'রাজাগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকামাত্র' ইতিহাস নয়, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র কার্লাইল-সুলভ রোমান্টিক বীরপূজার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। তাই মারাঠাজাতির ইতিহাস বিশ্লেষণে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—"একবার মহারাষ্ট্রে শিবাজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন, তাঁহার সিংহনাদে মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল।" (ভারতকলঙ্ক)। সুতরাং ভারতীয় ইতিহাসের সীমাবদ্ধতা ও অসম্পূর্ণতার জন্য কিছু পরিমাণে এবং সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণ ব্যক্তিকে বঙ্কিম ইতিহাসের পরিচালক ও গতির উৎস বলে মনে করতেন বলে, তিনি 'রাজসিংহ'-এ ঐতিহাসিক চরিত্রকে প্রাধান্য দিয়েছেন। ফলে, তৎকালীন সমাজের নিম্নস্তরের জীবনযাত্রা উপেক্ষিত হওয়ায় এই উপন্যাসে বাস্তবতার হানি হয়েছে। এই সমস্ত কারণে 'রাজসিংহ' ঐতিহাসিক উপন্যাসের চরিত্র হারিয়ে ঐতিহাসিক রোমান্সে পর্যবসিত হয়েছে।

ছয়

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ রোমান্টিকধর্মের দ্বারা বিশেষভাবে আক্রান্ত ছিল। তাঁর সাহিত্যে বহু রোমান্টিক লক্ষণ বিদ্যমান—তাঁর অতীত ইতিহাসের রূপায়ণ সেও যেন রোমান্টিক দূরাভিসার, তিনি সৌন্দর্যের অপরিতৃপ্ত পিপাসু, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যে তিনি রোমান্টিকের মত আকণ্ঠ নিমগ্ন। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে তিনি যে অনন্যসাধারণ ঐতিহাসিক পুরুষকে নায়ক হিসাবে নির্বাচন করেছেন তারও পিছনে কাজ করেছে এই রোমান্টিক মানস। রোমান্টিক কাব্যের নায়কও অনন্যসাধারণ মানুষ। কার্লাইলের মত বঙ্কিমও ছিলেন রোমান্টিক বীরপূজারী। অথচ ঐতিহাসিক উপন্যাসিকের গুরুস্থানীয় স্কট কদাচ রোমান্টিক বীরপূজারী

ছিলেন না; ইতিহাস সম্বন্ধে যে রোমান্টিক ধারণা, স্কট ছিলেন তার সম্পূর্ণ বিরোধী। সেই কারণে তাঁর পক্ষে সত্যকার ঐতিহাসিক উপন্যাস অর্থাৎ বাস্তবধর্মী ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর নায়কগণ মধ্যবর্তী শ্রেণীর গড়পড়তা মানুষ, প্রখ্যাত বা সার্বভৌম প্রতিভাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তি নয়। লুকাচ এই প্রসঙ্গে চমৎকারভাবে মন্তব্য করেছেন, "The latter are the national heroes of a poetic view of life, the former of a prosaic one." বঙ্কিমের রোমান্টিক উদ্দীপ্তকল্পনা, কবি-মন, স্কটের মত গদ্যময় নায়ক নিয়ে সুখী হতে পারত না। ইতিহাস সম্বন্ধীয় স্বতন্ত্র ধারণার জন্য বাস্তবতা ও কার্যকারণশৃঙ্খলাকে যথোচিত মর্যাদা না দেওয়ায়, রোমান্টিক সাহিত্যাদর্শের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হওয়ায়, বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে বাস্তবধর্মী ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করা সম্ভব হয় নি। যে দেশাত্মবোধ জাতীয় ইতিহাস-সন্ধানের তথা ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রধান প্রেরণা, বঙ্কিমের মধ্যে সেই দেশপ্রেমের জ্বলন্ত উপস্থিতি সত্ত্বেও এই সব কারণে তিনি 'রাজসিংহ'-কে সত্যকার ঐতিহাসিক উপন্যাসের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলেন না। ঐতিহাসিক উপাদানের পরিমাণে উনিশ-বিশ হলেও তাই 'চন্দ্রশেখর' ও 'দুর্গেশনন্দিনীর' সঙ্গে 'রাজসিংহের' কোনো গুণগত পার্থক্য নেই।

রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধের একটি মন্তব্য উপসংহারে উদ্ধারযোগ্য। মন্তব্যটি এই—"দেশের ইতিহাসই আমাদের স্বদেশকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।...তাহা স্বদেশ সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টির সহায়তা করে না, দৃষ্টি আবৃত করে মাত্র। তাহা এমন স্থানে কৃত্রিম আলোক ফেলে যাহাতে আমাদের দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার হইয়া যায়।...সেই অন্ধকারের মধ্যে অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝনঝনা, সুদূরব্যাপী শিবিরের তরঙ্গিত পাণ্ডুরতা, কিংখাব-আস্তরণের স্বর্ণচ্ছটা, মসজিদের ফেনবুদ্‌বুদাকার পাষাণমণ্ডপ, খোজাপ্রহরীরক্ষিত প্রাসাদ-অন্তঃপুরের রহস্য-নিকেতনের নিস্তব্ধ মৌন, এ-সমস্তই বিচিত্র শব্দে ও বর্ণে ও ভাবে যে প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল রচনা করে, তাহাকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বলিয়া লাভ কী?" ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই সীমাবদ্ধতা বঙ্কিমচন্দ্র জানতেন এবং তিনি জানতেন সামাজিক ইতিহাসই জাতির প্রকৃত ইতিহাস। কিন্তু বুদ্ধিতে সেই সত্য জানলেও সেই সত্য তাঁর কল্পনাকে উদ্দীপিত করতে পারে নি। তাঁর অতীতচারী রোমান্টিক মন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতায় অপরিতৃপ্ত মন, সৌন্দর্যকেলিতে মগ্ন মন, 'রাজসিংহ' উপন্যাসে সেইদিকে 'কৃত্রিম আলোক' সম্পাত করেছে, যার ফলে বাস্তব 'দেশের দিকটাই আমাদের চোখে অন্ধকার' হয়ে গেছে, সৃষ্টি করেছে মোহময় রোমান্সের 'প্রকাণ্ড ইন্দ্রজাল'। 'রাজসিংহ' উপন্যাসে যখন 'অশ্বের ক্ষুরধ্বনি, হস্তীর বৃংহিত, অস্ত্রের ঝনঝনা' ইত্যাদি প্রধান হয়ে উঠেছে তখন তাকে ঐতিহাসিক উপন্যাস 'বলিয়া লাভ কী?'

দেবেশ রায়

যযাতি

(পূর্বানুবৃত্তি)

মনে তো করতে চাই-ই না। এ-বাড়ির কোথাও খোকাকে মনে করার কিছু নেই। তাই যেন সব আবার মনের মধ্যে এসে জমা হয়েছে। সে জন্মের শত্রুকে ভুলতে পারি না,—একটি মুহূর্তের জন্যও না। আমার মনটা যেন খোকার খেলাঘর। সেখানে সব খেলনা ফেলিয়ে-ছড়িয়ে রেখে গেছে নতুন খেলার খোঁজে। নাকি খেলতে খেলতে সেখানেই ঘুমিয়ে পড়েছে খোকা? কী-রকম যে হয় না! বুকটা একেবারে ধক্‌ধক্‌ করে ওঠে। সেদিন মিঠু আমার শোবার ঘরের বাইরের দিকের বারান্দায় ঈজিচেয়ারে একেবারে কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে পা দুটোকে রেলিঙে তুলে দিয়ে কী পড়ছিল। সিধু খুব কাজের ছেলে। অমন ঢিলেঢালা হয়ে ওকে তো বড় একটা বসতে দেখি না। পড়তে গেলে ও পড়ার ঘরেই বসে। খাওয়ার ঘর ছাড়া ওর খাওয়া হয় না। যাহোক, আমি ঘর পরিষ্কার করছিলাম। ঝাড় দিতে দিতে জানলার পর্দাটা সরাতেই রেলিঙের ওপর সিধুর পা-দুটি দেখে একেবারে চমকে উঠেছি। আমি জানতামই না সিধু এখানে। তাই পর্দা সরাতেই ওর পা-দুটোই আগে চোখে পড়েছে, শুধু পা-দুটোই চোখে পড়েছে। আর সিধুর পা-দুটি একেবারে ওর দাদার মতো, একেবারে অবিকল। বসার জায়গা, বসার ভঙ্গির মধ্যেও খোকাকে মনে পড়ে যাওয়ার কারণ ছিল। আমি জানলার শিক ধরে কোনোরকমে টাল সামলেছিলাম—সিধুর পা দুটির দিকে তাকিয়ে। তারপর সিধুও যখন ওর দাদার মতো ডান পায়ের বুড়ো আঙুল নাচাতে সুরু করল তখন আর আমি সহ্য করতে পারলাম না। খোকাকে আমি ঠাট্টা করতাম, "তোর জন্ম হবার পর তাকিয়ে দেখি, ও মা এত সুন্দর টুকটুকে ছেলে, তার ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটিই নেই, আমি তো ভয়ে মরি, সবাই আমার খোকার নিন্দে করবে, তখন কি করি, কি করি, হাতের কাছে দেখলাম একটা টিকটিকি, বেশ বড়-

সড়, সেটার লেজটা ছিঁড়ে নিয়ে ব্লেড দিয়ে বুড়ো আঙুলের মতো কেটে আঠা দিয়ে তোর পায়ে লাগিয়ে দিলাম। ব্যস, কেউ টের পেল না। সেজন্যই তো তোর ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা ওরকম নাচে—টিকটিকির লেজ তো !”

এ-গল্প শুনে একটা বয়স পর্যন্ত খোকা কাঁদত, তারস্বরে পাড়া মাতিয়ে, শেষে কোলে করে আমাকে সামলাতে হত ; একটা বয়স থেকে খোকা বিশ্বাস-অবিশ্বাসে মেশানো হাসত, অপ্রস্তুতের মতো চলে যেত। একটা বয়স থেকে খোকা নিজেই নিজেকে আমার কাছে টিকটিকি বলত। একটা বয়স থেকে আমার কাছে খোকার একটা গোপন আদুরে নামই হয়ে গিয়েছিল —টিকটিকি। বরাদ্দ টাকার বেশি কিছু দরকার হলে কলকাতা থেকে খোকা যে গোপনে আমাকে চিঠি দিত তাতেও দু-একবার “ইতি তোমার টিকটিকি” লিখেছে। আমার ভালো লাগে নি। সেই টিকটিকির লেজ দেখে আমি তাড়াতাড়ি জানলা ছেড়ে খাটের কোণায় প্রথমে বসলাম, তারপর ধীরে ধীরে কাত হয়ে শুয়ে পড়লাম। আমার বুকটা সত্যিসত্যি ধকধক করছিল। শুয়ে পড়ে আমার মনে হয়েছিল আমি যেন আর পারছি না। যদি সত্যি-সত্যি আমি খুব অসুস্থ হয়ে পড়তাম—বেঁচে যেতাম। অন্তত আমার ভাবনা-চিন্তা নিয়ে একা একা পড়ে থাকতে পারতাম, এই সংসারের ঘানি আর টানতে হত না। এ-সংসার কোনোদিনই আমার ছিল না, আজ তো একেবারেই নয়।

কি করে আমার হবে ? যখন প্রথম বিয়ের কথা হয়েছিল তখন থেকেই সকলে একেবারে আত্মহারা। এমন বর-ও রেণুর কপালে জুটবে কেউ ভেবেছে ? উনি তো সব সময়ই বলেন আমাদের নাকি চাষা-বাড়ি। তা উনি বলতেই পারেন। পড়াশুনা আমাদের বাড়ির কেউই বড় একটা করে নি। চাকরি বাবা জ্যাঠামশাই হয়তো কোনো এক সময় করেছেন—কিন্তু সেও কোন কালে, জমিদারবাড়ির চাকরি। তারপর তাঁরাই জোতজমি কিনে সম্পত্তি করেছেন। বাবা-জ্যাঠামশাই তো বৎসরের অর্ধেক সময়ই জোতে থাকতেন। সারা বছর ধরে আমাদের বাড়িতে জোত থেকে জিনিস আসতো। জিনিস কী একটা। ধান চাল তো ছিলই, কিছু কিছু পাটও। আর আসতো পাটকাঠি, গুড়, আম, কাঁঠাল, নারকোল; সুপুরি, তরি-তরকারির মধ্যে প্রধানত লাউ, কুমড়ো, শাক, ডাঁটা আর উচ্ছে, কিছু-কিছু আলু-পটল-ঝিঙেও। সরষের তেল, কলাইসুঁটি। আমাদের গলির মধ্যে এইসব

নিয়ে গোরুর গাড়ি ঢুকলেই,—আমরা যদি তখন রাস্তায় থাকতাম,—গোরুর গাড়ির পেছনে ঝুলে-ঝুলে বাড়ি আসতাম। দাদা তো একেবারে গোরুর গাড়ির উপর চড়ে বসত। আমরা ছোট ছিলাম। গোরুর গাড়ির উপরে উঠতে পারতাম না। আমাদের গলির গদা-পদাদেরও জোত ছিল। ওদেরও জিনিস আসত গোরুর গাড়িতে। অনেক সময়, যদি গাড়ির গাড়োয়ানকে আমরা, আমি-দাদা-গদা-পদা, কেউই চিনতে না পারতাম—তাহলে গদা-পদার সঙ্গে আমার আর দাদার ঝগড়া লেগে যেত। গদা-পদাদের বাড়ি আমাদের বাড়ির আগে ছিল, যদি গাড়ি ওদের বাড়ির দিকে ঘুরত তবে দাদা লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে দৌড়ত। আমি তো গাড়ির পেছনে ঝুলতাম। চট্ করে নামতে পারতাম না। গদা-পদা আমাকে ধাক্কা দিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিত। কত ভাবতাম যে কবে আমি দাদার মতো গাড়ির উপর উঠতে পারব। তাহলে তখন, ভুল করে গদা-পদাদের গাড়িতে উঠলেও আমাকে ওরা মারতে পারবে না। আমি লাফিয়ে নেমে যাব। কিন্তু গাড়ির উপর ওঠা আমার আর কোনোদিনই হয় নি। তখন বড় হয়ে গেছি। বাড়ি থেকে বেরোনই প্রায় বন্ধ। আমরাও ছেড়ে দিতাম না। যদি গাড়ি গদা-পদাদের বাড়ি না-ঢুকে সোজা যেত তাহলে আমি আর দাদা গদা-পদাকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দিতাম। একটু বয়স হতেই বুঝেছিলাম বাড়িতে যেগুলো আসে সেগুলো বাড়তি। আসল জিনিসপত্র নানা হাট-বাজারে চলে যায়। বাবা জ্যাঠামশাই যখন মাঝে মধ্যে বাড়ি আসতেন তাঁদের কথাবার্তা শুনতাম—কোন্ হাটে কোন্ জিনিসের কত দাম উঠেছে, কত দাম পড়েছে—এইসব। ছোটবেলায় বাবা জ্যাঠামশাই কখন জোতে থাকতেন, কখন বাড়িতে, বুঝতাম না। পরে বুঝেছি জ্যৈষ্ঠ মাস নাগাদ বাড়ির ঠাকুর-মশাই পাঁজি খুলে দিন দেখে দিতেন কবে কবে জমিতে হাল-দেয়ার শুভদিন, কবে কবে জমিতে চারা ফেলার শুভদিন। সেইসব কাগজে লিখে গোরুর গাড়িতে চড়ে জ্যাঠামশাই আর বাবা রওনা দিতেন। বিছানাপত্র সঙ্গে যেত। দুটো লণ্ঠন আর দুটো ছোট টিনে কেরোসিন তেল থাকত। বৃষ্টি সুরু হওয়ার পর সেই যে তাঁরা যেতেন, ফিরতেন মাসখানেক মাস দেড়েক পর। তারপর আবার দিন পনর কি এক মাস বাড়িতে থাকতেন। এবং আবার বেরিয়ে মাস্ দেড়েক-দুয়েক পরে ফিরে আসতেন। আবার মাস খানেক-দেড়েক পরে আবার বেরুতেন—ফিরে আসতেন পুজোর আগে-আগে।

পুজো সেরেই আবার যেতেন। শীতকালে তাঁরা মোটামুটি বাড়িতেই থাকতেন। মাঝে মধ্যে দিন পাঁচ-সাত-দশের জন্য জোতে যেতেন। হিসেবটা বুঝেছিলাম পরে। আমাদের দেশে আউস ধানের খুব একটা চাষ নেই। কিছু কিছু জমিতে হয়। নাম—ভাদই। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ বৃষ্টি হলে মোটামুটি জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝি চাষ দিয়ে জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি ধান ফেলা হয়। সেই ধান বোনা হয়ে গেলে জ্যাঠামশাই বাবা বাড়ি ফিরতেন। অম্বুবাচী পর্যন্ত বাড়ি থাকতেন। অম্বুবাচী শেষ হলে আবার রওনা দিতেন। তখন বোনা হত আসল শস্য—আমন ধান। চাষ আগেই করা থাকত। আমন বুনতে সময় নিত। বোনা-টোনা হয়ে গেলে তাঁরা কিছুদিনের জন্য বাড়ি ফিরতেন। তারপর ভাদ্র থেকে একেবারে শীতের গোড়া সেই অঘ্রান পর্যন্ত কাটিয়ে আসতেন। কোনো-কোনোবার আবার অঘ্রানও শেষ হয়ে যেত, পৌষ পড়ে যেত। ধান কাটা, হাটে-হাটে ধান বেচা শেষ করে তবে তারা কিছুদিনের জন্য বাড়ি এসে বসতেন। তাও একেবারে বসে থাকার কোনো উপায় ছিল না। ততদিনে রবিশস্য বোনা সুরু হয়ে যেত। মাঝে মধ্যে জোতে গিয়ে তদ্বির-তদারক করে আসতেন। সেই ছোটবেলা থেকেই সব জিনিসের তাজা গন্ধের সঙ্গে আমার নাক পরিচিত। শাক, তরি-তরকারি যখন বাড়ি এসে পৌঁছুতো তাতে মাটি লেগে থাকত। একেবারে ছোটবেলা থেকেই আমাদের কাজ ছিল কুয়োপাড়ে এক বিরাট বালতির মধ্যে চুবিয়ে-চুবিয়ে সেই শাক-ডাঁটা, তরি-তরকারি ধোয়া। চালকুমড়োর গায়ে যে সাদা চুন লেগে থাকে দাদা সেগুলো হাতে নিয়ে আমার মুখে ঘষে দিত। কাঁঠালের গায়ে যে মাকড়সার ছোট-ছোট সাদা-সাদা বাসা থাকত আমিও সেগুলো নিয়ে দাদার মুখে লাগিয়ে দিতাম। পেঁপেগুলোর উপরে বোঁটার শুকনো দুধ ছড়িয়ে থাকত। কলাইসুঁটি তো গাছসুদ্ধু আসত। সেগুলোকে গাছ থেকে ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ঝুড়ি ভর্তি করে রাখা হত। ভাদ্র মাসে আর কার্তিক-অঘ্রানে গোলাঘর গোবর দিয়ে লেপে ঝক্‌ঝক্ করে রাখা হত। ডুলিগুলি গোবর-লেপা হত। এত সব তাজা-তাজা গন্ধ আমার ছোটবেলায় ছিল। এই নতুন বাড়িতে যখন রেফ্রিজারেটর এলো, তখন রেফ্রিজারেটরে রাখা তরি-তরকারির গন্ধে আমার বমি আসত। অথচ আমার তো এ-বাড়িতেই বেশিদিন কেটেছে, ও-বাড়িতে আর ক' বছর ছিলাম। তবু সেই মাটির গন্ধ আর ভুলতে পারলাম না।

আমার বাবা আর জ্যাঠামশাইকে যখন বাড়িতে দেখতাম তখন মনে হত তাঁরা বাইরে থেকে এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছেন। বাইরে বাঁশের মাচার কাছারিঘর ছিল। তাতে দুই ভাই পাশাপাশি দুই চৌকিতে থাকতেন। সামনে একটা পোর্টিকো মতো ছিল। সেখানে দুই ভাই বসে থাকতেন। বাবা জ্যাঠামশাইয়ের সামনে তামাক খেতেন না। জ্যাঠামশাই পোর্টিকোতে থাকলে ঘরে গিয়ে খেতেন আর জ্যাঠামশাই ঘরে থাকলে বারান্দায় বসে খেতেন। বাইরে, কাছারিঘরের পাশেই ছিল গোয়ালঘর। আর পোয়ালের গাদা। দুই ভাই সারাদিন ধরে গোরুগুলোকে গোয়াল থেকে বের করতেন, তাদের চড়াইগুলোর সামনে বেঁধে দিতেন, ঘাস কুচি-কুচি করে কেটে খোল দিয়ে মেখে, পোয়াল মিশিয়ে চড়াইয়ে ঢেলে দিতেন, কখনো বা শুধুই খড় দিতেন। সকাল-সন্ধ্যা গোরু দোয়াতেন। ছোটবেলায় ভাবতাম—দুই ভাই মিলে সবগুলো গোরুরই কাজ করতেন। পরে বুঝেছি আসলে তা না। বাবার আর জ্যাঠামশাইয়ের গোরুগুলো আলাদা-আলাদা ছিল। তাঁরা নিজেদের গোরুর কাজই করতেন। নিজেদের গোরুই দোয়াতেন! আসলে ঐ গোরু নিয়ে তাঁদের মধ্যে খুব রেশারেশি ছিল। কার গোরু দুধ বেশি দেয়, ভালো দেয়। জ্যাঠাইমা আর মা নিজেদের মধ্যে তামাশা করতেন যে বাবা আর জ্যাঠামশাই নাকি গোপনে গোপনে নিজেদের গোরুদের বেশি-বেশি খাওয়ান আবার অন্যের গোরুর চড়াই থেকে দানা-খোলও নাকি চুরি করে নিজ-নিজ গোরুকে দিতেন। দুধ অবিশ্যি দেখার মতো ছিল। ফেনায় ফেনায় ছোট-ছোট বালতি দুটো ভরে উঠত, উথলে উঠত। মা-জ্যাঠাইমা এমন কথাও বলতেন যে নিজের গোরুর দুধ যে বেশি হয় তা প্রমাণ করার জন্য বাবা আর জ্যাঠামশাই নাকি গোপনে গোপনে দুধে জলও মেশাতেন। তাঁরা যখন বাড়ি থাকতেন না তখন বাবার গোরুগুলোর ভার পড়ত মার উপর আর জ্যাঠামশাইয়ের গোরুগুলোর ভার পড়ত জ্যাঠাইমার উপর। ওঁদের মধ্যে গোরু নিয়ে কোনো রেশারেশি ছিল না। আর জ্যাঠাইমা দুধ দুইতে পারতেন না। মা-ই দুজনের গোরুর দুধ দোয়াতেন। রেশারেশি না থাকলেও, মা আর জ্যাঠাইমা দুজনই কিন্তু গোরুগুলিকে যত্ন করতেন। এবং নিজেদের গোরুগুলোকেই। অথচ এত যে কিছু—এর কোথাও কোনো চিৎকার-চেঁচামেচি হৈ-হট্টগোল ছিল না। জোত থেকে ফিরে বাবা-জ্যাঠামশাই যেভাবে বাড়ির কাজে লেগে যেতেন

তাতে মনে হত তাঁরা বাড়ি থেকে বেরই হন নি, বাড়িতেই ছিলেন। আর বাড়িতে থাকতেন অথচ সারাদিনে তাঁদের গলা কেউ শুনতে পেত না। যা-কিছু কথা দুই ভাই বলতেন, যা-কিছু কাজ দুই ভাই করতেন।

ফলে বাড়িটা আসলে আমাদেরই ছিল। ভাইদের মধ্যে জ্যাঠামশাইয়ের বড় ছেলে, বড়দা, কাছেই কোনো এক বন্দরে মনোহারী দোকান আর ঐ-সব ব্যবসা-পত্র করতেন। তিনি প্রধানত ঐখানেই থাকতেন। মাঝে মধ্যে বাড়িতে আসতেন। বিয়ের পর খুব ঘনঘন আসতেন। জ্যাঠামশাইয়ের ছোট ছেলে ছোড়দা রংপুরে কলেজে পড়তেন। বন্ধের সময় বাড়ি আসতেন। তারপর তো তাকে চাকরি দিয়ে জ্যাঠামশাই ওখানেই বসিয়েছিলেন। বউ নিয়ে ছোড়দা বাড়িতেই থাকতেন পরে। দাদা তো ছোট্ট, স্কুলে পড়ত। আর আমি। বড়বৌদি, ছোটবৌদি, জ্যাঠাইমা আর মা-ই ছিলেন যেন বাড়ির আসল লোকজন। বাড়ির যাঁরা আসল মালিক তাঁরা সব বাইরে-বাইরে। অথচ সমস্ত বাড়ির পরিবেশের মধ্যেই যেন বাড়ির বাইরের বাবা আর জ্যাঠামশাই আর জোত-জমি ছিল। বাবা-জ্যাঠামশাই যখন হাল-দোয়ার জন্য বা বীজ বোনার জন্য বাইরে তখন আমাদের বাড়ির ভিতরে সবসময় একটা চাপা উত্তেজনা। বৃষ্টি হবে কি হবে না, থাকবে কি থাকবে না—এ-নিয়ে মা আর জ্যাঠাইমার গবেষণার অন্ত ছিল না। মনে আছে—হয়তো সারাদিন বৃষ্টি হয়েছে, সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি থেমেছে, ধীরে ধীরে বৃষ্টি-ধোয়া আকাশে রাশি-রাশি তারা উঠেছে, সারাদিন ঘরে আটকা থেকে আমরা একটু উঠোনে নেবে হৈ-হৈ করছি—জ্যাঠাইমা রান্নাঘরের ভিতর থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন—"অত লাফাস না, 'দিনে জল রাত্রে তারা, এই দেখবে শুকোর ধারা'—মানুষজন গেছে জমিতে হাল দেওয়াতে, আর এদিকে বর্ষার নাম নেই, ওনারা লাফাচ্ছেন—"। আবার দিনের কাজকর্মের মধ্যেও যদি দেখতেন মেঘ ঘন হয়ে এসেছে, তাহলে একদিকে তাড়াহুড়ো করে হাতের কাজ সারতেন আর মেঘের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে নিজেদের মধ্যে কী সব বলাবলি করতেন। দু একটা ছড়া আমার আজও মনে আছে—"পূর্বেতে উঠিল কাঁড় খানা-ডোবা একাকার।" আবার কখনো কখনো দুই জায়ের মধ্যে তর্ক লাগত, আকাশে যে-মেঘ এসেছে তাতে বৃষ্টি হবে কি না। জ্যাঠাইমাই বেশি ছড়া জানতেন। কোন্ মেঘে বৃষ্টি হবে, কোন্ মেঘে হবে না—জ্যাঠাইমার কাছে শিখেছিলাম—"কোদাল্যা কুড়ল্যা মেঘের গা।

মধ্যে মধ্যে দেয় ঘা। চাষিরে ক বাঁধতে আল্। আজ না হয় হবে কাল॥" আবার মা-জ্যাঠাইমা বাড়িতে বসে বসেই অনুমানের চেষ্টা করতেন মাঠের কাজ কতখানি এগোল বা এগোন উচিত—শ্রাবণের পুর ভাদ্রের বার। এর মধ্যে যত পার॥ বা আউস ধানের চাষ। লাগে তিনমাস॥ আবার বাড়িতে বসে বসেই তাঁরা হিসেব করতেন সেবার কীরকম ফসল হতে পারে, বর্ষণের পরিমাণ, সময় এইসব মিলিয়ে তাঁরা বিবেচনা করতেন—"বৈশাখের প্রথম জলে। আশুধান দ্বিগুণ ফলে॥" "কার্তিকের উন্বা জলে। দুইগুণ ধান খনায় বলে॥" এতদিন পরেও এগুলো মনে আছে। এতদিন পরেও এই বর্ষা আর মেঘ আর মাসের সঙ্গে কেমন যেন একটা মিল খুঁজে পাই। ছোটবেলা থেকে শিখেছি এইসব, দেখেছি। এখন যদি হঠাৎ জানলা দিয়ে মেঘ দেখে, মেঘের ডাকার ধরন দেখে সেই পুরোন অভিজ্ঞতা কথা বলে উঠতে চায় তবে ঠোঁট বন্ধ করে থাকি। খোকার বাবারও অবশ্য কিছু পৈতৃক জমি আছে। কিন্তু সে তো সম্পত্তি। ছোট দেওর আছে। সে দেখাশোনা করে। মাঝে মাঝে আসে, টাকা-পয়সা দেয়া-নেয়া করে—এই পর্যন্তই। আমি খোকার বাবার জমিও দেখি নি, আমার বাবার জমিও দেখি নি, আমার মা-জ্যাঠাইমাও দেখেন নি। কিন্তু আজও যেন সেই বাবা-জ্যাঠামশাইয়ের জমির কথাই মনে পড়ে যায়, বৈশাখের প্রথমে আমরা মেঘ দেখলে, কার্তিকের শেষে বৃষ্টি দেখলে, থমথমে কালো মেঘে বিদ্যুতের ঝিলিক দেখলে, বা বিদ্যুৎহীন মেঘের ডাক শুনলে। ভিতরে কোথাও গুড়-গুড় করে ওঠে। বুকের ভিতরে। মা-জ্যাঠাইমা নেই। বাবা-জ্যাঠামশাই নেই। বড়দা-ছোড়দা নেই। বড়বৌদি সেই যে বাড়ি থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছিলেন। ছোটবৌদি এখনো দাদার সংসারে। অথচ সেইসব বৃষ্টি মেঘ আকাশ এই বিশাল বাড়িতে আমার বুকের উপর চেপে আছে।

(ক্রমশ)

চেদোমীর মিন্দেরোভিচ

শুভরাত্রি, কলকাতা

সারাটা বিকেল প্রকাণ্ড ট্যাক্সিতে চেপে এই অশান্ত সমুদ্রের মানবতরঙ্গ ভাঙি আর ভাঙি

আকাশ মেঘাবৃত

বিপুল সীমাহীন নগরী থেকে ধোঁয়া উঠছে

নীলরঙা ডাবলডেকার বাস

ধুলো

মানুষের এই সমুদ্রের অনেক অনেক উর্ধ্বে

ডকেরও ওধারে

মানবজীবনের সমস্ত ধূসর শহরতলীর প্রান্তে

দাঁড়িয়ে আছে দশ হাজার শ্রমজীবীসহ

কেশোরাম কটন মিল্‌স লিমিটেডের দেয়ালগুলো

আর, ওদের সঙ্গে, অতীতের একটা আস্ত জগৎ

যেন একদিন সবকিছুই ছিল সবকিছু আবার হবে একদিন

সব প্রতিধ্বনি

সমস্ত আচ্ছাদনী

যাবতীয় ফুল

সব কটি হেমন্তের যতো ঝরাপাতা

যতো সব অসুখ আর সমস্ত মৃত্যু

উত্তপ্ত লাল বালু

গনগনে আগুন মানুষের রক্তবর্ণ ঘূর্ণি

দূরে অনেক দূরের ছাদের ওপারে যাবতীয় সূর্যাস্ত আর ধূলিধূসর গলিপথে যতো সব নিঃসঙ্গ পদধ্বনি

বাসস্টপগুলোয় স্তূপাকার দলাপাকানো ট্র্যামবাসের টিকেট, কে জানে কে, কে জানে কখন ওইখানে নেমে চলে গেছে

কোথায় কোন্‌দিকে

হোটেলের ঘরে যতো সব মৃত প্রত্যুষা, যেখানে রঙ্‌চটা ফুলের নক্‌শাকাটা পরদাগুলো দিবারাত্রি সব সময় একভাবে টানা

শীততাপ নিয়ন্ত্রণযন্ত্রের প্রায়-অলক্ষ্য গুনগুন স্পষ্ট হচ্ছে স্পষ্টতর হচ্ছে

সময়—যেন দাঁড়িয়ে গেছে

যেন ওখানে দীর্ঘ দীর্ঘকাল না-নড়েচড়ে কাটাবে বলে ফিরে এসেছে সময়

নাকি, সে আমিই যে দাঁড়িয়ে আছে

ভালোবাসা আর মৃত্যুর মধ্যে

মৃত্যু আর বিনষ্টির মধ্যে

একা

একাকী

"মানুষ জাতটা ওরমুজ্‌দ্‌ ও আহ্‌রিমানের দুই রাজ্যের মধ্যে দ্বিধাবিচ্ছিন্ন নয়। প্রত্যেকের মধ্যেই আলো আর অন্ধকারের ওই দুই রাজত্ব।"

বইটা আমার বালিশের গোড়ায় বেড্‌কভারের ওপর পড়ে। শান্তি-নিকেতনের অধ্যাপক ওটা ওখানেই রেখে গেছেন

"...প্রত্যেকের মধ্যেই আলো আর অন্ধকারের এই অবিচ্ছিন্ন দ্বৈত রাজত্ব"।

থেকে থেকে এক-আধটা পৃষ্ঠা পড়ি আর একটা ইঁদুর ঘরে অনবরত দৌড়তে থাকে, এক কোণ থেকে আরেক কোণে, জীর্ণ লাল কার্পেট মাড়িয়ে তুর্‌তুর করে

গরমের ভয়ে ঘরটা সর্বদা বন্ধ, যদিও ইতিমধ্যেই এখন নভেম্বর মাস

আর, একটা পাখি পর্যন্ত নেই

না-আছে কোচিনদেশী কাক

না-আছে বোম্বাইয়ের বাদুড়

অন্তহীন ভ্রমণের পর যখন ট্যাক্সি থেকে নামি

আমি ওই ঘরটা ছেড়ে ফিরে যাই

আমার বহুতর হোটেল-ঘরগুলোর একটা ছেড়ে

আর সমস্ত সময়টা আমি তীব্র তীব্রভাবে অনুভব করি, সবকিছু ছেড়ে গেছে চলে গেছে

মনে হয়, মস্ত রুপোলি ডাকোটা-বিমানটা নীল আকাশে কোন্‌খানে হারিয়ে গেছে, যেখান থেকে নেই প্রত্যাবর্তন

আর, ঘন্‌ঘনে ট্র্যামের আওয়াজে মেশা, বাসের ভেঁপুর শব্দে মাখা
প্রকাণ্ড পুরনো ট্যাক্সির গায়ে আছড়ে-পড়া ধুলো থেকে
অ্যাস্‌ফল্‌টের ওপরে, কলকাতার নিঅন-বাতির ফাঁকে ফাঁকে
আমার কোন্‌-এক প্রাক্তন জীবন বয়ে যাচ্ছে বয়ে যাচ্ছে
যেন কার এক যৌবনের দূরতম দিন
আলো আর অন্ধকার
কোথায় চলে গেল হারানো বছরগুলো, কোথায় ফিরে এলুম আমি
স্তূপাকার দলাপাকানো ট্র্যাম আর বাসের টিকেট বাসস্টপগুলোয়, কে জানে
কে ওখানে নামল আর চলে গেল
কোথায়
কোন্‌খানে
কোথায় উড়ে গেল সেই রুপোলি ডাকোটা
সে কি আর ফিরে আসবে
আর সে কি ফিরবে কখনো।

চৌরঙ্গি
রবিবার
পেভ্‌মেণ্টের ওপর
মাঠে মাঠে
নীলরঙা বাস আর শাদা ট্র্যামের ফাঁকে ফাঁকে
রোগা-রোগা কলকাতার গোরুগুলো চরে বেড়ায়
কিছু না-চিবিয়েই
কে জানে ওদের মালিক কে
কিংবা কেউ-না
আর টাঙ্গা
আর রিক্‌শা
আর ট্যাক্সি
আর প্রচণ্ড অন্তহীন মানুষের ভিড় পার্কের প্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ছিটনো
পুকুর আর জলার ধারে-ধারে উপচে-পড়া

নালা-নর্দমার এধার-ওধার

সেণ্ট পল্‌স্‌ গির্জার আশেপাশে গির্জার সামনে রৌদ্রে ঝলমল কেতাদুরস্ত মোটরগাড়ির সার, ম্যাস্‌-পরব সমাপ্তির প্রতীক্ষায়

দিলীপ মালাকারকে তার বইয়ে-বোঝাই ছোট্ট নোংরা উঁচু চিলেকোঠায় পাওয়া গেল না

আর অকস্মাৎ যেন কানে এলো আমার কালো কালো ডানার ঝাপ্‌টানি

ওরা কি কোচিনদেশী কাক

ওরা কি বোম্বাইয়ের বাদুড়

উঠে যাই সিঁড়ি বেয়ে

অত্যন্ত সরু

নোংরায় চট্‌চটে

স্ত্রী-পুরুষ অলসভাবে বসে কিংবা শুয়ে রবিবারের দিন

দোতলার স্ত্রীলোকটি তাড়াতাড়ি বুকে কাপড় টেনে দিল

কব্‌জি থেকে কনুই ময়লা প্লাস্টারে-মোড়া শিশুটির হাত

সিঁড়িগুলোর আর শেষ নেই

কালো ডানার ঝট্‌পটানি বাড়ছে ক্রমশ বাড়ছে

ওরা কোচিনদেশী কাক

ওরা বোম্বাইয়ের বাদুড়

এই-ই সেই সময়, চলতে-চলতে দাঁড়িয়ে-যাওয়া সময়।

কার যেন অন্ত্যেষ্টি সেরে সবেমাত্র কলকাতায় ফিরেছে নীতা চক্রবর্তী

যখন বিয়ে হয় তখন ওর বয়স বারো, তেরো বছরে মারা যায় স্বামী, সন্তান জন্মায় ওর চৌদ্দ বছর বয়সে

বাবা এসেছিলেন দূর সিংহল থেকে

কিন্তু ওর শহর, ওর ঘর কলকাতাই

মানুষের যাবতীয় ধূসর শহরতলীর গন্‌গনে আগুনে-লাল ঘূর্ণি

ওর বাড়িটা

একটা অপরিচ্ছন্ন সরু প্রবেশপথ

চারদিকে উঁচু দেয়াল-দেয়া নোংরা চিলতে উঠোন

তিনটে ময়লা জীর্ণ আরাম কেদারাসমেত অপরিষ্কার দম-আটকানো একটা হল্-ঘর

ওর বোনের ভাঙা-ভাঙা কর্কশ কণ্ঠস্বর

নীতা

গিল্‌টি-করা সোনার রিমের চশমা পরে

কেক খেতে-খেতে নানানতর শখের কথা বলছিল ও : ঘোড়ায় চড়া, সাঁতার কাটা, নাচ

ওকে আরো অনেক কেক দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল আমার, কারণ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, ও ক্ষুধার্ত

অনেক অনেক দিন ধরে ও ক্ষুধার্ত

সম্ভবত, যেদিন ও সিংহল ছেড়েছিল সেইদিন থেকেই

ওকে আমার আরো অনেক কেক দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল

আর ওকে বলেছিলুম, আমি কখনো ঘোড়ায় চড়ি না, সাঁতার দিই না, নাচি না

প্রায় বলতে যাচ্ছিলুম যে আমার শখ হল, স্থিরবিন্দুতে দাঁড়ানো সময়

উত্তপ্ত লাল বালু

গন্‌গনে-আগুন মানুষের রক্তবর্ণ ঘূর্ণি

কার এক যৌবনের দূরতম দিন

"আলো আর অন্ধকার"

চৌরঙ্গির অসচ্ছল সবুজ গ্যাসবাতির নিচে ট্র্যামের অবর্ণনীয় ঘন্‌ঘনে আওয়াজ আর অসংখ্য মোটরকার ও বাসের ভেঁপুর শব্দে-মেশা একজোড়া ছেঁড়া চটি

যখন সবকিছুই আশ্রয়ের দিকে ধাবিত

যখন সমস্ত যানবাহন স্তব্ধ

আর স্টিআরিং হুইলের ওপর দুটো চোখ জ্বলজ্বল করে ওঠে

আর রাস্তার মোড়ে মোড়ে সঞ্চারিত কুয়াশা আর অন্ধকার ম্লান আলোর শ্বাস রুদ্ধ করে দেয়

আমি তো অনেক অনেক কেক দিতে চেয়েছিলুম ওকে

অধ্যাপক মশাই

নীতা চক্রবর্তীকে বড় এক-টুকরো কেক দিন, ও কোন্-এক সমস্যাসঙ্কুল অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থেকে ফিরে এসেছিল সমস্যাজর্জর

দিন ওই নীতাকে, যে ঘোড়ায় চড়ে

সাঁতার দেয়

নাচে

ভালোবাসা আর মৃত্যুর মধ্যে

মৃত্যু আর বিনষ্টির মধ্যে

তিনটে নোংরা আরামকেদারা শূন্য পড়ে আছে

ময়লা দম-আটকানো হল্-ঘরটা ফাঁকা

অন্তহীন অন্ধকারে ডুবে-যাওয়া কলকাতার ওপর গিল্‌টি-করা সোনার রিম্‌ওয়ালা পরকলা-দুটো জ্বলজ্বল করে

অধ্যাপক মশাই

আমরা এসে গেছি

পৌঁছে গেছি হোটেলে

দেখুন, লিফ্‌ট্‌বয়টি কী-রকম ফ্যাকাশে আর হল্‌দেটে

ও অমন টাল্‌ খেয়ে হাঁটছে কেন

লিফ্‌ট্‌ ছাড়বে বলে ঘুরে দাঁড়াল

পিঠের কাছে ওর কামিজটা রক্তে ভেজা

ঘাড় বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে

মনে হচ্ছে, যে-কোনো মুহূর্তেই ছেলেটা বুঝি টলে পড়ে যাবে

"র‍্যামোনা" রেস্তোরাঁ থেকে কি বাজনার সুর ভেসে আসছে, অধ্যাপক

লিফ্‌ট্‌ থামল

দরজা খুলে দিয়ে হাতটা উঠিয়ে প্রায়-অশ্রুত কণ্ঠে আমাদের শুভরাত্রি জানাল লিফ্‌ট্‌বয়

আমরা জানতে চাইলুম, ওর কী হয়েছে

নিচের তলা থেকে বাজনার আওয়াজ এখন বেশ উচ্চকণ্ঠ

কিছু না। লিফ্‌টের ফাঁকে মাথাটা আটকে গিয়েছিল

ঘাড়ের পিছনটা পিষে গিয়েছিল লোহার ডাণ্ডায়

আর তা থেকেই রক্ত, এখন রক্ত

শুভরাত্রি জানাই

শুভরাত্রি

শুভরাত্রি

অনুবাদ : মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

আশিস ঘোষ

স্বপ্ন

প্রায়-অন্ধকার ময়দানের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সজলের হঠাৎ মনে হলো, গতকাল রাতে ও কী যেন একটা স্বপ্ন দেখেছিল। আশ্চর্য, স্বপ্নটা এখন কিছুতেই মনে করতে পারছে না! শুধু এইটুকুই মনে আছে যে, সকালে ঘুম ভাঙার পর সবকিছু কেমন যেন অচেনা মনে হয়েছিল। বালিশে মুখ গুঁজে আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকতে চেয়েছিল সজল। ঘুমের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া স্বপ্নটাকে বারবার মনে করার চেষ্টা করেছিল।

ট্রামের জানলায় বসে ময়দানের অন্ধকার দেখতে দেখতে সজল এখন আবার সেই স্বপ্নটাকে মনে করার চেষ্টা করল। কিন্তু আশ্চর্য, ফুলের মিষ্টি গন্ধের মতো একটা সুখকর অনুভূতি ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পেল না। সকালে কিছুক্ষণ মনটা একটু খারাপ ছিল। তারপর কখন যেন আপনা থেকেই ভুলে গেছে সেই স্বপ্নের কথা। যথারীতি স্নান-খাওয়া সেরে অফিসে গেছে, নিয়মমাফিক কাজ করেছে সারাদিন, কিন্তু সেই স্বপ্নের কথা একবারও মনে পড়ে নি।

ট্রামের জানলা থেকে মুখ সরিয়ে নিল সজল। এলোমেলো ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা লাগছিল চোখে-মুখে, ট্রামের গায়ে কোন বিদেশী কোম্পানির বিজ্ঞাপনে একটা হরিণের ছবি ছিল। সবুজ প্রান্তরের বুক চিরে হরিণটা ছুটে চলেছে। দূর দিগন্তে মেঘের মতো অস্পষ্ট নীল পাহাড়ের সারি। ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল সজল। এই দৃশ্যের সঙ্গে সেই স্বপ্নটার কোথায় যেন একটা মিল আছে! মনে হয় এমন একটা বিশাল প্রান্তর ও যেন কোথায় দেখেছে। একপাশে বিরাট নদী আর অন্যদিকে এক প্রান্তর। মাঝখানের সরু রাস্তা দিয়ে ও হেঁটে চলেছে। কতক্ষণ ধরে হাঁটছে, কোথায় যাবে, কিছুই জানে না। ...স্বপ্নের এই অংশটুকুই মনে করতে পারল সজল। কিন্তু স্বপ্নটা যে কোথায় শুরু হয়ে কীভাবে শেষ হয়েছিল—কিছুই মনে

করতে পারল না। কেমন একটা চাপা অস্বস্তি অনুভব করছিল। সারাদিন অফিসের একঘেয়ে কাজ আর ভালো লাগে না। প্রায়-অন্ধকার ঘরটায় আলো নেই, কেমন যেন স্যাঁতসেতে গুমোট। লোকগুলো ফাইলের মধ্যে মুখ গুঁজে সারাদিন কাজ করে যাচ্ছে। আর অবিরাম টাইপ মেশিনের শব্দ। রুমাল দিয়ে বারকয়েক মুখ ঘষল সজল। সবকিছুই বড় বেশি একঘেয়ে মনে হয়। লোকগুলোর একেবারেই যেন ক্লান্তি নেই!

রাসবিহারীর মোড়ে ট্রাম থেকে নামল সজল। এখন ঠিক বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। এই সন্ধের সময়টায় বাচ্চাদের হৈ-চৈ, রেডিওর শব্দ, মশা আর বাড়ির পাশের কাঁচা ড্রেনের দুর্গন্ধ—সবকিছু মিলে একটা যেন বিভীষিকা তৈরি হয়। সজল যতটা পারে দেরি করে বাড়ি ফেরে। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে তবু কিছুটা নিশ্চিন্ত থাকা যায়। একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আয়নায় মুখ দেখল সজল। প্যাকেট বার করে একটা সিগারেট ধরাল। 'এখন কোথায় যাওয়া যায়?' ভাবতে ভাবতে সাদার্ন এভিনিউয়ের দিকে এগুতে থাকল। এদিকটায় লোকজন এমনিতেই একটু কম। নিয়নের অস্পষ্ট আলো আর কুয়াশায় সবকিছুই আবছা মনে হয়। ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছিল। মাঝখানের লনটা শুকনো পাতায় ছেয়ে গেছে। হাত তুলে ঘড়ি দেখল সজল। সন্ধ্যা সাতটা। 'বিনয়দের ওখানে একবার গেলে হয়।' এদিক-ওদিক তাকিয়ে সাবধানে রাস্তা পার হলো। 'অনেকদিন যাই নি, গেলে খুশি হবে নিশ্চয়ই!' ইতস্তত পড়ে থাকা শুকনো পাতার উপর দিয়ে হাঁটতে থাকে সজল। পায়ের নীচে একটানা একটা মচমচ শব্দ। মাঝে মাঝে দু-একটা পাতা গায়ে পড়ছিল।

বার দুয়েক কড়া নাড়তেই দরজা খুলল বিনয়ের স্ত্রী—'ওমা, আপনি!'

'অবাক হচ্ছেন বুঝি?' হাসল সজল।

'এদিকে তো আপনার দর্শন পাওয়াই ভার।' দরজা ছেড়ে একপাশে সরে দাঁড়াল মীরা—'অবাক হওয়াটা কি অস্বাভাবিক?' ঠোঁট ছড়িয়ে হাসল। হাসার সময় ওর গালে টোল পড়ে না।

'কর্তা আছেন?' সজল ভিতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ করল মীরা।

'যান, ভেতরেই আছে।' সুইচ টিপে বারান্দার আলো জেলে দিল।

তারপর কয়েক পা সামনে এগিয়ে, ঘুরে দাঁড়িয়ে রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

পায়ের জুতো খুলতে খুলতে ইচ্ছে করেই বারকয়েক গলার শব্দ করল সজল। তারপর নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। জানলার কাছে মাদুর পেতে কী একটা বই পড়ছিল বিনয়। পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল।

'আরে তুই ?'

'এতক্ষণে টের পেলি ?' মাদুরের একদিকে বসল সজল।

'কতক্ষণ এসেছিস ?'

'এই-তো।' রুমাল দিয়ে মুখটা একবার মুছে নিল সজল।

হাতের বইটা একপাশে সরিয়ে রাখে বিনয়—'তোর খবর কী বল ? অনেকদিন পরে এলি এবার।'

মুচকি হাসল সজল—'খবর বিশেষ কিছু নেই।' ডান হাতে ভর দিয়ে কাত হয়ে বসল। 'শেষ যেদিন তোর সাথে দেখা হয়েছিল, সেদিন যে অবস্থায় দেখেছিলি আজও সেই অবস্থাতেই আছি।' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা বার করে সামনে রাখল। 'বাড়ির আর কাউকে দেখছি না ?'

একবার হাই তুলল বিনয়—'বাবা রোজকার মতো ধর্মসভা করতে মিশনে গেছেন।' সজলের দিকে তাকিয়ে হাসল। 'টোপন আছে কোথাও, এক্ষুনি এসে পড়বে হয়তো।' উঠে গিয়ে দেওয়ালে ঝোলানো পাঞ্জাবির পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করল। তারপর দু-পা সামনে এগিয়ে জানলাটা বন্ধ করে দিল। অনেকক্ষণ ধরে একটু একটু করে ধোঁয়া ঢুকছিল। ঘরের আলোটা সেইজন্যেই বোধহয় ফ্যাকাশে হয়ে আছে। ডুমটার চারপাশে কুয়াশার মতো একটা আবছা ধোঁয়ার পর্দা ঝুলছে।

মীরা ঘরে ঢুকল হঠাৎ। দু-হাতে চায়ের কাপ। 'বাঃ, আসতে না আসতেই !' সোজা হয়ে উঠে বসল সজল।

'আর লজ্জা দেবেন না। কিই-বা আর দিতে পারছি।' গায়ের আঁচল ঠিক করছিল মীরা।

হাত বাড়িয়ে চায়ের কাপটা তুলে নিল সজল। বাইরের দরজায় শব্দ হচ্ছে।

'বসুন, আসছি। বাঁদরটা এলো বোধহয়।' দ্রুত পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বিনয়ের দিকে একপলক তাকিয়ে গেল মীরা।

দূরে কোথায় যেন শাঁখ আর কাঁসর ঘণ্টার শব্দ হচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে চোখ বুজে ঐ একটানা শব্দটা শোনার চেষ্টা করল সজল। বেশ ভালে লাগছে। ঠিক সন্ধের সময় অনেকদূর থেকে ভেসে-আসা ঐ ধরনের শব শুনলে মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে যায়। ইচ্ছে হয় শহরের কোনো নির্জ রাস্তা দিয়ে পায়ে পায়ে অনেকদূর হেঁটে যায়। এখন এই শব্দটা শুনতে শুনতে সজলের মনে হলো ও যেন কবে একবার এভাবে একাকী পথ চলেছিল

'কী ব্যাপার একেবারে চুপচাপ যে?' মীরার গলা শুনে চোখ খুলল সজল।

'টোপন আসে নি?' ঘরের কোণ থেকে সরে এসে মীরার সামনে দাঁড়াল বিনয়।

'সে তার কাজ করছে রান্নাঘরে।' খাটের একপ্রান্তে বসল মীরা—'সারাদিন একটু কি বসার উপায় আছে!'

—'কেন, মন্দ কি? এই তো ভালো, নিজের ঘরের কাজ করছেন।' সোজা হয়ে উঠে বসল সজল—'আমাদের মতো তো অন্যের কাজ করতে হয় না।'

'আপনারা তবু মাসের শেষে মাইনে পান।' যেন খুব একটা মোক্ষম জবাব দিয়েছে, এমন সপ্রতিভ মুখভঙ্গি করল মীরা—'আমাদের তো বিনে মাইনের চাকরি।'

'তা কেন? দু-বেলা খেতে-পড়তে পাও, হাত-খরচের জন্য কিছু চাইলেও দেওয়া হয়।' খাটের উপর পা তুলে বসল বিনয়। কথাটা শেষ করে একবার সজলের দিকে আর একবার মীরার দিকে তাকাল।

'শুনছেন কথার ছিরি!' মুখ ভার করল মীরা।

'যাই বলুন, কথাটা কিন্তু মিথ্যে বলে নি।' একটা বালিশ টেনে নিয়ে হেলান দিয়ে বসল সজল।

'তা তো বলবেন-ই!' মীরাকে একটু যেন অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

'জানিস সজল, মীরা খুব শীগ্‌গির বড়লোক হয়ে যাবে।' হাতের তেলোয় খানিকটা নস্যি ঢালল বিনয়।

'ত্যাখো, বাজে ইয়ারকি করবে না!'

'কেন, বাজে ইয়ারকির কি হলো?' শব্দ করে নস্যি নিল বিনয়—'যা সত্যি কথা তাই বললাম।'

'সব ব্যাপারে ঠাট্টা ভালো লাগে না।' মুখ গোঁজ করে আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল মীরা।

'খামখা চটিয়ে দিলি তো ?'

বিনয় হাসছিল—'ওটা চটা নয়, আসলে ও খুশীই হয়েছে।'

'ব্যাপারটা কী ?'

'আর বলিস কেন'—কাত হয়ে বসল বিনয়—'স্কুলের একজন আমাকে জোর করে একটা লটারির টিকিট গছিয়েছিল। আমি কোনোদিন ওসব ব্যাপারে যাই না। এবার কী মনে করে একটা টিকিট নিয়ে নিলাম।' হাত দুটো বুকের উপর জড়ো করল বিনয়—'ও এখন সেই টিকিটটাকে লক্ষ্মীর কৌটোর মধ্যে রেখেছে। রোজ ফুল ছোঁয়ায়।' ঠোঁট ছড়িয়ে হাসতে থাকে বিনয়—'এর মধ্যে একদিন কী যেন একটা স্বপ্ন দেখেছে। ওর ধারণা এবার ও জিতবেই।' কথাটা শেষ করে দু-হাত জড়ো করে মাথায় ঠেকাল—'সবই তাঁর ইচ্ছা।' হাসতে গিয়েও শেষটায় কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল বিনয়।

'তবে তুই-ও ওঁর মতো স্বপ্ন দেখছিস বল।' আঙুল দিয়ে ওকে একটা খোঁচা মারল সজল।

'বললাম যে, সবই তাঁর ইচ্ছে!' প্রসঙ্গটা এড়ানোর জন্য চতুরের মতো মুখভঙ্গি করে হাসছিল বিনয়।

সজল উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে দিল, আর খুলতেই এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা এসে লাগল চোখে-মুখে। গলিটা প্রায়-অন্ধকার। দু-পাশের বাড়িগুলি থেকে মাঝে মাঝে দু-এক ঝলক আলো এসে পড়ায় একটা কেমন আবছা অন্ধকার গলিটাকে রহস্যময় করে তুলেছে। রাস্তায় কাউকে দেখতে পেল না সজল। বড় রাস্তার ট্রাম-বাসের শব্দ মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে ভেসে আসছে। পাড়াটা কেমন যেন নির্জন। ঠিক সন্ধের পর সজল অনেকদিন অনুভব করে দেখেছে শহরটা কিছুক্ষণের জন্য একটু যেন ঝিম মেরে যায়। আর ঠিক এই সময়টায় ইচ্ছা হয়, একটা কোনো নির্জন ময়দানের একপ্রান্তে নিঃশব্দে একাকী দাঁড়িয়ে অন্ধকার ময়দানের জোনাকি ছাখে। চোখ বুজে সজল এখন এই নির্জনতাকে অনুভব করার চেষ্টা করছিল। পেছন থেকে বিড়বিড় করে বিনয় কী যেন বলছে, সজল ঠিক বুঝতে পারল না। রান্নাঘর থেকে মাঝে মাঝে অস্পষ্টভাবে মীরার

কণ্ঠস্বর ভেসে আসছে। পেয়ালা-পিরিচের শব্দ। কী যেন একটা পড়ে যাওয়ায় কিছুক্ষণ ধরে একটানা একটা ঝম্ ঝম্ শব্দ হতে হতে শব্দটা একসময়ে থিতিয়ে গেল। ক্রমশ ক্ষীয়মান শব্দটা শুনতে শুনতে এতক্ষণ পরে হঠাৎ গতরাতের সেই ভুলে যাওয়া স্বপ্নটার কথা আবার মনে পড়ে গেল সজলের। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর অনুভূতি মেরুদণ্ডের ভিতর শিরশির করে উঠল। কী আশ্চর্য, স্বপ্নের হারিয়ে যাওয়া সূত্রটা এখনো খুঁজে বার করতে পারছে না!

বিনয়দের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সজল আর ট্রামে বাসে উঠল না। একটা নির্জন রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকল। বেশ ঠাণ্ডা পড়েছে। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই বললেই হয়। হঠাৎ দু-একটা গাড়ি চলে যাওয়ায় মাঝে মাঝে পেট্রোলের গন্ধ পাচ্ছিল সজল। আরোহীবিহীন একটা রিকশা আসছে উল্টোদিক দিয়ে শব্দ করতে করতে। লাল একটা লণ্ঠন রিকশার নিচে দুলছে। 'আশ্চর্য, স্বপ্নটাকে কিছুতেই মনে করতে পারছি না!' লণ্ঠনের আলোটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল সজল। চাপা একটা অস্বস্তি ওকে অস্থির করে তুলেছিল। মীরার কথা মনে পড়ছে। লটারির টিকিট রেখেছে লক্ষ্মীর কৌটোয়। রোজ ফুল দেয়। ও একটা স্বপ্ন দেখেছে। বিনয়ও ওর মতো স্বপ্ন দেখছে বোধহয়। অথচ, এ স্বপ্নের কোনো মানে হয় না বললে, ওরা কিন্তু চটে যেত!

টালিগঞ্জের পোলের কাছে পৌঁছে একটা সিগারেট ধরাল সজল। অন্ধকারে ঝম্ ঝম্ শব্দে একটা মালগাড়ি যাচ্ছে। ফুটপাথে দাঁড়িয়ে উপরের চলন্ত গাড়িটার দিকে আনমনে তাকিয়ে থাকল সজল। 'ইশ্, আজকে ঘুমের মধ্যে আবার যদি সেই স্বপ্নটা খুঁজে পাই!' অস্থিরভাবে মাটিতে পা ঘষতে থাকে সজল। 'আশ্চর্য, সকালে ঘুম ভাঙার পরের সেই সুখকর অনুভূতিটাও আর ফিরে পাচ্ছি না!' ঘুমের মধ্যে দেখা সেই উজ্জ্বল সবুজ প্রান্তরের ছবি চোখ বুজে চিন্তা করতে থাকে সজল। 'সারাদিন পরে ক্লান্ত দেহে এখন বাড়ি ফিরছি। কালকেও ফিরব। প্রতিদিন একরকম ক্লান্তি নিয়েই কেটে যাবে!' ব্রীজের নিচের অন্ধকার সুড়ঙ্গের মতো পথটা সাবধানে পেরিয়ে ও-পাশে চলে গেল সজল। সোঁ সোঁ শব্দে একটা ট্রাম আসছে দূর থেকে।—'কোনোদিন যদি সেই সবুজ প্রান্তরে পৌঁছতে পারতাম!' দূর থেকে আসা ট্রামের লাল নীল আলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মনটা কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে গেল। আর ঠিক তখন হঠাৎ কিছুক্ষণ আগে দেখা সেই লাল লণ্ঠনটার ছবি মনে ভেসে উঠল। নির্জন রাস্তায় রিকশার মৃদু শব্দ আর আলোটা ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দুলছিল।

উমানাথ ভট্টাচার্য

রঙ্গ

চরিত্র

সমীর—যুবক	মানব—যুবক
ঘোষ—প্রৌঢ়	অমল—যুবক
রঘু—যুবক	হারাধন—প্রৌঢ়
সত্যেন—যুবক	রমাকান্ত—প্রৌঢ়
নিতাই—যুবক	বিজন—যুবক
বিশু—যুবক	চা-ওলা—কিশোর

সদানন্দ—কিশোর

মায়া—যুবতী	শ্যামা—যুবতী

[পর্দা উঠতে দেখা গেল, স্টেজ অন্ধকার; বাইরে দূরে কোথাও আলো আছে বোধহয়—তারই এক চিলতে এসে পড়েছে দেয়ালের এক কোণে। বাকী অংশ কিছুই দেখা যায় না]

[রঘুর প্রবেশ]

রঘু॥ ঠিক যা ভেবেছি, তাই; কোন মাক্ড়ার পাত্তা নেই।—আমি ছেড়ে দেব। কী দরকার ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াবার!—একটা লোক ঠিক সময়ে attendance দেবে না!...উঃ—

[রঘু আলো জ্বালতে গিয়ে সুইচ বোর্ডে হাত দিয়ে শক্ খায়। অন্ধকারের মধ্যে দুটি পুরুষ ও একটি নারী কণ্ঠের খিক্ খিক্ হাসি। রঘুর আর্তনাদ]

আঁ—আঁ—আঁ—

[ধুপ করে একটা শব্দ। স্টেজ তখনো অন্ধকার]

মায়া॥ ওমা! রঘুদা অজ্ঞান হয়ে গেল নাকি!

সমীর॥ চেল্লাসনি মায়া; চুপ করে বসে দেখ, কি হয়।

মায়া॥ ও মা! কি আবার হবে!

ঘোষ॥ স্ স্, আস্তে। কে যেন আসছে।

মায়া॥ ও মা! কে আসবে!

ঘোষ॥ আঃ! চুপ।

[গান গাইতে গাইতে সত্যেনের প্রবেশ]

সত্যেন॥ "মুরলী বাজে কেন বৃন্দাবনে—"

ঘোষ॥ দেশলাই আছে?

সত্যেন॥ কে!

[কোন জবাব নেই। আবার গান ধরে]

"মুরলী বাজে কেন বৃন্দাবনে……" উঃ—শালা পঞ্চাশ দিন বলেও একটা মিস্ত্রী ডাকিয়ে বোর্ডটা ঠিক করা গেল না। ঠিক আছে; আমি জ্বালব না আলো—সবাই একবার করে শক্ খাক, তবে বাবুদের গরজ হবে।—এখানে শুয়ে কে রে! [কোন জবাব নেই] কে শুয়ে?……কথা বলে না কেন!

[মায়া ফ্যাঁচ্ করে হেঁচে ফেলে। সত্যেন "বাবা গো" বলে হাউমাউ করে ছুটে পালায়। মায়া-সমীর-ঘোষ হেসে গড়ায়]

ঘোষ॥ এই চল, বাইরে যাই। আবার কে এসে পড়ে গোলমাল বাধাবে, দোষ পড়বে আমাদের ঘাড়ে। চল—

মায়া॥ কিন্তু রঘুদা—

ঘোষ॥ ও থাক। চল—quick—

মায়া॥ ও মা! থাকবে কি গো! অন্ধকারে একা পড়ে থাকবে?

ঘোষ॥ থাক না। তুই আয়।

[তিনজনের প্রস্থান। নিতাই ও বিশুর প্রবেশ]

নিতাই॥ দেখ বিশু, আমি বলেছিলাম—কেউ আসেনি।

বিশু॥ তাই তো দেখছি।

নিতাই॥ সাতটায় attendance—সাড়ে সাতটা বাজতে চলল—এখনো কারুর পাত্তা নেই।

বিশু ॥ বলে কি হবে! আমরাও তো এলাম দেরি করে।

নিতাই ॥ আমরা দেরি করেছি বলে আর সবাইকে দেরি করে আসতে হবে?—উঃ—

[নিতাই রঘুর গায়ে পা লেগে আছাড় খায়—
চেয়ার টেবিলের শব্দ হয়]

মাঝখানে শুয়ে কে রে?

বিশু ॥ আলোটা জ্বালো না।

নিতাই ॥ দেশলাই দে।

বিশু ॥ দেশলাই লাগবে কিসে? ওই তো ডানদিকে দরজার পাশে সুইচ্।

নিতাই ॥ ডানদিকে দরজার পাশে সুইচ্, আমি জানি।

বিশু ॥ তবে জ্বালো না।

নিতাই ॥ তুই জ্বাল।…এখানে শুয়ে কে?

বিশু ॥ উঃ—

নিতাই ॥ খেলি তো!

বিশু ॥ কালকের মধ্যে যদি এই বোর্ড ঠিক করা না-হয় তো পরশু থেকে আমি গ্রুপে আসা বন্ধ করব। রোজ কেউ-না-কেউ শক্ খেয়ে মরবে, অথচ কারুর এতটুকু গরজ নেই!

নিতাই ॥ গরজ করলেই পারিস।—জ্বাল, দেশলাই জ্বাল।

বিশু ॥ আমি সিগারেট খাই না।

নিতাই ॥ ঢং করিস না বিশু। তুই সিগারেট খাস কি না, আমি জানি। বের কর।

[বিশু দেশলাই জ্বালে। নিতাই সুইচ্ টিপে আলো
জ্বালে; পরক্ষণে পায়ের কাছে রঘুকে ওইভাবে
পড়ে থাকতে দেখে ছিট্‌কে দু-পা সরে আসে।
তারপর ধীরে ধীরে নীচু হয়ে রঘুকে দেখে]

রঘু!

বিশু ॥ [তারস্বরে] জল, জল—

নিতাই ॥ আঃ! গলাবাজি না-করে বাইরে যা; জল নিয়ে আয়।

বিশু ॥ ডাক্তার ডাকব?

নিতাই ॥ না। জল।

[বিশুর প্রস্থান]

রঘু! [রঘুর মুখের কাছে মুখ নিয়ে] রঘু! [রঘুর যেন ঘুম ভাঙল এমনিভাবে সে নড়েচড়ে উঠে বসে। নিতাইয়ের মুখের উপর চোখ পড়তে আবার হাউমাউ করে ওঠে। নিতাই ওর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনী দেয়] রঘু! এই রঘু! আমি—নিতাই। রঘু—[রঘু নিতাইয়ের মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে] কি হয়েছে? অমন করছিস কেন?

রঘু ॥ এমনি।

নিতাই ॥ এমনি!—অন্ধকারে ওভাবে শুয়েছিলি কেন?

রঘু ॥ এমনি।

নিতাই ॥ এমনি!

[রঘু হঠাৎ হা হা করে হেসে ওঠে]

রঘু ॥ [সহাস্তে] তোমরা বল, এ্যাকটিংটা আমার তেমন আসে না। ঘোষদা আমাকে পার্ট দিতে চায় না।—এইবার দেখলে তো, কেমন এ্যাকটিং করে দেখিয়ে দিলাম। [নিতাই ওর হাতটা টেনে নিয়ে নাড়ী দেখে] ও কি, হাত দেখছ কেন?

নিতাই ॥ [হাত ছেড়ে দেয়] এ্যাকটিংটা ঘোষদাকে দেখাতে পারলে পার্ট পেতি।

[একটা মাটির পাত্রে জল নিয়ে বিশুর দ্রুত প্রবেশ]

বিশু ॥ নিতাইদা, জল।

নিতাই ॥ খেয়ে নে।

বিশু ॥ খেয়ে নেব!

নিতাই ॥ না, থাক। [রঘুকে দেয়] তুই খা।

রঘু ॥ আমি জল খাব কেন?

নিতাই ॥ আবার কি দেখে হাউমাউ করে উঠবি—আগে থেকে জল-টল খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে রাখ। চা খাবি?

রঘু ॥ ধ্যাৎ!

[কথা বলতে বলতে মানব ও অমলের প্রবেশ]

মানব ॥ Colonialism আর Neo-colonialism—এ দুটোর বাইরের চেহারায় তফাৎ থাকলেও, আসল বস্তুটি যে এক—একথা মানো তো?

অমল ॥ মানি।

মানব ॥ তাহলে ?

অমল ॥ তাহলে কি ?

মানব ॥ তাহলে আমার কথাটাই সত্যি বলে প্রমাণ হলো না ?

অমল ॥ কই হলো ?

মানব ॥ হলো না ?

অমল ॥ নাঃ।

মানব ॥ তুমি যদি এখন জেগে ঘুমোতে চাও, সব বুঝেও কিছু না-বোঝার ভান কর,—তাহলে স্ট্যালিনের বাবারও ক্ষেমতা নেই তোমাদের বোঝায়।

অমল ॥ স্ট্যালিন কি বোঝাবে হ্যাঃ ? পোস্ট-ওয়ার পলিটিক্স-এ অতবড় বাংলিং করার পরেও তার কিছু বোঝাতে আসার ধৃষ্টতা আসে কোত্থেকে ?

মানব ॥ [অমলের মুখের কাছে মুখ নিয়ে] তাহলে কে বোঝাবে ? ক্রুশ্চেভ ?

অমল ॥ Sure.

মানব ॥ রেনিগেড্।

অমল ॥ Dogmatic Sectarians.

মানব ॥ সাম্রাজ্যবাদের লেজুড়।

অমল ॥ আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

মানব ॥ বলবি কি, অ্যাঁঃ ? বলার তোদের আছে কি ? সব তো কেনেডির পায়ে সঁপে দিয়ে এসেছে।

অমল ॥ খবরদার মানব ! খিস্তি করতে চাইলে আমি তোমার থেকে কম যাব না। সংযত হয়ে কথা বলো।

[হারাধনের প্রবেশ]

হারাধন ॥ কি ব্যাপার !…ও, শুরু হয়েছে ?

মানব ॥ সংযম ! সংযম কিসের রে ? Imperialist-এর লেজুড়-বৃত্তি করে যারা সমস্ত প্রগতিশীল আন্দোলনকে একেবারে ছড়কুটে দিলে, তাদের সম্পর্কে আবার সংযম কি ?

অমল ॥ ট্রট্স্কীর ভূত তোমাদের ঘাড়ে চেপেছে। Disrupters.

মানব ॥ এই খবরদার, Trotskyite বলবে না।

অমল ॥ বড় গায়ে লাগে, না ? বেশ করব, বলব।

মানব ॥ [তারস্বরে] রেনিগেড্।

[তারপরে আর ওদের কোনো কথা বোঝা যায় না; মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ওরা হাত-পা ছুঁড়ে সমানে চিৎকার করতে থাকে। নিতাই দু-একবার হুঙ্কার দেয়, কিন্তু তা শোনা যায় না। হারাধন চুপচাপ দাঁড়িয়ে কি দেখছিল; নিতাইকে হাত তুলে ইশারা করে; তারপর জল-সুদ্ধ মাটির পাত্রটা তুলে নিয়ে ওদের গায়ে ছুঁড়ে দেয়। মুহূর্তে ওরা স্তব্ধ]

মানব ॥ গায়ে জল দিলেন যে?

হারাধন ॥ ঝগড়া থামাবার জন্য। দুটো বেড়াল যখন ঝগড়া করে—ওদের গায়ে দিয়ে দেখেছি—ঝগড়া থেমে যায়।

মানব ॥ Silly.

অমল ॥ Infantile.

নিতাই ॥ [গর্জন] চুপ। ফের যদি একটা কথা শুনি তো স্ট্যালিন-ক্রুশ্চেভ কাউকে মানব না; দুটোকেই ঘাড় ধরে বের করে দেব। সাতটায় attendance, সাড়ে সাতটায় গা দোলাতে দোলাতে এসে এখন আবার গলা ফাটিয়ে politics করা হচ্ছে।—লজ্জা করে না?

হারাধন ॥ আহাঃ, সাতটায় আসব বললে সাতটায়ই আসতে হবে, এমন কথা কি স্ট্যালিন-ক্রুশ্চেভ কোথাও লিখে গেছে নাকি?

মানব ॥ ওকথা বলবেন না হারাধনদা। নিয়মানুবর্তিতা ছিল স্ট্যালিনের অন্যতম প্রধান গুণ।

অমল ॥ আর ক্রুশ্চেভ যেন কোনো নিয়মই মানত না!

বিশু ॥ [হারাধনকে] আর এক ভাঁড় জল নিয়ে আসব?

মানব ॥ আমি ওকথা বলিনি অমল, কদর্থ করো না। আমি বলছিলাম—

অমল ॥ তুমি কি বলছিলে, আমার জানা আছে। আসলে তুমি বোঝাতে চাও—

নিতাই ॥ [গর্জন] চুপ!···স্ট্যালিন-ক্রুশ্চেভের গু খেয়ে তোরা কি করছিস, অ্যাঁঃ? এখন কটা বাজে? লেট করলি কেন?

মানব ॥ লেট তো সবাই করেছে। তুমিও তো—

নিতাই ॥ সবাই করেছে বলে তুইও করবি?

হারাধন ॥ এটা ব্যক্তির যুগ নয় নিতাই, সমষ্টির যুগ। Socially conscious ওরা—সমষ্টিকে বাদ দিয়ে নিজের কথা আলাদা করে ভাবে কেমন করে বলো।

নিতাই ॥ ফুট্ কাটবেন না তো দাদা; ভালো লাগে না।—হতে পারে পুরনো নাটক; কিন্তু কালকে শো, আজ একবার অন্তত যদি রিহার্সাল না হয় তাহলে কাল কি নিয়ে স্টেজে দাঁড়াব বলতে পারেন?

হারাধন। রিহার্সাল হবে না, একথা তো কেউ বলছে না।

নিতাই ॥ কিন্তু হবেটা কাকে নিয়ে? বাবুদের রিহার্সাল রুমে আসতেই ইচ্ছে করে না। ··আবার politics হচ্ছে। গ্রুপটা যদি উঠে যায়—

মানব ॥ Politics নয় নিতাই—

নিতাই ॥ তবে ওগুলো কি হচ্ছিল শুনি?

মানব ॥ তুমি যাকে politics বলছ, আমার কাছে তা হচ্ছে—যাকে বলে—social consciousness. অর্থাৎ বাংলা করলে দাঁড়ায়—সমাজ-সচেতনতা। আর একথা তো ঠিক যে, সমাজ-সচেতনতা হচ্ছে একটা শিল্পীর সবচেয়ে বড় পুঁজি। অর্থাৎ যে-ব্যক্তি সামাজিক শক্তিগুলোর ঘাত-প্রতিঘাত তথা গতি-প্রকৃতি তথা থিসিস্-অ্যান্টিথিসিস্-সিন্থিসিস্ সম্পর্কে অবহিত অর্থাৎ সচেতন নয়, অথচ সে নিজেকে শিল্পী বলে ঘোষণা করছে—তাকে আমি শিল্পী বলেই স্বীকার করি না।

নিতাই ॥ তুই শিল্পী?

মানব ॥ নিশ্চয়।

নিতাই ॥ বুঝলি কিসে?

অমল ॥ মানবের ওকথাটা বোধহয় ঠিক হলো না।

মানব ॥ কোনটা?

অমল ॥ ওই যে বললে, থিসিস্-অ্যান্টিথিসিস্ না-বুঝলে সে আর শিল্পী নয়।—কথাটার মধ্যে sectarianism-এর গন্ধ পাওয়া যায়।

মানব ॥ তা তো পাবেই। Revisionism আর বলে কাকে।

অমল ॥ [রেগে] Balzac থিসিস্-অ্যান্টিথিসিস্ বুঝতেন না—politically তিনি ছিলেন রাজতন্ত্রের সমর্থক। কিন্তু তাই বলে কি শিল্পী ছিলেন না? আমাদের দেশে—

নিতাই ॥ অমল, ফের কথা বাড়াবি তো—এই বলে দিচ্ছি, আমি দুটোকেই একসঙ্গে লেবড়ে দেব।

[ঘোষের প্রবেশ]

ঘোষ ॥ কাকে লেব্ড়ে দিবি রে নিতাই ?—এই যে রঘু, কেমন আছিস ?

রঘু ॥ "কেমন আছিস" মানে ?

ঘোষ ॥ আহা, ভালো আছিস তো ?

নিতাই ॥ [ঘোষকে] এত দেরি করলেন কেন ? বাড়িতে কোনো—

ঘোষ ॥ দেরি ! কই দেরি করিনি তো।

[নিতাই ঘড়ি দেখে]

ওঃ ! আমি এসেছিলাম অনেক আগে। কেউ নেই দেখে একটু চা খেয়ে এলাম।

[মায়া ও সমীরের প্রবেশ]

মায়া ॥ আমরাও তাই।

নিতাই ॥ তা চা-টা এখানে আনিয়ে খাওয়া যেত না ?...একজন করে আসছেন, আর কেউ নেই দেখে চায়ের দোকানে গিয়ে আড্ডা জমাচ্ছেন। এদিকে ঘর ফাঁকা। সাতটায় আপনি রিহার্সাল ডেকেছেন—এখন বাজে পৌনে আটটা।

মায়া ॥ ও মা ! পৌনে আটটা হবে কেন ! [নিজের ঘড়ি দেখে] সাতটা চল্লিশ।

নিতাই ॥ খুব হয়েছে। এখন বসুন তো।

মায়া ॥ আবার মেজাজ দেখায় !

নিতাই ॥ সমীরবাবুকে তো কিছু বলাই যাবে না; ফিল্মে পার্ট করছেন—

সমীর ॥ দুঃখু করো না ভাই। লেগে থাকো, হবে—তোমারও হবে।

[মায়া হাসে। হাসি শুনে রঘু তড়াক করে উঠে দাঁড়ায়, একদৃষ্টে মায়ার মুখের দিকে চেয়ে দেখে। মায়া সঙ্কুচিত হয়]

মায়া ॥ ও মা ! আমি আবার কি করলুম !

হারাধন ॥ এই রঘু ! ওর দিকে অমন করে কী দেখছিস ?

রঘু ॥ ওই হাসি—

[মায়া আবার হেসে ফেলে, রঘু চমকে তার দিকে তাকায়, মায়া মুখে হাত চেপে গম্ভীর হয়]

হারাধন ॥ বস বস।…হাসি কি দেখার জিনিস না কি রে মুখ্যু, অ্যাঃ ?

রঘু ॥ না—

ঘোষ ॥ [হারাধন-রঘু-মায়াকে] হয়েছে ?

মায়া ॥ ও মা! কি আবার হবে!

নিতাই ॥ কিছু হয়নি। এবার দয়া করে ঘোষদার কথাগুলো শুনুন।

মায়া ॥ শুনব না বলেছি নাকি!

ঘোষ ॥ শুনুন। কাল কাঁকিনাড়ায় 'কাকের বাসা'র শো। পুরনো নাটক হলেও একবার ঝালিয়ে নেওয়া দরকার—এই জন্যে আজ রিহার্সাল ডাকা হয়েছে। এখুনি রিহার্সাল শুরু করব। কিন্তু তার আগে একটা কথা। আমি নিতাইয়ের বক্তব্য সমর্থন করি। অর্থাৎ, আমাদের যদি সত্যিই seriously কিছু করতে হয়, তাহলে attendance সম্পর্কে আমাদের আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

হারাধন ॥ সমাজ-সচেতন ?

মানব ॥ Vulgarise করো না হারাধনদা। আমি যা বলেছি—

হারাধন ॥ বেশ বেশ, আমি না-হয় কথা দিলাম—vulgarise করব না। কিন্তু তাতে কি তোদের Marxism-এর Vulgarisation বন্ধ হবে ?

মানব ॥ Marxism-এর vulgarisation মানে ? কে করেছে ?

হারাধন ॥ করেছে না, করছে; তোদের দাদারা—International big brothers.

[মায়া ও অমল সশব্দে হাসে]

রঘু ॥ আঃ! আপনি হাসছেন কেন ?

মানব ॥ বোকার মতো হেসো না অমল।

মায়া ॥ ও মা! হাসি পেলে হাসব না!

[আবার হাসে]

রঘু ॥ [উঠে দাঁড়ায়] উঃ—

নিতাই ॥ কি হলো ?

মানব ॥ [নিতাইকে] অমলের এই বোকার মতো হাসি দেখে—

নিতাই ॥ [জোড় হস্তে মানবকে] আপনাকে বলিনি স্যার—রঘুকে বলছিলাম। [রঘুকে] কি হয়েছে ?

রঘু ॥ [মায়াকে দেখিয়ে] হাসছে।

নিতাই ॥ মাথা-ফাতা খারাপ হয়ে গেল নাকি সব !

[মায়া আবার হাসে]

রঘু ॥ আঃ—[উঠে মায়ার কাছ থেকে সরে অন্যদিকে গিয়ে বসে ; সমীর মায়ার কাছে সরে যায়]

ঘোষ ॥ হয়েছে ?

সমীর ॥ বলুন বলুন, কি বলছিলেন।

ঘোষ ॥ হ্যাঁ, বলছিলাম—attendance সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

হারাধন ॥ [মানবকে] সচেতন নয়।

[গান গাইতে গাইতে সত্যেনের প্রবেশ]

সত্যেন ॥ "মুরলী বাজে কেন বৃন্দাবনে—"

[সবাই ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে গলার স্বর নামিয়ে দেয়, কিন্তু গুনগুন থামে না। একপাশে গিয়ে বসে]

ঘোষ ॥ আমি আমার বক্তব্যটা আর একবার repeat করি।—আমরা ঠিক করেছি, ভবিষ্যতে attendance সম্পর্কে আমরা আরো একটু সচেতন হব। কারণ—

সত্যেন ॥ কথাটা কি আমাকে বলা হলো ?

ঘোষ ॥ সবাইকেই বলা হলো।

সত্যেন ॥ কিন্তু আমি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে বলা হলো কেন ?

নিতাই ॥ কারণ তুমি একঘণ্টা লেট্ করে এসেছ।

সত্যেন ॥ লেট্ সবাই করেছে। আমি সোয়া সাতটায় একবার এসে গেছি। ঘর অন্ধকার। কেউ ছিল না।

ঘোষ ॥ কেউ ছিল না !

[সমীর ও মায়া হেসে ওঠে]

রঘু ॥ ওই—

[সবাই ওর দিকে তাকায়]

নিতাই ॥ কি ?

রঘু ॥ নাঃ, কিছু না।

ঘোষ॥ [সত্যেনকে] কিন্তু আর সবাই লেট্ করেছে বলে তুমিও লেট্ করবে, এটা কোনো যুক্তি হতে পারে না সত্যেন।

সত্যেন॥ তা পারে না। কিন্তু এ-বিষয়ে—আমি একা না—সবারই সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

ঘোষ॥ সেই কথাই তো বলছি।

সত্যেন॥ [ঈষৎ ক্ষুণ্ণ] তাই বলুন।

ঘোষ॥ আচ্ছা, আমরা বোধহয় সবাই এসে গেছি—এবারে রিহার্সালটা শুরু করতে পারি।…নাঃ, রমাদা আসে নি। আচ্ছা, কামাখ্যাদার কি হলো? উনি তো কোনোদিন লেট্ করেন না। হ্যাঁরে সমীর, কোনো খবর রাখিস? বাড়িতে কোনো বিপদ-আপদ ঘটে নি তো?

সমীর॥ কার কথা হচ্ছে?

ঘোষ॥ কামাখ্যাদা।

সমীর॥ [একটু ভেবে] নাঃ, শুনি নি কিছু।

ঘোষ॥ এতখানি বয়েস, family নিয়ে একেবারে জের-বার হয়ে আছে; তবু ছাড়বে না। বলে, আর কিছু পারি না, নাটকটা একটু-আধটু পারি—সুতরাং নাটকই করব। Because—I am committed. কার কাছে commitment রে বাবা! [সবাইকে দেখে নেয়] শ্যামাও তো আসে নি দেখছি। তার আবার কি হলো?

মানব॥ ক্ষেপ।

সমীর॥ Language please.

হারাধন॥ না, আক্ষেপে?

সমীর॥ আক্ষেপে নষ্ট করার মতো সময় তার নেই। পুরো একটি সংসার তার কাঁধে।

ঘোষ॥ কিন্তু রমাদা? তিনিও কি ক্ষেপ নাকি?

সমীর॥ হ্যাঁ। স্টেট ব্যাঙ্কে নাটক direction দিচ্ছেন।

[সত্যেন এক কোণায় গিয়ে বসেছিল]

সত্যেন॥ হারাধনদা!

হারাধন॥ বল।

সত্যেন॥ একটা কথা আছে। এদিকে আসুন।

[হারাধন উঠে যায়]

ঘোষ ॥ আশ্চর্য ! আড়াই বছর আগে একখানা নাটক লিখে ভেবেছেন—উনি শেক্‌স্‌পীয়রের ছোট ভাই ।—যা উনি করতে পারেন, তা করবেন না ; ফালতু কাজে—

[সমীর ও মায়া কি আলোচনা করছিল, সমীর হঠাৎ মুখ তোলে]

সমীর ॥ কার কথা হচ্ছে ?

ঘোষ ॥ রমাদা ।

সমীর । নোটিশ দেওয়া উচিত । এক মাসের মধ্যে নতুন নাটক দিতে না-পারলে গ্রুপ থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে ।

ঘোষ ॥ তাতে ওঁর ভারী বয়েই যাবে ।

[রমাকান্তের প্রবেশ]

রমা ॥ বিজন আসে নি ?

ঘোষ ॥ নাটক কোথায় ?

রমা ॥ [দেয়ালের গায়ে র‍্যাক দেখিয়ে] ওইখানেই তো ছিল ।

ঘোষ ॥ ও-নাটক আমরা পড়েছি, আজ আলোচনা করব । কিন্তু আমি বলছি, তোমার নাটক কোথায় ?

রমা ॥ আমার নাটক ! আমি কোনে নাটক দেবো বলেছিলাম নাকি !

ঘোষ ॥ জানি না । কিন্তু আড়াই বছর আগের লেখা তোমার শেষ নাটক—'কাকের বাসা' । অভিনয় করে পচিয়ে ফেলেছি । আচ্ছা, তুমি কি ভেবেছ, তোমার আর লেখার দরকার নেই ? শেক্‌স্‌পীয়র হয়ে গেছ ?

রমা ॥ শেক্‌স্‌পীয়রের পরে আর ভাবতে পারলি না তো ?

ঘোষ ॥ ভাবতে কেন, দেখতেই পাচ্ছি—তোমাকে !

[রমা সশব্দে হাসে]

রমা ॥ দেবো, দেবো । এবারে একখানা যা দেবো না—বুঝলে হারাদা, এবারে ফেঁদেছি একেবারে ধ্রুপদী স্টাইলে ; যাকে বলে—Pyramidal structure বোঝো ? তলা থেকে ক্রমশ—

সমীর ॥ ধ্রুপদ পরে হবে, আগে এক-আধখানা ঠুংরি দাও না দাদা, গ্রুপটা বেঁচে যায় ।

রমা ॥ কেন, গ্রুপ না-বাঁচার কি হলো ?

সমীর ॥ নাটকের গ্রুপ ; হাতে নাটক নেই । গ্রুপ বাঁচবে কি নিয়ে ?

রমা ॥ নাটক নেই, নাটক নেই করছিস কেন ? কাল যে নাটকটা পড়া হলো—সেইটা কর।

ঘোষ ॥ সে কথায় আসছি আমি।

রমা ॥ কিরে রঘু, ভুত দেখার মতো ওর দিকে অমন করে দেখছিস কি ?

[মায়া হাসে]

এতে হাসির কি হলো ?

মায়া ॥ ও মা ! হাসি পেলে হাসব না !

রমা ॥ হাসো। কিন্তু অমন দেঁতো হাসি না-হেসে একটু মুখ খুলে হাসো—আমরা শুনে তৃপ্তি পাই।

ঘোষ ॥ হয়েছে ? [হাতঘড়ি দেখে] কামাখ্যাদা এসে পড়বে নিশ্চই। তার আগে আমরা বরং কালকের ওই নাটকটা সম্পর্কে আলোচনাটা সেরে ফেলি। শুধু বসে থেকে কি হবে ? কি বলো, রমাদা ?

রমা ॥ তাই করো।

[সবাই নড়েচড়ে বসে]

সমীর ॥ নাটকের নামটা কি দিয়েছে যেন ?

ঘোষ ॥ 'পক্ষীরাজ'।

সমীর ॥ চলবে না।

ঘোষ ॥ কেন ?

সমীর ॥ আমাদের আগের নাটকের নাম ছিল 'কাকের বাসা'। এটার নাম 'পক্ষীরাজ'। আমরা কি পক্ষী-বিশারদ হতে চলেছি ?

রমা ॥ পক্ষীরাজ পাখি নয় সমীর—ঘোড়া। তুই নাটকটা নিয়ে আলোচনা কর।

সমীর ॥ কিন্তু এইরকম ভজখট নাম—

ঘোষ ॥ নাম নিয়ে আমাদের কোনো বিভ্রাট হবে না। দরকার হলে নাম আমরা পালটে দেবো। তুমি নাটক সম্পর্কে বলো।

সমীর ॥ নাটক সম্পর্কে আমি পরে বলব। আগে আর সবাই বলুক।

নিতাই ॥ তার মানে, নাটকটা তুমি শোনো নি। এই মায়া, তুই বল।

মায়া ॥ ও মা ! আমি আবার কি বলব !

নিতাই ॥ দেখুন ঘোষদা, কাল নাটক শোনার ওঁদের সময় হয় নি।—সারাক্ষণ ওই কোণায় বসে দুটোতে মিলে কি করো ! অ্যাঃ ?

মায়া ॥ ও মা! আমরা আবার কী করলাম!

রঘু ॥ আমি বলব?

ঘোষ ॥ বলো।

রঘু ॥ [গলা খাঁকারি দিয়ে] নাটকটা গোড়া থেকে যেভাবে আরম্ভ হয়েছে—মানে···চরিত্রগুলো—আ — situation — আ ··· নাটকটা আমার ভালোই লেগেছে।

রমা ॥ তুই কী বললি?

রঘু ॥ কেন! পরিষ্কার হলো না?

ঘোষ ॥ না, হলো না। আর একটু পরিষ্কার করো।

রঘু ॥ [আবার নড়েচড়ে গলা খাঁকারি দিয়ে] বেশ। আমার বক্তব্য হচ্ছে—চরিত্রগুলো আমরা চিনি।

[সবাই অপেক্ষা করে, কিন্তু রঘু আর কিছু বলে না]

ঘোষ ॥ তারপর?

রঘু ॥ আবার কি? ওই তো বললাম।

ঘোষ ॥ ব্যস?

রঘু ॥ ধ্যাৎ তেরি! তোমরা কিছু বুঝতে পারছ না। আমি বলছিলাম, চরিত্রগুলোর সঙ্গে দর্শকরা নিজেদের Identify করতে পারবে। আর তাহলেই সাক্‌সেশ্‌। অর্থাৎ আধুনিক নাটকের—

মানব ॥ আধুনিক নাটকের তুমি কি বোঝো?

রঘু ॥ না, আমি বুঝব কেন; তুমিই সব বোঝো।

অমল ॥ এই তোমাদের দোষ মানব। বড় বেশি অসহিষ্ণু।—ওকে বলতে দাও না।

মানব ॥ বেশ, বলো।

[রঘু চুপ করে থাকে]

রমা ॥ কি হলো, বলো।

রঘু ॥ না, আমি বলব না।

ঘোষ ॥ আহা, এর মধ্যে আবার রাগারাগির কি হলো!—বলো, বলো।

রঘু ॥ আমি বলছিলাম, আজকের দিনে মধ্যবিত্তের ট্র্যাজেডি এই নাটকে মোটামুটিভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আধুনিক নাটকে—

মানব ॥ মধ্যবিত্তের ট্র্যাজেডি ! পক্ষীরাজে ? হাঃ হাঃ—

রঘু ॥ হাসছ যে ?

মানব ॥ সরি। [কিন্তু খুক খুক করে তখনো হাসে]

রঘু ॥ ঠিক আছে, তুমিই বলো।

মানব ॥ না না, তুই-ই বল। [খুক খুক হাসি]

রঘু ॥ [ঘোষকে] আমার নাটকটা খারাপ লাগে নি, ব্যস। আমার আর কিছু বলার নেই।

ঘোষ ॥ মানব বলো।

মানব ॥ পক্ষীরাজের নায়ক এর-ওর কাছে চাকরির উমেদারি করে শেষপর্যন্ত চাকরি পেল না। ট্রামে-বাসে ভিক্ষে করতে নামল—কিন্তু শিক্ষিত ভদ্রসন্তানকে কেউ ভিক্ষে দিল না। মনের দুঃখে নায়ক গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল।—আচ্ছা, এর মধ্যে রঘু ট্র্যাজেডিটা পেল কোথায় ? ঘটনাটা প্যাথেটিক হতে পারে ; কিন্তু ট্র্যাজেডির নাম-গন্ধ এতে নেই।

নিতাই ॥ পরিষ্কার করো।

মানব ॥ ট্র্যাজেডি বলতে পারতাম, যদি দেখতাম—স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে তার জন্মগত অধিকার—অর্থাৎ খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার অধিকার অর্জনের জন্য পক্ষীরাজের নায়ক লড়তে লড়তে মৃত্যু বরণ করেছে। তা না, উল্টো আমরা কী দেখলাম ? গলায় দড়ি দিয়েই ক্ষান্ত হলো না ; Shadow-তে দেখানো হলো, তার অমর আত্মা পক্ষীরাজে চেপে আকাশপথে সুদূরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। কারণ, সে নাকি তখন মুক্ত।…Silly.

রমা ॥ এরপরে তুমি নিশ্চই Class struggle-এর কথা তুলবে ?

মানব ॥ তা, Ultimate analysis-এ class struggle এবং সমাজতন্ত্র ছাড়া যে এ-সমস্যার সমাধান নেই—এ তো জানা কথা।

রমা ॥ ও তো হলো সমাধানের কথা। ট্র্যাজেডির কি হলো ? ধরো, সত্যজিত রায়ের 'মহানগর' ছবিতে—ওঁর মনে কি ছিল আমি জানি না ;—তবে দেখে যা মনে হয়, মধ্যবিত্তের যে-ট্র্যাজেডি উনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন—

মানব ॥ কিভাবে ?

রমা ॥ এই যে প্রতিমুহূর্তে অন্যায়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে বেঁচে থাকা—

মানব ॥ 'মহানগর'-এর নায়ক-নায়িকা যুদ্ধটা করল কোথায় ? তাছাড়া,

মধ্যবিত্তের শ্রেণীগত অবস্থানের কথাটা যদি আমরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করি, তাহলে সিদ্ধান্ত একটাই দাঁড়ায়। আর তা হলো, মধ্যবিত্তের পক্ষে সত্যিকারের কোনো যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়।

রমা॥ কারণ?

মানব॥ তার পিছুটান। উত্তেজনার বশে দু-পা এগোতে পারলেও পরমুহূর্তেই সে তিন-পা পিছিয়ে আসবে। এইটাই তার শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য। সুতরাং, মধ্যবিত্ত জীবনের কাঁদুনি শুনিয়ে অযথা সময় নষ্ট করে কোনো লাভ নেই।

অমল॥ মানবের বক্তব্যটা পরিষ্কার হলো না। তুমি বলতে চাইছ—মধ্যবিত্তের ট্রাজেডির কথা বললে সময় নষ্ট করা হয়?

মানব॥ হ্যাঁ, তাই হয়।

সত্যেন॥ তোমার মুণ্ডু হয়।—শিশির ভাদুড়ী যোগেশের ভূমিকায় যখন স্টেজের সামনে এসে হাত পেতে বলতেন, "আমাকে একটা পয়সা দেবে?"—তখন সেটা কী হতো?

মানব॥ কী হতো?

সত্যেন॥ ঠিকমতো অ্যাক্টিং করতে পারলে রাজা-গজা সবার ট্র্যাজেডি ফোটানো যায়। ওদেশের পিটার ওটুলের অ্যাক্টিং দেখা আছে?

সমীর॥ কার কথা হচ্ছে?

সত্যেন॥ O'toole.

সমীর॥ অতুলপ্রসাদ তো গীতিকার। উনি আবার নাটক লিখলেন কবে?

নিতাই॥ অতুল নয়, গবেট Peter O'Toole.

ঘোষ॥ তার মানে, মানব বলতে চাইছে, পক্ষীরাজে কোনো ট্র্যাজেডি নেই?

মানব॥ ঠিক তাই। শ্রমিক-কৃষকের লড়াইয়ের কথা বাদ দিয়ে কেরানী-মধ্যবিত্তের প্যান্‌প্যানানি নিয়ে প্রগতি হয় না; যা হয়, তার নাম প্রগতির বিলাসিতা।

অমল॥ [উঠে দাঁড়ায়] আমি একটু পরিষ্কার হতে চাই।

ঘোষ॥ কে পরিষ্কার করবে?

অমল॥ আমি বলতে চাই—

নিতাই ॥ বলতে দেবেন না ঘোষদা, ওরা এই ছুতোয় আবার পলিটিক্স করার প্ল্যান করছে।

অমল ॥ ও বলল, মধ্যবিত্তের পিছুটান। কিন্তু—

নিতাই ॥ এখনো থামান ঘোষদা। দেখছেন না, ওর গলার শিরা দপদপ করছে? রিহার্সালের বারোটা বাজিয়ে এখুনি এটাকে কফি-হাউস বানিয়ে ছাড়বে।

রমা ॥ মানব-অমল—দুজনের কথা থেকে যেটা পরিষ্কার হলো—

অমল ॥ না না, আগে আমি পরিষ্কার করি।—ও যাকে বলল, পিছুটান; আমি তাকেই বলি ট্র্যাজেডি। মধ্যবিত্তের বৈষয়িক অবস্থান শ্রমিকের সঙ্গে—কারণ, সে wage earner; কিন্তু তার মানসিক অবস্থান বুর্জোয়ার সঙ্গে। এখন, এই অবস্থানগত বৈপরিত্য অর্থাৎ দ্বন্দ্বের ঘূর্ণিপাকে সে যে নিয়ত হাবুডুবু খেয়ে মরছে, প্রতিমুহূর্তের দোটানায়—

সমীর ॥ কার কথা হচ্ছে?

নিতাই ॥ হাবুডুবু।

সমীর ॥ আই বাস! এখুনি মায়ার সঙ্গে কথা হচ্ছিল, ক্রিকেটের বদলে ফিল্ম্ স্টারদের নিয়ে 'হাডুডুডু'র প্রতিযোগিতা চালু করলে—

রমা ॥ হাডুডু নয়, মুখ্যু,—হাবুডুবু।

সমীর ॥ কে খাচ্ছে?

রমা ॥ আমরা।

মানব ॥ কিন্তু এই হাবুডুবুর গল্প শুনিয়ে আমরা কি achieve করব অমল?

অমল ॥ গল্প শোনানো নয়। কথাটা পরিষ্কার করে বললে দাঁড়ায়—আমরা অর্থাৎ মধ্যবিত্তরা হাবুডুবু খাচ্ছি। আর এটা যদি মেনে নিই, তাহলে তার সঠিক শ্রেণীগত অবস্থানের কথা বলাটাই কি প্রধান দায়িত্ব হিসেবে দেখা দেয় না!

মানব ॥ মহান দায়িত্ব।

অমল ॥ বিদ্রূপ করো না মানব।

হারাধন ॥ ওদের বক্তব্য ওরা নিজেরাই গুলিয়ে ফেলেছে। আমি একটু পরিষ্কার করে বলি ঘোষ।

ঘোষ ॥ আবার পরিষ্কার!

অমল ॥ Middle class intelligentia is a potential ally of the working class.—লেনিনের এই কথাটা জানা আছে কি ?

মানব ॥ So what ?

রঘু ॥ বাংলায় বললি ? কিছু বুঝতে পারছি না। [মায়া হাসে। রঘু চমকে] এই !

হারাধন ॥ বোঝার দরকার নেই। চেপে যা।

অমল ॥ 'শ্রমিক-কৃষক' বলতেই অমন থেকে থেকে মূর্ছা যেও না ; কথাটা লেনিন কেন বলেছিলেন—বোঝবার চেষ্টা করো। Abstraction and absolution—

[মায়া হাসে]

রঘু ॥ আপনি হাসবেন না।

নিতাই ॥ এ আলোচনাটা শেষ করুন না ঘোষদা। আমরা রিহার্সাল শুরু করতে পারি।

অমল ॥ রিহার্সাল কি আমাদের জন্যে আটকে আছে নাকি ?

নিতাই ॥ হ্যাঁ, তাই আছে। এখন দয়া করে 'পক্ষীরাজ' সম্পর্কে তোমার মতামতটা জানালে বাধিত হই।

অমল ॥ Shadow-র ব্যাপারটা বাদ দিলে চলতে পারে।

বিশু ॥ বা বা, Shadow বাদ দিলে আর রইলটা কি ? বরং shadow থাকলেই বেশ ব্রেশ্‌টের নাটকের মতো—

রমা ॥ সে কি রে বিশু, তোর কি ব্রেশ্‌টের নাটকও দেখা আছে নাকি ? কোথায় হচ্ছে র‍্যা ?

নিতাই ॥ রূপালীতে।

অমল ॥ প্রগতিশীল আন্দোলনে বাঙালী মধ্যবিত্তের যে পজিটিভ কন্‌ট্রিবিউশন্—

মানব ॥ প্রগতিশীল শব্দটা বড় vague অমল। আর একটু পরিষ্কার করো।

নিতাই ॥ আমাদের আর পরিষ্কারে দরকার নেই। এবার এ আলোচনাটা বন্ধ হোক।

সমীর ॥ উনবিংশ শতাব্দীর নাটক—

সত্যেন ॥ আপনার চাল।

বিশু ॥ [অন্যমনস্কভাবে হঠাৎ গেয়ে ওঠে] "মা আমারে দয়া করে—"

[এ-ওর-তার কথা মিলে ছোটখাট হট্টগোল শুরু হয়। নিতাই উঠে দাঁড়ায়]

নিতাই ॥ [গর্জন] চুপ! চুপ! [সবাই চুপ করে] নাটক করতে এসেছে!—আড্ডা দিতে হয়—যা না, মাঠে যা; পয়সা খরচ করে ঘর ভাড়া নিয়ে এখানে কেন? নাটক করছে!—ঘেঁচু করছে।—প্রগতির তোরা কি বুঝিস রে?

[সবাই চুপচাপ]

ঘোষ ॥ হয়েছে?—রমাদা, আমি একটু বলি। আমি পক্ষীরাজ নিয়েই বলব নিতাই। ধরো, আমাদের মতো চাকুরে মধ্যবিত্ত প্রতিমুহূর্তে অন্যায়ের সঙ্গে সমঝোতা করে বেঁচে আছি। আছি তো? চোখের সামনে অনবরত অন্যায় ঘটতে দেখছি; কিন্তু কিছু বলার ইচ্ছে থাকলেও, বলার উপায় নেই। কারণ, বলতে গেলে আমার চাকরি নট্ এবং গুষ্টিসুদ্ধ উপোস।—এখন, এই যে প্রতিমুহূর্তে আপোষ করে বেঁচে থাকা—

মানব ॥ তুমি coward—তাই আপোষ করো, প্রতিবাদ করো না।

ঘোষ ॥ [মানবকে লক্ষ্য করে] আমি coward—এটা কি বললি! প্রতিবাদ করে আমি হয়তো শহীদ হতে পারি, কিন্তু তাতে ফল কিছু পাওয়া যাবে?

মানব ॥ ফল আজ না-পেতে পারো। কিন্তু তুমি আজ প্রতিবাদ করলে, কাল আর একজন করল, তারপর আর একজন, তারপর আর একজন,—এমনি করে ক্রমশ—

ঘোষ ॥ অনন্তকাল ধরে একটা একটা করে প্রতিবাদ চিত্রগুপ্তের খাতায় জমা হতে থাকবে। [সামনে ঝুঁকে] তুই তো রাজনীতি করিস। আমার মনের অবস্থাটা আমার একার না, সমস্ত মধ্যবিত্তের—এটা বুঝিস তো?

মানব ॥ বল।

ঘোষ ॥ প্রতিবাদগুলো একটা একটা করে মালিকদের বিরুদ্ধে ছুঁড়ে না-দিয়ে, সবাইকে একত্র করে যদি—

মানব ॥ কেন?

ঘোষ ॥ এর জবাব তো আমি দেবো না। বুকের মধ্যে জমাট আগুন নিয়ে

সেই দিনটির অপেক্ষায় থাকব। কারণ, [হেসে ফেলে] After all—আমি যে মধ্যবিত্ত রে। জবাব আমি দেব কেমন করে!

হারাধন ॥ মডার্ন কস্ট্যুম্-এ 'সাজাহান' বা 'গৈরিক পতাকা' করলে কেমন হয়?

নিতাই ॥ ধ্যাৎ! আলোচনা হচ্ছিল 'পক্ষীরাজ' নিয়ে, আপনি আবার এর মধ্যে 'সাজাহান' এনে ফেললেন। ও আলোচনাটা কি তাহলে শেষ হয়েছে?

হারাধন ॥ শেষ না-হলেও বুঝতে পারছি—'পক্ষীরাজ'-এর নো চান্স্।··· কি হল, সাজেস্‌সন্‌টা?

রমা ॥ আমি তো ভাবছি, কামাখ্যাদাকে হিরো করে একটা নাটক লিখব।

সমীর ॥ কিসের কথা হচ্ছে?

বিশু ॥ 'সাজাহান'—মডার্ন কস্ট্যুমে।

সমীর ॥ চলতে পারে।

বিশু ॥ আমার মত হচ্ছে, উনিশ শতকের আরও গোড়ার দিকের কোনো নাটক মঞ্চস্থ করা।

রমা ॥ কেন?

বিশু ॥ আমরা কি ছিলাম, সেটা আমরা দেখাতে পারব।

ঘোষ ॥ কেন, আমাদের দেখে কি আমরা কি ছিলাম, সেটা বোঝা যাচ্ছে না?

সমীর ॥ এটা ভালো কথা। পুরনো নাটক করলে গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে নাট্যোন্নয়ন খাতে আমরা কিছু টাকাও পেয়ে যেতে পারি?

অমল ॥ Nonsense. ফিল্মে ঢুকে শুধু টাকাটাই চিনেছ।

সমীর ॥ বাজে ব'কো না। টাকার আমাদের যথেষ্ট প্রয়োজন।

অমল ॥ বাইজীর দল খোলো না, অনেক টাকা পাবে।

সমীর ॥ I object.

ঘোষ ॥ আস্তে।···মায়া, তুমি কিছু বলবে?

মায়া ॥ ও মা! আমি আবার কি বলব!

ঘোষ ॥ ঠিক আছে, বলো না। সত্যেন?

সত্যেন ॥ [চমকে মুখ তোলে] অ্যাঁ! কি বলছেন?

ঘোষ ॥ পক্ষীরাজ সম্পর্কে তুমি কিছু বলবে ?

সত্যেন ॥ আমি ? হ্যাঁ।

ঘোষ ॥ ছোট করে বলো।

সত্যেন ॥ আমার মতে, শিল্পের সঙ্গে দৈনন্দিন রাজনীতির সম্পর্ক কি, তা ঠিক করার আগে শিল্প-রস—আমাদের ক্ষেত্রে নাট্যরস—ঘনীভূত হলো কি হলো না তা ঠিক করতে বসে রসের অনুভূতি এবং রসের ঘনত্ব—এর তুলনামূলক বিচার যদি না-করতে পারি, তাহলে শিল্প এবং রাজনীতির মাঝে যে ব্যবধান, অপরপক্ষে শিল্প ও রাজনীতির মধ্যে যে সেতু—অর্থাৎ রস—

[মায়া হাসে]

ঘোষ ॥ তাড়াতাড়ি বলো সত্যেন ; এরপর আমাদের রিহার্সাল আছে।

সত্যেন ॥ তাড়াতাড়িই তো বলছি।—হ্যাঁ, অর্থাৎ রস। রস যদি ঠিকমতো ঘনীভূত হয়, আর তা যদি আমাদের অনুভূতিকে সঠিকভাবে সিক্ত করতে পারে, তাহলে রাজনীতির সঙ্গে শিল্পের যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক সে বিষয়ে শিল্পগতভাবে—

ঘোষ ॥ ছোট করে বলো সত্যেন, আমরা কিছু বুঝতে পারছি না।

সত্যেন ॥ ছোট করে বলব ?…'পক্ষীরাজ' চলবে না। আমাদের আধুনিক নাটক চাই।

রমা ॥ চাই, কিন্তু পাচ্ছি কোথায় ?

সত্যেন ॥ কেন, এত লোক নাটক লিখছে—কিরণ মৈত্র, রমেন লাহিড়ী, অজিত গাঙ্গুলী, 'বৌদির বিয়ে'—না না—পিকলু নিয়োগী, বিভূতি মুখুজ্জে—

ঘোষ ॥ কিন্তু আধুনিক বিষয়বস্তু ও আধুনিক আঙ্গিকের সমন্বয়ে এদের কোনো নাটক কি সত্যিকারের সার্থক বাংলা নাটক হয়ে উঠতে পেরেছে !

মানব ॥ আধুনিক যুগটা কি, তাই এঁরা বুঝতে চান না—আধুনিক নাটক হবে কোত্থেকে ?

অমল ॥ উমানাথ ভট্‌চাজ্‌ ?

রমা ॥ ইঁট খাবার ইচ্ছে হয়েছে ?

রঘু ॥ ম্যাসে নেবে না।

বিশু ॥ বিজন ভট্‌চাজ্‌ কিম্বা দিগিন বাঁড়ুজ্জে ?

সমীর ॥ চলবে না।

মানব ॥ উৎপল দত্ত ?

অমল ॥ চলবে না।

ঘোষ ॥ তাহলে কি চলবে বলো।

[ফাইল ইত্যাদি হাতে নিয়ে বিজনের প্রবেশ]

বিজন ॥ কামাখ্যাদার আসতে দেরি হবে।

[সকলের মধ্যে ঈষৎ চঞ্চলতা]

ঘোষ ॥ কি হলো ?

বিজন ॥ ডেট্ ফিক্স্‌ড্। মিনার্ভা। ১০ই ডিসেম্বর।

হারাধন ॥ [ওপাশ থেকে] কোন্ নাটকটা করব আমরা ?

বিজন ॥ কোন্ নাটক মানে ? নতুন নাটক।

হারাধন ॥ ধ্যাৎ। আমাদের হাতে নতুন নাটক কোথায় ?

সত্যেন ॥ কিস্তি সামলান দাদা।

নিতাই ॥ [চমকে] কে রে !—ও, ঘরে জায়গা হয় নি, এখানে এসেছ কিস্তি সামলাতে ! দাঁড়াও—[উঠে দাঁড়ায়, ওদের দিকে এগোয়]

সত্যেন ॥ Please নিতাই। একটা দান। রিহার্সাল শুরু হলেই বন্ধ করে দেবো—কথা দিচ্ছি।…নিতাই ভালো হবে না কিন্তু—খবরদার—

[নিতাই পা দিয়ে দাবার ঘুঁটি উলটে দেয়]

এটা কি হলো ?

নিতাই ॥ লেব্‌ড়ে দিলাম।

সত্যেন ॥ লেব্‌ড়ে দিলি !—আমি যদি তোকে এবার লেব্‌ড়ে দি—[বলতে বলতে ওঠে]

নিতাই ॥ [বাঁ হাত তুলে প্রচণ্ড ধমক দেয়] বোস্।

[সত্যেন একমুহূর্ত থমকে থাকে]

সত্যেন ॥ আমি খেলব, বেশ করব—দেখি, কে ঠেকায়।

[সত্যেন ঘুঁটি সাজাতে আরম্ভ করে, নিতাই নিচু হয়ে দাবার ছকটা তুলে নেয়]

ভালো হবে না বলে দিচ্ছি।—রমাদা, বারণ করো ; শেষে কিন্তু রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।

নিতাই ॥ [সত্যেনের গাল টিপে আদর করে] কাকা—

হারাধন ॥ ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর খেলবে না। তুই যা ওদিকে।

সত্যেন ॥ মাস্তানি করার আর জায়গা পায় নি।

[নিতাই বোর্ডটা ছুঁড়ে দেয় সত্যেনের দিকে]

ঘোষ ॥ হয়েছে ?—বলো, বিজন।

বিজন ॥ পুরানো নাটক আমাদের হাতে যা আছে, তা দিয়ে organised show করা চলে না। আমাদের নতুন নাটক করতে হবে।

হারাধন ॥ নতুন নাটক পাচ্ছি কোথায় ?

বিজন ॥ পাচ্ছি কোথায় মানে! 'পক্ষীরাজ' টা করে ফেলুন।

হারাধন ॥ হ্যাঃ! 'পক্ষীরাজ' কি একটা নাটক হয়েছে ?

বিজন ॥ নাটক হয়েছে মানে! জানেন, বারোখানা নাটক লিখেছেন উনি! ওঁর নাটকগুলো আজ পর্যন্ত বত্রিশটা প্রাইজ পেয়েছে! তিনটে নাটকের edition হয়েছে! আশুবাবু, অজিতবাবু, সাধনবাবু তাঁদের নাটকের ইতিহাসে ওঁর নাটক নিয়ে ছ-পৃষ্ঠা, তের পৃষ্ঠা, সাত পৃষ্ঠা আলোচনা করেছেন! সবচেয়ে পপুলার নাট্যকার! আর আপনি বলতেছেন—ওটা কি একটা নাটক হয়েছে ? [তারস্বরে] get out !

হারাধন ॥ এই দেখ, আপনি আবার রেগে গেলেন।

বিজন ॥ রেগে গেলেন মানে! রাগের কথা বললে রাগ হবে না ?

হারাধন ॥ বেশ, আমি withdraw করছি।

অমল ॥ colonialism আর neo-colonialism—আসলে এক হলেও, তুমি কিন্তু explain করতে পারলে না।

মানব ॥ কি explain করব ?

ঘোষ ॥ নিতাই, 'পক্ষীরাজ'টা দে।

অমল ॥ classical রূপ ছেড়ে Neo রূপ ধারণ করতে হলো কেন ?

মানব ॥ যুগের দাবি।

অমল ॥ তবু স্বীকার করবে না যে, imperialism আজ আর দুনিয়ার ভাগ্য-বিধাতা নয়।

মানব ॥ revisionist 20th কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত তাই।

অমল ॥ তুমি মানো কি না।

মানব ॥ না, মানি না।

অমল ॥ তোমাদের মৃত্যু রোধ করবে কে!

মানব ॥ সেই স্বপ্নই দেখ।

ঘোষ ॥ স্বপ্ন বাড়িতে গিয়ে দেখো মানব। এখন রিহার্সাল শুরু হবে।—আচ্ছা, কামাখ্যাদার কি হয়েছে বলছিলে ?

বিজন ॥ কিচ্ছু হয়নি। আসতে দেরি হবে।

ঘোষ ॥ কেন ?

সত্যেন ॥ হারাধনদা !

হারাধন ॥ পরে শুনব সত্যেন। এখন না।

বিজন ॥ কামাখ্যাদা প্রেসে কাজ করে জানিস তো। হেড কম্পোজিটর।

সমীর ॥ কার কথা হচ্ছে ?

হারাধন ॥ কামাখ্যাদা।—মাইনে পায় কত ?

বিজন ॥ মাইনে পায় কত মানে ! দেড় শ টাকা, আপনি জানেন না ?

হারাধন ॥ মস্ত family শুনেছি। চলে কি করে ?

বিজন ॥ চলে না।

নিতাই ॥ ধ্যাৎ ! কাজের নামে নাম নেই, খালি ফালতু কথা।

[উঠে দাঁড়ায়]

ঘোষ ॥ বোস বোস, এখুনি কাজ শুরু করছি। [বিজন] দেরি হবে কেন ?

বিজন। ওদের প্রেসে কি একটা বই ছাপা হয়েছে—Press Act-এ পড়ে। পুলিশের সার্চ চলছে। খবর পেয়ে মালিক ফেরার।

রমা ॥ মালিকের প্রেস—মালিক ফেরার। কিন্তু কামাখ্যাদা ওখানে কি করছে ?

বিজন ॥ কামাখ্যাদা ওখানে কি করছে মানে ! উনি হেড কম্পোজিটর না !

রমা ॥ হলোই বা। মালিক নয় তো।

বিজন ॥ মালিক নয়তো মানে ! মালিক যদি না থাকে তাহলে প্রেসটা কার ? কার ?

রমা ॥ কার ?

বিজন ॥ যারা কাজ করে, তাদের না ? কামাখ্যাদা হেড কম্পোজিটার, মালিকের অনুপস্থিতিতে সব দায়-দায়িত্ব তার না ?

রমা ॥ কেন, ম্যানেজার নেই ?

বিজন ॥ ম্যানেজার নেই মানে! অত্তটুকু প্রেস তার আবার ম্যানেজার কিসের! মাথার চুলগুলো সব সাদা করে ফেলেছেন, দুনিয়ার সব বোঝেন আর এটা বোঝেন না!—[তারস্বরে] get out.

রমা ॥ থাক বাবা, ঘাট হয়েছে।

সমীর ॥ [মায়াকে] আজ গেট্ আউট্-টা বড্ড বেশি হচ্ছে, নারে মায়া?

মায়া ॥ ওমা! বেশি হবে কেন! রোজই তো এইরকম।

ঘোষ ॥ হয়েছে?

অমল ॥ আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীন দেশগুলো—

ঘোষ ॥ ব্যস, ব্যস। এখন আমরা রিহার্সাল শুরু করব।—সত্যেন, দেশলাই আছে?

সত্যেন ॥ [চমকে মাথা তোলে] কি! কে বললে কথাটা?

ঘোষ ॥ বলছিলাম, দেশলাইটা দে।

[সত্যেন পকেট থেকে দেশলাই বের করে, উঠে গিয়ে ঘোষকে দিয়ে আসে—কিন্তু দৃষ্টি তার সারাক্ষণ ঘোষের মুখের উপর নিবদ্ধ]

ঘোষ ॥ [সিগারেট ধরিয়ে] কি দেখছিস?

সত্যেন ॥ না, কিছু না।

[ঝোলা ব্যাগ কাঁধে—দ্রুত শ্যামার প্রবেশ]

শ্যামা ॥ [বসতে বসতে] আমি কিন্তু বেশিক্ষণ বসব না।

বিজন ॥ বেশিক্ষণ বসব না মানে! [তারস্বরে] get out.

শ্যামা ॥ কি! আপনি আমাকে get out বললেন?

বিজন ॥ get out বললেন মানে! কাল শো, রিহার্সাল ডাকা হয়েছে সাতটায়, আটটায় হাজির হয়ে আবার বলা হচ্ছে—বেশিক্ষণ বসব না। ইয়ার্কি পেয়েছ?

বিশু ॥ বয়েস কত হলো?

সমীর ॥ কার, কামাখ্যাদার? ষাটের কাছাকছি।

বিশু ॥ উৎসাহ আছে, বলতে হবে।

রমা ॥ না না, বিজন; তুমি কথাটা অন্যভাবে বলতে পারতে। বিনা কারণে শ্যামা কখনো লেট করে না।

বিজন ॥ লেট করে না মানে ! ও মহিলা-সমিতিতে যায় কেন ?

রমা ॥ তার সঙ্গে এর সম্পর্ক কি ?

বিজন ॥ সম্পর্ক কি মানে ! মহিলা-সমিতিতে গিয়ে বসে বসে আড্ডা দেবে, রিহার্সালে সময়মতো হাজির হবে না। পুরনো নাটক—অভিনয় ভালো না হলে লোকে মন্দ বলবে, বোঝে না। (তারস্বরে) get out.

সমীর ॥ কার কথা হচ্ছে ?

[শ্যামা বড় আঘাত পেয়েছে। মাথা নিচু করে বসে কাঁদছিল। এবার মুখ তোলে]

শ্যামা ॥ [কান্না জড়ানো গলায়] আমি যে কি ভাবে আসি, কেউ জানে না।...ঘোষদা director—উনি কিছু বলেন নি...আমাকে get out ! কেন, আমি কি...[আর বলতে পারে না, মাথা নিচু করে]

সমীর ॥ বিজনদা, আপনি ওকে get out বলেছেন ?

বিজন ॥ get out বলেছেন মানে ! দালালি করতে আসছে...

হারাধন ॥ ঘোষ, তুমি কিছু বলো।

বিজন ॥ ও কি বলবে ? ডিসিপ্লিন্ দেখার ভার আমার না ?

সমীর ॥ আমি জিজ্ঞেস করছি, আপনি ওকে get out বলেছেন কি না।

বিশু ॥ এই সমীর !

সমীর ॥ তুই থাম।—বলুন, বলেছেন ?

বিজন ॥ বলেছেন মানে ! আবার কৈফিয়ত চায় ?

নিতাই ॥ ডিসিপ্লিন maintain করার জন্যে যদি বলে থাকে—বেশ করেছে।

রমা ॥ তাই বলে ওই কথা ?

অমল ॥ বাজে কথা বলো না। কী অবস্থায় Third International তৈরি হয়েছিল—বোঝবার চেষ্টা করো।

সমর। তুমি বোঝ, আমার দরকার নেই।

সমীর ॥ [উঠে দাঁড়ায়] আমার একটা কথা। এখন একটা মিটিং হওয়া দরকার।

বিজন ॥ মিটিং মানে !

ঘোষ ॥ না না, মিটিং আবার কেন ?

সমীর ॥ গত শো-র হিসেবপত্র নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করতে চাই।

বিজন॥ আলোচনা মানে! হিসেব চায়?···হিসাব আমার কাছেই আছে। [পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করে] আমরা পেয়েছি আড়াই শো টাকা। ট্যাক্সি ছিয়ানব্বই টাকা। মাইক ৩৫ টাকা। লাইট ৭৫ টাকা। মেক আপ ১৭ টাকা, খাবার ২৫ টাকা। loss.

[মায়া, সমীর ও ঘোষ একসঙ্গে হাসে। রঘু উঠে দাঁড়ায়]

হারাধন॥ ব্যস হয়েছে তো? এবার রিহার্সালটা শুরু হোক।

সত্যেন॥ আপনার চাল।

নিতাই॥ আবার বসেছে?

[নিতাই উঠে সত্যেনের দাবার কাছে যায়; দুজনে গোলমাল বাধে]

ঘোষ॥ অঙ্কটা বিজনই দেখুক, ও সব আমাদের মাথায় ঢুকবে না সমীর।

সত্যেন॥ তোমরা ওদিকে কি রাজ-কাজটা করছ শুনি?

সমীর॥ আমরা proper accounts চাই।

বিশু॥ কে-কে চা খাবে?—এই চা খাবি?···

[বিশু ঘুরে ঘুরে সবাইকে জিজ্ঞেস করে—চা খাবে কি না। সবাই 'হ্যাঁ' বলে]

বিজন॥ আমারে চ্যালেঞ্জ করছে!

বিশু॥ এই সত্যেন, চা খাবি? এই সত্যেন, চা খাবি? এই সত্যেন—

সত্যেন॥ খাব, খাব।

বিশু॥ কাপে খাবি না, ভাঁড়ে খাবি? এই সত্যেন—

সত্যেন॥ ভাঁড়ে, ভাঁড়ে।

শ্যামা॥ আমি গ্রুপে থাকব না।

ঘোষ॥ দেশলাই আছে?

সত্যেন॥ কে! কে বলল কথাটা?

ঘোষ॥ আমি। দেশলাই আছে?

সত্যেন॥ ও, তাহলে তুমিই অন্ধকারে বসে···আজ সবার আগে কে এ ঘরে এসেছিল—আমি জানতে চাই।

রঘু ॥ আমিও জানতে চাই, অন্ধকার ঘরে বসে ওরা তিনজনে কী করছিল। আমরা এদিকে শক্ খেয়ে মরি, আর ওরা—

মায়া ॥ ও মা! আমরা আবার কী করলাম।

রঘু ॥ I demand—

সমীর ॥ proper accounts না-পেলে—

ঘোষ ॥ কিন্তু রিহার্সালটা আজ না-হলে—

হারাধন ॥ কালকের শো কি হচ্ছে? না-হলে বলো, বাড়ি চলে যাই।

ঘোষ ॥ কামাখ্যাদা—

বিজন ॥ Get out—

[এদের আর কোনো কথা বোঝা যায় না। কয়েকটি গ্রুপে ভাগ হয়ে সবাই উত্তেজিত আলোচনায় মাতে। পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলা। ওরই মধ্যে একজন শক্ খায়। চা-ওলা এক হাতে অনেকগুলো খুরি, অন্য হাতে একটা কেটলি নিয়ে ঢোকে—একজনের ঠেলা লেগে খুরি-কেটলি পড়ে যায়। চা-ওলা হাত-পা নেড়ে অনেক কিছু বলে চলে যায়। গ্রুপগুলির সরব আলোচনা পঞ্চগ্রামে ওঠে। একটি কিশোরের প্রবেশ। সে এর-ওর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে। এরাও একে-একে ওকে দেখতে পায়—একে-একে সবাই থেমে যায়, লোকটিকে দেখে। স্তব্ধতা]

—আপনি কে?

লোকটি ॥ আমি সদানন্দ চট্টোপাধ্যায়।

রমা ॥ চেনা মুখ মনে হচ্ছে!

বিজন ॥ কি চাই?

সদানন্দ ॥ আমার বাবা—

বিজন ॥ কে আপনার বাবা?

সদানন্দ ॥ শ্রীকামাখ্যাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

রমা ॥ আগেই বলেছি—চেনামুখ। [এগিয়ে আসে] কি হয়েছে? বাবা আসতে পারবে না?

সদানন্দ ॥ না। খানিক আগে প্রেস থেকে বাবাকে পুলিশে ধরে নিয়ে

গেছে। আপনাদের কাছে খবরটা পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। কাল নাকি আপনাদের অভিনয়—

[রমা কেমন হয়ে যায়। নিতাই সক্রোধে টেবিলে একটা ঘুসি মেরে উঠে দাঁড়ায়—ওপাশে যায়। থমথমে স্তব্ধতা]

রমা ॥ কামাখ্যাদা আর কিছু বলে যান নি ?

সদানন্দ ॥ না।

রমা ॥ correct. এই একটিমাত্র কথাই তাঁর মাথায় এসেছে ; কারণ, he is committed—দর্শকের কাছে, জনতার কাছে···অঙ্গীকারে আবদ্ধ।—তুমি যাও সদানন্দ।

[সদানন্দর প্রস্থান]

এখন কি করবে বিজন ?

বিজন ॥ কি করবে মানে ! শো cancel করা হবে।

[রমা হো হো করে ওঠে। হাসি আর তার থামতে চায় না। মানব এগিয়ে আসে—রমার গায়ে হাত দেয়।]

মানব ॥ রমা দা ! রমা দা !

[রমা হাসিমুখে ওর দিকে তাকায়]

অমল বলছিল, কামাখ্যাদার পার্টটা ওর মুখস্ত আছে। একটা রিহার্সাল পেলে—

রমা ॥ তুই কি বলিস ?

মানব ॥ ও পারবে রমাদা। [অমলকে] কি রে, পারবি না !

রমা ॥ [হাসির ভাবটা তখনো রয়েছে] কিন্তু ওটা যে বুড়োর পার্ট ?

অমল ॥ আমি পারব রমা দা।

[রমা গম্ভীর হয়। এক মুহূর্ত ভাবে। সবাই উদ্‌গ্রীব]

রমা ॥ হ্যাঁ, পারবি।···কি রে, তোরা কি বলিস ?

নিতাই ॥ তোরা কি বলিস মানে ! নাটক করতে এসেছি, করব—ব্যস। এর মধ্যে আবার বলাবলির কি থাকতে পারে !

[সকলের সরব সমর্থন]

মানব ॥ তার মানে, একা কামাখ্যাদাই নয়, আমরা সবাই committed. —তাই না, নিতাই? [হাসে]

নিতাই ॥ তোর কথা আমি কিছু বুঝতে পারি না বাবা।

ঘোষ ॥ ঠিক আছে। দশ মিনিট recess. চা-ফা খেয়ে এসো চট্ করে। এখুনি রিহার্সাল শুরু করব।…মনে রেখো, আজ কিন্তু রিহার্সাল একটু বেশিক্ষণ চলবে।

হারাধন ॥ চলো শ্যামা।

শ্যামা ॥ চলুন।—বিজনদাটা না ভারি ইয়ে—

বিজন ॥ রিহার্সাল শুরু হবে মানে!

[কয়েকজন বিজনের সামনে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে গেয়ে ওঠে—"আর দেরী নয়, ধর গো তোরা হাতে হাতে খড়্গ—" সবাই হাসে। একে দুয়ে অনেকের প্রস্থান।

নিতাই, অমল, ঘোষ, মানব ও রমা চেয়ার-টেবিল দিয়ে রিহার্সালের জন্যে সেট্ সাজাতে থাকে]

॥ যবনিকা ॥

শঙ্কর চক্রবর্তী

পৃথিবীর চাঁদ

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা পৃথিবীকে তার যে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহটি উপহার দিয়েছিলেন ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর তারিখে, তার নাম রাখা হয়েছিল—'ইস্কুত্‌ভেনি স্পুট্‌নিকি জেমলি'। কথাটি রুশভাষায়, বাংলা অর্থ দাঁড়ায়—পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী কৃত্রিম সহযাত্রী। আমাদের পৃথিবীর স্বাভাবিক সহযাত্রীটি হল চাঁদ। এই চাঁদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছোটানো হয়েছিল বলে বিজ্ঞানীদের হাতে গড়া ঐ খোকাচাঁদটির নাম তাই রাখা হয়েছিল কৃত্রিম সহযাত্রী—কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুট্‌নিক।

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা এপর্যন্ত পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন সাড়ে তিনশ'র মতো কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ত্রিশজনের মতো মহাকাশযাত্রীকে মহাকাশে পাঠিয়ে তাদের নিরাপদে ফিরিয়ে এনেছেন। পৃথিবীর নকল চাঁদেরা কিন্তু আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। পৃথিবীর আসল চাঁদটি সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই। সম্প্রতি সোভিয়েত স্বয়ংক্রিয় স্টেশন লুনা-৯-এর চাঁদে নিরাপদে অবতরণের ঘটনা, লুনা-১০-এর কৃত্রিম উপগ্রহরূপে চাঁদের চারদিকে ঘুরতে থাকা এবং আমেরিকান মহাকাশযান সার্ভেয়ারের চাঁদে অবতরণ প্রভৃতি ঘটনাগুলো চাঁদ সম্বন্ধে আমাদের অনেক দিনের কৌতূহলটাকে আরো বাড়িয়েই তুলেছে। মহাকাশ অভিযানে পৃথিবীর দুটি অগ্রণী দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকার বিজ্ঞানীরা পরবর্তী যে বড় প্রোগ্রামটিকে কাজে রূপ দেবার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন, তা হল—এই চাঁদের জমিতে মানুষকে নিরাপদে নামানো। পূর্ববর্তী এবং আধুনিক গবেষণার মাধ্যমে চাঁদ সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছুই জানতে পেরেছি। বর্তমান প্রবন্ধে তারই একটি মোটামুটি আলোচনা আমরা করব।

চাঁদের পরিচয়পত্র

সৌরজগতে চাঁদের সংখ্যার দৌলতে অন্যান্য গ্রহের তুলনায় পৃথিবীর গর্ব করার কিছু নেই। মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন এই পাঁচটি

গ্রহের পরিবারে চাঁদের সংখ্যা হল যথাক্রমে দুই, বার, নয়, পাঁচ ও দুই। পৃথিবীর সবেধন নীলমণি একটিমাত্র চাঁদ—ইনি অবশ্য ভর (মাস্) ও মাপের বিচারে অন্য সবকটি চাঁদের উপরেই টেক্কা মেরে বসে আছেন।

পৃথিবীর চাঁদটি মাপে অবশ্য তার গ্রহটির তুলনায় অনেক ছোট। ব্যাস মোটে ২১৬০ মাইল—পৃথিবীর ব্যাসের ১/৪ ভাগের চেয়ে একটু বেশি। চাঁদের আয়তন (ভল্যুম্) পৃথিবীর আয়তনের ১/৫০ ভাগ, ভর পৃথিবীর ভরের ১/৮১ ভাগ। সেই আনুপাতিক হিসেবে দেখা যাচ্ছে, চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বলের পরিমাণ দাঁড়াবে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের ১/৬ ভাগ। পৃথিবীর জমিতে একটি বস্তুর যা ওজন, চাঁদে হবে ঠিক তার ১/৬ ভাগ। অর্থাৎ পৃথিবীতে যে মানুষের ওজন ১১/২ মণ, চাঁদে সে ওজন দাঁড়াবে ১০ সেরের মতো। চাঁদের বস্তুর গড়পড়তা গুরুত্ব (অ্যাভারেজ ডেন্সিটি) পৃথিবীর শতকরা ৬০ ভাগ। চাঁদের আকার পৃথিবীর তুলনায় ছোট হওয়ার জন্যে চাঁদের দিগন্ত হবে অনেক কাছে—মাত্র দেড় মাইল দূরে, পৃথিবীতে যে দূরত্বের মাপটা হল তিন মাইল।

চাঁদ এক উপবৃত্তাকার কক্ষপথে পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে চলেছে। চাঁদ কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্রের চারদিকে ঘুরছে না। চাঁদের পরিক্রমাপথের কেন্দ্র পৃথিবীর মধ্যে ; কিন্তু পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে তা ২৮৮৬ মাইল দূরে। ঐ কেন্দ্র থেকে চাঁদের কক্ষপথের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দূরত্ব হল ২,৫২,৭৬০ ও ২,২১,৪৬৩ মাইল। গড়পড়তা দূরত্ব তাহলে দাঁড়ায় ২,৩৮,৮৫৭ মাইল।

চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই, সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করেই চাঁদের জ্যোৎস্নার সৃষ্টি—এ আমরা সবাই জানি। পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা। কিন্তু পৃথিবীও যেহেতু সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, তার ফলে এক অমাবস্যা (চাঁদ যে সময়টা সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করে) থেকে আর-একটি অমাবস্যা পর্যন্ত সময়ের মাপ দাঁড়ায় ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা।'

চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে একবার ঘুরে আসতে যে সময় নেয়, তার মধ্যে চাঁদ নিজের অক্ষের চারদিকেও একবার ঘুরে আসে। যার ফলে চাঁদের একটিমাত্র পিঠই আমরা বরাবর দেখতে পাই। একটি ছোট পরীক্ষায় ঘটনাটা সহজেই বোঝা যাবে। ঘরের মাঝখানে একটি আলো রেখে তার চারপাশে ঘোরা যাক। ঘোরার সময় খেয়াল রাখতে হবে, যেন আমাদের সামনের দিকটাই আলোর দিকে ফেরানো থাকে, পেছনের দিকটা নয়। আলোটাকে

একবার সম্পূর্ণ ঘুরে এলে দেখা যাবে, ঐ সময়টুকুর মধ্যে আমরা নিজেদের মেরুদণ্ডের চারদিকেও একবার ঘুরে এসেছি, অথচ আমাদের একটা দিকই বরাবর আলোর দিকে ফেরানো ছিল। চাঁদ ঠিক এক কায়দায় পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। পৃথিবীকে পরিক্রমার সময় চাঁদের থালাটা একপাশ থেকে আর একপাশে খানিকটা আন্দোলিত হয়। এই আন্দোলনকে বলা হয় লাইব্রেসন। এর জন্যে চাঁদের থালার অর্ধেকের চেয়ে খানিকটা বেশি জায়গা (শতকরা প্রায় ষাট ভাগ) আমাদের চোখে পড়ে।

চাঁদে অভিযানের ঘটনাপঞ্জী

১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা চাঁদের থালাটার উপর একটি পূর্বনির্দিষ্ট জায়গায় লুনা-২ রকেটটি ছুঁড়ে মারেন। রকেটটি ভেঙে চুরমার হয়ে যায় কিন্তু সেটি চাঁদের জমিকে স্পর্শ করবার আগেই তার মধ্যে থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের একটি প্রতীকচিহ্ন বার করে এনে নিরাপদে চাঁদের জমিতে নামানো হয়। সেটি এখনও চাঁদের বুকে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানীরা ১৯৫৯ সালের অক্টোবর এবং ১৯৬৫ সালের জুলাই মাসে লুনা-৩ ও জোন্দ্-৩ নামে দুটি স্বয়ংক্রিয় মহাজাগতিক স্টেশন চাঁদের উলটোদিকে পাঠিয়ে টেলিভিসন ক্যামেরার সাহায্যে সে পিঠের ছবি তুলে নিয়ে এসেছেন।

১৯৬৪ সালের জুলাই ও ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে আমেরিকার বিজ্ঞানীরা রেঞ্জার নামে তিনটি মহাকাশযান একের পর এক পাঠিয়ে খুব কাছাকাছি থেকে চাঁদের জমির প্রায় ৬০০০ ছবি তোলবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

চাঁদে অভিযানের পরের ঘটনাগুলো একটু নাটকীয় রূপ নিতে শুরু করে। ১৯৬৬ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি রুশ বিজ্ঞানীরা লুনা-৯ নামে একটি স্বয়ংক্রিয় স্টেশনকে নিরাপদে চাঁদের জমিতে নামিয়ে এক মস্ত জটিল পরীক্ষাকাজকে সফল করে তুললেন। এ বছর ৩রা এপ্রিল তাঁরাই আবার আমাদের প্রিয় চাঁদকে লুনা-১০ নামে একটি চমৎকার জিনিস উপহার দিলেন—একটি খোকাচাঁদ, অর্থাৎ চাঁদেরই একটি কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্পুট্নিক।

আমেরিকান বিজ্ঞানীরা এ-বছর ২রা জুন সার্ভেয়ার নামে একটি স্বয়ংক্রিয় স্টেশনকে নিরাপদে চাঁদের জমিতে নামিয়েছেন।

এই স্বয়ংক্রিয় স্টেশনগুলোর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তাদের কলকাঠির নড়াচড়ায় ইতিমধ্যেই বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য বিজ্ঞানীদের হাতে পৌঁছে দিয়েছে। তাঁদের পরবর্তী চাঁদে অভিযানের পরিকল্পনা তৈরির কাজে এই তথ্যগুলো বিশেষভাবে সাহায্য করবে, সন্দেহ নেই। চাঁদের জমির গঠনপ্রকৃতির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে এবারে আমরা আলোচনা করব।

চাঁদের জ্বালামুখ

জ্যোৎস্নারাতে দূরবীণ দিয়ে চাঁদের থালাটার দিকে তাকালে আমরা আংটির মতো গোল গোল চেহারার অনেকগুলো গঠন দেখতে পাব। এদের বলা হয় ক্রেটার বা আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ। এরা প্রায় সবাই এখন ঠাণ্ডা হয়ে বসে আছে বলে বেশির ভাগ চান্দ্রবিজ্ঞানীর ধারণা। এদের উচ্চতাও নেহাত কম নয়। চাঁদের দক্ষিণমেরুর কাছে 'আইজাক নিউটন' নামে একটি জ্বালামুখ রয়েছে, এর উচ্চতা প্রায় ২৯০০০ ফুট। ঐ একই অঞ্চলে ক্লেভিয়াস নামে যে-জ্বালামুখটি রয়েছে, তার পাথরের দেয়ালের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্যন্ত ব্যাস হল ১৪৬ মাইল। আকারে জ্বালামুখগুলোর মধ্যে এটিই সর্ববৃহৎ। কলকাতার মতো গোটাকয়েক শহরকে স্বচ্ছন্দে ওর মধ্যে পুরে ফেলা যায়।

ছোট-বড় মিলিয়ে চাঁদের মোট জ্বালামুখগুলোর সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় ৩২০০০-এর মতো। চাঁদের থালাটা জুড়ে এরা সবাই বিভিন্ন সরলরেখার আকারে সারিবদ্ধ হয়ে আছে। জ্বালামুখগুলোর অবস্থানের মধ্যে এ-জাতীয় একটি চমৎকার শৃঙ্খলার সন্ধান পেয়ে ওদের উৎপত্তি সম্বন্ধে চান্দ্রবিশেষজ্ঞরা দুটি তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন। একটি তত্ত্বের বক্তব্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, চাঁদের জীবনের প্রাথমিক অবস্থায় হাজার হাজার উল্কা এসে তার জমির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। উল্কাদের আঘাতে লক্ষ লক্ষ টন পাথর শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে গিয়ে শূন্য স্থানগুলোয় সৃষ্টি হয়েছিল ঐ জ্বালামুখগুলো।

এই ধারণার জবাবে পালটা যে-তত্ত্বটি হাজির করা হয়েছে তার মতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গারই হল জ্বালামুখগুলোর উৎপত্তির কারণ। আজকের ঠাণ্ডা, মৃত আগ্নেয়গিরিগুলো একদিন ছিল জীবন্ত অবস্থায়। তখন মাঝে মাঝেই তারা ফুঁসে উঠত এবং বিপুল পরিমাণে জ্বলন্ত পাথর ও লাভার (পাথরের গলিত স্রোত) স্রোত বাইরে ছুঁড়ে মারত। এমনি ধারার ব্যাপার সুদীর্ঘকাল ধরে চলতে চলতে ঐ জ্বালামুখগুলো তাদের বর্তমান গভীরতাকে লাভ করে বসেছে।

চাঁদের সমুদ্র

কোনো জ্যোৎস্নারাতে দূরবীণ ছাড়াই চাঁদের দিকে তাকালে চাঁদের সমস্ত থালাটা জুড়ে যে কালো কালো জায়গাগুলো আমাদের চোখে পড়ে, তাদের উৎপত্তির ব্যাপারটা নিয়েও চান্দ্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে তর্কের শেষ নেই। অনেকেই মনে করেন, ওদের সৃষ্টির মূলেও উল্কাদের সংঘাতই ছিল প্রধান ঘটনা। এক মাইল থেকে দু মাইল আকারের এক-একটি বিরাট উল্কাপিণ্ড প্রচণ্ডবেগে এসে যখন আছড়ে পড়ত চাঁদের জমিতে, তারা ঠিক একতাল মাখনের মধ্যে ছুরির মতোই সেই পাথুরে জমি ভেদ করে নেমে যেত নিচে। উল্কার সংঘাতের বেগে চাঁদের লক্ষ লক্ষ টন পাথর গলে গিয়ে জলন্ত লাভার স্রোতের আকারে বাইরে বেরিয়ে আসত। সেই লাভার নদী চাঁদের জমির উপর দিয়ে এগিয়ে চলত এবং নাগালের মধ্যে যা-কিছু পেত, তাকে গ্রাস করে বসত। উঁচু, নিচু সব জায়গা লাভার নদীর তলায় চাপা পড়ে গিয়ে এক-একটি বিরাট সমতলক্ষেত্র উঠত জেগে। এই জলন্ত লাভার স্রোতই কালক্রমে জমাট বেঁধে গিয়ে আজকের 'মেরিয়া' বা চাঁদের সমুদ্রগুলোকে গড়ে তুলেছে। জলের কোনো চিহ্ন নেই এই সমুদ্রগুলোয়। এদেরই কালো দেখায়, কারণ এই অংশগুলো সূর্যের আলোর শতকরা মাত্র পাঁচভাগ ফিরিয়ে দিতে পারে। চাঁদের এই সমুদ্রগুলোর গড়ে ওঠার পেছনে অবশ্য আরো কিছু কিছু মত আছে।

চাঁদের থালাটার মধ্যে যে ঝলমলে জায়গাগুলো আমরা দেখি, তারা হল চাঁদের স্থলভাগ। এরা সূর্যের আলোর শতকরা প্রায় পনের ভাগ অংশকে প্রতিফলিত করে থাকে।

চাঁদের থালাটার প্রায় ½ ভাগ জায়গা জুড়ে রয়েছে তার সমুদ্রগুলো। চাঁদের সবচেয়ে বড় সমুদ্রটির নাম হল 'মেয়ার ইমব্রিয়াম'। কথাটা ল্যাটিন, বাংলা অর্থ হল 'বৃষ্টি সাগর'। লুনা-২ আছড়ে পড়েছিল চাঁদের তিনটি সমুদ্রের মাঝামাঝি একটি জায়গায়। সমুদ্র তিনটির নাম হল মেয়ার সেরেনিট্যাটিস, মেয়ার ট্র্যানকুইলিট্যাটিস ও মেয়ার ভেপারাম। এই ল্যাটিন কথাগুলোর বাংলা মানে হল শান্তি সাগর, প্রশান্তি সাগর ও বাষ্প সাগর। সম্প্রতি লুনা-৯ ও সার্ভেয়ার চাঁদের আর-একটি সমুদ্রের উপর গিয়ে নেমেছে, যার নাম হল 'ঝড়ের সাগর'। এগুলো অবশ্য নেহাতই নামের বাহার। চাঁদের সাগরগুলোর নামকরণ যারা করেন, তাঁরা যে পরম রসিক ও কল্পনাবিলাসী

ব্যক্তি ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, চাঁদে না আছে বৃষ্টি, না আছে বাষ্প, না আছে ঝড়ের কোনো চিহ্ন। সে যাই হোক, দূরবীণে চাঁদের সাগরগুলোর দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ না হয়ে কিন্তু পারা যায় না।

চাঁদের পাহাড় ও রশ্মি

দূরবীণে চাঁদের আর-একটি বস্তু আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। সে তার সমুন্নত পর্বতগুলো। চাঁদের জীবনের একটি পর্বে যখন তপ্ত থেকে ঠাণ্ডা হবার পালা শুরু হয়েছে, তখনই হয়তো এই পর্বতগুলোর জন্ম হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। গঠনপর্বের ঐ সময়টায় চাঁদের সারাটা দেহ জুড়ে বিরাট বড় বড় সব ফাটল জেগে উঠছিল। আর সেই সব ফাটলের মধ্য দিয়ে শূন্যে হাজার হাজার ফুট মাথা তুলে রীতিমতো জাঁকিয়ে বসছিল দৈত্যের মতো চেহারার সব পাথরের খণ্ড। একেবারে গোড়াতে পাহাড়গুলোর যে খোঁচা খোঁচা চেহারা ছিল, আজও তার কোনো বদল হয় নি। জল আর বাতাসই পৃথিবীর পাহাড়গুলোর প্রথম যুগের এবড়োখেবড়ো চেহারাকে অমন মসৃণ ও সুঠাম করে তুলেছে। কিন্তু চাঁদে না আছে বাতাস, না আছে জল। কাজেই তার দেহে ক্ষয়ের পালা একরকম বন্ধ।

চাঁদের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টির নাম হল 'মাউন্ট লিবনিত্‌জ্‌'। এর উচ্চতা ৩৫০০০ ফুট, পৃথিবীর এভারেস্টের চেয়েও ৬০০০ ফুট বেশি।

জ্যোৎস্নারাতে জোরালো দূরবীণে চাঁদের আর-একটি আশ্চর্য ব্যাপার আমাদের চোখে পড়বে। সে হল তার লম্বা লম্বা হাতের মতো কতকগুলো রশ্মি, চাঁদের জ্বালামুখগুলো থেকে বেরিয়ে এরা চারদিকে অনেকটা দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। অনেকের মতে, উল্কার সংঘাতে চাঁদের জমিতে যে বিস্ফোরণ ঘটছে তার ফলে খুব পাতলা ময়দার মতো পদার্থ চারপাশে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। পৃথিবী থেকে এদেরই আমরা রশ্মির আকারে দেখি। টাইকো নামে জ্বালামুখ থেকে বেরিয়ে আসা রশ্মিটাই সবচেয়ে বিচিত্র।

চাঁদের জমি

চাঁদের জমির গঠন নিয়েও অনেক তর্ক রয়েছে। চাঁদে বায়ুমণ্ডল না থাকার ফলে মহাকাশের সৌখিন ভ্রমণকারী উল্কার দল প্রায়ই চাঁদের জমির উপর প্রচণ্ডবেগে এসে আছড়ে পড়ছে। এই ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে বহু কোটি

বছর ধরে। কারো কারো মতে এর ফলে চাঁদের জমির উপরটা ফেটে চৌচির হয়ে গিয়ে বিরাট সব ধুলোর পাহাড় তৈরি হয়ে বসে আছে। এই ধুলোর স্তর কয়েকশো ফুট থেকে কয়েক মাইল পর্যন্ত গভীর হতে পারে।

রুশ বিজ্ঞানীদের রেডিও জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে চাঁদের জমির গঠনপ্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু নতুন খবর মিলছে। চাঁদের উপরকার বস্তু বা শিলাকে বলা হয় লুনাইট। এই প্রথম শিলাস্তরটি গভীরতায় পাঁচ থেকে সাত ফুটের মতো। পাহাড়ের চুড়ো, তার ঢাল বা সানুদেশ, মেরিয়া বা স্থলভাগ চাঁদের সর্বত্রই এই লুনাইটের রাসায়নিক গঠন মোটামুটি একই রকম। লুনাইট প্রধানত আগ্নেয় ছাই, টাফ্, ব্যাসল্ট ও অন্যান্য শিলার সমবায়ে তৈরি এবং ঝামাপাথর বা স্পঞ্জের মতোই নাকি ছিদ্রযুক্ত। চাঁদের উপরকার শিলাস্তরের বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু গভীর ফাটলের সন্ধানও পাওয়া গেছে।

বেতার তরঙ্গের সাহায্যে লুনাইটের রাসায়নিক ও খনিজ গঠন সম্পর্কে অনুসন্ধানের মাধ্যমে মোটামুটিভাবে জানা গেছে, এর মধ্যে সিলিকন অক্সাইড শতকরা ৬০ থেকে ৬৫ ভাগ, অ্যালুমিনিয়াম ডাই-অক্সাইড শতকরা ১৫ থেকে ২০ ভাগ এবং পটাসিয়াম, সোডিয়াম, আয়রন ও ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড শতকরা ২০ ভাগ পরিমাণে রয়েছে। পৃথিবীতে তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থেরা যে পরিমাণে রয়েছে, চাঁদে দেখা যাচ্ছে তাদের পরিমাণ পাঁচ থেকে ছ' গুণ বেশি। এ থেকে বোঝা যায় চাঁদের অতীতে আগ্নেয়-প্রক্রিয়া কি বিপুল পরিমাণে ঘটেছিল। সম্ভবত এ কারণেই চাঁদের বুকে বিরাট আকারের সব আগ্নেয়গিরি আমাদের চোখে পড়ে। ঐ বিরাট চেহারার আগ্নেয়গিরি পৃথিবীর কোথাও দেখা যায় না।

চাঁদের ভিতরটা একেবারে ঠাণ্ডা মেরে বসে আছে বলেই বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল। ১৯৫৮ সালে রুশ জ্যোতির্বিদ কজিরেভ চাঁদের আলফনসাস নামে জ্বালামুখটি থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন। ফরাসী জ্যোতির্বিদ ডুবোয়ার চোখেও এই ঘটনা ধরা পড়েছিল। এ থেকে প্রমাণ মিলছে, চাঁদের ভিতরে এখনো আগ্নেয় গ্যাস রয়েছে, তাহলে সেখানে হাইড্রোকার্বন জাতীয় পদার্থও নিশ্চয়ই থাকবে। কাজেই চাঁদের অভ্যন্তরে খুব নিম্নশ্রেণীর কিছু ব্যাকটিরিয়া ও পোকামাকড়ের থাকবার সম্ভাবনাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

রুশ বিজ্ঞানীরা লুনা-৩ ও জোন্দ্‌ ৩-এর সাহায্যে চাঁদের উলটো পিঠের যেসব ছবি তুলে এনেছেন, তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের সংখ্যা অনেক কম এবং দৃশ্য পিঠটার সমুদ্রগুলোর তুলনায় তারা আয়তনেও ছোট। পর্বতমালার সংখ্যাই সেখানে বেশি। জ্বালামুখেরাও আয়তনে কেউ খুব বড় নয়। সবচেয়ে বড়টির ব্যাস হল ৪৩ মাইল।

চান্দ্রবিজ্ঞানীরা একটি মস্ত সমস্যায় পড়েছেন। চাঁদের দুই পিঠের গঠন-প্রকৃতির মধ্যে এতটা তফাত হবার কারণ কি?

দিনের বেলা চাঁদের জমির তাপ ২০০ ডিগ্রী ফারেনহিটের কোঠায় পৌঁছোয়। চন্দ্রগ্রহণের সময় পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের মধ্যে এসে পড়ে এবং পৃথিবীর ছায়াটা চাঁদকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলে। এটা যখন ঘটে, তার একঘণ্টার মধ্যেই চাঁদের উপরকার স্তরের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ১০০ ডিগ্রী ফারেনহিটের চেয়েও কমে যায়। এত তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হতে গিয়ে চাঁদের উপরকার শিলাস্তরের ভেঙে চুরমার হয়ে যাওয়াটাও বিচিত্র নয়। বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে পরীক্ষার সাহায্যে ধরা পড়ছে, চাঁদের উপরকার স্তরের তাপ পরিবহনের ক্ষমতা খুবই কম।

চাঁদের জন্ম

চাঁদের জন্ম কিভাবে হল, সে তর্কের শেষ আজো হয় নি। কারো কারো মতে, চাঁদ একদিন পৃথিবীরই অংশ ছিল। পৃথিবীর গঠনপর্বের একটি বিশেষ অধ্যায়ে যখন তপ্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হবার পালা চলেছে তখন কতকগুলো বিশেষ ঘটনায় পৃথিবী থেকে একটি বড় বস্তুপিণ্ড ছিটকে বেরিয়ে গিয়ে চাঁদের জন্ম ঘটিয়েছিল। পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে প্রশান্ত মহাসাগরের বিরাট গভীর খাতটাই নাকি চাঁদকে হারানোর সেই ক্ষতচিহ্ন।

আর-একটি মতের সপক্ষে যুক্তি অনেক বেশি। তার মোদ্দা কথাটা হল এই, সূর্যের কাছাকাছি একটি বিরাট বিস্তৃত ধুলো ও গ্যাসের মেঘের মধ্যে দানা বাঁধবার কাজের মধ্যে দিয়ে কালক্রমে আজকের গ্রহগুলোর সৃষ্টি হয়েছে। সূর্যের মাধ্যাকর্ষণ বল গ্রহগুলোর এই গড়ার কাজে এক মস্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। গ্রহগুলো তৈরি হবার সময় তাদের চারপাশে আবার কতকগুলো ধুলো ও গ্যাসের চক্র দানা বাঁধতে শুরু করে। এই ছোট চক্রগুলোই কালক্রমে আজকের উপগ্রহরূপে গড়ে উঠেছে। একদল বিজ্ঞানী বিশ্বাস

করেন, পৃথিবী ও তার চাঁদের জন্ম এরকম একটি ঘটনার মধ্যে দিয়েই ঘটে থাকবে। তাঁদের এই ধারণাটাই সবচেয়ে বেশি বিজ্ঞানসম্মত বলে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

কয়েকজন ভূপদার্থবিদ্‌ আবার চাঁদকে পৃথিবীর উপগ্রহ বলে মনেই করেন না। তাঁদের মতে চাঁদ ছিল সৌরজগতের অন্যান্য গ্রহের মতোই একটি গ্রহ। পৃথিবীর খুব কাছাকাছি হয়তো তার জন্ম ঘটে থাকবে এবং পরে পৃথিবীর জোরালো মাধ্যাকর্ষণ বলের টানে সে বন্দী হয়ে পড়ে। এই ধারণার পেছনে মূল যুক্তিটা হল এই যে সৌরজগতে অন্য উপগ্রহদের তুলনায় আমাদের চাঁদ যে আকারে সবচেয়ে বড় তাই নয়, নিজের গ্রহের সঙ্গে মাপের অনুপাতেও সে সবাইকে টেক্কা দিতে পারে। শনির সবচেয়ে বড় উপগ্রহ হল টাইটান, যার ব্যাস শনির ব্যাসের ১/২০ ভাগ এবং ভর শনির ভরের ১/৪৭০০ ভাগ। আমরা জানি আমাদের চাঁদের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের ১/৪ ভাগ, ভর পৃথিবীর ভরের ১/৮১ ভাগ। এসব কারণের জন্যেই শেষের মতের সমর্থকেরা পৃথিবী এবং চাঁদকে একটি যুগ্ম গ্রহব্যবস্থা বলে ধরে থাকেন।

চাঁদের ঠিকুজী

চাঁদ কি চিরদিন পৃথিবীর উপগ্রহ হয়ে থাকবে? বিজ্ঞানীরা বলছেন, চাঁদের কক্ষপথ প্রতি বছর সাত ফুট করে সূর্যের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এভাবে বেড়ে গিয়ে চাঁদের দূরত্ব যেদিন পৃথিবী থেকে দশ লক্ষ মাইলের কোঠায় গিয়ে দাঁড়াবে, সেদিন চাঁদ সূর্যের মাধ্যাকর্ষণে বন্দী হয়ে সৌরজগতে আর একটি নতুন গ্রহের ভূমিকা গ্রহণ করে বসবে। চাঁদের সূর্যপরিক্রমাপথ তখন তৈরি হবে পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলে।

চাঁদকে হারানোর পর পৃথিবীর জীবনে কয়েকটি বড় পরিবর্তন ঘটবে। চাঁদের আকর্ষণে সমুদ্রে যে জোয়ারের সৃষ্টি হত, তা আর কোনোদিন ঘটবে না। পৃথিবীর আকাশ আর কোনোদিন ভরে উঠবে না জ্যোৎস্নার আলোয়। মানুষ আর কোনোদিনই সূর্যগ্রহণ ঘটতে দেখবে না।

বিজ্ঞানীদের মতে শৈশব অবস্থায় পৃথিবী নাকি আপন অক্ষের উপর দশ ঘণ্টায় একবার করে পাক খেত। অর্থাৎ পৃথিবীর একটি দিন ও রাতের পরিমাণ তখন ছিল মোট দশ ঘণ্টা। চাঁদের আকর্ষণে সাগরের জলে প্রতিদিন যে দুবার করে জোয়ারের সৃষ্টি হত, তা পৃথিবীর ঐ জোরালো আবর্তনের

গতিকে কমানোর জন্যে ব্রেকের ভূমিকাকে গ্রহণ করেছিল। বর্তমানের তুলনায় চাঁদ তখন পৃথিবীর অনেক কাছে থাকার জন্যে চাঁদের আকর্ষণের জোরটাও ছিল বেশি। কয়েকশো কোটি বছর ধরে চাঁদের আকর্ষণরূপী ব্রেকটা ধীরে ধীরে পৃথিবীর আপন অক্ষের উপর ঘূর্ণনবেগটাকে কমিয়েছে। দশ ঘণ্টার জায়গায় আজ পৃথিবীতে চব্বিশ ঘণ্টায় একটি দিন ও একটি রাত ঘটছে।

লুনা-৯

মহাকাশে বিজ্ঞানীদের যে-জয়যাত্রা শুরু হয়েছে, তার ঘটনাপঞ্জীর মধ্যে স্মরণীয় একটি ঘটনা ঘটল এবছর গত ৩রা ফেব্রুয়ারি তারিখে। রুশ বিজ্ঞানীরা ঐদিন স্বয়ংক্রিয় স্টেশন লুনা-৯-কে চাঁদের জমিতে নিরাপদে নামালেন।

লুনা-৯-কে প্রথমে একটি কৃত্রিম উপগ্রহের মতো পৃথিবীরই কাছাকাছি একটি কক্ষপথে ছোঁড়া হয়েছিল। তার গতিবেগ ছিল তখন ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইলের মতো। এরপর দ্বিতীয় দফায় লুনা-৯-এর ঘাড়ে চাপানো হল আরো ৭০০০ মাইলের মতো গতিবেগ এবং ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইলের গতিবেগের সাহায্যে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলকে কাটিয়ে লুনা-৯ ৩১শে জানুয়ারি একটি নির্দিষ্ট পথে চাঁদের দিকে এগিয়ে চলল। তৃতীয় দফায়, ছোটবার পথের খানিকটা সংশোধনের মধ্যে দিয়ে লুনা-৯ একেবারে নির্ভুলপথে চাঁদের জমির দিকে নেমে আসতে শুরু করল।

পৃথিবী থেকে ২,২১,০০০ মাইল দূর পর্যন্ত পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল লুনা-৯-এর উপর কার্যকর প্রভাবকে বিস্তার করবে এবং এই বলের বিরুদ্ধে ছুটতে গিয়ে লুনা-৯-এর গতিবেগ ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইলের কোঠা থেকে কমে ঘণ্টায় ৫০০০ মাইলের কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়াবে। চাঁদের জমির প্রায় ২০,০০০ মাইল দূর থেকে চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবীর তুলনায় অনেক বেশি জোরালোভাবে লুনা-৯-এর ওপর প্রভাব খাটাতে শুরু করে। এই বলকে কাটাতে না পারলেই বিপদ, ঘণ্টায় ৫০০০ মাইল বেগে সোজা গিয়ে আছড়ে পড়তে হবে চাঁদের জমিতে। তাই ভ্রমণপথের শেষপর্বে লুনা-৯-এর দেহে সংযুক্ত রেট্রোরকেট ব্যবস্থার সাহায্যে চাঁদের আকর্ষণের উলটোদিকে একটি ছুট তৈরির ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। ফলে শুরু হল যেন দুমুখো এক দড়ির লড়াই। লুনা-৯ এর গতি ধীরে ধীরে কমে এসে খুব অল্প একটি পরিমাণের কোঠায় এসে দাঁড়ায় এবং

তাই নিয়ে ৩রা ফেব্রুয়ারি সে নিরাপদে আলতোভাবে চাঁদের জমিতে নেমে পড়ে। এই পরীক্ষাকাজটিকে সফল করার জন্যে বিজ্ঞানীদের বহুদিনের স্বপ্ন এভাবে বাস্তবে পরিণত হল।

লুনা-৯-কে হিসেব করে পৃথিবী থেকে ছোঁড়া হয়েছিল এমন একটা সময়ে, যাতে সে যেন ঠিক চাঁদের সকালবেলা তার জমিতে গিয়ে নামতে পারে। টেলিভিসন ক্যামেরার সাহায্যে চাঁদের জমির ছবি তোলার জন্যে এটাই সবচেয়ে প্রশস্ত সময় বলে বিজ্ঞানীরা জানতেন। পৃথিবীতে লুনা-৯-এর মোট ওজন ছিল ১৫৮৩ কিলোগ্রাম। চাঁদে অবশ্য এই ওজন কমে এর ঠিক $\frac{১}{৬}$ ভাগ, অর্থাৎ ২৬৪ কিলোগ্রামে গিয়ে দাঁড়াবে।

চাঁদ সম্বন্ধে জানা গেল

লুনা-৯ যেসব ছবি তুলে বিজ্ঞানীদের কাছে ফেরত পাঠিয়েছে, তাতে চাঁদের জমির উপর কোনো ধুলোর স্তর ধরা পড়ে নি। লুনা-৯ চাঁদে নামতে গিয়ে চাঁদের জমিতে ঢুকেও পড়ে নি। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, চাঁদের জমির গঠন বেশ শক্ত। চাঁদের প্রতি বর্গফুট জায়গা এক টন বা দু টনের মতো বস্তুভারকে সামলাবার ক্ষমতা রাখে বলে মনে করা হচ্ছে। কাজেই একটি বড় রকেট ভবিষ্যতে যখন চাঁদে গিয়ে নামবে, তখন জমিটা ভেঙে গুঁড়িয়ে যাবে না, এরকম সিদ্ধান্তই বিজ্ঞানীরা করছেন।

লুনা-৯-এর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির কাছ থেকে পাঠানো বিভিন্ন সংকেতের বিশ্লেষণ কাজ চলেছে। একটি সংকেত জানাচ্ছে, চাঁদের জমির উপর বিকীরণের যে তীব্রতা, তা প্রধানত মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। চাঁদে বায়ুমণ্ডলের আবরণ না থাকার ফলে এই রশ্মি তার প্রাথমিক তীব্রতা নিয়ে চাঁদের জমি বরাবর নেমে আসে এবং জমির উপরের স্তরে শিলার পরমাণুদের দেহে পারমাণবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া ঘটায় ও বিকীরণ সৃষ্টি করে।

লুনা-৯ চাঁদের পৃষ্ঠভাগ ও ত্বকের রাসায়নিক গঠন, তাপমাত্রা, চৌম্বকক্ষেত্র, ভূমিকম্প এবং বীজাণুজগতের সম্ভাব্যতা ও প্রকৃতি সম্বন্ধে নিখুঁত তথ্য অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবে।

লুনা-১০

আর একটি বিরাট খবর এবছর ৪ঠা এপ্রিলের কাগজে পড়ে আমরা অবাকবিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। খবরটা ছিল, ৩রা এপ্রিল রুশ বিজ্ঞানীরা

খোদ চাঁদকেই একটি চাঁদ উপহার দিয়েছেন। এই স্বয়ংক্রিয় স্টেশনটির নাম ছিল লুনা-১০। পৃথিবীরই একটি কক্ষপথে স্পুটনিকরূপে এ প্রথমে আশ্রয় নেয়। তারপর ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইলের ছুট ঘাড়ে নিয়ে চাঁদের দিকে তার দৌড় শুরু হল। লুনা-১০-এর ছোটার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিমুহূর্তে চাঁদের জমি থেকে তার দূরত্বের পরিমাণ কমছিল, তার গতিবেগ ও ছোটার দিকের মাঝেও পরিবর্তন ঘটছিল। পৃথিবীতে বসে বিজ্ঞানীরা প্রতিমুহূর্তে লুনা-১০-এর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতির কাছ থেকে এই তথ্যগুলো পাচ্ছিলেন। চাঁদের জমির ঠিক কতটা উচ্চতায় এবং কতখানি গতি ঘাড়ে থাকা অবস্থায় লুনা-১০-এর রেট্রোরকেট ব্যবস্থাকে চালু করে তাকে চাঁদের কক্ষপথে স্থাপন করতে হবে, কম্পিউটার যন্ত্রে আগে থেকে পাওয়া তথ্যগুলোর বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানীরা তার জন্যে তৈরি হয়ে উঠছিলেন। লুনা-১০-এর গতিবেগ কমতে কমতে যখন ঘণ্টায় ৪৫০০ মাইলে এসে পৌছেছে, তখনই এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণটি। রেট্রোরকেটের এক ধাক্কায় লুনা-১০-কে বিজ্ঞানীরা চাঁদের হাতে তুলে দিলেন।

চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ বল পৃথিবীর তুলনায় অনেক কম বলে ঘণ্টায় ৪৫০০ মাইলের মতো সম্মুখগতি তৈরি করতে পারলেই স্বচ্ছন্দে চাঁদের একটি কক্ষপথে গা ভাসিয়ে নেমে পড়া যায়। পৃথিবীর জোরালো মাধ্যাকর্ষণ বলকে কাটানোর জন্যে তার স্পুটনিকদের ক্ষেত্রে এই গতির পরিমাণ যেখানে কমপক্ষে ঘণ্টায় ১৮০০০ মাইলের কোঠায় পৌছে দিতে হয়। পৃথিবীকে একচক্কর ঘুরতে এইসব স্পুটনিকদের বেশিরভাগেরা সময় নেয় প্রায় দেড়ঘণ্টার মতো। অনেক কম গতি ঘাড়ে নিয়ে লুনা-১০ চাঁদকে একবার ঘুরপাক খেতে সময় নিচ্ছে প্রায় তিন ঘণ্টা। চাঁদের জমি থেকে এর উপবৃত্তাকার কক্ষপথের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন দূরত্ব হল যথাক্রমে ৬২৫ ও ২২০ মাইল। কক্ষপথের চেহারাকে ইচ্ছেমতো বদলে সর্বনিম্ন দূরত্বকে ৩০ মাইলে নামিয়ে আনার ব্যবস্থাও রুশ বিজ্ঞানীরা করেছেন।

চাঁদের আরো খবর

চাঁদের কক্ষপথে টহল দেবার ছাড়পত্রটি পাওয়া মাত্র লুনা-১০-এর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি চাঁদের অন্দরমহলে তার সন্ধানী দৃষ্টিকে পাঠিয়ে বসে আছে। বিজ্ঞানীদের এই দূতটি ইতিমধ্যেই কিছু খবর তাঁদের কাছে পৌছে দিয়েছে।

চাঁদের জমি যে গামা-রশ্মিকে ছেড়ে থাকে, লুনা-১০ তাকে পরিমাপ করে জানাচ্ছে, চাঁদের শিলাস্তর থেকে স্বাভাবিক বিকীরণের মাত্রা পৃথিবীর ব্যাসল্ট্ ও গ্র্যানাইট শিলার স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তার খুব কাছাকাছি। এ খবরটির দৌলতে বিজ্ঞানীদের কাছে একটি ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে উঠতে চলেছে—সে চাঁদের জন্মের ব্যাপারটা। আজ থেকে ৫০০ কোটি বছর আগে পৃথিবী ও চাঁদের জন্ম হয় একই কারণে ঘটেছে অথবা চাঁদ ছিল পৃথিবীরই অংশ, এরকম একটা সিদ্ধান্তেই তাঁরা পৌছচ্ছেন। চাঁদের উৎপত্তি সম্বন্ধে তর্কবিতর্কের পালাটা তাই ছোট হয়ে এল।

১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রুশ বিজ্ঞানীরা চাঁদের জমিতে যে লুনা-২-কে ছুঁড়ে মেরেছিলেন তার ম্যাগনিটোমিটারে (চৌম্বকক্ষেত্র মাপার যন্ত্র) চাঁদের নিজস্ব কোনো চৌম্বকক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া যায় নি। যেটুকু ধরা পড়েছিল, তার শক্তি ছিল খুবই সামান্য। কিন্তু লুনা-১০-এর ম্যাগনিটোমিটারে চাঁদের একটি দুর্বল চৌম্বকক্ষেত্রের অস্তিত্ব ধরা পড়ছে। সূর্য থেকে যে বৈদ্যুতিক কণিকাস্রোত ঘণ্টায় প্রায় ৭ লক্ষ থেকে ১৭ লক্ষ মাইল গতিতে ছুটে বেড়াচ্ছে (একে সোলার উইণ্ড বা সূর্যের বাতাস বলা হয়ে থাকে), তারাই হয়তো চাঁদের ভেতরে একটি স্বল্পমাত্রার বিদ্যুৎপ্রবাহ তৈরি করছে। ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ থেকেই আবার সৃষ্টি হচ্ছে একটি দুর্বল চৌম্বকক্ষেত্র। পৃথিবীর ম্যাগ্‌নি-টোস্ফিয়ার বা চৌম্বকমণ্ডলের প্রভাবেও চাঁদের চৌম্বকক্ষেত্রটা তৈরি হতে পারে, অথবা হয়তো চাঁদের একটি সম্পূর্ণ নিজস্ব চৌম্বকক্ষেত্রই রয়েছে।

ভবিষ্যতে পৃথিবীর মানুষের চাঁদের দেশে অভিযানে উল্কার বিপদের কথাটা বিজ্ঞানীদের বিশেষভাবে ভাবতে হচ্ছে। লুনা-১০ এ-সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাঠিয়েছে। ৩রা এপ্রিল থেকে ১২ই এপ্রিলের মধ্যে কোনো একদিন ৫ ঘণ্টা ১৬ মিনিট সময়ের মধ্যে লুনা-১০-এর সঙ্গে উল্কাকণাদের ৫৩টি সংঘাত ঘটে। আন্তর্গ্রহ অঞ্চলে গড়পড়তা প্রতি সেকেণ্ডে প্রতি বর্গমিটার ক্ষেত্রে উল্কাকণার সঙ্গে সংঘাতের তুলনায় এই সংখ্যাটি প্রায় ১০০ গুণ বেশি। তাহলেও ভবিষ্যৎ চন্দ্রযাত্রীদের ক্ষেত্রে উল্কা কোনো বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না বলেই বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস।

চাঁদে কোনো বায়ুমণ্ডল নেই বললেই চলে। যেটুকু আছে, তার ঘনত্ব পৃথিবীর জমির ওপর বায়ুমণ্ডলের যে ঘনত্ব, তার একলক্ষকোটি ভাগের একভাগ মাত্র। লুনা-১০ চাঁদের কক্ষপথে স্বল্পশক্তিসম্পন্ন আয়নকণিকার

স্রোতের সন্ধান পেয়েছে। কাজেই চাঁদের ওপরে একটি অতিতনু আয়নমণ্ডল যদি থেকে থাকে, পরবর্তী পরীক্ষায় তার অস্তিত্ব ধরা পড়বার সম্ভাবনা।

সার্ভেয়ার

এ-বছর ২রা জুন আমেরিকার বিজ্ঞানীরা সার্ভেয়ার নামে একটি স্বয়ংক্রিয় স্টেশনকে নিরাপদে চাঁদের জমিতে নামিয়েছেন। জায়গাটির নাম 'ঝড়ের সাগর'। লুনা-৯-কেও ওখানেই নামানো হয়েছে। লুনা-৯-কে চাঁদে নামানোর পেছনে যে সমস্যাগুলো ছিল, সেই একই সমস্যার সমাধান সার্ভেয়ারের ক্ষেত্রেও করতে হয়েছে।

সার্ভেয়ার এপর্যন্ত বিজ্ঞানীদের কাছে যে তথ্যগুলো পাঠিয়েছে, সেগুলো বিশ্লেষণ করে তাঁরা কয়েকটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। চাঁদের জমি নাকি আলগা ধুলোর দ্বারা ঢাকা নয়। মানুষকে নিয়ে একটি মহাকাশযান ভবিষ্যতে নিরাপদেই চাঁদে নামতে পারবে। মানুষ চাঁদের জমির ওপর সচ্ছন্দে ঘুরেফিরে বেড়াতে পারবে, উল্কাকণার সংঘাতের ভয়ে ভীত হবার কোনো কারণ নেই।

রুশ ও আমেরিকার বিজ্ঞানীদের পাঠানো স্বয়ংক্রিয় স্টেশনগুলো চাঁদ সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য তাঁদের হাতে পৌঁছে দেবে। খোদ চাঁদের রাজ্যে যন্ত্রপাতিসমেত এরকম আরো বহু দূতকে অদূরভবিষ্যতে তাঁরা পাঠিয়ে চলবেন। চাঁদে মানুষের অভিযানের দিনটি এভাবে ক্রমেই এগিয়ে আসতে থাকবে। তারপর একদিন মানুষের সেই বহুদিনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপ লাভ করবে।

চাঁদে নামার পর

চাঁদে মানুষের অভিযানের দিনটি বিজ্ঞানীরা আজ হাতে বসে গুনছেন। আগামী দু-তিন বছরের মধ্যে এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি ঘটবে, সন্দেহ নেই।

চাঁদে পৌঁছনোর পর মহাকাশযাত্রীদের জীবনে কয়েকটি বড় সমস্যা দেখা দেবে। চাঁদে বাতাস নেই, তাই বাতাসের চাপও নেই। মহাকাশের প্রাণঘাতী রশ্মিরা তাদের প্রাথমিক চরিত্র নিয়ে চাঁদের জমি বরাবর নেমে আসছে। কাজেই চাঁদে বাঁচবার জন্যে উপযোগী স্পেসটুকু. বা মহাকাশ পোশাকের প্রয়োজন দেখা দেবে।

চাঁদের একটি দিন পৃথিবীর চোদ্দটি দিনের সমান, তাপমাত্রা চড়তে চড়তে

২০০ ডিগ্রী ফারেনহিটের কোঠায় পৌঁছে যায়। চাঁদের একটি রাত পৃথিবীর চোদ্দটি রাতের সমান, তাপমাত্রা নেমে আসে-২৬০ ডিগ্রী ফারেনহিটে। চাঁদে বায়ু না থাকার ফলে দিনের বেলাতেও এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় তাপ ছড়াতে পারে না। ফলে আলো থেকে এক পা পেছিয়ে ছায়ার মধ্যে ঢুকলেই তাপমাত্রা হিমাংকের বহু নীচে এসে দাঁড়াবে।

চাঁদে গোধূলি লগ্ন বলে কিছু নেই। সূর্য যেই দিগন্তের ওপারে মাথাটি নামিয়ে নেবেন, ঝকঝকে দিনের আলোর জায়গায় মুহূর্তের মধ্যে অমানিশার কালো অন্ধকারে চারদিক ভরে উঠবে।

বিজ্ঞানীরা চাঁদের জমির ৪০ বা ৪৫ ফুট তলায় চলে গিয়ে পাকাপাকিভাবে থাকবার ব্যবস্থা করতে পারেন। সেখানে তাপমাত্রা সবসময়ের জন্যই -৪০ ডিগ্রী ফারেনহিটে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চাঁদ : মানমন্দির

চাঁদে কোনো বায়ুমণ্ডল না থাকার ফলে আকাশের রং চব্বিশ ঘণ্টাই নিকষ কালো দেখাবে। কাজেই ভবিষ্যতে বিজ্ঞানীরা চাঁদে চমৎকার সব জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক মানমন্দির তৈরি করে বসবেন। চব্বিশ ঘণ্টা ধরে আকাশের গ্রহ নক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ করার কাজে তাঁদের আর কোনো বাধা থাকবে না। পৃথিবী থেকে আকাশের তারাকে আমরা মিটমিট করে জলতে দেখি। কারণ বায়ুর বিভিন্ন স্রোতের মধ্যে পথ তৈরি করতে গিয়ে তারার আলোর প্রতিসরণ (রিফ্র্যাকসন) ঘটে, ফলে আলোর রেখা খানিকটা বেঁকে যায়। কিন্তু বায়ুহীন চাঁদের আকাশে তারাদের দেখাবে নিষ্কম্প, শান্ত জ্যোতিষ্কের মতো।

চাঁদে সূর্যের আলোকে মনে হবে অনেক বেশি উজ্জল। সূর্যের দ্বিতীয় স্তর ক্রোমোস্ফিয়ারের লাল আলোর ছটা এবং সৌরস্ফীতির সঙ্গে যে জলন্ত গ্যাসের শিখা ঐ স্তর থেকে মাঝে মাঝে বেরিয়ে আসে, তা পরিষ্কার দেখা যাবে। সূর্যের আবহ-মণ্ডল, করোনা বা কিরীটিকার রুপোলি গ্যাসের চাদরটির আশ্চর্য উজ্জলতায় চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে। পৃথিবী থেকে পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় ছাড়া তার ক্রোমোস্ফিয়ার ও করোনা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না।

পূর্ণিমার রাতে চাঁদকে আমরা যত বড় দেখি, চাঁদের আকাশে পৃথিবীকে দেখা যাবে তার চেয়ে ১৩½ গুণ বড় একটি উজ্জল, হালকা নীল গোল বলের মতো ভেসে আছে। পৃথিবীর মহাদেশ, সাগর ও মহাসাগরের এলাকা এবং তার দুই

মেরুঅঞ্চলে জমাট বাঁধা তুষারের সাদা স্তূপ খালিচোখেই দেখা যাবে। আর দেখা যাবে, পৃথিবী কিভাবে আপন অক্ষের ওপর ঘুরে চলেছে আর মেঘের দল জটলা বেঁধে তার অনেকখানি অংশকে দৃষ্টির আড়াল করে রেখেছে। পৃথিবী যেহেতু চাঁদের তুলনায় আকারে অনেক বড়, তাই পৃথিবীর জ্যোৎস্না হবে চাঁদের জ্যোৎস্নার চেয়ে বহুগুণ বেশি উজ্জ্বল।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের আবরণের জন্যে নক্ষত্র দেহজাত বেগনিপারের (আলট্রাভায়োলেট) আলো, লালউজানী (ইনফ্রারেড) আলো, রঞ্জন রশ্মি, গামারশ্মি পৃথিবীর জমি পর্যন্ত এসে পৌছতে পারে না। ফলে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেকগুলো মহল এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে অনাবিষ্কৃতই রয়ে গেছে। চাঁদে মানমন্দির প্রতিষ্ঠা হলে জ্যোতির্বিদ্যার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ একটা নতুন দিগন্তই উন্মুক্ত হয়ে উঠবে।

চাঁদে বিচিত্র জীবন

চাঁদে বসবাস করা এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা চালানোর জন্যে যারা আসবেন, তাদের বেশ কয়েকটি বিচিত্র পরিস্থিতির জন্যে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

চাঁদে মানুষের ওজন কমে পৃথিবীর $\frac{1}{6}$ ভাগ হয়ে দাঁড়ালে শরীরের মাংসপেশী-গুলো ঝুলে পড়বার সম্ভবনা। কাজেই পৃথিবীর ওজনের মাপে বেশ কয়েক মন ভারী ডাম্বেল রোজ না ভেঁজে কোনো উপায় নেই। পৃথিবীতে যিনি ৪ ফুট লাফাতে পারেন, চাঁদে লাফাতে পারবেন ২৪ ফুট। ওজন কমে বসে আছে, কাজেই চাঁদে ভুল করে পৃথিবীর কায়দায় হাঁটতে গেলেই সর্বনাশ। নতুন করে হাঁটাই শিখতে হবে চাঁদে। প্রথম বেশ কিছুদিন দু-পকেটে মণখানেক পাথর ভরে নিয়ে ধীরে ধীরে পা ফেলার অভ্যাস করতে হবে, তা নাহলেই বিপদ।

চাঁদে শরীরের ওজন কমে যাওয়ার ফলে রক্তের ওজনও কমে আসবে। ফলে হার্টরূপী পাম্পযন্ত্রটার ওপর রক্তের চাপ পড়বে কম ও তার ক্ষয় হবে ধীরে ধীরে। অর্থাৎ চাঁদে একজন মানুষ বুড়ো হবে ধীরে ধীরে।

পৃথিবীতে হৃদযন্ত্রের বা ব্লাডপ্রেসারের রোগ থাকার জন্যে শ্রমসাধ্য কোনো কাজ যারা করতে পারেন না, চাঁদ হবে তাদের কাছে এক স্বর্গরাজ্য। হৃদযন্ত্রের ওপর রক্তের চাপ কমে যাওয়ার ফলে যে কোনো কঠিন কাজই তারা সেখানে অনায়াসে করতে পারবেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই রোগের দল তাদের দেহযন্ত্রটা ছেড়ে পালাবে। কাজেই দূর ভবিষ্যতে চাঁদে গোটা কয়েক স্যানাটোরিয়াম তৈরি করে পৃথিবীর যত হার্টের রোগীদের পালা করে সেখানে পাঠানোর বন্দোবস্তটা করে ফেললে মন্দ হয়না। সেখানে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে, রোগ সারিয়ে, বয়েস কমিয়ে পৃথিবীতে ফিরে এসে দেখা গেল, আমাদের পাড়ার নীলধ্বজবাবুর বয়েসটাই তার ছেলেমেয়ের বয়েসের চেয়ে কম হয়ে বসে আছে।

পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের সশরীরে চাঁদে অভিযানের দিনটির জন্যে আমরা সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রয়েছি।

বৌধায়ন চট্টোপাধ্যায়

বিনিময় হার হ্রাস, টাকার না ভারতের ?

ডিভ্যালুয়েশন, মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় হার হ্রাস কোনো স্বাধীন দেশ কেন করে ? অর্থনৈতিক যুক্তিটা কি ?

আমদানিকৃত পণ্যের দেশী মুদ্রায় দাম বাড়ার ফলে আমদানির পরিমাণ কমবে, ফলে আমদানি বাবদ বিদেশী মুদ্রার ব্যয় কমবে। অন্যদিকে রপ্তানি-যোগ্য পণ্যের বৈদেশিক দাম কমার ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার বাজারে স্বদেশী রপ্তানিযোগ্য পণ্যের চাহিদা বাড়বে এবং বৈদেশিক মুদ্রার আয় বাড়বে। দুইয়ে মিলে বৈদেশিক লেনদেনে আয় ব্যয়ের ঘাটতি অপসারিত হবে। কিন্তু, কর্ম ও কর্মফলের মধ্যে যোগাযোগটা অর্থনীতিতে বেশ জটিল। উক্ত সরল উপপাদ্যটির অনেকগুলি পূর্বশর্ত বা assumption আছে।

এই পূর্বশর্তগুলি নিম্নরূপ :

১। আমদানিকৃত পণ্যের চাহিদা ও দরের স্থিতিস্থাপকতার (price-elasticity of imports) পরিমাপ ১-এর চেয়ে বেশি হওয়া দরকার, অর্থাৎ, দর যদি মুদ্রা মূল্য হ্রাসের দরুন শতকরা ১ ভাগ বাড়ে তবে আমদানির চাহিদা শতকরা ১ ভাগের বেশি কমা প্রয়োজন।

অথবা,

২। বিদেশের আমদানিকৃত পণ্যের ও বিদেশে রপ্তানিযোগ্য পণ্যের চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার মিলিত যোগফল ১-এর চেয়ে বেশি হলেই চলবে—যদি রপ্তানির যোগানের স্থিতিস্থাপকতা অসীম হয়, অর্থাৎ উৎপাদনের মাত্রা--প্রতি খরচ স্থির রেখে যত ইচ্ছা রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন বাড়ানো যায়।

যে সমীকরণটি থেকে মুদ্রার বৈদেশিক বিনিময় মূল্য হ্রাস দ্বারা বৈদেশিক বাণিজ্যে আয়-ব্যয়ের ঘাটতি পূরণের এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, তার অন্যতম মৌলিক পূর্বশর্ত হলো স্বদেশে জাতীয় আয় একই পর্যায়ে স্থির থাকবে। কিন্তু, তা থাকে না স্বভাবতই। কেননা, জাতীয় আয়ের উপর রপ্তানি বৃদ্ধির

একটা গুণনীয়ক প্রভাব আছে, অর্থাৎ, রপ্তানি বৃদ্ধি ঘটলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। এখন যদি দেশটা এমন হয় যাতে তার প্রান্তিক বিনিয়োগ-প্রবণতা (marginal propensity to invest) প্রান্তিক সঞ্চয়-প্রবণতার (marginal propensity to save) চেয়ে বেশি, তাহলে দেশটিতে জাতীয় আয়ের যে কোনো রকম উর্ধ্বগতির ফলে বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি বৃদ্ধি ঘটবে। অর্থাৎ, জাতীয় আয় বৃদ্ধির অনুপাতে যদি সেই দেশে বিনিয়োগ--যোগ্য সঞ্চয়ের যোগান বৃদ্ধি বিনিয়োগের চাহিদা বৃদ্ধির তুলনায় কম হয়, তাহলে বৈদেশিক বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাপে বৈদেশিক পুঁজির আমদানি অবশ্যম্ভাবী। ভারতবর্ষে বর্তমানে এই অবস্থা বিরাজমান।

মোটের উপর দাঁড়াল তাহলে যে, মুদ্রার বিনিময় মূল্য কমিয়ে, যোগান ও চাহিদার স্থিতিস্থাপকতার প্রাগুক্ত পূর্বশর্তগুলি হাসিল হলে যদিও বা বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি মেটার সম্ভাবনা থাকে, তাহলেও জাতীয় আয় বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগ ও সঞ্চয়-প্রবণতার আপেক্ষিক মাত্রার উপর নীট ফলাফল নির্ভর করবে। এই সিদ্ধান্ত মার্কসবাদীদের বহুবিধ ডগ্‌মার একটি নয়, খাঁটি মার্কিন-বিলিতি অর্থ-নীতির সদ্বংশজাত সিদ্ধান্ত।

* * *

প্রথমেই লক্ষ করা দরকার, ভারত সরকার ডিভ্যালুয়েশন করেছেন আমদানি কমানোর জন্যে নয়, আমদানির কড়াকড়ি শিথিল করার জন্যে। এখন দেখা যাক, এই পূর্বশর্তগুলির একটিও ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় হাসিল হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিনা। ভারত সরকারের বাণিজ্য-দপ্তরের (Ministry of Commerce) ১৯৬৫-৬৬ সালের বাৎসরিক রিপোর্টে (এটি মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ভারত সরকারের নামে প্রকাশিত হয়েছে) ডিভ্যালুয়েশনের বিরুদ্ধে দুই পৃষ্ঠাব্যাপী যুক্তি সমাবেশ লিপিবদ্ধ আছে (৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তাতে বলা হয়েছে যে, আমাদের আমদানির শতকরা ৭৫ ভাগ শিল্পগত কাঁচা মাল ও মূলধনী পণ্য এবং শতকরা ২০ ভাগ খাদ্য দ্রব্য। অর্থাৎ শতকরা ৯৫ ভাগ আমদানি অপরিহার্য এবং দর যাই হোক আমাদের কিনতে হবেই। অর্থাৎ, ১৪০০ কোটি টাকা মোট আমদানির মধ্যে ১৩০০ কোটি টাকাই অপরিহার্য (বর্তমান খাদ্যনীতি ও শিল্পনীতির চৌহদ্দিতে)। এই ১৩০০ কোটি টাকা আমদানি পণ্যের দর বাড়লেও পরিমাণ কমবে না, অর্থাৎ, শতকরা ৯৫ ভাগ আমদানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা শূন্য। নতুন বিনিময় হারে এর

দর বেড়ে যাবে প্রায় ২০০০ কোটি টাকায়। অন্তত, ১৯০০ কোটি টাকায়, যদি ধরেও নিই যে যাবতীয় ভোগ্য পণ্য আমদানি বন্ধ হয়ে যাবে।

অন্য দিকে আমাদের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের শতকরা ৮০ ভাগ সনাতন কৃষিভিত্তিক শিল্প বা আকরিক উৎপাদন-জাতীয়। আন্তর্জাতিক বাজারে—বিশেষত অনগ্রসর পশ্চিমী দেশগুলিতে এই সব রপ্তানির চাহিদার মূল্যগত স্থিতিস্থাপকতা অত্যন্ত কম—এ কথা সর্বজনস্বীকৃত। যেমন ভারতীয় পাটজাত দ্রব্যের রপ্তানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা মার্কিন দেশে—০·৭। (অর্থাৎ, শতকরা ৮০ ভাগ সনাতন রপ্তানির ক্ষেত্রেই মুদ্রামূল্য হ্রাসের দরুন যতটা বৈদেশিক দর কমবে তার চেয়ে কম অনুপাতে রপ্তানির পরিমাপ বাড়বে, ফলে মোট রপ্তানির আয় কমবে, যদি আন্তর্জাতিক দর বিনিময় হার অনুসারে কমতে দেওয়া হয়। [পাট, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে রপ্তানির চাহিদার স্থিতিস্থাপকতা কিছুটা আছে, দরের সূত্রে নয়, বিদেশের মোট বাণিজ্যিক তৎপরতার মানের (level of business activity) সূত্রে।] তাই, বাণিজ্য দপ্তরের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ডিভ্যালুয়েশনের ফলে রপ্তানির আয়ের প্রভূত ক্ষতি হবে—যার কোনো কারণই ছিল না, যেহেতু, তাঁদেরই মতে ভারতের এই শতকরা ৮২·৮ ভাগ সনাতন রপ্তানির বাজার দর আন্তর্জাতিক দরের সঙ্গে সমতা রক্ষা করেই চলে, এবং কোনো রকম আর্থিক সাহায্য বা অনুদানের (subsidy) প্রয়োজন হয় না। এখনো বলা হচ্ছে যে, রপ্তানি আয়ের লোকসান ঠেকানোর জন্যে উচ্চ হারে রপ্তানি শুল্ক বসানো হবে, যাতে বৈদেশিক দর না কমে। তাহলে সরকারি মতেই রপ্তানির আয় বাড়ানোটা ডিভ্যালুয়েশনের লক্ষ্য নয় যদিও সেকথা তাঁরা মুখ ফুটে বলেন না। সেই সঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে, ভারতবর্ষের সমস্যা যেহেতু আমেরিকা-বৃটেনের মতো অগ্রসর অর্থনীতির মতো অতিরিক্ত উৎপাদন সামর্থ্যের বাহুল্যের (excess capacity) সমস্যা নয়, এবং যেহেতু তার রপ্তানির শতকরা ৮০ ভাগই সনাতন, কৃষিভিত্তিক উৎপাদনপ্রসূত, সুতরাং রপ্তানিযোগ্য উৎপাদন ভারতবর্ষের পক্ষে স্বল্পকালীন মেয়াদে যথেচ্ছ বৃদ্ধি সম্ভবপর নয়। যোগানের স্থিতিস্থাপকতা সামান্যই—অনগ্রসর দেশের মূল লক্ষণই তাই। বাকি যে শতকরা ১৮·২ ভাগ রপ্তানি আধুনিক ও শিল্পোৎপাদনসঞ্জাত, তাদের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক দরের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ দরের বৈষম্য এত বেশি ও এমন হরেক মাত্রায় যে, "ঢালাও কোনো একই মাপের সাহায্য বা অনুদান

বা বিনিময় মূল্য পরিবর্তনের দ্বারা কিছুই সাহায্য হবে না" (বাণিজ্য দপ্তরের ১৯৬৫-৬৬ সালের বাৎসরিক রিপোর্ট, পৃষ্ঠা ৩৭)। উপরন্তু, এই সব আধুনিক রপ্তানির উৎপাদন আবার বহুলাংশে আমদানিকৃত কাঁচা মালের উপর নির্ভরশীল। ফলে এগুলির উৎপাদন খরচ এক ধাক্কায় বিনিময় মূল্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে বাড়বে, এবং আন্তর্জাতিক বাজারের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে হলে অধিকন্তু আর্থিক অনুদান প্রয়োজন হবে। এক হাতে যা আসবে অন্য হাত দিয়ে তা বেরিয়ে যাবে। বোঝা শক্ত যে, সরকার যদি নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুর অনিবার্য দর বৃদ্ধি রোধের জন্য খাদ্য, রাসায়নিক সার ও কেরোসিনের আমদানির খাতে একদিকে আর্থিক অনুদান দেন (শুধু খাদ্যের জন্যই এ বছর লাগবে ১৫০ কোটি টাকা) এবং অন্যদিকে আধুনিক রপ্তানির খাতেও অনুদান দিতে হয়, উপরন্তু, দরবৃদ্ধির আশঙ্কায় এবং আমদানির কড়াকড়ি শিথিল করার মার্কিন দাবি অনুযায়ী আমদানি শুল্কও কমিয়ে দেন ও অনেক ক্ষেত্রে তুলে নেন, তবে বাজেটের কি দশা হবে? ব্যাপকভাবে আর্থিক অনুদান ও সম্ভাব্য ঘাটতি বাজেটের প্রকোপে শেষ অবধি দরবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতির হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া অসম্ভব। ফলে, ভারত সরকারের বাণিজ্য দপ্তরের রিপোর্ট ঠিকই বলেছেন যে, দরবৃদ্ধির প্রকোপে "শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান ও সমগ্র মজুরি-কাঠামো বিকৃত ও বিপর্যস্ত হবে"। আসলে, কিন্তু, ডিভ্যালুয়েশনের অর্থনৈতিক কার্যকারিতা দরবৃদ্ধির মধ্য দিয়েই প্রকাশ পায়।

সবচেয়ে অসাধারণ ব্যাপার হলো এই যে, ডিভ্যালুয়েশন করা হলো আমদানি কমানোর জন্য নয়, আমদানির বিধিনিষেধ শিথিল করার জন্য, অকেজো উৎপাদন সামর্থ্য কেজো করার নামে প্রকল্প-বহির্ভূত সাহায্য (non-project aid) পাওয়ার জন্য। আমদানি বাড়ানোর জন্য ডিভ্যালুয়েশন বোধহয় অর্থনৈতিক ইতিহাসে এই প্রথম ঘটল। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি যে, আমদানির শতকরা ৯৫ ভাগ এমন ধরনের যা বর্তমান খাদ্যনীতি ও শিল্পনীতির চৌহদ্দির মধ্যে অপরিহার্য। আসলে তো আমদানি কমানোটা উদ্দেশ্যই নয়, বাড়ানোই উদ্দেশ্য। একই পরিমাণ জিনিষ দিয়ে ভারতের অর্থনীতির উপর অধিকতর দখল কায়েম করাই উদ্দেশ্য। ডিভ্যালুয়েশন হলো তবে ৯০ কোটি ডলার প্রকল্প-বহির্ভূত সাহায্য পশ্চিমী সাহায্য-গোষ্ঠীর (Aid India Consortium) কাছ থেকে পাওয়া গেলো। এমন কি 'স্টেটস-

ম্যান' পত্রিকাও খবরটা দিতে গিয়ে প্রথমেই বলেছে যে, সাহায্য সেই এলো কিন্তু "দুর্ভাগ্যবশত" ডিভ্যালুয়েশনের পরে এলো। একই পরিমাণ ৯০ কোটি ডলারের দাম এখন ৪৫০ কোটি টাকার বদলে প্রায় ৭০০ কোটি টাকা। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াল ?

দাঁড়াল এই :

১। ভারত সরকার ডিভ্যালুয়েশন করেছেন জেনে শুনে যে এর দ্বারা রপ্তানির কোনো সুরাহা হবে না, আমদানি কমা তা দূরস্থান বাড়ানোটিই উদ্দেশ্য। সরকারের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, যার অধীনে বৈদেশিক বাণিজ্য দপ্তর, তাদের রিপোর্টে সরকারেরই কয়েক সপ্তাহ আগেকার সঠিক মতামত স্বপ্রকাশ।

২। আমদানি ও রপ্তানি উভয়েরই দরবৃদ্ধি ঘটবে, এবং ফলে ভারতীয় অর্থনীতির বিচিত্র নিয়মে সর্বব্যাপী দরবৃদ্ধির ঝোঁক ত্বরান্বিত হবে ; সরকারী রিপোর্ট অনুসারেই জীবনযাত্রার মান বিপর্যস্ত হবে।

৩। সাদামাটা একটা হিসেব করেই দেখা যাচ্ছে যে, আমদানির ব্যয়বৃদ্ধির ফলে, বাণিজ্যিক লেনদেনে বাৎসরিক ঘাটতি (১৯৬৫-৬৬ সালের পরিমাণ অনুসারে) দাঁড়াবে গিয়ে ১২০০ কোটি টাকায়। তার সঙ্গে যোগ করুন অতিরিক্ত কাঁচামাল ও সংরক্ষক আমদানি (maintenance imports) বাবদ আরো বছরে অন্তত ২০০ কোটি টাকা, এবং বৈদেশিক ঋণের সুদ ইত্যাদি বাবদ আগামী ৫ বছরে গড়ে প্রতি বছর ৩০০ কোটি টাকা। সর্বসাকুল্যে বৈদেশিক লেনদেনে বাৎসরিক ঘাটতি ১৭০০ কোটি টাকা, ৫ বছরে ৮,৫০০ কোটি টাকা ! ৪র্থ পরিকল্পনায় মোট বিনিয়োগ ২১,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এর অর্ধেকের কিছু কম হবে বৈদেশিক পুঁজি !!

৪। বছরে ১৭০০ কোটি টাকা বৈদেশিক পুঁজি আসার কোনো সম্ভাবনা নেই। গত দশ-বারো বছরে সমগ্র অনগ্রসর অঞ্চলে বিদেশী পুঁজির লগ্নির হার যা তাতে গড়ে বছরে ৪৫০/৫০০ কোটি টাকার চেয়ে বেশি বৈদেশিক পুঁজি আসা সম্ভব নয়। নতুন বিনিময় হারের হিসেবে ধরলেও তা ৭০০ কোটি টাকার বেশি হয় না। এই হার দ্বিগুণ বেড়ে যাওয়া অসম্ভব। তাহলে ভবিতব্য কি ? মার্কিন পরামর্শ অনুযায়ী ৪র্থ পরিকল্পনায় নতুন আর্থিক সামর্থ্য গড়ে তোলার কাজটি শিকেয় তোলা। "Holiday from Planning" "পরিকল্পনার হাত থেকে ছুটি" "Consolidation not

growth" "উন্নতি নয় সংহতি" ইত্যাদি যেসব বুলি তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ দু-বছর ধরেই শোনা যাচ্ছে, বিশ্বব্যাঙ্কের সেই সব বাণী মেনে নিয়ে ৪র্থ পরিকল্পনাকে ফরাসী বা বৃটিশ ধরনের "প্ল্যানিং", যেটা পরিকল্পনা নয়, পরিকল্পনার "ইসারা" (Indicative Planning), বা মার্কিন দেশীয় "managed economy"-র ভঙ্গিতে ফিরে যেতে হবে। অশোক মেহতা তো এবার মার্কিন দেশ থেকে ফিরে এসে বলতে শুরু করেছেন যে ভারতবর্ষ হবে "guided economy"। এই সব শব্দের তাৎপর্য হলো, অগ্রসর দেশের কেইন্‌সীয় "প্ল্যানিং" অনুযায়ী রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক তৎপরতাকে বড়জোর ব্যক্তিগত মালিকানায় পরিচালিত খোলাবাজারী আর্থব্যবস্থার শর্তাধীন সম্পূরক ভূমিকায় সীমাবদ্ধ রাখা। ১৯৬৬ সালের এপ্রিল মাসে 'The American Review' নামক দিল্লীর ইউ. এস. আই. এস. থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক পত্রিকায় ৪-৫ বছর U. S. A. I. D.-এর অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা, অধ্যাপক লিণ্ডব্লম লিখেছেন যে, তাঁদের প্রস্তাবিত "নীতির বাণ্ডিল" (package-reforms) অনুযায়ী চললে ভারতসরকারকে খুব আয়াস স্বীকার করতে হবে না, বড়জোর গাত্রোত্থান করে অর্থনীতির ক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করতে হবে ("a great gain will ensue from nothing more than the retirement of government")। এবং, ভারতীয় নীতির সুস্থ প্রয়োগধর্মিতার (pragmatism) প্রশংসা করে তিনি বলেছেন যে, ভারতের সরকারী নীতির পক্ষে "ব্যক্তিগত মালিকানার বিপরীতমুখে যাওয়ার সম্ভাবনা যতটা ঠিক ততটাই সম্ভাবনা আছে ব্যক্তিগত মালিকানার অভিমুখে যাওয়ার"। এই সম্ভাবনার কথা মনে রেখে তিনি মার্কিন সরকারকে "সাহায্য ও নীতির সূক্ষ্ম সম্পর্ক" (The Subtle Relation Between Aid & Policy) রচনা করার পরামর্শ দিয়েছেন। তদনুযায়ী ৯০ কোটি ডলার প্রকল্প-বহির্ভূত সাহায্য ডিভ্যালুয়েশনের তিন সপ্তাহের মধ্যে ভারত-সাহায্য-গোষ্ঠীর কাছ থেকে এসেছে, এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী হাঁক পাড়ছেন যে, দরকার হলে পিতার সমাজতান্ত্রিক নীতিসমূহ থেকে সরে আসতেও তিনি অপারগ নন। ভাবখানা তাঁর ঝাঁসির রানীর মতো হলেও, ব্যাপারটা পরিষ্কার। ভারতের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বিকাশের পরিকল্পনার মৃত্যু ঘটছে। ভারতের স্বাধীন পরিকল্পনার শ্রেষ্ঠ সম্বল, সমাজতন্ত্রের দেশের সঙ্গে বাণিজ্যও ডিভ্যালুয়েশনে বিপর্যস্ত। অতঃপর আমরা ব্রাজিল আর্জেন্টিনার মতো হয়ে যাব অচিরেই।

*　　　　*　　　　*

এখন কী করা যেতে পারে? ক্ষমতা থাকলে এই সরকারকে গলাধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়া উচিত নিশ্চয়ই। গলাধাক্কা খাওয়ার যোগ্যতাটুকু এরা অর্জন করেছেন কয়েকমাসের মধ্যেই। কিন্তু, অর্থনৈতিক ব্যাপারে কী করা উচিত এখন, ডিভ্যালুয়েশনের ফলাফল বিপরীতদিকে ঘুরিয়ে দিতে হলে? স্বল্পপরিসরে এ-বিষয়ে লেখা সম্ভব নয়। উল্লেখ করছি মাত্র যে, নিম্নলিখিত আশু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবলীর জন্য ব্যাপকতম জাতীয় সমাবেশ গড়ে তোলা উচিত ও সম্ভব :

১। সারা ভারতে একটি কেন্দ্রীয় খাদ্যনীতি এবং সে-নীতি হলো খাদ্য-সরবরাহে দেশব্যাপী পূর্ণাঙ্গ রেশনিং, বড় জোতের মালিকের উপর বাধ্যতামূলক লেভি, গরিব ও মাঝারি কৃষকের জন্য অর্থকরী দর ও সহজ ঋণ, মেহনতী কৃষকের সমবায় মারফৎ ঋণব্যবস্থা ও বেচাকেনাকে একসূত্রে গাঁথা, ভূমিহীন ক্ষেত-মজুরের জন্য কমদামে রেশন, গ্রামীণ উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার তদারকির জন্য গ্রামে গ্রামে মেহনতি কৃষকের নির্বাচিত কমিটি। রেশনিং ও বড় জোতের উপর লেভি কার্যে পরিণত করার দায় সরকারের চেয়ে বিরোধী বামপক্ষের বেশি বৈ তো কম নয়, একথা প্রকাশ্যে কবুল করা প্রয়োজন। নয়তো "রেশনের পরিমাণ বাড়াতে হবে" বা "সস্তাদরে ভালো চাল দিতে হবে"-র দাবি বাস্তবিকপক্ষে পি.-এল. ৪৮০-র পক্ষেই কাজ করবে। মেদিনীপুরের অঞ্চলবিশেষে সম্প্রতি যে তথাকথিত "লুঠ" বা মজুতধরার ঘটনাবলী ঘটছে, তাকে সংগঠিত সর্বভারতীয় রূপ দেওয়া দরকার।

২। পুরনো টাকা ও নোট বাতিল করে নতুন নোট প্রচলনের দ্বারা মুদ্রাব্যবস্থার পুনর্নির্ধারণ (Demonetisation of Currency)। সম্পত্তি কেনা-বেচার উপর উচ্চহারে কর retrospective effect-এ বসিয়ে—অর্থাৎ মুদ্রাব্যবস্থার পুনর্নির্ধারণের দিনের কিছুকাল আগের মধ্যে যত সম্পত্তি কেনা-বেচা হয়েছে তার উপর কর বসিয়ে—সেই সঙ্গে পুরনো মুদ্রার বদলে নতুন মুদ্রার প্রচলন বাজার থেকে কালো টাকা অপসারণের একমাত্র পথ। অবিলম্বে এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাপ দিতে হবে।

৩। বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয়করণ এবং সমাজতান্ত্রিক ও বন্ধুভাবাপন্ন সদ্যস্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক চুক্তির দ্বারা ডিভ্যালুয়েশনের ফলাফলকে পশ্চিমী বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা ও বাস্তবত বহুমাত্রিক বিনিময় হার ব্যবস্থা

(Multiple Exchange Rate System) চালু করা। মার্কিনী ও পশ্চিম ইওরোপের বাজারের সঙ্গেই আমাদের বাণিজ্য অতিমাত্রায় ভারসাম্যহীন। সমাজতান্ত্রিক ও সদ্যস্বাধীন দেশগুলির সঙ্গে লেন-দেনে এজাতীয় সমস্যা বহুলাংশে অনুপস্থিত। এ-অবস্থায় রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য মারফৎ বহুমাত্রিক বিনিময় হার ব্যবস্থার দ্বারা ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের গতিমুখ পরিবর্তনই একমাত্র বাস্তবপন্থা। বৈদেশিক বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ ব্যতিরেকে এই পরিবর্তন সম্ভব নয়, কারণ, ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের শতকরা ২৫ ভাগ মাত্র ১০টি প্রতিষ্ঠানের হাতে—যেগুলি সবই বিদেশী পুঁজির প্রতিষ্ঠান—আর শতকরা ৭৫ ভাগ ১০০টির হাতে। এদের হাতে বৈদেশিক বাণিজ্য ছেড়ে রেখে বৈদেশিক লেন-দেনে কোনো পরিকল্পনা চালু করা সম্ভব নয়।

গত ৬ই জুন মধ্যরাত্রে যে ঘটনাটা ঘটল তাকে বলা যায় নিমন্ত্রিত অতিথিকে ছদ্মবেশী আততায়ী জেনেও একই ছাতের নিচে আশ্রয় দিয়ে একপ্রকার আত্মহত্যা বরণ। দায়িত্বটা ভারতসরকারের, প্রধানত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার ও তাঁর তিন মন্ত্রীর—অশোক মেহতা, সুব্রহ্মনিয়ম্ ও শচীন চৌধুরীর। দায়িত্বটা যে এঁদেরই তা অস্বীকার করা যায় না। আবার পুরোটাই কেবল তাঁদের তা-ও হলফ করে বলা যায় না। একটা দেশ যখন বিক্রি হয়ে যায়, স্বখাতসলিলে সমাধিস্থ হয়, তখন সেদেশের সব জীবিত এমনকি মৃতরাও বোধহয় হাত ধুয়ে ফেলে বলতে পারেন না যে, দায়িত্বটা ওই কজন ঠিকেদারের। এদেশের মঙ্গল-অমঙ্গলের যাবতীয় ঠিকে ওই কজনেরই এমন কথা আহাম্মক না হলে বলা চলে না। পাপের ভাগ কার কতটা, তা নিয়ে হয়তো বাছবিচারের অবকাশ আছে—ওড়িশার যে হতভাগ্য পিতামাতা ১ টাকা দরে সন্তান বেচেছিল তার, আর মসৃণ মুখশ্রীমণ্ডিত প্রিয়দর্শিনীর মধ্যে নিশ্চয়ই পাপের ভাগে তারতম্য আছে। কিন্তু, দেশ বলতে ওই যে হতভাগ্য পিতামাতা ও তাদের বাজারদরে বিকিয়ে যাওয়া সন্তানকে বোঝায়, তাদের যাবতীয় না হলেও কিছু মঙ্গল-অমঙ্গলের ঠিকে তো আমরাও নিয়েছি, নিয়ে ভোট চেয়েছি, আমরা যারা প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রপ্রেমী বামপন্থী।

অধঃপাতে গেছি আমরাও, কেউ জেনে কেউবা না-জেনে। নয়তো, ওড়িশায় কেবলমাত্র American Peace Corps ও সংশ্লিষ্ট বিদেশীরাই ওড়িশার বাইরের একমাত্র বেসরকারী সেবাদল হবে কেন—ভারত সেবাশ্রম

সজ্য ছাড়া ? অথচ আমরা কিন্তু অম্লানবদনে ওড়িশার তথাকথিত "উদ্বৃত্ত" চাল আমাদের রেশনের সঙ্গে গলাধঃকরণ করে চলেছি। রাস্তায় চাঁদা তুলতে বেরিয়ে শোনা গেল: শালা, নিজেরাই খেতে পাই না, আবার ওড়িশাকে সাহায্য কর! বামপন্থী দলগুলি কেউ অঙ্গুলিহেলনও করলেন না। তারপর, দেখুন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাযজ্ঞে যে তাণ্ডবনৃত্য হয়ে গেলো, সে ব্যাপারেও আমরা কেমন নিশ্চেষ্ট। পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকসমিতি ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রইউনিয়নের মুষ্টিমেয় ছেলের দল ছাড়া সারা বাংলাদেশের ডাকসাইটে সব গণপ্রতিষ্ঠান, শিক্ষা-সংস্কৃতি-রাজনীতির মোড়লস্থানীয়দের সরব কণ্ঠস্বর একেবারে নীরব। সামনেই যে নির্বাচন।

কলকাতা শহর ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই ঐতিহাসিক ধর্মঘটে উত্তাল হয়ে ভেঙে পড়েছিল, আর তার একপক্ষকাল পরেই ১৬ই আগস্ট অভূতপূর্ব ভ্রাতৃহত্যার নরকে গড়াগড়ি দিয়েছিল। গত ১১ই মার্চ থেকে ৬ই এপ্রিল পর্যন্ত কলকাতা ও বৃহত্তর কলকাতার শহরতলী অঞ্চলের তরুণসমাজ আইন-শৃঙ্খলার রক্ষকের টুঁটি টিপে ধরেছিল আর সেই ঘা শুকোতে না শুকোতেই শিক্ষাদীক্ষা সভ্যতারও টুঁটি টিপে ধরল বিশ্ববিদ্যালয়ের দালানে ও কলেজে কলেজে। পাক-ভারত সংঘর্ষের সময়ে জওয়ানদের শৌর্য ও ত্যাগে সারা দেশের দেহমনে উদ্দীপনার বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে গিয়েছিল। মায় অতুল্য ঘোষ মশাই মেদিনী কাঁপিয়ে তর্জন করেছিলেন: নেহি মাঙ্গতা মার্কিনী গম ও অস্ত্রসাহায্য। আর তার ৬ মাসের মধ্যেই স্বয়ং জওহরলালদুহিতা ডলারের স্পর্শমোহে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। আমরাও তো দিব্বি পি. এল. ৪৮০-র দানা গিলে চলেছি। দায়িত্ব কার? এমনি করেই কি ভারতবর্ষের দরিদ্র মানুষ মহত্ত্বের শীর্ষদেশ থেকে রসাতলে নিক্ষিপ্ত হবে বারবার নেতৃত্বের ক্ষমতাসীন অংশের বিশ্বাসঘাতকা আর বিরোধী অংশের অপদার্থতায়? বর্তমান মুহূর্তে ভারতের টাকার বিনিময়-মূল্যহ্রাস ঘটল কোনো অর্থনৈতিক যুক্তিতে নয়, রাজনৈতিক আত্মবিক্রয়ের শর্তে। আর, এই আত্মবিক্রয়ের পৃষ্ঠপটে আছে দেশের সমগ্র সামাজিক নেতৃত্বের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আর্থিক—চরম নৈতিক দৈন্য। এই নৈতিক পরাজয়ের আত্মগ্লানি বর্তমান সংকটের অর্থনৈতিক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের সঙ্গে যুক্ত না হলে ব্যাখ্যা শুধু ব্যাখ্যাই থেকে যাবে, রূপান্তরের দায়গ্রহণে ব্যাখ্যার সম্পূর্ণতাপ্রাপ্তি ঘটবে না—"Interpretation

consists in change" কথাটা ভারতের মার্কসবাদীদের অপদার্থতারই সাক্ষ্য বহন করবে। ভারতের অর্থনীতিকে বাঁচাতে হলে, সরকারী, বেসরকারী, বিরোধীমহল নির্বিশেষে সমগ্র দেশের সমাজমানসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে গোত্রহীন সারমেয়বৃত্তি (Homo Homini Lupus-এর খাঁটি দেশজ সংস্করণ) বাসা বেঁধেছে তার বিরুদ্ধে ব্যাপক সৃষ্টিকামী গঠনবাদী অভিযান প্রয়োজন, যা ভারতের অসহায় মানুষকে আরো একা নয়, এক করে। সমগ্র জাতির আত্মসমালোচনার আগুনে পুড়িয়ে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক কার্যক্রম তৈরি করতে হবে। তার কেন্দ্রবিন্দু হবে ভারতের শ্রমজীবী কৃষক। সে-ই এদেশের সভ্যতার আদিজনক। এই আদিজনকেরই ভাবরূপ সেই অর্ধনগ্ন ফকিরকে হত্যা করে যে স্বাধীনতার শুরু হয়েছিল, তা শেষপর্যন্ত আত্মঘাতী হবে এ আর আশ্চর্য কি! বিনিময়-হার তো অনেক আগেই তলিয়ে গেছে। টাকার নয়, ভারতের, আমাদের!

পুস্তক-পরিচয়

বিলুপ্ত হৃদয়। আজহারউদ্দীন খান। ডি. এম. লাইব্রেরি। তিন টাকা।

'বিলুপ্ত হৃদয়'-এ বিস্মৃতপ্রায় মুসলমান সাহিত্যসাধকদের স্মরণ করেছেন আজহারউদ্দীন খান। "সময়ের স্রোতে যাঁরা আজ হারিয়ে যাবার মুখে" বর্তমান গ্রন্থে তাঁদেরই কয়েকজন আলোচিত। হিন্দু-মুসলমানের সমবেত সাধনায় আজকের বাংলা সাহিত্য গঠিত। অথচ, বেদনাদায়ক হলেও, একথা স্বীকার করতেই হয় যে আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে প্রায়ই এ-সত্য অনুপস্থিত। যদিও বা কিছুটা স্বীকৃতি থাকে তাতে অবহেলা বা অনুগ্রহের অংশই বেশি। মীর মশাররফ হোসেন—কায়কোবাদ—মোজাম্মেল হক—আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদ—এস. ওয়াজেদ আলী—শাহাদৎ হোসেন—গোলাম মোস্তাফা—জসীমউদ্দীন—সবকটিই অতিপরিচিত নাম। কিন্তু ঐ নাম ছাড়া তাঁদের আর কিছুর সঙ্গেই আমরা পরিচিত নই, হতে বোধহয় আগ্রহীও ছিলাম না। আজহারউদ্দীনের এই বই এঁদের যেমন বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে পরিচিতির আলোকে নিয়ে এসেছে তেমনি আমাদেরও কর্তব্যচ্যুতির দায় থেকে বাঁচিয়েছে। এই দুই কারণেই লেখক বাঙালী মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

আজহারউদ্দীনের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি কোথাও কারও সম্পর্কে অযথা প্রশস্তিবাক্য উচ্চারণ করেন নি। বরং কোথাও কোথাও তিনি অতিমাত্রায় নির্মম। প্রায় একই সময়ে রচিত হওয়া সত্ত্বেও মীর মশাররফ হোসেনের 'জমিদার দর্পণ' নীলদর্পণের মতো লোকপ্রিয় হতে না পারার কারণ তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছেন। "দীনবন্ধুর মত মীরসাহেবের নাট্য-প্রতিভা উঁচুদরের ছিল না। আর কোনোকিছুর অনুকরণরূপে কোনোকিছু স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে পারে না।" মোজাম্মেল হক প্রসঙ্গে তিনি অনায়াসে বলতে পারেন, "হক সাহেব সম্মিলিত হিন্দু-মুসলমান বাংলা সাহিত্যে কাব্যের মারফৎ এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আনতে পারেন নি যার জন্যে আজকের পাঠকরা তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবেন।' গোলাম মোস্তাফা সম্পর্কে তাঁর তীব্র অথবা সার্থক মন্তব্য, "কালের গতির সঙ্গে তাল রেখে তিনি এগোন নি। এগুতে হলে আধুনিক কবিতার শিল্পরীতিকে অধিগত করার জন্যে যে মন দরকার হয় সে মন

তিনি প্রায় নিঃশেষে খরচ করছেন প্রতিক্রিয়াশীলদের খুশী করবার জন্যে তৃতীয়শ্রেণীর গান আর প্রচারমূলক প্রবন্ধের বই লিখে।" এ সমস্ত মন্তব্যই একজন খাঁটি ও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

শুধু সমালোচনার জন্যই নয় অনেক অপরিচিত, অজ্ঞাত তথ্য ও ঘটনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্যও গ্রন্থটি স্মরণীয়। যেমন, আমরা অনেকেই জানতাম না যে, মীর মশাররফ হোসেনের গন্থ পড়ে বঙ্কিম লিখেছিলেন, "তাঁহার রচনার ন্যায়, বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না।" কায়কোবাদকে তো বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অনায়াসে সাম্প্রদায়িক কবি হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। সেই কায়কোবাদই যে লিখে গেছেন "হিন্দু মুসলমান উভয়েই একটি চরম আত্মঘাতী সংগ্রামে লিপ্ত এবং উভয়েই বীর এবং ধর্মপ্রাণ।"—তা এর আগে কে জানত? আব্দুল করিম সাহিত্যবিশারদের উদাত্ত ঘোষণা এখনো যেন কানে বাজছে "আমার দেশের মৃত্যু নাই। আমার দেশের আত্মার জনগণের মৃত্যু নাই। তেমনি অমর আমার এই বাংলাভাষা।" সবার ওপরে রয়েছেন এস. ওয়াজেদ আলী, "আমি মুসলমান সমাজের বটে, কিন্তু তারও ওপর আমি মানুষ, আমি ভারতবাসী বটে কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ। আমি বাঙালী বটে কিন্তু তারও উপর আমি মানুষ।" উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। কথায় কথায় অধিকাংশ মুসলমান সাহিত্যিককে সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণবুদ্ধি বলে সরিয়ে রাখা কতখানি অযৌক্তিক ও হাস্যকর বইয়ের পাতায় পাতায় তার যুক্তিসংগত অজস্র প্রমাণ রয়েছে। এ সমস্তের সঙ্গেই আমাদের বহুপূর্ব থেকেই পরিচিত না হওয়াটাই লজ্জার। বিলম্বে হলেও তাঁর বই বের করে আজহারউদ্দীন সাহেব আমাদের সেই লজ্জার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

বিশ্ববন্ধু ভট্টাচার্য

ইংলিশ চ্যানেল। কৃষ্ণা দত্ত। নবপত্র প্রকাশন। সাতটাকা।
পটভূমি। কমল ঘোষ। পাণিনি প্রকাশনা। দু-টাকা।
রাত্রির সংলাপ। অজিত মুখোপাধ্যায়। পেলিক্যান প্রেস। চার টাকা।
মাটি ও মানুষ। কাতিকচন্দ্র দলুই। গ্রন্থপীঠ। তিন টাকা।

বাংলা ভাষায় লণ্ডন নিয়ে সাহিত্যরচনা আজ আর নতুন নয়। বলা যেতে পারে লণ্ডন নিয়ে সাহিত্যরচনার একটা ধারাই এর মধ্যে গড়ে উঠেছে। এবং এই সব লেখার মধ্যে যেগুলি রম্যরচনা নামে বিজ্ঞাপিত, সেগুলো রূপকথার মতো

প্রস্থানত বানিয়ে তোলা ; আর উপন্যাস নামে প্রচারিত লেখাগুলি আসলে রম্য, অংশত বানানো, ফাঁপিয়ে তোলা বেলুনের মতো উৎসে তুচ্ছ পরিণামে আকাশচারী।

কিন্তু কৃষ্ণা দত্ত-র 'ইংলিশ চ্যানেল' একই সঙ্গে উপন্যাসের রস, রম্যরচনার মেজাজ এবং সবচেয়ে বড় কথা বিশ্বাসগুণে সমৃদ্ধ। গল্পবলার ক্ষমতা আছে লেখিকার। ইংরেজি বাক্যাংশ ও শব্দব্যবহার মানিয়ে গেছে—পরিবেশরচনায় সাহায্যও করেছে। চরিত্র-চিত্রণের পারদর্শিতা অসধারণ। সামান্য বর্ণনায় প্রত্যেকটি চরিত্র উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে সবিতার স্বামী দেবেন্দ্রর উল্লেখ করা যায়—স্বাতন্ত্র্যযুক্ত এই চরিত্র এঁকেছেন লেখিকা—যেন কত আয়াসবিহীন। পুরব-সবিতা, হেমন্ত-ভারতী এপিসোডগুলি অনেকক্ষণ মনকে ধরে রাখে। অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেভিসের চরিত্র-অঙ্কনেও লেখিকা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

সুখের কথা, ইংরেজ ও ইংরেজের দেশ সম্বন্ধে এঁর কোনো কমপ্লেক্স নেই। যতটা সম্ভব মুক্ত বিচারবোধ নিয়ে তিনি লণ্ডনে সমাগত ভারতীয় নরনারী এবং ওখানকার ইংরেজ চরিত্রগুলি দেখেছেন। সংকীর্ণতা বা উন্নাসিকতার চিহ্ন নেই। অনেকটা অবজেকটিভ্ দৃষ্টিকোণ থেকে পৃথিবীর একটি বিশিষ্ট শহরে মিলিত আন্তর্জাতিক নরনারীসমাজকে দেখা ও দেখানোর চেষ্টা—আর সেই চেষ্টা বিভিন্ন চরিত্রের হৃদয়-সংবাদে পর্যবসিত। এই হৃদয়-সংবাদে গ্রন্থটি অধিকাংশ পাঠককে ধরে রাখবে আর সকলকেই স্পর্শ করবে; কারণ তাঁর লেখায় আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও জীবনকে উপলব্ধির চেষ্টা আছে।

আবার হৃদয়-সংবাদে পর্যবসিত বলে এ-গ্রন্থ বুদ্ধিজীবী পাঠকের কাছে অনিবার্য অসম্পূর্ণতা নিয়ে দেখা দেবে। কিন্তু তাঁরাও এর গল্পরস উপেক্ষা করতে পারবেন না। আমাদের অধিকাংশের অপরিচিত জীবন মন্থন করে লেখিকা পরিচিত জীবনের গভীর স্বাদ এনে দিয়েছেন।

লণ্ডন থেকে আসা গেল কলকাতার পটভূমিতে। কমল ঘোষের 'পটভূমি' উপন্যাসে কলকাতাকে কেন্দ্র করেই গল্প বানানোর চেষ্টা। মানে না-বানানোর চেষ্টা।

লেখকের আর কোনো বই পড়ি নি। বেরিয়েছে কিনা জানি না। এটাই প্রথম বই হওয়া সম্ভব। ভাষা ও বিন্যাসরীতি কাঁচা ও ছেলেমানুষি স্টান্টে ভর্তি। দৃষ্টান্ত—'তপনের মনে হয় একটা ঘোরানো পথে তার ব্যক্তিত্বের একটা দানা যেন ককিয়ে উঠলো।' এরকম অনেক আছে। বিষয়বস্তু বর্তমান নাগরিক, বিশেষত, কলকাতার জীবন! এই জীবন তাঁর চোখে 'শিল্পীর সামনে পড়ে থাকছে সাদা ক্যানভাস, কবি হয়ে উঠেছে দিশেহারা, নাগরিকেরা চলেছে উদ্দেশ্যহীনতার অভিসারে।' এসব কথা হয়তো সত্যি। কিন্তু লেখক যে শিল্পী-কবি ও নাগরিকদের এঁকেছেন, তারা বিকৃতকাম, অসুস্থ। নগ্ন নারীকে

সামনে রেখে এই সব শিল্পীরা প্রেরণা চায়, তারপর—'আস্তে আস্তে সে এগিয়ে আসে মেয়েটির কাছে। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তার মুখের দিকে চেয়ে, তারপর সজোরে তার গালে একটা চড় বসিয়ে দেয়।'—এদের ক্যানভাস সাদা থাকাই ভালো।

পাইকা হরফে মুদ্রণ, অঙ্গসজ্জার ও পরিচ্ছেদ-বিভাগের কৌশলসত্ত্বেও উনসত্তর পৃষ্ঠার বেশি এগোয় না এসব ছবি—তবু 'পটভূমি' তো উপন্যাস হিসেবেই রচিত। কিন্তু জীবনের যে-ছবি লেখক এঁকেছেন—বিহঙ্গ-চোখেও জীবন তার চেয়ে অনেক বড় ও গভীর।

এই বই শিক্ষানবিশীর কলমে লেখা। পাঠক-চক্ষুর অগোচরে রাখলেই লেখক নিজের প্রতি সুবিচার করতেন। আর একটা কথা—'বার' ও বারবনিতারা সিনেমার মতো উপন্যাসেও কি অনিবার্য হয়ে উঠল ?

'রাত্রির সংলাপ' উপন্যাসেও অজিত মুখোপাধ্যায় এইসব উপকরণ এনে জড়ো করেছেন। অন্ধকার কলকাতার—আর্থিক ও নৈতিক সমস্যায় জর্জরিত কলকাতার লক্ষ্যভ্রষ্ট তরুণদের অন্ধকার জীবনের কাহিনী এই বই। কিন্তু জীবনের এই আংশিক চিত্রও গভীর মনে হয় নি, কারণ এ-গল্প রোমাঞ্চরসে ভিজে গেছে, অনেক ছবি লেখক তুলে ধরেছেন, সে-সবের বস্তুগত সততা নিশ্চয়ই আছে ; কিন্তু রচনা ও বিন্যাসে শস্তা চলচ্চিত্র-স্বভাব এসে গেছে বলেই—নিছক একটা গল্প শোনা গেল—এর বেশি কিছুই মনে হয় না। তাছাড়া দুঃখ-যন্ত্রণা-সমস্যা-বস্তি-ক্ষীয়মান মধ্যবিত্ত জীবন-আর্থিক ও নৈতিক পতন-গুণ্ডা-ডাকাত-শয়তান ধনী—বিষয় হিসেবে এরা সকলেই খুব জরুরি ও যথার্থ হতে পারে—কিন্তু সব জড়িয়ে লেখকের একটা বক্তব্য থাকা চাই তো! খালেদ চৌধুরীর সুন্দর অঙ্গসজ্জা ও আরম্ভে উদ্ধৃত শেক্‌স্‌পীঅরের বাণীর প্রতি লেখক সুবিচার করতে পারেন নি।

কলকাতার পটভূমি ছাড়িয়ে গ্রামবাংলার গল্পে এসেও স্বস্তি নেই। কারণ কার্তিকচন্দ্র দোলুই-এর 'মাটি ও মানুষ' উপন্যাসে মাটিও নেই, মানুষও অনুপস্থিত। নাটকের ফর্মে লেখা উপন্যাসজাতীয় বস্তু। সিনেমার ভরসায় সম্ভবত। প্রথম দৃশ্য বা পরিচ্ছেদ যাই বলুন, পড়ে শেষ করা শক্ত। হাস্যকর, গ্রাম্য, অশুদ্ধ ভাষা। প্রথম দৃশ্যের কিছুটা অংশ তুলে দিলে আমাদের বক্তব্যের সহায়ক হত, কিন্তু অপব্যয়যোগ্য অত জায়গা আমাদের নেই।

পরিশেষে উপন্যাস রচনার এই জাতীয় উদ্যম সম্বন্ধে পাঠকের দিক থেকে এই নালিশ রাখতে চাই যে, উপন্যাসের শিল্পটি জীবনের সঙ্গে সবচেয়ে বিশ্বাস্যসূত্রে যেখানে জড়িয়ে থাকার কথা, এইসব রচনায় তখন প্রাণোত্তাপ-বর্জিত কঙ্কালসার জীবনের ছবি আমাদের স্পর্শ করে না, কেননা যাথার্থ্যের অভাব উপন্যাসের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করে।

জ্যোতির্ময় ঘোষ

পরীক্ষা সংকটের একটি দিক

পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাব্যবস্থার পচ ধরেছে বহু বছর আগেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমাবর্তন উৎসবে অনেক নামকরা পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদ আজ দশবছর ধরে বার বার বলেছেন যে আমাদের পরীক্ষাব্যবস্থায় ঘুন ধরে গেছে, একে খোল-নলচে বদলে ফেলা দরকার। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কিছুই করা হয় নি। বছরে বছরে একটি ফালাও-করা বক্তৃতার পর একটানা দিবানিদ্রা—আর আমাদের উচ্চশিক্ষা ও তার পরীক্ষাব্যবস্থা চাকাভাঙা গরুর গাড়ির মত 'যথাপূর্বম তথাপরম্' চলছিল। কিন্তু আর বোধহয় চলবে না। এবছর (১৯৬৮) এপ্রিল ও মে মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ., বি. এস-সি., বি. কম-এর অনার্স সহ সমস্ত পরীক্ষার বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে ছাত্রদের এক বৃহৎ অংশ যে তাণ্ডব-নৃত্য করল, তার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমগ্র পরীক্ষাব্যবস্থাই ভণ্ডুল হতে বসেছিল। পরীক্ষার্থীদের দুষ্কৃতিকারী অংশের প্রায় হাতে পায়ে ধরে ও তাদের অনেক অপকীর্তিকে এক চোখ বুজে মেনে নিয়ে, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ কোনও গতিকে নমো নমো করে পরীক্ষাগুলি পার করেছেন। সেসব কেলেঙ্কারী ও তার চরিত্র সম্বন্ধে আমার মতামত অন্যত্র বিশদভাবে ধারাবাহিক লিখেছি। এখানে তার পুনরুক্তি তাই নিষ্প্রয়োজন। তাছাড়া এই স্বল্প পরিসরে পরীক্ষসংকটের সমস্ত দিক সম্বন্ধে যথাযথ আলোচনাও সম্ভব নয়। এই ছোট্ট প্রবন্ধে আমি শুধু পরীক্ষা-সংকটের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ দিকের উপরই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকেন্দ্রে গোলমালগুলির প্রায় একটা বাঁধাধরা ছক আছে। সেটা কি রকম? প্রশ্নপত্র হাতে পাবার মিনিট দশেকের মধ্যেই (যেদিন গণ্ডগোল হয়) পরীক্ষার্থীদের অনেকে বলতে থাকে—"জানা" প্রশ্ন একটাও নেই বা বড্ড অল্পসংখ্যক আছে, অতএব প্রশ্নপত্র ভীষণ "শক্ত" হয়েছে—তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার, তারপর চেয়ার টেবিল ভাঙা, যে ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে চায় তাদের জোর করে বের করে দেওয়া ও মারধোর করা, ইত্যাদি। তারপর দাবি "ফের পরীক্ষা চাই" এবং প্রশ্ন "জানা" হতে হবে। এবারের প্রথমদিনের গণ্ডগোলের ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই আমি

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শতবার্ষিকীভবনের কাছে উপস্থিত হয়েছিলাম। সেদিন সমস্ত অনার্স ছাত্র-ছাত্রীর ৪র্থ পত্র বা শেষ দিন। ঐ কেন্দ্রের প্রায় তিন হাজার ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শ দুই-তিন মাত্র হট্টগোল সুরু করে ও জিনিস-পত্র ভেঙেচুরে সকলের পরীক্ষা ভণ্ডুল করে দেয়। শ তিন-চার ছাত্রছাত্রী পরীক্ষা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাকি হাজার দুই নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। এই শেষোক্ত বৃহৎ অংশের বক্তব্য হল—হট্টগোল, ভাঙাচোরা, মারধোর, এসব খুব অন্যায় হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন "জানা" পাই নি, বড়ই শক্ত হয়েছে।

ইতিহাস অনার্সের ছাত্ররাই গোলমালটা সুরু করে। আমি ইতিহাস পড়াই—প্রশ্নপত্র দেখে আমার মনে হল, প্রশ্ন বেশ ভালই হয়েছে, সমস্ত পাঠ্যসূচী থেকে ছড়িয়ে এসেছে—ফরাসী বিপ্লব, নেপোলিয়ন, বিসমার্ক, প্রথম মহাযুদ্ধ, জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচার—এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপরই প্রশ্ন এসেছে যা অনার্সের ছাত্র-ছাত্রীদের না লিখতে পারার সংগত কারণ নেই। তাহলে এত ছাত্রছাত্রী কি ফাঁকিবাজ? সবাই কি দুষ্কৃতিকারী?—ব্যাপারটা কি? যাঁরা কলেজে আমার মত অনেকদিন অধ্যাপনা করছেন, তাঁরা সবাই মনে মনে কিন্তু জানেন আসলে ব্যাপারটা কি! বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম-অনুযায়ী অনার্স এবং এম. এ.-এম. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তর ইংরেজি ভাষায় লেখা আজও বাধ্যতামূলক। আর পশ্চিমবাংলার সহর ও গ্রামের দরিদ্র মধ্য শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা প্রায় সবাই ইংরেজি ভাষার জ্ঞানে ছেলেবেলা থেকে অত্যন্ত কাঁচা। স্কুল ফাইনাল, উচ্চ মাধ্যমিক ও প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় সমস্ত উত্তর তারা বাংলা ভাষাতেই লিখে এসেছে—যেখানে শুনে বোঝা, পড়ে বোঝা ও হৃদয়ঙ্গম করে লেখার মধ্যে বিদেশী ভাষার নাগপাশ কোথাও তাদের বুদ্ধির স্বাভাবিক বিকাশকে অবরুদ্ধ করে দেয় নি। কিন্তু তারপরই সেই উচ্চ শিক্ষায় আগ্রহী কিশোর-কিশোরীরা যেই অনার্স পড়তে আরম্ভ করল, তখনই সুরু হল বিদেশী ভাষার প্রাণান্তকর নিগ্রহ। ফলে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির ও চিন্তাশক্তির স্বাভাবিক বিকাশ একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যায়। তাদের তখন ঝোঁক পড়ে বাছাই-করা কয়েকটি প্রশ্ন কাউকে দিয়ে ইংরেজিতে লিখিয়ে নিয়ে সেগুলি প্রাণপণে মুখস্থ করার দিকে। আর সেই "বাছাই" প্রশ্নর বাইরে প্রশ্ন এলেই হয় বিপর্যয় ও ফলে সহজেই তারা হয় পরীক্ষাকেন্দ্রে দুষ্কৃতিকারীদের শিকার। শিক্ষার বাইরের সমস্যাটা কথা নয়। আমাদের দেশের সত্যিকার

বড় বড় মনীষীরা গত প্রায় একশত বছর ধরে এই কথা বলে গলা ভেঙেছেন। তাঁদের মতামত তবু বারবার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার। তবে তার আগে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কয়েকটি কথা বলব। কারণ, কোনও কোনও ইংরেজিনবীশ বুদ্ধিজীবী সম্প্রতি বলেছেন যে, শিক্ষার মান উন্নয়ন ও পরীক্ষাব্যবস্থার উন্নতির প্রসঙ্গে মাতৃভাষাকেই সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম করার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন বসু প্রভৃতির মতামত নাকি 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' নীতি-সর্বস্ব, অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করা নয়!

কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেব।

বছর পাঁচ-ছয় আগে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের আই. এ. ক্লাসের সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর কাছে আমি একটি প্রশ্ন রাখি—তোমাদের যে এক হাজার নম্বর পড়তে হয়, তার মধ্যে মাত্র দুই শত তো ইংরেজির জন্য। কিন্তু তোমরা তোমাদের পড়াশুনোর সময়ের কত অংশ ইংরেজির জন্য ব্যয় কর? প্রায় সমস্ত ছেলেমেয়েরই জবাব পেলাম—পড়াশুনোর সময়ের বারো আনাই তারা ইংরেজি পড়ায় ব্যয় করে। কেননা মনে সর্বদা আতঙ্ক—ইংরেজি জানি না, ইংরেজিতে ফেল করব। তা সত্ত্বেও প্রতি বছর অর্ধেকের উপর ছেলেমেয়েই শুধুমাত্র ইংরেজিতেই ফেল করে। আর যারা বারো আনা সময় ইংরেজি পড়ে কোনোমতে ইংরেজিতে পাশ করে, তাদেরও একটা বড় অংশ নিশ্চয়ই অন্য বিষয়ে পড়ার সময় দিতে না পারায়, কোনো না কোনো ঐচ্ছিক বিষয়ে ফেল করে বসে থাকে। আর-একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—সুরেন্দ্রনাথ কলেজেরই মেয়েদের বিভাগে গত ১০ বছর ধরে পরীক্ষার ফলাফলের ব্যাপারে একটা ছক চলে আসছে। আগে আই. এ. ও বর্তমানে প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষায় গড়পড়তা পাঁচশত ছাত্রী পরীক্ষা দিলে, তাদের মধ্যে চার থেকে সাড়ে চার শত ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, তর্কবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে সফলকাম হয়, কিন্তু মাত্র দুই থেকে আড়াই শত ইংরেজি পরীক্ষার দুর্লঙ্ঘ্য বেড়াটি ডিঙোতে পারে।

অন্য ধরনের একটি দৃষ্টান্ত দিই। মফঃস্বল একটি জেলার একজন কৃষক নেতার ছেলে আমাদের কলেজে ইতিহাস অনার্স পড়তে আসে। ছেলেটি কর্মঠ ও বুদ্ধিমান। ক্লাসে যে-কোনো প্রশ্নের বাংলা ভাষায় বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরও দিত। অথচ প্রথম কলেজীয় পরীক্ষায় আমরা দুজন অধ্যাপক একত্রে বসেও তার খাতার মর্মোদ্ধার করতে পারলাম না। কেননা এক বিচিত্র অর্থহীন ইংরেজিতে সে উত্তর লিখেছিল। এই ছেলেটি এবং এর মত হাজার হাজার

গরীব ছেলেমেয়ে যদি বাংলার মাধ্যমে সর্বস্তরে লেখাপড়া করার ও পরীক্ষায় উত্তর লেখার সুযোগ পেত, তবে তারা শুধু ঠাণ্ডা মাথায় সুশৃঙ্খলভাবে পরীক্ষা দিতে পারত তাই নয়, দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে এদের নাড়ীর যোগ আছে বলে, নিজেদের অর্জিত বিদ্যা ও জ্ঞানকে তারা দরিদ্র দেশবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে যোগ্যতার সঙ্গে এগোতে পারত। কিন্তু টমাস ব্যারিংটন মেকলের তৈরি করা ইংরেজির ফাঁস আজও তাদের গলায় আটকে রয়েছে, কারণ মুষ্টিমেয় ইংরেজিশিক্ষিত বাঙালি ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষা-লাভকেই উচ্চশিক্ষার জগতে মোক্ষলাভের একমাত্র পথ জেনে বসে আছেন। তাঁদের তাতে অসুবিধেও নেই। কারণ, ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে ছেলেমেয়েদের পড়তে পাঠানো ও প্রয়োজন হলে ইংরেজির জন্য গৃহশিক্ষক রাখা এঁদের পোষায়। উচ্চশিক্ষার জগতের সুযোগ-সুবিধা এঁরাই এতদিন পেয়েছেন; তাই বলে এখনও পাবেন—এ অসম্ভব। দেশমাতার অধিকাংশ সন্তানকে শিক্ষার সুযোগ সমানভাবেই দিতে হবে।

কিন্তু মুস্কিলটা বেধেছে এইখানে যে, বিশ্বজোড়া নিপীড়িত মানুষের জয়-যাত্রার যুগে, এদেশেরও গরীব ছেলেমেয়েরা উচ্চশিক্ষার সব কটা সিঁড়িই পেরোবার অধিকার চাইছে। আর তার সুস্থ, স্বাভাবিক পথ খোলা না পেলে, অসুস্থ ধরনের বিস্ফোরণের মধ্য দিয়েও সেই পথ খুলে নেবার ভ্রান্ত ও অন্যায় চেষ্টাও করছে। ছাত্রসাধারণের সেই সব অন্যায় ও অপকীর্তিকে অন্যত্র আমি দ্ব্যর্থহীনভাবে ধিক্কার দিয়েছি। কিন্তু তারপর? আমরা দেশের ছাত্রসাধারণকে কি বলব? তারা যখন চীৎকার করে বলে যে 'আমরা ইংরেজি জানি না, বুঝতে পারি না, অত জিনিস ইংরেজিতে পড়ে মনে রাখতে পারি না, গুছিয়ে লিখতে আরও কম পারি, তাই আমরা বাছাই করে পড়ি ও মুখস্থ করে পরীক্ষা দিতে যাই,'—তখন, নিশ্চয় আমরা বলব, এ ভুল পথ এবং বাছাই করা প্রশ্ন না এলে হট্টগোল করে পরীক্ষা বানচাল করার কোনও অধিকার তোমাদের নেই। কিন্তু আমরা কি তাদের বলবো যে ও-সব কথা জানি না; যে করে পারো ইংরেজি তোমাদের শিখতেই হবে, মোটা মোটা বই ইংরেজিতেই পড়তে হবে আর ইংরেজিতেই তার উত্তর লিখতে হবে, নইলে তোমাদের উচ্চশিক্ষার দরজা বন্ধ? এ প্রশ্নকে আর এড়ালে চলবে না। পরীক্ষাসংকট সমাধান করতে গেলে আরও অনেক কিছু যেমন করতে হবে, তেমনই শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যমের প্রশ্নে দ্ব্যর্থহীন উত্তরও দিতে হবে—সর্বস্তরে শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যম একমাত্র মাতৃভাষাই হবে এবং আজই হতে হবে আর ইংরেজিকে কলেজীয় স্তরে বাধ্যতামূলক বিষয় না রেখে ঐচ্ছিক বিষয়ে পরিণত করতে হবে।

প্রায় একশত বছর আগে বঙ্কিমচন্দ্র সখেদে বলেছিলেন:

"বাঙ্গলায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙ্গালী কখনও বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে

না। যে কথা সকল দেশের লোক বুঝে না বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোনও উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

অর্ধ শতাব্দী আগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র আরও তীক্ষ্ণভাবে বলেছিলেন, "বিদেশী ভাষার কোটর হইতে অতি পরিশ্রমে যে বিদ্যা অর্জিত হয়, তাহাতে বাঙালী ছাত্রগণের মস্তিষ্ক দারুণ পীড়া অনুভব করে।"

জীবিত শিক্ষানায়কদের মধ্যে পুরোধা বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুও তাঁর সারাজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন :

"আমি মনে করি যে ইংরেজির উপর এত বেশি জোর দিলে দেশে শিক্ষা-বিস্তারের অন্তরায় সৃষ্টি হবে। যাঁরা শিক্ষকের বৃত্তি গ্রহণ করবেন তাঁদের সারাজীবন চেষ্টা করা দরকার—মনের সমস্ত কথা কি করে মাতৃভাষায় প্রকাশ করা যায়।"

কাগজে দেখেছি যে অনেক দেরিতে হলেও অবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য তদন্ত কমিশন বসিয়েছেন। তাঁরা নিশ্চয় পাঠ্যসূচী, পড়ানোর পদ্ধতি, নম্বর দেওয়া, প্রভৃতি বহুবিধ বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করবেন। কিন্তু নতুন বনেদ গাঁথার প্রথম কাজটা অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যম মাতৃভাষাই হবে, এই নীতি কি এখনই তাঁরা বলবৎ করতে পারেন না? অর্ধশতাব্দী আগে দেশবাসীর, বিশেষত দেশের উচ্চশিক্ষিত প্রগতিশীল মহলের কাছে রবীন্দ্রনাথ যে তীব্র প্রশ্নটি করেছিলেন, তাই দিয়েই প্রবন্ধটি শেষ করছি :

"মাতৃভাষা বাঙলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক, সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাঙলা বলে, সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চশিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবেই কি আমরা দ্বিজ হই?"

গৌতম চট্টোপাধ্যায়

(এ বিষয়ে আরও আলোচনা প্রার্থনীয়।—সম্পাদক)

প্রতিবেশী-পরিচয়

শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আমাদের প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে অধুনা যেসব শুভপ্রয়াস দেখা যাচ্ছে তার সম্পর্কে আমরা সচরাচর উদাসীন। এই ঔদাসীন্যের পিছনে সাধারণত থাকে কিছুটা আত্মম্ভরী স্বয়ংসম্পূর্ণতা। আবার এর ফলেও ফের পুষ্ট হয় সেই কূপমণ্ডুকতাই।

আমাদের পক্ষে তাই মাঝে মাঝে প্রতিবেশী-পরিচয়লাভের চেষ্টার গুরুত্ব সমধিক। সেদিক থেকে উড়িষ্যার এই খবরগুলি আমাদের পক্ষে কিছুটা হয়তো মূল্যবান।

'বহুরূপী' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীকিরণময় রাহার এক প্রবন্ধে কিছুদিন আগে জানা গিয়েছিল যে 'কটকে দুটি স্থায়ী মঞ্চে ('অন্নপূর্ণা' ও 'জনতা') সপ্তাহের ছদিন অভিনয় হয়, কলকাতার মতন তিনদিন নয়। যতটা জানি ভারতবর্ষের আর কোনো শহরে দুটি থিয়েটারে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে গত ১৫।২০ বছর ধরে এরকম নিয়মিত অভিনয় হচ্ছে না। এতদিন ধরে তুলনায় একটি ছোট শহরে দুটি থিয়েটার চলছে এটাই আশ্চর্য লেগেছিল।'

গত মে মাসের মাঝামাঝি থেকে কটকে আরো একটি মঞ্চে নিয়মিত অভিনয় শুরু হয়েছে—সপ্তাহে ছদিন। তাছাড়া নাট্যামোদী তরুণদের অপেশাদারী থিয়েটার গড়ারও চেষ্টা চলেছে কিছুদিন থেকে। অনেকের বিশ্বাস এদের মধ্যে 'সৃজনী'র মতো নাট্যগোষ্ঠী সাংগঠনিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারলে আধুনিক নাট্যপরিবেশনের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শকের কাজ করতে পারবে বহুলাংশে। স্বভাবতই এর প্রভাব কিছুটা পড়ছে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের উপরেও। সেখানেও গতমাস থেকে অভিনয় শুরু হয়েছে শ্রীকালিন্দীচরণ পানিগ্রাহীর মতো প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকের 'মাটির মানুষে'র (এই বিখ্যাত ওড়িয়া উপন্যাসটির বাঙলা তর্জমা প্রকাশ করেছে ভারতীয় সাহিত্য অকাডেমি)।

শিক্ষার ক্ষেত্রে একটা বড় খবর এই যে উড়িষ্যায় এখন প্রাথমিক শিক্ষার পাঠ্যপ্রকাশন ব্যবস্থা পুরোপুরি সরকারের হাতে। আর ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক দৃষ্টির সঙ্গে পরিচয়ের বদলে প্রাথমিক স্তর থেকেই যাতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের উপরে জোর পড়ে—বিশেষজ্ঞদের এই সুপরামর্শ অনুসারে নতুন করে রচিত পাঠ্যপুস্তক ধরে পড়ানোও শুরু হয়ে গেছে কিছুদিন থেকে। ছাত্রদের হাতে যথাযথভাবে পাঠ্যপুস্তক পৌছোনোর ব্যাপারে অবশ্য সরকারী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ শোনা গেল—না শুনলেই অবাক হতাম—কিন্তু নতুন পাঠ্যপুস্তকগুলি যে দৃষ্টিভঙ্গিতে রচিত হয়েছে তার তাৎপর্য সত্যই অপরিসীম, বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে।

আর একটি শুভপ্রচেষ্টার উল্লেখ না করলে অপরাধ হবে। শ্রীবিনোদচন্দ্র কানুনগো মহাশয় একদা ছিলেন উড়িষ্যার একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী। ৪৫ বছর আগে গান্ধীজীর অসহযোগের ডাকে তিনি স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন—আর ফিরে যান নি। তারপর ১৯৩০, ১৯৩২ ও সর্বশেষে ১৯৪২ সনের আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি মোট ৭ বছর কারাভোগ করেন। শেষবার—'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময়ে কিন্তু তাঁর একটি নতুন চিন্তা মাথায় আসে। তিনি স্থির করলেন যে জ্ঞানবিজ্ঞান-বিষয়ক নানা প্রসঙ্গে তিনি সহজ করে একটি গ্রন্থমালা রচনা করবেন—সাধারণ উড়িয়া পাঠকদের জন্য। এই উদ্দেশ্যে তিনি কঠোর অধ্যয়নে ব্রতী হলেন কারাবাসকালে। তারপর মুক্তি

পাবার পর চলতে থাকল সেই নিরলস সাধনা। ১৯১৪ সন নাগাদ তিনি স্থির করলেন যে পৃথক পৃথক গ্রন্থ রচনা না করে তিনি ওড়িয়া ভাষায় প্রথম সরল মহাকোষ (Popular Encyclopaedia) রচনা করবেন ৬০ খণ্ডে। এতে থাকবে আনুমানিক ১৫,০০০ পৃষ্ঠা, প্রায় ১০,০০০ ছবি ও ১২,০০০-এর মত প্রসঙ্গবিচার। বিজ্ঞানবিষয়ক প্রসঙ্গগুলির উপরে তাঁর বিশেষ ঝোঁক। তারই সঙ্গে উড়িষ্যা, ভারতবর্ষ, তথা সারা বিশ্বের সাধুসন্ত, দার্শনিক, লেখক, জাতীয় নেতা, বিশিষ্ট সমাজকর্মী প্রভৃতিদের সংক্ষিপ্ত জীবনীও এতে স্থান পাবে। বিভিন্ন ভাষায় রচিত বিখ্যাত গ্রন্থগুলির সঙ্গেও তিনি পরিচিত করাবেন ওড়িয়া পাঠকদের।

কানুনগো মহাশয় তাঁর বিরাট পরিকল্পনার নামকরণ করেছেন 'জ্ঞানমণ্ডল'। ইতিমধ্যে তার ৫টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৯ সনের ২রা অক্টোবর অর্থাৎ গান্ধীজীর জন্মশতবর্ষপূর্তি দিবসের মধ্যে তিনি বাকি ৫৫টি খণ্ড প্রকাশের ভরসা রাখেন।

'জ্ঞানমণ্ডলের' এই বিশাল পরিকল্পনার মাহাত্ম্য আমরা আরো উপলব্ধি করতে পারি যখন দেখি এটি রূপায়িত হচ্ছে কানুনগো মহাশয়ের প্রায় একক চেষ্টায়। আনুসাঙ্গিক খরচপত্রেরও গুরুভার এতাবৎ বহন করে আসছিলেন তিনিই, অথচ তিনি নিশ্চয়ই এমন কিছু বিত্তবান নন। সম্প্রতি অবশ্য সাহিত্য অকাডেমির আগ্রহে ভারতসরকারের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছে ও তার ফলে ৫০,০০০ টাকা বরাদ্দ হয়েছে এরই খরচ বাবদ—যদিও মঞ্জুরীর প্রায় দেড় বছর পরে এখনও পর্যন্ত তাঁর হাতে এসে পৌঁছেছে মাত্র ১২,৫০০ টাকা।

'মহাকোষ' চয়নে কানুনগো মহাশয়ের সহকর্মী তাঁর পুত্র ও কন্যা। সম্প্রতি একজন কর্মীও নিযুক্ত হয়েছেন সরকারী মঞ্জুরীর পর।

'মহাকোষ' রচনা বর্তমানকালে বহু বিশেষজ্ঞের মিলিত প্রয়াসের ফলেই শুধু সম্ভব। তাই কানুনগো মহাশয়ের এই বিশাল পরিকল্পনার সত্যকার মূল্য সম্পর্কে সংশয় জাগা স্বাভাবিক—বিশেষ করে যখন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণের একান্ত সীমাবদ্ধতার কথা মনে করি। তবু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে বিশেষজ্ঞেরাও বলেছেন যে কানুনগো মহাশয়ের মহাকোষে প্রসঙ্গ-বিচার Encyclopaedia Britannica জাতীয় মত বনেদী মহাকোষের মত সর্বাঙ্গসুন্দর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ না হলেও তাতে তথ্যের কোন ভুল নেই কোনখানে। আর সকলেই তারিফ করেছেন কানুনগো মহাশয়ের আশ্চর্য সহজ প্রসঙ্গবিচার পদ্ধতির। 'জ্ঞানমণ্ডল' তাই উড়িষ্যার সাধারণ মানুষের কাছে, এমনকি সরকারী মহলেও খুবই সমাদর লাভ করেছে।

চিন্মোহন সেহানবীশ

পা ঠ ক গো ষ্ঠী

আধুনিক চেক চলচ্চিত্র প্রসঙ্গ : ভ্রম-সংশোধন

চেক চলচ্চিত্র সম্পর্কিত আমার লেখার মধ্যে তিনটি শিরোনামা ব্যবহার করেছিলাম। কিন্তু মুদ্রণকালে দ্বিতীয় শিরোনামাটি ("চেতনপ্রবাহ, কাফকা, alienation…") শিরোনামা হিসেবে মুদ্রিত না হয়ে ঠিক পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদের অংশ হিসেবে ছাপা হয়েছে (পৃ. ৪২২, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ পংক্তি, 'পরিচয়', বৈশাখ)। ফলে একটি অর্থহীন অসংলগ্নতার সৃষ্টি হয়েছে। চিতিলোভার ছবির আলোচনা থেকে অকস্মাৎ 'চেতনপ্রবাহ, কাফকা, alienation…' অত্যন্ত বেখাপ্পা লাগছে শুনতে। অপরদিকে 'ডায়মণ্ডস্', 'জোসেফ' ইত্যাদির আলোচনাটির শুরুও খুব আকস্মিক লাগছে।

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

বি য়ো গ প ঞ্জী

অধ্যাপক কোশাম্বী

এই সংখ্যা ছাপার কাজ যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছে তখন হঠাৎ খবর এল অধ্যাপক দামোদর ধর্মেন্দ্র কোশাম্বী আর ইহজগতে নেই। আগামী সংখ্যায় যোগ্য ব্যক্তিরা তাঁর মনীষার পূর্ণ মূল্যায়ন করবেন। আমরা আপাতত তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে জানাই আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।